মুসলিম উম্মাহর জেগে উঠার প্রতীক্ষায়

ড. মোহাম্মদ শামীম খান

মুসলিম উম্মাহর জেগে উঠার প্রতীক্ষায়

Wating for the Waking up of Muslim Ummah

ড. মোহাম্মদ শামীম খান

১ম অনলাইন প্রকাশ: আগস্ট ২০২০
প্রকাশক: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারি
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, আলী-সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: এসপি, এডাবি স্পার্ক, লেখক।

যারা ইসলামকে পছন্দ করেন- এই গ্রন্থ তাদের জন্য।

যারা ইসলামকে পছন্দ করেন না- এই গ্রন্থ তাদের জন্য।

মহান ও পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল সাইয়্যিদুল মুরসালীন
রাহমাতুল্লিল আলামীন খাতামান্নাবিয়্যিন
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ- বিকল্পহীন সর্বজনীন আদর্শ,
বিশ্বনবীর ﷺ সকল সাহাবী ﵃- মানবজাতির সর্বোৎকৃষ্ট জামাতঃ

স্নেহের মাহদী ও তাজদীন-
আল্লাহ যেন তাদেরকে বিশ্বনবী ﷺ ও সাহাবা জামাতের ﵃- আদর্শের ওপর কায়েম রাখেন, আমীন।

হে মহান ও পবিত্র আল্লাহ্, একমাত্র তোমারই জন্য তোমার হাবীবকে ﷺ, তোমার হাবীবের ﷺ সকল সাহাবীকে ﵃ প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি, আমাকে তাঁদের পায়ে স্থান দিও, আমীন।

পাঠক্রম:

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ্। মহান ও পবিত্র প্রতিপালকের করুণায় *মুসলিম উম্মাহর জেগে উঠার প্রতীক্ষায়* গ্রন্থখানা বিশ্ববাসীর সম্মুখে পেশ করা সম্ভব হলো। মহান রাব্বুল-আলামীন কোনো কাজ করাতে চাইলে, বান্দার যোগ্যতা-অযোগ্যতার দিকে তাকান না, তিনিই সকল ব্যবস্থা করে দেন। এই গ্রন্থ আমি লিখিনি, সকলের মালিক ও পরিচালক সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তায়ালা অধমকে ব্যবহার করে ধন্য করেছেন। ইনশাআল্লাহ্, গ্রন্থটি একাধিকবার পাঠ করলে অধিক উপকৃত হওয়া যাবে বলে আশা রাখি।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন অনেক অন্ধকার কাল অতিক্রান্ত হয়েছে যা অকথ্য অত্যাচার-লাঞ্ছিতই নয়, বরং সেই কালসমূহের ঘটনাপ্রবাহ সভ্যতার ভবিষ্যত গতি-প্রকৃতি ও অগ্রগতিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। সভ্যতার গৌরবের পাশাপাশি ঐসব বেদনাবিধূর ইতিহাস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আজও আমাদের সম্মুখে কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক ছিল মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অন্ধকার যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্ব মানবসমাজ জাহেলিয়াতের কারণে যে অধঃপতন ও ধ্বংসের পথে হাঁটছিল, ঐতিহাসিকদের মতে এটা ছিল তার শেষ ধাপ। কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি, মানবীয় বোঝ-বুদ্ধি, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ

ইত্যাদি যে কোনো প্রশ্নে পঞ্চম, এবং বিশেষত ষষ্ঠ শতক ছিল জাহেলিয়াতের সর্বনিকৃষ্ট যুগ। ওহি ও রেসালতের শিক্ষার বিস্মৃতি, বিকৃতি ও বিলুপ্তির মাধ্যমে মানবসমাজ জাহেলিয়াতের পথে যে যাত্রা শুরু করেছিল, ষষ্ঠ শতকে এসে তা মৃত্যুগহ্বরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

এসব কালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সভ্যতার প্রাণ তাওহীদের পরিবর্তে সর্বনাশা শিরক ও মূর্তিপূজার নিষককালো দৈত্যের লালন-পালন এবং সমাজ সংস্কার ও মানবমুক্তির বিকল্পহীন ব্যবস্থা আল্লাহ্ প্রদত্ত রেসালতের পরিবর্তে মনগড়া রেসালতের অনুসরণ। এর অনিবার্য ফল হয়েছিল নিকৃষ্ট স্বৈরতান্ত্রীক সরকার ও রাজনীতি, মানুষ শোষণ করে রাজার বা কতিপয়তন্ত্রের ভোগ-বিলাসের অর্থনীতি, জোর যার মুল্লুক তার বা দুর্বলের উপর সবলের যুলুম-অত্যাচার, বিচারের বাণী নিরবে-নিভৃতে কাঁদা এবং বিচারের নামে অবিচার ও অত্যাচার, জানমাল, ইজ্জত-আবরুর লুণ্ঠন প্রভৃতি। জোনাকী পোকার আলোর মতো যা কিছু ভালত্ব পৃথিবীর নানা প্রান্তে তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তা গোটা বিশ্বমানবতাকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য সক্ষম ছিল না মোটেও, বরং এই আলোও সর্বগ্রাসী ধ্বংসের বিষবাষ্পে নিবু নিবু ছিল। এই অবস্থায় গোটা মানবসমাজ আত্মহত্যার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। আল-কুরআনের ভাষায় এ যেন ছিল:

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

"স্থলে ও জলে (সর্বত্র) মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, যেন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (রুম : ৪১)

G.H.Denson তাঁর *Emotions as the Basis of Civilization* গ্রন্থে লেখেন, 'পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সভ্য পৃথিবী নৈরাজ্যের ধ্বংস-গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়েছিল। কেননা যে সকল ধর্মবিশ্বাস সভ্যতার বিনির্মাণে সহায়ক হয় সেগুলোই বিকৃত হয়ে পড়েছিল। সেখানে উল্লেখযোগ্য এমন কিছু ছিল না যা

সেসবের স্থান পূরণ করতে পারত। তখন মনে হল, যে সভ্যতা গড়ে তুলতে চার হাজার বৎসরের চেষ্টা-সাধনা ব্যয় হয়েছিল তা ছিন্নভিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং মানবজাতি আবার অসভ্যতা ও বর্বরতার পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে যাচ্ছে। গোত্র ও সম্প্রদায় ছিল কেবল পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত, আইন-কানুন বলতে কিছু ছিল না। ... সভ্যতা যেন ছিল ডালপালা ছড়ানো এক বিরাট বৃক্ষ, যার ছায়া সারা বিশ্বে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তা দাঁড়িয়ে থাকলেও পতনুন্মোখ ছিল এবং বিনষ্টি তার মর্মমূলে পৌঁছেছিল। এই ব্যাপক বিপর্যয় ও ধ্বংসের মধ্যেই সেই মহামানব[১] জন্মগ্রহণ করলেন যিনি সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।'

দীর্ঘ ঐসব কালসমূহে কোন-ই সংস্কার প্রচেষ্টা যে হয় নি তা নয়। যারা-ই মানবতার কল্যাণে চেষ্টা করেছেন, ইতিহাসে তারা অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের কাছে কোনো ওহি অবতীর্ণ হত না। ফলে, মানবীয় স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির কারণে ঐসব সংস্কার প্রচেষ্টা ছিল খণ্ডিত প্রয়াস যা দিয়ে মুমূর্ষু বিশ্বমানবতাকে ধ্বংসগহ্বর থেকে টেনে তোলে স্থায়ী শান্তি ও মুক্তির পথে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় পরিবর্তনের জন্য এমন কোনো উচ্চস্তরের কল্যাণশক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

ষষ্ঠ শতকের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটল যিনি গোটা বিশ্বমানবতাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। তিনি এমন একটি দৃষ্টান্ত- জামাত ও শিক্ষামালা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রেখে গেলেন যার নযির পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। তাঁর আদর্শ অর্থাৎ, কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসরণের ফলে এমন একটি সোনালী সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল যা প্রায় আটশত বৎসর ধরে পৃথিবীকে জ্ঞানে ও কর্মে নেতৃত্ব দিয়েছিল। Robert Briffault তাঁর *The Making of Humanity* গ্রন্থে লেখেন, ইউরোপের

---

[১] লেখক এখানে মহানবীর ﷺ কথা বুঝিয়েছেন।

উন্নতি-অগ্রগতির এমন কোনো অঙ্গন নেই যেখানে ইসলামি সভ্যতার বিরাট অবদান নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বের সমাজচিত্র ও এর তৎপরবর্তী যুগসমূহের ইতিহাস যদি নিরপেক্ষ হৃদয়ে অধ্যয়ন করা যায় তাহলে দেখা যাবে, সভ্য পৃথিবীর এমন কোনো অঙ্গন নেই যা ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ হয় নি।

বিশ্ববাসীর প্রতি মুসলিম উম্মাহর রয়েছে সুবিশাল দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে মহান ও পবিত্র আল্লাহ বলেন:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

অর্থাৎ "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে...।" (আলে-ইমরান : ১১০)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন এই বাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থক জামাত যার নমুনা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। মহান প্রতিপালকের নির্দেশ পালনের জন্যে তাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পথহারা মানুষের প্রতি তাঁদের আহ্বান হত:

> "আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন যেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, বের করে আনি মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে, জাগতিক সঙ্কীর্ণতা থেকে পরকালীন প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।"

মুসলিম জাতির হাতে চিরন্তন দীন এবং সুসংরক্ষিত শরীয়ত বিদ্যমান থাকার কারণে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ একমাত্র মুসলিম জাতিকে এই সুমহান দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলমানগণ দিনে দিনে তাদের ওপর অর্পিত এই মহান দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সংস্কৃতির মোহমায়ায় নেতৃত্বের সকল মঞ্চ থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করলেন।

মুসলিম জাহানের শাসক ও জনসাধারণ আবার সেই পুরনো জেহালতে ডুবে যেতে লাগলেন। তারা যেন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, কিন্তু জেহালত তো চিরযৌবনা। মুসলিম উম্মাহর ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র- জীবনের প্রতিটি অঙ্গে জাহেলিয়াতের পুরাতন রোগ-অসুখ দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠছিল, এমনকি আছড়ে পড়া শুরু করল। নির্ভেজাল ঈমান, তাকওয়া ও নিখাদ পরহেজগারী, নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধ, সহজ-সরল জীবন ও পরকালমুখীতা, ইনসাফপূর্ণ জীবন ও সমাজ প্রভৃতির, অর্থাৎ জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর ধারাবাহিক সোনালী ঐতিহ্যের অনুসরণ বাদ দিয়ে তারা বিজাতীয় ভ্রান্ত সংস্কৃতি তথা ভোগবাদ ও বস্তুবাদী জীবনদর্শনের অন্ধ অনুসরণ, পারস্পরিক আত্মবিভেদ ও আত্মকলহ, জ্ঞান-গবেষণা পরিত্যাগকরণ প্রভৃতি আত্মঘাতী জীবনাচারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনে একদিকে প্রেম অন্যদিকে রণমূর্তি- এ তো জগতের অমোঘ নিয়ম। প্রথম যুগের মুসলমানগণ ছিলেন এর সর্বোত্তম আদর্শ, মানবজাতির শুভ-অশুভের অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর পতনের দিকে লক্ষ্য করলে এ যেন মহাকবি আল্লামা ইকবালের ভাষায়:

শোন, বলি তোমায় কোনো জাতির উত্থান পতনের তাকদীর
শুরুতে তীর-তলোয়ার, শেষে পায়েল-সেতারের মধুর ঝঙ্কার ॥

খোলাফায়ে রাশেদার পর যেদিন থেকে মুসলিম উম্মাহর মতিভ্রম ও ভ্রষ্টতার যাত্রা শুরু হয়েছিল, বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব ও মর্যাদার অধঃপতনের বীজ সেদিনই রূপিত হয়ে গিয়েছিল। তুর্কী সালতানাত, ভারতে মোঘল সালতানাতের পতনের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতন তার দীর্ঘ সফরের যবনিকা টেনেছিল বলা যায়। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে মুসলিম জাহানে অনেক তারকার উদ্ভব হয়েছে, যোগ্যতার বিচারে তাঁরা সকলেই ছিলেন আপন আপন কর্ম ও কীর্তিতে সমুজ্জ্বল। কিন্তু পূর্বসূরীদের ঈমানী চেতনা, যোগ্যতা ও কর্মের সঙ্গে পরবর্তী শাসকদেরকে তুলনা করলে দেখা যায়, অধঃপতনের ধারাবাহিক গতি দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েছে। ঐসব কতিপয় উজ্জ্বল তারকার পক্ষে এই অনিবার্য শূন্যতা শতভাগ পূরণ করা যেমন ছিল খুব কঠিন, অন্যদিকে শূন্যতার

দীর্ঘসূত্রীতার বিপরীতে নিশ্চয় অন্য কোনো জাতির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে, যারা এর প্রস্তুতিও গ্রহণ করে চলেছিল। কেননা, ময়দান খালি পড়ে ছিল যা পূরণ হওয়ার দাবী রাখে। ইউরোপই হল সেই জাতি যারা এই শূন্য ময়দানে উঠে এসেছিল, যারা আজ তাদের নেতৃত্ব ও উদ্ভাবন দিয়ে বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইউরোপ যদিও ভোগবাদ ও বস্তুবাদী জীবনদর্শনের সবচয়ে বড় ভোক্তা ও পরিচর্যাকারী কিন্তু ষোল-সতের শতক থেকেই ইউরোপ যেভাবে তাদের গতিপথ চিহ্নিত করা ও বুদ্ধিচর্চা শুরু করেছিল তাতে তখনই মূলত মুসলিম দুনিয়া তথা প্রাচ্য ও ইউরোপের ভবিষ্যত পরিণতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যা ঘটেছে ইতিহাসের গতিধারায় তা ঘটা অনিবার্য ছিল।

কিন্তু পৃথিবীর নেতৃত্বের রঙ্গমঞ্চে ইউরোপ বা পাশ্চাত্য সমাজ যত তন্ত্র-মন্ত্র, ইজম, বাদ-মতবাদ এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে তার সবই বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার অনিবার্য ফল হিসেবে গড়ে ওঠা এবং এ-সবই বিশ্বমানবতার স্থায়ী শান্তি ও মুক্তির পথে ইতোমধ্যে চরমভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে গ্রিক চিন্তামানসের ওপর ভিত্তি করে যা ইন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদ, এবং এককথায় নাস্তিকতার সমষ্টি। পাশ্চাত্য সমাজ ও জীবন- তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্পকলা ইত্যাদির লক্ষ্য তাদের গ্রিক ইন্দ্রিয়বাদী দর্শনের সীমা পর্যন্ত, এর উর্ধ্বে সে কোনো দিন উঠতে পারে নি। যেদিন থেকে সে ধর্মের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিতে শুরু করে, তার এই বস্তুবাদী চিন্তা ও জগৎ সেদিন থেকে ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে।

বস্তুবাদ ও ধর্ম- এ দুটি বিষয় কখনই আপোষমূলক নয়, পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। একটিকে গ্রহণ করলে, অন্যটির বিসর্জন অনিবার্য। পাশ্চাত্য বস্তুবাদকে সকল তনুমন খাটিয়ে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে, ঠিক সেভাবে ধর্মকে বিতাড়িত করেছে। পাশ্চাত্যবাসীর জীবনে ধর্ম বলতে এখন যা কিছু আছে তা নামেমাত্র, বিকৃতির ফলে নবী মুসা আ. বা ঈসা আ.- এর আদর্শ অনুসরণের

কোনো সুযোগ এখন তাদের সম্মুখে বিদ্যমান নেই। এই বসুন্ধরাকে আবালবৃদ্ধবণিতার বাসযোগ্য শান্তির আবাস হিসেবে গড়ে তোলা এমন কোনো জাতির পক্ষে তাই সম্ভবই নয় যাদের কাছে আছে কেবল মানবীয় মন-মগজ-মস্তিষ্কপ্রসূত ত্রুটিযুক্ত ও সীমাবদ্ধ কিছু জ্ঞান। যাদের কাছে কোনো ওহির শিক্ষামালা নেই, এমনকি তারা এর পরোয়াও করে না, যারা ডুবে আছে নাস্তিকতা, বস্তুবাদ, উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী নেশার চাদরে, যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য 'পেট ও পকেট' ছাড়া কিছু নয়, মানুষ শোষণ ও সম্পদ লুণ্ঠনের নেশায় যারা পৃথিবীকে রক্তের গঙ্গায় ভাসায় একের পর এক, দুর্বল জাতিকে নিয়ে যারা স্বার্থের ভাগ-বন্টনের খেলা খেলে গোলটেবিলে বসে- এমন জাতিগোষ্ঠীর কাছে নিখিল বিশ্বের, অন্তত নিপিড়ীত মানুষের কোনো দাবী বা আকাঙ্ক্ষা নেই। তাহলে?

এ অবস্থায় যেসব প্রশ্ন আজ অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে তা হল- মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের মধ্যে দিয়ে গোটা বিশ্বমানবতার কী কোনো লাভ বা ক্ষতি হল? কিংবা যে ইউরোপীয় তথা বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মেষ ঘটল তাতে বিশ্বমানবতার কী লাভ হল? মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের অর্থ-ইসলামের পতন তো নয় মোটেও। তাহলে, মুসলিম উম্মাহর পতনের উল্লাসের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য কী নিজের জন্য কোনো সর্বনাশ ডেকে এনেছে? এবার নিশ্চয় এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার সময় হয়েছে।

ওপরে সংক্ষেপে যা বলা হল এবং যেসব অনিবার্য প্রশ্ন জেগে উঠল তার অপরিহার্য অনুসন্ধান ও প্রামাণিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থ। সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহিমাহুল্লাহর বিভিন্ন গ্রন্থ এবং বিশেষ করে বিখ্যাত *মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল?*- আমার কাজকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে, তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। মাওলানা আবু তাহের মেছবাহকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন যার অনুবাদের মাধ্যমে আমি এই গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। গ্রন্থটি থেকে আমি প্রচুর তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করেছি এবং অনেক তথ্যের সূত্র লাভ করতে পেরেছি। অনেক ক্ষেত্রে আমি মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ- এর অনুবাদ ও শিরোনাম ব্যবহার করেছি। কোনো

কোনো ক্ষেত্রে যদি যথাযথ রেফারেন্স উল্লেখ না হয়ে থাকে তাহলে সেটা দীনের খেদমত হিসেবে বিবেচনা করার জন্য নিবেদন রইল।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "আল-কাসিম"- এর মে-জুন, ২০১৭ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। কিছু সুহৃদ পাঠক বিষয়টিকে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থে রূপ দেওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। বিশেষ করে উক্ত জামেয়ার তৎকালীন মুহতামিম মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া রহ. ও মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। এ গ্রন্থের প্রথম পাঠক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারি। তিনি নানাভাবে এই গবেষণায় সহায়তা করেছেন। লেখক মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান পুরো গ্রন্থ পড়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। শায়খ মাওলানা ফারুক আহমদ, লেখক আবদুল মুকিত মুখতার, প্রফেসর ড. মো: খায়রুল হাসান, ড. মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, লেখক মাওলানা শাহ-নজরুল ইসলাম, লেখক ও সাংবাদিক আব্দুস সবুর মাখন- এর কাছ থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছি। প্রফেসর মো: মুয়াজ্জম হোসেন (সমাজকর্ম বিভাগ, শাবিপ্রবি) গ্রন্থের নিরীক্ষার (Review) বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া রহ. পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছুটা কাজ করেছিলেন। তাঁদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। এই কাজে সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করে অনেক উপকৃত হয়েছি।

এই গ্রন্থ রচনার কাজে দীর্ঘদিন আমাকে স্ত্রী-সন্তান থেকে প্রকারন্তরে বিচ্ছিন্নই থাকতে হয়েছে, এই দূরত্ব এরা নীরবে সহ্য করেছেন। আল্লাহ তাদেরকেও উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ্ যেন এই কাজটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উসিলা হিসেবে কবুল করে নেন, আমীন। ইনশাআল্লাহ, গ্রন্থের যে কোনো ভুল-ত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রইল।

Dr. Mohammed Shamim Khan, Sylhet
sk160674@yahoo.co.uk

১

অন্ধকারের দুনিয়া

মানুষের প্রতি মহান প্রতিপালকের ভালবাসা ও দয়া

জগতসমূহের প্রতিপালক মহান ও পবিত্র আল্লাহ মানবজাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, নিজের প্রতিনিধি বা খলীফা বানিয়ে এই জগতে প্রেরণ করেছেন এবং তার জন্য চলার পথ নির্ধারন করে দিয়েছেন। তার জন্য গোটা জাহানকে সর্বোত্তমরূপে সাজিয়ে দিয়েছেন– এর অনেক কিছু আমরা দেখি ও উপভোগ করি, অনেক কিছু দেখতে পাই না। মানুষের সৃষ্টি ও তার ব্যবস্থাপনার পেছনে মহান আল্লাহর অপরিসীম দয়া ও ভালবাসা নিহিত রয়েছে। মানুষকে আল্লাহ কতো ভালবাসেন, তার জন্য কতো উপায়-উপকরণ নিয়োজিত করেছেন তা মানুষ মাত্রেই চিন্তার দাবি রাখে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ (তীন) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ (বনি-ঈসরাইল) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝ (আবাসা) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ

شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ۞ نَحْنُ جَعَلْنَاهَاتَذْكِرَةًوَمَتَاعًالِلْمُقْوِينَ ۞ فَسَبِّحْبِاسْمِرَبِّكَ الْعَظِيم (ওয়াকিয়া) ﴾

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে। (তীন: ৪) নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনি-ইসরাইল: ৭০) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাকসবজি, যাইতুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।(আবাসা: ২৪-৩২) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? আমি সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী। অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (ওয়াকিয়া: ৬৮-৭৪)

আল্লাহ্ মানবজাতির প্রতি তাঁর অন্যতম কৃপা সম্পর্কে বলেন:

﴿ وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

অর্থাৎ, "আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে, যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" (বাকারা: ১৮৬)

এক হাদিসে কুদসীতে আছে, "যখন বান্দা বলে, ইয়া রাব্বি, ইয়া রাব্বি [হে আমার রব], তখন আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দা, আমি হাজির আছি। তুমি

চাও, তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেওয়া হবে।”[২] মানবজাতির প্রতি মহান ও পবিত্র রাব্বুল আলামীনের ইহসান ও ভালবাসা সম্পর্কে অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষের জন্য উপরিউল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহই যথেষ্ট হতে পারে।

মহান প্রতিপালকের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন– না কারো ইবাদতের, না তাঁর জন্য বা তাঁর পক্ষে কোনো প্রয়োজন পূরণের। কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য যে কোনো মাখলুকের, সে মানুষই হোক আর অন্য প্রাণীই হোক, আল্লাহর দয়া ও করুণা ব্যতীত এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষের প্রতি আল্লাহর যে দয়া ও করুণা চিরন্তনরূপে বিরাজ করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর প্রতি মানুষের কী কর্তব্য ছিল বা আছে? কর্তব্য তো এটাই যে, সে এমন মালিকের দাসত্ব তথা আবদ্বিয়াত স্বীকার ও প্রতিষ্ঠা করবে। অর্থাৎ, মালিকের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। এককথায়, সত্যিকার আবদ্বিয়াত অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করাই হবে মহান আল্লাহর প্রতি বান্দার যথাযত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কিন্তু আজ প্রতিটি মানুষ নিজেকে বিবেকের সঙ্গে জিজ্ঞেস করুক, সে তার মালিকের কী আবদ্বিয়াত অর্জন করেছে? ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র– বিশ্বসমাজের কোনো একটি অঙ্গেও আবদ্বিয়াতের মানসম্মত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া আজ খুব কঠিন। এটি কী মানুষের তার স্রষ্টা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া নয়? আল্লাহ্ আল-কুরআনুল কারিমে বলেন:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

অর্থাৎ,“কীভাবে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন

---

[২] ইবনে আবিদ-দুনইয়া ও বায়হাকী রহ. ইহা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উদ্ধৃতি, আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী রহ.। *হাদিসে কুদসী*। উদ্ধৃতি নং- ২০০।

পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন অতঃপর তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।" (বাকারা : ২৮)

আল্লাহ কুরআনে অন্যত্র বলেন:

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۞ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۞ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾

অর্থাৎ, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রসমূহ খসে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, তখন প্রত্যেকে জেনে নেবে- সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। অতএব, হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? (ইনফিতার: ১-৬)

ইবনে কাসীর রহ. সূরাতুল ইনফিতারের তাফসীরে লেখেন:

সূরায় ১-৪ নং আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলি ঘটার পর মানুষ তার পূর্বাপর যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত হবে। তখন, "প্রত্যেকে জেনে নেবে- সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।" অতঃপর আল্লাহ্ ধমকের সুরে বলছেন, কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? অর্থাৎ, হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল যার ফলে তুমি তাঁর অবাধ্যতা করার সাহস পেলে? এক হাদিসে আছে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন বলবেন, "হে আদমসন্তান! আমার সম্পর্কে কিসে তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিল? হে আদমসন্তান! রাসূলগণকে তোমরা কী জবাব দিয়েছিলে? সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদিন এক ব্যক্তিকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনে বললেন, 'অজ্ঞতাই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে।' অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত পাঠ করে বলেন, 'আল্লাহর শপথ, অজ্ঞতাই মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।' হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতেও এমন বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩]

---

[৩] ইবনে কাসীর রহ। ২০১৩। *তাফসীরে ইবনে কাসীর*। ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফা)। "সূরাতুল ইনফিতার।"

একই সূরায় আল্লাহ্ বলেন, "যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামতো আকৃতিতে গঠন করেছেন।" মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন, এরপর বলা হয়েছে, তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন। মানব সৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর অপার কুদরতী রহস্যে এগুলোর সুসমন্বয়ে একটি সুষম মেজায ও function তৈরি করে দিয়েছেন। শুধু কী তাই? মানবজাতি একটি প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ সকল মানুষকে স্বতন্ত্র আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, যা না হলে মানুষ অসংখ্য অসুবিধা, বিশৃঙ্খলা ও বিপদে পড়ে যেত। এসব নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে।

এভাবে এই সূরায়, এবং কুরআনের নানা স্থানে, একদিকে পৃথিবী ও তার সমুদয় সবকিছুর বিনাশ ও আখিরাতের কথা অন্যদিকে মানুষের অনুপম সৃষ্টির প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, এসব কিছু রাসূলদের মাধ্যমে তোমরা অবগত হয়েছ, অনেক নিদর্শন তো তোমরা নিজ চর্মচোখে তোমাদের সৃষ্টি ও দেহের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকায় নিপতিত হলে, তাঁকে ভুলে গিয়েছ ও তাঁর নির্দেশাবলি অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তো তোমাকে তোমার মহান স্রষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হল? হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু। অর্থাৎ, যে নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে।

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. বলেন, সূরায় 'কারিম' শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার এক কারণ এই যে, আল্লাহ মহানুভব, তিনি তাঁর অতুলনীয় দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের পাপের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না,

তাকে সুপথে ফিরে আসার সুযোগ ও অবকাশ দেন। এমনকি তার রিযিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ, সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরো বেশি আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।[৪]

ষষ্ঠ শতকের বিশ্ব

ওপরে যে মানব-বিভ্রান্তির কথা বলা হল তা-ই যে বিশ্বসমাজের সকল রোগের, সকল যন্ত্রণার, সকল ধ্বংসের মূল কারণ তা আজ কে বুঝবে? বিশ্ব মানবসমাজের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নির্মম প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। মানব-বিভ্রান্তির এই ধ্বংসের রক্তাক্ত ইতিহাস– উত্থান ও পতনের– তার সাধারণ কিন্তু বিস্ময়কর চিত্র, বিশেষত ষষ্ঠ শতকের, আমরা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব।

ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত এটি প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক ছিল মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অন্ধকার যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্ব মানবসমাজ জাহেলিয়াতের কারণে যে অধঃপতন ও ধ্বংসের পথে হাঁটছিল, ঐতিহাসিকদের মতে এটা ছিল তার শেষ ধাপ। পৃথিবীর সর্বত্র ভোগ-দখল ও জুলুম-অত্যাচারে নিমজ্জিত ছিল, মানবতার নিদারুণ ক্রন্দনধ্বনি শোনার তখন কেউ ছিল না। পৃথিবীতে এমন কোনো কল্যাণশক্তি ছিল না যা পথভ্রষ্ট মানবতাকে হাত ধরে সত্য ও শান্তির পথ দেখাবে এবং চূড়ান্ত পতন থেকে রক্ষা করবে, বরং দিনে দিনে অধঃপতনের এই গতি যেন বেড়েই চলছিল। যুগে-যুগে নবী-রাসূলগণ সত্য ও কল্যাণের যে দাওয়াত দিয়ে গিয়েছিলেন তা ভুলে গিয়ে হতভাগা মানুষজাতি বহু আগেই আত্মধ্বংসী পৌত্তলিকতার অভিশাপে ডুবে গিয়েছিল।

---

[৪] মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.। ২০০৫। *তাফসীরে মারেফুল কুরআন*। ঢাকা : ইফা। "সূরা-ইনফিতার।"

একদল দুনিয়াখোর ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করে, নিজের হাতে লেখা গ্রন্থকে ওহি বলে চালিয়ে দিয়ে গোটা মানবজাতিকে সর্বনাশা পচনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ওহি গ্রন্থধারীরা [যেমন: ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতি।] স্রষ্টার অপার এই রহমতরূপ সত্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আরেকদল মানুষও এমন কিছু গ্রন্থকে ওহি ও ধর্মগ্রন্থ সাব্যস্থ করে বসে থাকে যা কখনই ওহির মর্যাদায় উত্তীর্ণ হবার নয়, ফলে এসব গ্রন্থের অনুসারীরাও স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয় ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এর ফলে সর্বনাশা পৌত্তলিকতায় একদিকে তারা আসল মালিককে ভুলে গিয়েছিল, সত্যের বদলে বানিয়েছিল অসংখ্য মিথ্যা খোদা। অন্যদিকে মিথ্যা খোদার সম্মুখে মাথা নত করার মাধ্যমে তারা তাদের মানবীয় মূল্য ও মর্যাদাকে করেছিল লাঞ্ছিত ও পদদলিত। নবী-রাসূলগণ যদি এসময় পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতেন তাহলে তাঁদের রেখে যাওয়া ধর্ম তাঁরাই চিনতে পারতেন না। যেহেতু আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ে ওহির জ্ঞান ও বাণীকে তারা ভুলে গিয়েছিল, ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র– সবকিছু ছিল বাতিলের সাজে সজ্জিত, এতে মানবতার উন্নতি ও মুক্তির জন্য কোনো নূর বা আলোর লেশমাত্র ছিল না। অবস্থা এমন হয়েছিল– স্রষ্টা ও রেসালতের কথা ভুলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, সে হারিয়ে ফেলেছিল মানবীয় স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি এবং কল্যাণ-অকল্যাণের চিন্তাশক্তি। ভালো কী, মন্দ কী, সত্য-মিথ্যা কাকে বলে– তা যেন তার জানাই ছিল না।

ব্যতিক্রম হিসেবে সত্যের শেষ চিহ্ন তখনও যাদের বুকে টিম টিম জ্বলছিল, যারা ছিলেন দ্বীনের ধারক-বাহক, তারা বাতিলের সম্মুখে পিছু হঠে গিয়েছিলেন জিন্দেগির ময়দান থেকে এবং কোনঠাসা হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন উপাসনালয়, গুহা কিংবা অরণ্যে। তারা ভেবেছিলেন এভাবে হয়তো নিজেদের দীন-ঈমান রক্ষা পাবে যামানার ফিতনা থেকে এবং বাকি জীবন কেটে যাবে নির্ঝঞ্ঝাটে। আসলে এটি ছিল জীবনের বাস্তবতা ও দায়-দায়িত্ব থেকে তাদের পলায়ন। এটি ছিল ধর্মশাসন ও রাজ্যশাসন এবং আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাদের কাপুরুষোচিত পরাজয়ের নামান্তর। এককথায়, প্রবল ঝড়-

তুফানের মুখে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং জনপদ ও জনসমাজের নেতৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। অল্প ক'জন, যারা তখনও রয়ে গিয়েছিলেন যিন্দেগির ময়দানে ঝড়-তুফানের মাঝে, তারা ধরেছিলেন সমঝোতার পথ, শাসক ও শোষকের মধ্যে। যুলুম ও শোষণ-নিপীড়নের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন রাজশক্তির ধর্মীয় সহযোগী। অন্যায় পথে মানুষের সম্মান-সম্পদ লুণ্ঠনে তারাও ছিলেন দুনিয়াদারদের সমান অংশীদার। বলা যায়, এরা ছিল দ্বীনের বিক্রেতা ও দুনিয়ার ক্রেতা।[৫]

খ্রিস্টধর্ম

সায়্যিদুল আম্বিয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে দু'জন মহান নবী সায়্যিদুনা হযরত মুসা ও ঈসা আ. তাঁদের জাতিগোষ্ঠীর কাছে মহান রবের বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন। সে সময় এগুলোই ছিল মানুষের আশার আলো। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তাঁদের বিদায়ের পর একদল এসব ধর্মীয় বাণী বা গ্রন্থসমূহকে ইচ্ছামতো বিকৃত করেছিল। ফলে সেগুলোতে মানব মুক্তির কোনো আলো অবশিষ্ট থাকল না। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾

অর্থাৎ, "অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।" (বাকারা : ৭৯)

পরিণতিতে পবিত্র বাইবেলের [তাওরাত/বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও ঈঞ্জিল/বাইবেল নতুন নিয়ম] নামে এমন এক বাইবেল মানুষকে উপহার

[৫] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল?* অনু. আবু তাহের মেছবাহ। ঢাকা : দারুল কলম। পৃ. ৬৫-৬৬।

দেওয়া হল যাতে ঘটেছে প্রচুর স্ববিরোধী, অবৈজ্ঞানিক ও অশ্লিল বক্তব্যের সমাহার। এই ধারাবাহিক বিকৃতি, যার সূচনা মুসা ও ঈসা মাসিহের আ. বিদায়ের পর পরই শুরু হয়েছিল, তারই অবশেষ ফল হল আজকের ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। ইহুদি ধর্মগ্রন্থের নাম হল তাওরাত বা বাইবেল পুরাতন নিয়ম। খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থের নাম হল ইঞ্জিল বা বাইবেল নতুন নিয়ম। Father De. Vaux, Richard Simon, Jean Astruce প্রমুখ বিখ্যাত ধর্মযাজকগণ বলেন, বাইবেলকে বিকৃত করা হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিল যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল সেটি আজ হুবুহু নেই, যেমনটি ইসলাম ধর্মের আছে। তাওরাত ও ইঞ্জিল কীরকমভাবে বিকৃত হয়েছে তার দীর্ঘ বিবরণ দিতে গেলে স্বতন্ত্র পুস্তক লেখার প্রয়োজন; এই দীর্ঘ বিবরণ বিভিন্ন পণ্ডিতগণ তাদের লিখিত গ্রন্থে ইতোমধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৬]

প্রসঙ্গক্রমে শুধু এটুকু উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী খ্রিস্টধর্ম কথাটি মোটেও ঈসা মাসিহের আ. দেওয়া নয়। এটি সাধু সেন্ট পৌলের আবিষ্কার। পৌল বা শৌল ছিলেন ঈসার আ. চরম বিরোধী।[৭] পৌল নিজে বলেন: ঈসার পথে যারা চলত আমি তাদের উপর অত্যাচার করে মেরে ফেলতাম। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ধরে জেলে দিতাম। (ইঞ্জিল শরিফ, প্রেরিত ২২:৪।) ..... কি ভীষণভাবে আমি খোদার মণ্ডলির উপর অত্যাচার করতাম ও তা ধ্বংস করার চেষ্টা করতাম। (ইঞ্জিল শরিফ, গালাথীয় ১:১৩, প্রেরিত, ৯ :১-২, ১৩-১৪, ২২:১৯-২০।) যীশুর বার জন সহচরের মধ্যে তার নাম নেই। কিন্তু তিনিই পরে নিজেকে যীশুর প্রেরিত বলে দাবি করতে থাকেন। ঈসা মাসিহের আ. একটি বহুল প্রচারিত নির্দেশ ছিল, তিনি বলেছিলেন: "আমি কেবলমাত্র ইস্রাইল কুলের হারানো মেষদের (ইহুদিদের) জন্য প্রেরিত হইয়াছি। কাজেই তোমরা অ-ইহুদিদের নিকটে বা শরমিয়দের কোনো গ্রামে যাইও না, বরং

---

[৬] এ বিষয়ে জানতে গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত *খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ*, *সত্যের সন্ধানে*, *খ্রিস্টান-মুসলিম সংলাপ*, *ইযহারুল হক*, বিবিএস প্রকাশিত *বাংলা ইঞ্জিল শরিফ* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ দেখুন।

[৭] এ বিষয়ে জানতে গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত *খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ*, *সত্যের সন্ধানে*, *খ্রিস্টান-মুসলিম সংলাপ* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ দেখুন।

ইস্রাইল কুলের হারানো মেষদের (ইহুদিদের) নিকটে যাইও।" (ইঞ্জিল শরিফ, মথি ১০:৫-৬।) অথচ পৌল দাবি করেছেন যে, ঈসা মাসিহ আ. তাকে অইহুদিদের কাছে ধর্ম প্রচারের জন্য মনোনিত করেছেন। (ইঞ্জিল শরিফ, প্রেরিত ২২:১৮,২১; ১৩:৪৭।) একজন নবী কী এরকম স্ববিরোধী কথা বলতে পারেন? কখনই না। আর এই দায়িত্ব বুঝি তিনি নিজের বিশ্বস্ত সহচরদের বাদ দিয়ে এমন একজনকে দিলেন যিনি ছিলেন ঈসা মাসিহের আ. ঘোর বিরোধী এবং ঈসার আ. অনুসারীদের প্রতি চরম অত্যাচারী। এ ধরনের পরস্পর বিরোধী তথ্য কী করে সম্ভব হতে পারে?

পৌল সম্পর্কে মরিস বুকাইলি বলেন, বস্তুত পৌল হচ্ছেন খ্রিস্টধর্মের সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি। যীশুখ্রিস্টের পরিবারের সদস্যদের নিকট তো বটেই, যীশুর যেসব সঙ্গী-সাথী ও প্রেরিত জেরুজালেমে জেমসের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের নিকটও পৌল বিবেচিত হয়েছেন যীশুর ধর্মীয় মতবাদের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবেই। আসলে, যীশুখ্রিস্ট যে সব লোককে তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য জড়ো করেছিলেন, তাঁদের বর্জন করেই পৌল একা এক আলাদা খ্রিস্ট ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। যীশুর জীবদ্দশায় যীশুর সাথে তার কখনও সাক্ষাৎ বা পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু পৌল তার ধর্ম প্রচারের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করেছেন এই বলে যে, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের পর দামেস্কে যাওয়ার পথে যীশু তার নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৮] এখন পৌল প্রচার করা শুরু করলেন যে তিনি যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং যীশু তাকে প্রেরিত (নবী) পদ দিয়েছেন। অতঃপর কালবিলম্ব না করে যীশুর নামে চরম মিথ্যা কথা প্রচার করতে লাগলেন যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। (ত্রাণকর্তা যীশুখ্রিস্টের নতুন নিয়ম, প্রেরিত ৯:২০।) পৌল খ্রিস্টবাদ নাম দিয়ে আরো প্রচার করেন যে, ঈসা মাসিহের অনুসারীদের কোনো শরীয়ত (বিধিবিধান) পালনের প্রয়োজন নেই, ঈসা

---

[৮] মরিস বুকাইলি। *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান*। ১৯৯৬। অনু. আখ্তার-উল্-আলম। ঢাকা:জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। পৃ. ৭৮। অথবা, Maurice Bucaille. *The Bible, The Qur'an and Science.* Translated from French by Alastair D. Pannell and The Author. p. 41. [To check the source, search in google by the book name.]

মাসিহের অনুসারীরা যত পাপ-ই করুক না কেন কোনো অসুবিধা নেই কারণ মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে ঈসা মাসিই সকলের মৃত্যু পর্যন্ত সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।

মুসা আ.- এর শরীয়তে শিরক, নরহত্যা, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি অপরাধ নিষিদ্ধ। ঈসা আ. বলছেন যে এগুলো অবশ্যই মানতে হবে। সাধারণ বিবেকও এসব কর্মকে পাপ বলে সাব্যস্ত করে। কিন্তু পৌল বলছেন যে এসব মানার প্রয়োজন নেই। (গালাতীয় ৫:৪, ২/১৬, ৩/১১-১৩, ঈঞ্জিল শরিফ, রোমীয়: ৩/২৮, ৩/২০ প্রভৃতি।) তাহলে মদ, যিনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, অন্যায় রক্তপাত প্রভৃতি শত পাপ বা অপরাধ করলেও কোনো দোষ নেই, কেবল ঈসা মাসিহকে বিশ্বাস করলেই সে মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে যাবে। অন্যদিকে, প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টমতের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথারও বলেছেন: তোমরা পাপ কর। পরিপূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে পাপ করতে থাক আর শুধু বিশ্বাস কর। খিস্টের ওপর শুধু বিশ্বাসই তোমাদের মুক্তি দেবে যদিও তোমরা প্রতিদিন একহাজার বার ব্যভিচার বা হত্যার মতো পাপে লিপ্ত হও।[৯]

বাইবেল বিষয়ে একমাত্র ঈসার আ. বিখ্যাত ও ঘনিষ্ঠ সাহাবি বার্ণাবাস লিখিত সুসমাচারসমূহ বিকৃতি থেকে সৌভাগ্যক্রমে অনেকটা বেঁচে গিয়েছে। বার্ণাবাসের সুসমাচারে আছে: (১) আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই, (২) ঈসা মাসিহ আ. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তিনি অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষ (৩) আল্লাহ স্ত্রী-সন্তান থেকে পবিত্র, (৪) ঈসা মাসিহ আ. মরিয়ম পুত্র, তিনি খোদাও নন খোদার পুত্রও নন, তিনি আল্লাহর দাস ও রাসূল, (৫) ঈসা মাসিহ আ. কেবল ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, (৬) সেন্ট পৌল বা শৌল নামে ঈসার কোনো সহচর ছিলেন না, (৭) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ইসমাইল বংশে আরবে জন্ম লাভ করবেন যিনি প্রেরিত হবেন গোটা বিশ্বের জন্য, তিনি এসে ধর্মকে পরিপূর্ণ করবেন- তিনি হলেন আহমদ

[৯] *ক্যাথলিক হেরাল্ড*, ভলিউম ৯, পৃ. ২৭৭।

ও মুহাম্মদ, তাঁর ওপর ঈমান আনা ছাড়া পরকালে মুক্তি নেই, (৮) [ঈসা মাসিহ বলেন] আমি মুসার শরিয়ত বাতিল করতে আসি নাই প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি, কোনো নবী-ই শরীয়ত বাতিল করতে আসেন না কেননা শরীয়ত পালন ব্যতিরেকে আল্লাহকে খুশি করার চিন্তা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়, (৯) প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের ফল পরকালে ভোগ করতে হবে, একের পাপে অন্য দোষী হবে না ইত্যাদি।[১০] ধর্মগ্রন্থ বিকৃতির চিত্র যদি এই হয়, তাহলে জীবন এবং সমাজের অন্যান্য অঙ্গের বিকৃতি যে চরম আকার ধারণ করবে তা বলাই বাহুল্য।

পৌলের পর বিকৃত খ্রিস্টধর্মের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকেন কনস্টান্টাইন। ৩০৫ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টাইন রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন যিনি ধারাবাহিক নানা ঘটনার অনিবার্যতায় পূর্বেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এতে প্রতিমাপূজার উপর খ্রিস্টধর্মের এক আপাত বিজয় অর্জিত হয় এবং এমন এক বিশাল সাম্রাজ্য ও অপ্রতিহত রাজশক্তি অর্জিত হয় যা এর আগে সে কল্পনাও করতে পারে নি। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের বিরাট আত্মত্যাগ, রক্তনদীর ওপর তৈরি তাদের লাশের সেতু পার হয়ে কনস্টান্টাইন ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন। কৃতজ্ঞ সম্রাট তাদের এই অবদানের প্রতিদান দিয়েছিলেন, এমনকি তাদেরকে সাম্রাজ্য শাসনে পূর্ণ অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় ছিল প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টধর্মের জন্য চরম আত্মবিপর্যয়ের এক সূচনা। কারণ একদিকে খ্রিষ্টের চরম বিরোধীতাকারী মূর্তিপূজকরা বিজয়ের অংশীদার সেজে, অন্যদিকে স্বয়ং খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা খ্রিস্টধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছিল। সবচেয়ে ভয়াবহ

[১০] *THE GOSPEL OF BARNABAS*. EDITED AND TRANSLATED FROM THE ITALIAN MS. IN THE IMPERIAL LIBRARY AT VIENNA BY LONSDALE AND LAURA RAGG WITH A FACSIMILE. OXFORD AT THE CLARENDON PRESS 1907; আফজাল চৌধুরী অনূদিত, *বার্ণাবাসের বাইবেল*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।

বিকৃতি ঘটেছিল স্বয়ং কনস্টান্টাইন দ্যা গ্রেটের হাতে যিনি খ্রিস্টধর্মের রক্ষক ও পতাকাবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। Drapar লেখেন:

> রোমান সাম্রাজ্যে যারাই ক্ষমতা লাভ করতেন তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হত সাম্রাজ্য, মুনাফা ও ক্ষমতা। রাজার অনুগত সাধারণ জনগণ ধর্মকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাত না। অবশ্য ধর্ম প্রশ্নে রাজা-প্রজা কেউই মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত ছিল না। কনস্টান্টাইন খ্রিস্টবাদকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পুনর্বাসিত করেছিলেন কিন্তু এ ব্যবস্থা খ্রিস্টধর্মকে গ্রিক পৌরাণিকতায়ই পর্যবসিত করেছিল। এটি ছিল খ্রিস্টবাদী-মূর্তিপূজা কিংবা মূর্তিবাদী-খ্রিস্টবাদ অর্থাৎ, মূর্তিপূজা ও খ্রিস্টধর্মের পারস্পরিক সংমিশ্রন।[১১]

এভাবে খ্রিস্টধর্ম হয়ে পড়ে গ্রিক কল্পকথা ও রোমান প্রতিমাবাদ এবং মিশরীয় প্লেটোবাদ ও সন্ন্যাসবাদের এক আজগুবি মিশ্রন। খ্রিস্টধর্ম তখন হয়ে পড়েছিল বিক্ষিপ্ত কিছু চিন্তা-বিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের সমষ্টি। এতে না ছিল আত্মার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি, না ছিল আকল-বুদ্ধি এবং ভাব ও আবেগের চাহিদা পূরণের পর্যাপ্ত উপকরণ। ফলে এটি না পেরেছে জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে, না পেরেছে জাতি ও সভ্যতার চলার পথ আলোকিত করতে; বরং মূর্খ ধর্মনেতা ও ধূর্ত ধর্মবণিকদের লাগাতার হস্তক্ষেপের ফলে একসময় তা হয়ে পড়েছিল মানুষ এবং তার মুক্ত বুদ্ধি ও সুস্থ চিন্তার মাঝে অন্তরায়। বহু শতাব্দীর ধারাপ্রবাহে তা হয়ে পড়ে নিছক প্রতিমানির্ভর একটি ধর্ম, ঈসা মাসিহের শিক্ষা ছিল যা থেকে বহু দূর।[১২]

G.H.Denson তাঁর *Emotions as the Basis of Civilization* গ্রন্থে লেখেন, খ্রিস্টধর্ম যেসব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তা ঐক্য ও শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিভেদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির পক্ষেই কাজ করেছিল।[১৩] সুতরাং খ্রিস্টধর্মে তখন সবকিছু ছিল, ছিল না শুধু ঈসা মাসিহের সহজ-সরল শিক্ষামালা- আদর্শ ও বিশ্বাস।

---

[১১] John William Drapar. 1875. *History of the Conflict between Religion and Science.* New York: D. Apleton & Company. pp. 39-52.

[১২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৭০-৭১।

[১৩] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৫৬।

আজ ঈসাও আ. যদি এসে এই খ্রিস্টধর্ম দেখেন তবে ইহা সুনিশ্চিত যে স্বয়ং তিনিও একে তাঁর প্রচারিত ধর্ম বলে চিনতে পারবেন না। পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদক Shell ষষ্ঠ শতকের নাছারাবাদ সম্পর্কে বলেন, "ধর্মজাযকদের পূজা এবং খ্রিস্টের ছবি ও প্রতিমার উপাসনা করার ক্ষেত্রে খ্রিস্ট সম্প্রদায় বড়ো সীমাছাড়া হয়ে পড়েছিল, এমনকি এ যুগের ক্যাথলিকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।"[১৪] মজার বিষয় হল, এতকিছুর পরেও ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতি উভয়ে একে অন্যকে 'কোনো ধর্মের ওপর নেই এবং পথভ্রষ্ট' বলে দাবি করত।

ভয়াবহ রোমান সাম্রাজ্য

ঈসা মাসিহ আ. যখন তাঁর ধর্মমত প্রচার শুরু করেছিলেন তখন ইউরোপের অর্ধেকের বেশি, উত্তর আফ্রিকার প্রায় সমগ্র এবং পশ্চিম এশিয়ার এক বৃহত্তম অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ৩৯৫ খ্রি. থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে উসমানী তুর্কীদের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রোমান বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল গ্রীস, বলকান অঞ্চল, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, সমগ্র উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল। রোমান সাম্রাজ্যে এই বিশাল এলাকা দৈবক্রমে খ্রিস্টধর্মের শষ্যক্ষেত্র এবং বিরোধী গোত্রসমূহের সমরক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।[১৫] খ্রিস্টধর্মের মৌলিক ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক-কলহ, নির্বোধ চর্চা এমন প্রবল রূপ ধারণ করে যে গোটা জাতির চিন্তা-চেতনা তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, অন্তসারশূন্য অবস্থায় গোটা জাতির মেধা-প্রতিভা এবং কর্মশক্তি বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন ফেরকার তর্ক-বিতর্ক, নির্বোধ চর্চা চলত যে– ঈসার আ. জন্মের পরও মরিয়ম কুমারী ছিলেন কিনা, ঈসা মরিয়মের চেয়ে ভাল, না মরিয়ম ঈসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ঈসার দেহরূপ কেমন ছিল, অশরীরী, না আত্মা ও দেহ একই পদার্থের তৈরি ছিল ইত্যাদি। মুদি

---

[১৪] *Shell's Translation*. 1896. p. 62.

[১৫] সৈয়দ আমীর আলী। ১৯৮৭। *দি স্পিরিট অব ইসলাম*। রাশিদুল আলম অনু. কলকাতা:মল্লিক ব্রাদার্স। পৃ. ৩১।

দোকানী, কসাই, চাপরাশি যে কারো কাছে গেলে আগে ঐসব তর্ক-বিতর্কের অবতারণা হত তারপর কাজের কথা হত। অবস্থার পরিণতিতে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি বলতে তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না। আসলে এসব হল কোনো জাতির পতন ঘনিয়ে আসার আলামত। ইহুদিরা অনেক আগে থেকেই খ্রিস্টানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত। এরা খ্রিস্টানদের এই ফের্কাবাজি ও আত্মকোন্দল জিইয়ে রাখতে তলে তলে নানা যড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। এসব বিতর্ক ও তর্কযুক্ত সময় সময় অস্ত্রযুদ্ধের ভয়াল রূপ ধারণ করত যার পরিণতি ছিল নির্মম নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা ও রক্তপাত। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে পারসিকদের উপর বিজয় লাভের পর সম্রাট হিরাক্লিয়াস (৬১০-৬৪১) বিবদমান গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কেউই নিজস্ব, বিশেষত কিবতিরা, মতবাদ ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। ফলে তাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পথভ্রষ্ট ধর্মান্ধদের হাতে মানুষের জান-মাল এমনকি ইজ্জত-আবরু পর্যন্ত নির্দয়ভাবে লুণ্ঠিত হত। গীর্জা ও ধর্ম চর্চাকেন্দ্রসমূহ পরিণত হয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুদ্ধমান ধর্মীয় দল-উপদলের সমর শিবিরে। এভাবে গোটা রোমান সাম্রাজ্য নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে। ধর্মীয় বিরোধ-বিবাদের উৎকটতম প্রকাশ ঘটেছিল রোমান ও সিরিয়ান, এবং মিশরীয় খ্রিস্টানদের মধ্যে, আরো সুনির্দিষ্টভাবে রাজধর্ম ও মানুবাদের মধ্যে। রাজধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল যিশুখ্রিস্টের দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাস। পক্ষান্তরে মানুবাদীরা বিশ্বাস করত- তিনি একটিমাত্র সত্তা ধারণ করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সত্তা যার মাঝে তাঁর মানবীয় সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গিয়েছে।[১৬] এভাবে তারা সবাই ধর্মের মূলতত্ত্ব থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

---

[১৬] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত* : ৭১-৭২।

রাজাগণ নিজেদেরকে খোদা বলে দাবি করত এবং মানুষকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেটা মানতে হত। রাজা বা সম্রাটকে খোদা না মানার অর্থ হত নিশ্চিত মৃত্যুকে নয়তো গুহাবাসকে আলিঙ্গন করা। দু'এক জন ব্যতিক্রমি ব্যক্তিত্বের কথা বাদ দিলে, সকলেই এই রীতিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল; এর পক্ষে-বিপক্ষে কোনো সৎ যুক্তি তাদের মস্তিষ্কে ধরা দিত না। যখন রাজা বা সম্রাট ঈসায়ী বিশ্বাসের বিরোধী হতেন তখন ঈসায়ীদের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট নেমে আসত, কথায় কথায় তাদেরকে তখন নিপীড়ন-নির্যাতন ও হত্যা কিংবা পুড়িয়ে মারা হত। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে-কাহাফের ঘটনা এসবেরই ফলশ্রুতি ছিল যাতে সত্যপন্থি একত্ববাদী কতিপয় যুবক তাদের ঈমান বাঁচানোর প্রয়োজনে গুহাজীবনে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আবার সম্রাট বিপরীত বিশ্বাসের হলে অন্যপক্ষের একই পরিণতি হত।

ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক জিঘাংসার বিষবাষ্পে মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার পুরোপুরি মৃত্যু ঘটেছিল। বিজয়ী দল বিজিতের উপর এমন পাশবিক আচরণ করত যা বিশ্বাস করা খুব কঠিন। ইহুদি-খ্রিস্টানরা একে অন্যকে দলে দলে আগুনে পুড়িয়ে, নদীতে ডুবিয়ে, এমনকি হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষেপ করে হত্যা করত।[১৭] গিবন লেখেন, "সহজ দ্রুত মৃত্যু ছিল নিহতের জন্য করুণা যা তাদের ভাগ্যে প্রায়ই জুটত না।" গিবন আরো লেখেন, ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে রোমান সাম্রাজ্য অধঃপতনের শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছেছিল। তার মধ্যে অধঃপতন ও ধ্বংস ছাড়া কিছু বাকি ছিল না এবং কাউকে কিছু তার দেওয়ারও ছিল না।[১৮] অবাধ যৌন সম্ভোগের লালসায় মানুষ পারিবারিক ও বৈবাহিক বন্ধন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছিল। এককথায় সর্বত্র ছিল অন্যায়-অবিচারের জয়যাত্রা।

---

[১৭] উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৭৯-৮০।

[১৮] Edward Gibbon. 1938. *The Decline and Fall of the Roman Empire*. Vol. 5. London : J. M. Dent & Sons Ltd. p. 31.

সৈয়দ আমীর আলী লেখেন, খ্রিস্টধর্মের কর্তৃত্বাধীন জাতিসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সমভাবে শোচনীয় ছিল। চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা মাননবজাতির ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।[১৯] যেসব খ্রিস্টধর্মত্যাগী তৎকালীন শক্তিশালী ধারণার থেকে স্বাতন্ত্র ঘোষণা করতে সাহসী হয়েছিল তাদের হত্যাযজ্ঞের উপর খ্রিস্ট রাজত্বের আনন্দোৎসব অনিুষ্ঠিত হয়েছিল। ধ্বংস, হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মিশর, ধ্বংসোন্মুখ আফ্রিকা, স্পেন– রোমান সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে নৈতিক জীবনের প্রতিটি শিখা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে ধর্মের পুরোহিত ও জনগণের সম্মুখে দেশের কল্যাণকামী নার্সেসকে কনস্টান্টিনোপলের বাজারে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। রোমের রাজপথে গভর্নরের চোখের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী বিশপদের দলীয় লোকেরা যুদ্ধ বাঁধিয়ে খ্রিস্টানদের রক্তে গির্জায় বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে সম্রাটের অধিনস্ত বড় বড় কর্মচারীরা দাসদাসী পরিবৃত্ত সুশোভিত ভিলায় চরম আনন্দ-বিলাসে জীবন উপভোগ করছিল।[২০]

অনেক সম্রাটও তখন নির্মমভাবে নিধনের শিকার হতেন। যেমন: ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে মরিস নামে একজন পুণ্যাত্মা সম্রাট বাইজান্টাইন সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। একজন খ্রিস্টান নৃপতির যড়যন্ত্রে তাকে স্ত্রী-পুত্রসহ পৈশাচিকভাবে নিধন করা হয়েছিল। সম্রাটকে তাঁর কক্ষ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করা হয় এবং তাঁর চোখের সম্মুখে তাঁর পাঁচটি পুত্রকে পর পর হত্যা করা হয়েছিল। সম্রাটের নিধনের মধ্যে দিয়ে এই মর্মন্তুদ দৃশ্যের যবনিকা পতন হয়েছিল। সম্রাটের স্ত্রী ও কন্যাগণের উপর চালানো হয়েছিল অবর্ণনীয় নির্যাতন এবং যে স্থান হতভাগা সম্রাটের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেখানে তাদের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। গোটা পরিবার নিধনের বিভীষিকার এখানেই শেষ ছিল না। সম্রাটের বন্ধু-বান্ধব, সহচর ও পরিষদবর্গের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছিল তা বাইজান্টাইন খ্রিস্টানদের নৈতিকতার এক চরম নিদর্শন হয়ে আছে। তাদের চক্ষুদ্বয় ছিদ্র করা হয়েছিল, জিহ্বা মূল থেকে কেটে দেওয়া

---

[১৯] সৈয়দ আমীর আলী। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৩।

[২০] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৪।

হয়েছিল, তাদের হস্তপদ কেটে ফেলা হয়েছিল; কেউ কেউ বেত্রাঘাত চলাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, কাউকে অগ্নিদগ্ধ করে নিধন করা হয়েছিল, কাউকে নিধন করা হয়েছিল তীরবিদ্ধ করে।[২১] মিলম্যানের মতে, এভাবেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নিঃশেষ হয়েছিল, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কোন্দলের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, ধর্মতাত্ত্বিক বিতণ্ডার ফলে উন্মত্ততার ঝড়ো হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং "ধর্মীয় বিশ্বাসের একানুবর্তিতা চাপিয়ে দেওয়ার মত্ততায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল"– এসব হত্যা, লাম্পট্য ও নিষ্ঠুরতার ঘৃণ্য চিত্র হাজির করেছিল।[২২]

নীলকন্যা মিশরের কান্না

সুজলা-সুফলা খ্যাত মিশর ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে নীলের [নীলনদের] জল যেন ছিল মিশরীয়দের ব্যথাতুর নীল-অশ্রুজল। নদবী রহ. লেখেন, এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, রোমকদের শোষণ-অত্যাচার ও ধর্মীয় নিপীড়নের ফলে সপ্তম শতকে এমন দেশটি তখন ছিল আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে দুর্ভাগা দেশ।[২৩] রোমান সাম্রাজ্যের সময় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী ছিল মিশরীয় ও রোমানদের মধ্যে লাগাতার রক্তক্ষয়ী সজ্ঘাত-সংঘর্ষের যুগ যার ইন্দন ছিল জাতিগত ভিন্নতা ও প্রবলতর রাজধর্ম ও মানুবাদের ধর্মীয় বিরোধ-বিবাধ। যদিও ধর্মকে তখন লোকজন পূণ্যকর্মের সহায়ক বলে ভাবত না, বরং তাদের কাছে এ ছিল কিছু বিষয়ের তত্ত্ব-বিশ্বাস মাত্র। অথচ অদ্ভুদ যে, এই বিশ্বাস বা দর্শনের চুলচেরা পার্থক্যকে উপলক্ষ করে তারা জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হত না।[২৪] গ্যাস্টপ লেভেন লেখেন, বলতেই হবে, মিশরকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এর ফলে সে অবক্ষয়ের অতলে চলে গিয়েছিল, ইসলামের

---

[২১] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৪।

[২২] মিলম্যান। *ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি*। ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৪, উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৫।

[২৩] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত* : ৭৫।

[২৪] A.J. Butler. 1902. *Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty years of the Roman Dominion*. London : Clarendon Press. pp. 29-30.

বিজয়াভিজানের আগে যা থেকে সে আর উদ্ধার পায় নি।[২৫] রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে, খ্রিস্টধর্মের অনুসারী হয়েও এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজভাণ্ডারে উৎপাদিত সম্পদের বিরাট অংশ প্রদান করা সত্ত্বেও মিশরীয়দের কোনো প্রকার অধিকার ছিল না। বিশেষত যে স্বাধীনতা ছাড়া জীবন স্থবির ও অর্থহীন, রোমান ও বাইজান্টাইন শাসনে মিশরীয় জনগণ ছিল এর অন্যতম নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাধ্যাতীত নতুন নতুন কর ও খাজনা দিতে তারা বাধ্য ছিল। বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্যে মিশরীয়রা ছিল শোষণের নিমিত্তে নানা বৈষ্যমূলক আইনের যাতাকলে পিষ্ট।[২৬]

A. J. Butler লেখেন, রোমকরা মিশর থেকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মানুষের সাধ্যাতীত মাথাপিছু খাজনা ও বিভিন্নমুখী কর আদায় করত।[২৭] নদবী রহ. যথার্থই লেখেন, রোমানরা মিশরকে গ্রহণ করেছিল শুধু দুধের বকরীরূপে। তারা দুধ দোহন করত শেষ ফোঁটা পর্যন্ত। ঘাস ও দানা-পানি যা খাওয়াত তা শুধু এজন্য যে ওলানে দুধ যেন ভালো করে জমে। মিশরে রোমকদের একমাত্র কাজ ছিল মিশরীয়দের সম্পদ লুণ্ঠন ও রক্তশোষণ।[২৮] মিশরে সাইরাসের দীর্ঘ দশ বছরের শাসনামল ছিল নিষ্ঠুর নিপীড়ন-নির্যাতনের যুগ। হাজার হাজার মানুষকে পানিতে জীবন্ত ডুবিয়ে মারা হত, মানুষকে ঝুলিয়ে আগুনে ঝলসানো হত যাতে চর্বি গলে আগুন নিভে যেত। কখনও মানুষকে বস্তাবন্দী করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হত।[২৯] রোমান ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়– স্বেচ্ছাচার ও শোষণ-জুলুমের যাতাকলে মুমূর্ষু মিশরের করুণ কাহিনী এভাবেই ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে।

---

[২৫] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ., ২০১৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫; Goldschmidt. *Ibid.* p. 38.

[২৬] *Historian's History of the World.* Vol. 7, p. 173; Goldschmidt. *Ibid.* pp. 35-38.

[২৭] A. J. Butler. *Ibid.*

[২৮] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৭৬।

[২৯] A. J. Butler. *Ibid.* pp. 183-189.

ইউরোপ

গোটা ইউরোপ ছিল অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।[৩০] বিশেষ করে, মানবসমাজের বহমান স্রোত থেকে তারা যেমন ছিল বহু দূরে অন্যদিকে যা কিছু সভ্যতা তখনও পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঠিকে ছিল সে সম্পর্কেও তাদের কোনো খবর ছিল না। এরা ছিল খুনাখুনি, হানাহানি ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। চিন্তা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা ছিল নবীন খ্রিস্টধর্ম ও প্রাচীন মূর্তিপূজার মাঝামাঝি অবস্থানে। ধর্মবিশ্বাস, রাজনীতি কোনো কিছুর জন্যই তাদের কাছে কোনো নূর বা বাণী ছিল না। পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে H.G. Wells লেখেন, পশ্চিম ইউরোপে তখন একতা এবং সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার লেশমাত্র ছিল না।[৩১] Robert Briffault তাঁর বিখ্যাত *The Making of Humanity* গ্রন্থে লেখেন:

> From the fifth to the tenth century Europe lay, sunk in a night of barbarism which grew darker and darker. It was a barbarism far more awful and horrible than that of the primitive savage, for it was the decomposing body of what had been a great civilization. The features and impress of that civilization were all but completely effaced. Where its development had been fullest, in Italy and in Gaul, all was ruin, squalor, desolation.[৩২]
>
> অর্থাৎ, পঞ্চম থেকে দশম শতক পর্যন্ত ইউরোপ বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল যা দিন দিন বেড়েই চলছিল। ঐ বর্বরতা ছিল আদিম যুগের চেয়েও ভয়াবহ, এ যেন ছিল বিরাট কোনো সভ্যতার পচা লাশ। সব ভাল কিছু নষ্ট হয়ে ধ্বংস ও বিলুপ্তি অবধারিত হয়ে উঠেছিল। ইটালি ও ফ্রান্সে এক সময় যে সভ্যতার উন্নতি ঘটেছিল, সেসব অঞ্চলে সব ধ্বংস হয়ে পড়েছিল, ছিল কেবল গোলযোগ ও নৈরাজ্য।

---

[৩০] H.G. Wells. 2010. *A Short History of the World.* World Public Library. p. 164.

[৩১] *Ibid.*

[৩২] Robert Briffault. 1919. *The Making of Humanity.* London : George Allen & Unwin Ltd. p. 164. [to veiw: www.archive.org]

সৈয়দ আমীর আলী লেখেন, ইসলামের আগমনের পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে সমগ্র খ্রিস্টান ইউরোপ নিশ্চিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং যাজকতন্ত্র বিভেদ ও দলাদলিতে বিদীর্ণ হয়েছিল। জনসাধারণের ধর্মীয় ধারণা পৌত্তলিক স্তর অতিক্রম করেনি; মৃত ব্যক্তির আত্মাসমূহ পূজিত হত এবং যেসব ব্যক্তি জীবদ্দশায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে উপাস্যে পরিণত হতেন। পুণ্যাত্মার দেহাবশেষ ও স্মৃতিচিহ্ন সর্বজনীন উপাসনায় পরিগণিত হয়েছিল। এভাবে খ্রিস্টধর্ম পৌত্তলিকতায় পুনরাবর্তিত হয়েছিল।[৩৩]

ইহুদি জাতি

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে ইহুদি জাতি চারিত্রিক অধঃপতন, নৈতিক অবক্ষয়, মনুষত্যহীনতা- জাতিগত নষ্টাচারে চরম স্তরে পৌঁছেছিল। ওহির জ্ঞানভাণ্ডার এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার দিক দিয়ে ইহুদি জাতি অনেক জাতির চেয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু ধর্ম, রাজনীতি তথা সভ্যতার ময়দানে তাদের তেমন কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। বরং ইতিহাসের পাতা তাদের দাসত্ব, শোষণ-নিপীড়ন, বিতাড়ন-নির্বাসন, এককথায় দুর্যোগের দুর্ভাগা কাহিনী দ্বারা ভরপুর। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এদেরকেই 'অভিশপ্ত' জাতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? কিন্তু কেন?

দীর্ঘ দাসত্বের মধ্যে একদিকে নিজেদের জাত্যাভিমান, বংশগৌরব অন্যদিকে মনো-চারিত্রিক স্খলন– সম্পদলিপ্সা ও সুদখোরিতা, পরাজয়ে আত্মসমর্পণ ও পদলেহন, বিজয়ে নীচতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। কপটতা, প্রতারণা, নির্দয়তা, স্বার্থপরতা, সম্পদ আত্মসাৎ এবং সত্যের পথে বাঁধা সৃষ্টি করা ছিল তাদের স্বভাবজাত দোষ। নবী-রাসূল হলেন মানব জাতির হিদায়াতের মাধ্যম যা ছাড়া মানুষ পশুর চেয়েও নিচে নেমে যায়, অন্যান্য মাখলুকের জন্যও নবীগণ রহমত স্বরূপ। অথচ পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী বাহক নবী-রাসূলগণকে যে জাতি সবচেয়ে বেশি উৎপীড়ন-নিপীড়ণ ও

---

[৩৩] সৈয়দ আমীর আলী। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪২-৪৩।

হত্যা করেছে সেটা এই ইহুদি জাতি ছাড়া আর কেউ নয়। এসবই তাদের অভিশপ্ত হওয়ার মূল কারণ। সম্ভবত ইহুদি-খ্রিস্টান [খ্রিস্টান জাতির কথা কিছুটা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।]- দুই জাতির এমন চিত্তবিকৃতিই তাদেরকে পারস্পরিক জিঘাংসার বিষবাষ্পে নিয়োজিত রাখত।

পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইহুদিরা সব সময় খ্রিস্টানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত। কারণ খ্রিস্টানরাই ইহুদিদেরকে বায়তুল-মাকদাস থেকে বহিঃষ্কার করেছিল। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইহুদিরা সব সময় প্রস্তুত থাকত। পর্দার আড়ালে তারা সর্বদা তৎপর থাকত যেন খ্রিস্টানরা কোথাও প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে। ইহুদি-খ্রিস্টান জাতি পরস্পরের বিনাশ সাধনের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না যার কিছু পরিচয় একটু পূর্বেই আমরা পেয়েছি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার পালাবদল এমন হত যে, যখন যে জয়ী হত তখন বিজিতের উপর পাশবিকতায় অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার হিংস্র প্রতিযোগিতা উল্লাসভরে পালন করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সম্রাট ফোকাসের রাজত্বকালে (৬১০ খ্রি.) ইহুদিরা এন্টাকিয়ায় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ দাঙ্গাবাজি শুরু করলে সম্রাট কর্তৃক দাঙ্গা দমনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাপতি বোনোসাস চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ইহুদি নিধনে মেতে উঠেন– হয় তলোয়ারের লোকমা বানিয়ে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে, এমনকি হিংস্র জানোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করে।[৩৪]

পারসিকরা খ্রিস্টানদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল। অগ্নিপূজারীরা সদা সতর্ক থাকত যে খ্রিস্টধর্ম যাতে ফোরাত নদী অতিক্রম করতে না পারে। সুতরাং ইহুদিরা খ্রিস্টান নিধনে পারসিকদের এই মনোভাবকে দারুণ সুযোগ মনে করত। দৃষ্টন্তস্বরূপ, রোমান সম্রাট ফোকাসের রাজত্বকালে, ৬১৫ খিস্টাব্দে পারসিকরা যখন শাম (সিরিয়া, জর্দান ও ফিলিস্তিনের বিস্তির্ণ ভূখণ্ড) জয় করল তখন ইহুদিদেরই প্ররোচনায় সম্রাট খসরু খিস্টানদের উপর পাশবিকতা ও

---

[৩৪] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৭৯।

বর্বরতার চূড়ান্ত করে ছাড়েন। তিনি তাদের এমন কচুকাটা করেন যে, খুব কম সংখ্যক খ্রিস্টানই ইরানী তলোয়ার থেকে রেহাই পেয়েছিল। এমনকি তিনি তাদের মিশর পর্যন্ত ধাওয়া করে হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করেন, আর বেশুমার দাসরূপে বন্দী করেন। পারসিক বাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় ইহুদিরা তখন খ্রিস্টানদের উপাসনালয়, ঘরবাড়ি জালিয়ে-পুড়িয়ে মনের জ্বালা মেটানোর চেষ্টা করেছিল। পরে যখন রোমকরা আবার ইরানীদের উপর জয়লাভ করে তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত খ্রিস্টানদের দাবীর মুখে সম্রাট হিরাক্লিয়াস এমন ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেন যে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া বা কোনো রকমে আত্মগোপনে যেতে পারা ইহুদিরাই কেবল প্রাণে বেঁচেছিল।[৩৫] আমীর আলী উল্লেখ করেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসংখ্য ইহুদি স্পেন ও পর্তুগালের উপদ্বীপে বসবাস করত। ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথ সিসবাটের রাজত্বকালে ধর্মযাজকদের হস্তে তারা যে নির্মম নিগ্রহ ভোগ করেছিল তা ধর্মান্ধতার বলিদেরকে ইসলাম উদ্ধার করার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শুধু ইসলামের জন্যই ইহুদিদের পক্ষে মায়মোনাইডস বা ইবনে গেবরেলের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।[৩৬]

পারস্য সাম্রাজ্য

শাসন-শোষণের ক্ষেত্রে পারস্য ছিল রোমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি। নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের কারণে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানবতার কোনো কল্যাণ সাধনে সক্ষম ছিল না। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের ধর্মবেত্তা মানী সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য অযৌন জীবন যাপন ও কুমারব্রত পালনের এক অবাস্তব আজগুবি মতবাদ প্রচার করেন। তার মতে বিবাহই সকল অনিষ্টের মূল, তাই বিবাহ বন্ধের দ্বারা বংশ বিলুপ্তির মাধ্যমে অন্ধকারের ওপর স্থায়ী বিজয় লাভ করতে হবে। এজন্য তিনি বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মানীর জীবনে এর ফল হয়েছিল তার নির্মম মৃত্যু। ২৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট

---

[৩৫] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৭৯-৮০; A. J. Butler. *Ibid.*

[৩৬] সৈয়দ আমীর আলী। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৬। Note: *Solomon ibn Gabirol was an 11th-century Andalusian poet and Jewish philosopher with a Neo-Platonic bent.*

বাহরাম মানীকে এজন্য হত্যা করেন যে, সে মানব জাতির বিলুপ্তি চায়, অতএব এই ভালো কাজ অন্যের পরিবর্তে তার নিজেকে দিয়েই শুরু করা কর্তব্য। পরবর্তীতে মাযদাক আন্দোলনের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিলেও তার পূর্ব পর্যন্ত মানীর আজগুবি মতবাদ কিছুকাল বেঁচে ছিল।

পারস্যে নীতিভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছেছিল যখন মাযদাক (জন্ম ৪৮৭ খ্রি.) খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে সাম্যবাদ বা কমিউনিজম প্রচার করেছিলেন। মাযদাক ঘোষণা করেন যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে বৈষম্যহীন সাম্যের ওপর তাই তাদের জীবন-যাপনও হতে হবে এমন সমতার ওপর। সম্পদ ও নারী হল এমন দুটি উপকরণ যার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মানবস্বভাবের চাহিদার অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, এই দুই ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে সাম্য ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।[৩৭] শাহারাস্তানী লেখেন, তিনি নারী ও সম্পদের মালিকানা অবাধ করে দেন এবং আগুন, পানি ও ঘাসের মতো নারী ও সম্পদের ক্ষেত্রেও সমমালিকানা ঘোষণা করেন। মানুষের মধ্যে এ আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে যেহেতু এটি ছিল তাদের ভোগলিপ্সা ও কামরিপু চরিতার্থ করার এক দারুণ সুযোগ। অধিকন্তু পারস্য সম্রাট কোবায এেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা দিয়ে সাম্রাজ্যব্যাপী প্রচার-প্রসার করেন। অল্প সময়ে এটি গোটা সাম্রাজ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ার ফলে পারসিক সমাজ নৈরাজ্য ও যৌন অনাচারের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে ভেসে যায়।

ঐতিহাসিক তাবারী লেখেন, বিকৃতরুচির ইতর লোকেরা এ সুযোগ লুফে নিয়ে মাযদাকীদের দলে ভিড়ে যায়। এরা এমনই বেপরোয়া হয়ে উঠে যে, সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে তাদের ভোগলিপ্সা ও কামলালসার অসহায় শিকার। এই সুযোগে দিনে দুপুরে ঘরে হানা দিয়ে যে কারো মান-সম্পদ ভোগদখলে নিয়ে নেওয়া হত। গৃহস্বামীর কিছুই বলার থাকত না। মাযদাকীরা সিংহাসনচ্যুতীর হুমকি দিয়ে সম্রাট কোবাযকেও বাধ্য করেছিল এই বর্বরতাবাদের প্রতি সমর্থন

[৩৭] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৭-২৮।

ঘোষণা করতে। শুরুতে কোবায অন্যতম আদর্শ শাসক ছিলেন কিন্তু এই বর্বরতাবাদে জড়িয়ে তিনি পারসিকদের জন্য এমন বিপর্যয় ডেকে আনেন যে ফলে গোটা রাজ্যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল সীমান্ত হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। এই বর্বর প্রথায় অতি অল্প সময়ে অবস্থা এমন হল যে সমাজে পিতৃপরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং বস্তুর উপর মালিকানা রহিত হয়ে গেল।[৩৮] পারস্য সমাজ এমন পাশবিকতায়ও ডুবেছিল যে তখনও যে রক্তসম্পর্কীয় বিবাহপ্রথা, যেমন আপন ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ অনেকের কাছে ঘৃণ্য ছিল সেখানে তা প্রশ্রয় পেত। পঞ্চম শতকের মধ্যেভাগে সম্রাট দ্বিতীয় ইয়াযদাগির্দ আপন কন্যাকে বিবাহ করেছিল এবং পরে নিজ হাতে তাকে হত্যা করেছিল।[৩৯] তারিখে তাবারিতে উল্লেখ আছে, পারস্যে ষষ্ঠ শতকের শাসক বাহরাম চুবীন- এর স্ত্রী ছিল তার আপন বোন।[৪০] ক্রিস্টেনসিন বলেন, সাসানী যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিক জ্যাতিয়াস ও অন্যান্যরা পারসিক সমাজে এ ধরনের রক্তসম্পর্কের মধ্যে বিবাহের প্রচলন ছিল বলে স্বীকার করেছেন। সমাজের দৃষ্টিতে এটি অন্যায় নয় বরং পূণ্যকর্ম বলেই বিবেচিত হত। চৈনিক পর্যটক হোয়ান স্যাঙ সম্ভবত এ জাতীয় বিবাহপ্রথার দিকে ইঙ্গিত করেই লিখেছেন, পারসিকরা অবাধ বিবাহে বিশ্বাসী। তাদের আইন ও সমাজে কোনো রক্তসম্পর্কই বিবাহের পথে বাঁধা ছিল না।[৪১]

সম্রাটপূজা

কিসরা উপাধিধারী পারস্য সম্রাটগণ নিজেদেরকে সম্রাটের সম্রাট এমনকি ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব মনে করতেন যাদের ধমনীতে রয়েছে 'ঐশী' নীল বর্ণের রক্ত।[৪২] প্রজারাও সম্রাটদেরকে সে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখত। ফলে তারা সম্রাটকে সেজদা করতে ও তাদের ঈশ্বর বন্দনা গাইতে কুণ্ঠাবোধ করত না।

---

[৩৮] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮১-৮২।

[৩৯] *Historian's History of the World*. Vol. 8, p. 84.

[৪০] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *প্রাগুক্ত*। ২০১৩। পৃ. ৮০-৮৪।

[৪১] মুহম্মদ ইকবাল অনু.। *আহদে সাসানীতে ইরান*। পৃ. ৪৩০, উদ্ধৃতি, নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*।

[৪২] Will Durant. 1942. *The Story of Civilization*. Vol. 1. New York : Simon & Schuster. p. 359.

পারস্য সম্রাট যদি রক্ত মোক্ষণ করাতেন বা কোনো ঔষধ সেবন করতেন তাহলে রাজধানীতে এটি ঘোষণা করা হত যে মহামান্য সম্রাট রক্ত মোক্ষণ করিয়েছেন বা ঔষধ সেবন করেছেন। এই ঘোষণার পর শহরে কোনো পেশাজীবী নিজ পেশায় রত হতে বা কোনো সরকারি কর্মচারী বা সভাসদ কাজ করতে পারত না।[৪৩] যদি কখনও সম্রাটের হাঁচি আসত তবে তার জন্য কোনো মঙ্গলবাণী উচ্চারণের অধিকার ছিল না, তিনি যদি নিজে কোনো মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করতেন তবেও এর সমর্থনে কিছু বলা যেত না। তিনি যদি কখনও কোনো কারণে কোনো আমীর বা উযিরের বাসভবনে গমন করে ফেলতেন তবে সেই দিনটিকে খুবই অস্বাভাবিক ও গুরুত্ববহ মনে করা হত এবং সেদিন থেকে সেই খান্দানের নতুন বর্ষপঞ্জী শুরু হত ও চিটিপত্রে নতুন তারিখ বসানো হত। একটি নির্ধারিত সময়সীমার জন্য তার ট্যাক্স মাফ করা হত। সেই ব্যক্তিকে নানা সম্মান, পুরস্কার, ক্ষমা ও পদোন্নতি দেওয়া হত। এসব কিছু কেবল এজন্য যে, মহামান্য সম্রাট পদধূলি দ্বারা তাকে ধন্য করেছেন।[৪৪]

সম্রাট ছিলেন সকল প্রকার আইন ও সমালোচনার উর্ধ্বে, তাই প্রজারা সম্রাটের 'পবিত্র নাম' মুখে উচ্চারণ করত না এবং রাজসভায় উপবেশনের দুঃসাহস করত না। প্রজারা বিশ্বাস করত, সবার উপর সম্রাটের অধিকার রয়েছে কিন্তু সম্রাটের উপর কারো কোনো অধিকার নেই। সম্রাট যদি কাউকে কিছু দেন বা ভোজপাত্র থেকে কিছু ছুঁড়ে দেন তবে সেটা শুধুই করুণা, অধিকার ও প্রাপ্য কিছুতেই নয়। সম্রাটের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যই প্রজা-কর্তব্য ও মোক্ষ লাভের পাথেয়। রাজবংশের দাসত্বই প্রজাসাধারণের গৌরব। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের জন্য নির্ধারিত কায়ানী রাজপরিবারের বাইরে অন্য কারো রাজমুকুট ধারণ ও সিংহাসনে আরোহণ ছিল অবাস্তব ও অসম্ভব। এটি ছিল রাজ পরিবারের উত্তরাধিকার বা মৌরসী স্বত্ব। প্রাপ্ত বয়স্ক

---

[৪৩] সাসানী আমলে ইরান। পৃ. ৫৩৫-৩৬, উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত।*
[৪৪] *প্রাগুক্ত।*

উত্তরাধিকারী না পেলে সম্রাটের শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হত। উদাহরণস্বরূপ, সম্রাট শেরোবার মৃত্যুর পর সাত বছরের শিশুপুত্র আর্দেশীরকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। কিসরা পারভেজের মৃত্যুর পর শিশু পুত্র ফররূখজাদ খসরু সিংহাসনে আরোহণ করেছিল। পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে নারীকে সিংহাসনে বসানো হত যাতে এই মিরাস রাজপরিবারে সুসংরক্ষিত থাকে। কিসরার দুই কন্যা রোবান ও আযরামিদখত এভাবে সিংহাসনে বসেছিল।[৪৫] জাতীয় কোনো দৈবদুর্বিপাক বা সঙ্কটকালে কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করত না যে যোগ্য, বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী কোনো সেনাপতি বা সভাসদকে, যেমন ছিলেন রুস্তুম, জাভান ও অন্যরা, রাজ্য শাসনের ভার দেওয়া যেতে পারে। কেননা তাদের হয়তো সবকিছু ছিল, ছিল না কেবল ধমনীতে রাজবংশীয় নীল রক্ত।[৪৬]

শ্রেণিভেদ

ইরানী সমাজের শ্রেণিভেদ ছিল অনেকটা ভারতীয় সমাজের মতো যা লঙ্ঘন ও অতিক্রম করার কোনো বিধান ও সাধ্য কারো ছিল না। আর্থার ক্রিস্টেনসিন লেখেন, পারস্যে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল বংশ ও পেশাগত পরিচয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ছিল অনতিক্রম্য ব্যবধান ও দূরত্ব। উপর থেকে নীচে, বা নীচ থেকে উপরে যাওয়ার কোনো যোগসূত্র যেমন ছিল না তেমনি ছিল না উভয় শ্রেণির মধ্যে দাস-প্রভু ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক।[৪৭] সাধারণ মানুষের জন্য অভিজাত ও শাসক শ্রেণির কারো ভূসম্পত্তি ক্রয় করা আইনত নিষিদ্ধ ছিল। সাসানী শাসননীতির বিধান ছিল, প্রত্যেকে তাঁর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বংশ ও মর্যাদা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, এর উপরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস তার জন্য বৈধই নয়। সুতরাং রাজকার্যে সাধারণ ও নিচু

---

[৪৫] ম্যাকারিয়স ইরানী। *তারিখে ইরান*, উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৩।

[৪৬] Will Durant. *Ibid.* pp. 359-364.

[৪৭] ম্যাকারিয়স ইরানী। *তারিখে ইরান*, উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৪।

বংশের কাউকে নিয়োগ করার প্রশ্নই উঠে না। প্রজা-সাধারণের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যেও সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানগত ভেদরেখা সুনির্দিষ্ট থাকত যা সবাই বজায় রাখত। অভিজাত শ্রেণির সমাবেশে সাধারণ বা নিচু বংশ ও সামাজিক মর্যাদার লোকদের বসার অধিকার ছিল না, তাদেরকে সেখানে বরং বুকে হাত রেখে নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হত। সেখানে প্রবেশাধিকারই ছিল এসব 'ছোট লোকদের' জন্য চূড়ান্ত মর্যাদার বিষয়।

তাবারীর একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ করছি যা থেকে ইসলামের অমিয়সুধা সদ্য-পানকারীদের সঙ্গে পারস্য সমাজের একটি পার্থক্য বোঝা যাবে। আবু উসমান আন-নাহদী বর্ণনা করেন, সাহাবী হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পারস্যে প্রবেশ করলেন। প্রহরীরা তাঁকে বসিয়ে রেখে সেনাপতি রুস্তুমের নিকট তাঁর প্রবেশ ও উপস্থিতির জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। চোখ ধাঁধাঁনো বিলাস-বসন পেরিয়ে সাহাবী মুগিরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রুস্তুমের দরবারে প্রবেশ করে সোজা গিয়ে রুস্তুমের পাশে বসে গেলেন। স্বয়ং রুস্তুম স্বর্ণখচিত মুকুট মস্তকে ধারণ করে গর্বভরে মঞ্চের উপর বসে ছিলেন। রুস্তুমের পরিষদবর্গ এতে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে তাঁকে হাত ধরে টেনে এনে তিরস্কারসূলভভাবে মঞ্চের নিচে বসিয়ে দেয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত মুগীরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তোমাদের মতো এমন নির্বোধ সম্প্রদায় দেখিনি। আমরা আরববাসী, আমাদের সেখানে এক ব্যক্তি খোদা হবে আর অন্যরা তার পূজা করবে এমন বিধান নেই। আমরা সকলে সমান। কেউ কাউকে দাস বানিয়ে রাখি না। তাই আমার ধারণা ছিল তোমরা পরস্পর সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ করে থাক যেমন আমরা নিজেদের মধ্যে করি। আমি এখানে উপযাচক হয়ে আসিনি, তোমাদের আহ্বানে এসেছি। ভালো হত যদি আমাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হত যে এখানে এমন দাস-প্রভুর রীতি পালিত হয়। সুতরাং, তোমাদের এমন আচরণ কী যুক্তিসঙ্গত? তোমাদের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে খুব শিগ্‌গির তোমরা বিলীন হয়ে যাবে। আমি বুঝলাম যে তোমাদের শাসন বিপর্যস্ত এবং তোমাদের পরাজয় ও ধ্বংস

অনিবার্য। কেননা, এমন নীতি ও চরিত্র এবং মানসিকতার উপর কোনো সাম্রাজ্য স্থায়ী হতে পারে না।[৪৮] বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঐ তিরস্কারসূলভ ভবিষ্যতবাণী অচিরেই সত্যে পরিণত হয়েছিল।

মিথ্যা অহমিকা

এতসব নষ্টামি-ভ্রষ্টামির পরেও পারসিকদের জাত্যাভিমান ছিল অতি প্রবল। নিজেদেরকে তারা পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, স্রষ্টা তাদের এমন সব গুণাবলি দান করেছেন যা অন্য কোনো জাতিকে দেন নি। তাই চারপাশের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে তারা কৃপা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত, অন্যদের প্রতি তাদের সম্মোধন রীতিতে এই কৃপা ও তাচ্ছিল্য প্রকটভাবে প্রকাশ পেত।[৪৯]

শিরক্ : ধ্বংসের মূল কারণ

তারীখে-ইরান- এ উল্লেখ আছে যে, প্রাচীনকালে পারস্যে এক আল্লাহর ইবাদত করা হত, তারা এক আল্লাহকেই সেজদা করত। কালের পরিক্রমায় তা নানা বস্তু যেমন, চাঁদ-সূর্য, তারকা প্রভৃতির উপাসনা তথা শিরকে পর্যবসিত হয়। বস্তুপূজা থেকে শুরু হয় মূর্তিপূজা। বলা হয়, জরথোস্ত্রর (About 628 B. C. – 551 B. C.) মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করে মানুষকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁর ধর্মদর্শন সম্পর্কে ইতিহাসে যা লেখা হয়েছে তা যদি সঠিক হয় তাহলে বলতে হয় যে জরথোস্ত্রর ধর্মদর্শনও মানব মুক্তির জন্য প্রকৃত আশার আলো ছিল না। কেন? তার কারণ হল, জরথোস্ত্রর একদিকে শুভ-অশুভ'র ধারণা: (১) একজন সত্য স্রষ্টা (অহুর মাজদা) যিনি সকল ক্ষমতা ও কল্যাণের উৎস এবং (২) একটি অশুভ আত্মা

---

[৪৮] *তারিখে তাবারী*, উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৫; মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ। ২০১২। *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*। ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। পৃ. ৯১-৯২।

[৪৯] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৬।

বা সত্ত্বা (অহরিমা/Ahriman) যে সকল মন্দের উৎস[৫০], উপস্থাপন করলেও তিনি মনে করতেন যে বিশ্বজগতের প্রতিটি আলোকিত ও উজ্জ্বল বস্তুতে স্রষ্টার নূর বা আলোই প্রতিবিম্বিত হয়। এ ধারণা থেকে তিনি প্রার্থনার সময় অগ্নি ও সূর্যের অভিমুখী হওয়ার আদেশ করতেন। এগুলোকে তিনি স্রষ্টার সর্বশক্তির প্রতীক মনে করতেন। অধিকন্তু, তিনি অগ্নি, বায়ু, মাটি, পানি– উপাদান চতুষ্টয়কে অসম্মান করতে নিষেধ করতেন। পরবর্তীতে ধর্মবিদগণ এই ধর্মের নানা বিধান প্রণয়ন করে এমনসব পেশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন যাতে আগুনের সাহায্য অপরিহার্য। এর ফলে এ ধর্মের অনুসারীরা ব্যবসা ও কৃষিকাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবেই পারস্যে ধ্বাংসাত্মক অগ্নিপূজা তথা স্বয়ং অগ্নিসত্তারই উপাসনা ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে পারস্য জাতি যুগ যুগ ধরে ধ্বংসাত্মক ধর্মচর্চা ও শিরকে লিপ্ত থেকে সত্যধর্মের আলো থেকে বঞ্চিত থাকে যা তাদের চিন্তা-চেতনার সুস্থ্যতা ও বৃদ্ধি-বিকাশকে গ্রাস করে নেয়। ফলে সপ্তম শতকের পূর্ব পর্যন্ত তারা আর কোনো ক্ষেত্রেই কোনো নৈতিক জীবনের দ্বার খুলতে সক্ষম হয় নি।

ইউরোপ ও পারস্যে নারীর অবস্থা

আমরা যে সময়ের কথা বলছি অর্থাৎ, পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে রোমান, পারস্য সাম্রাজ্য, ইউরোপ কোনো সমাজেই নারীর উল্লেখযোগ্য কোনো উজ্জত-সম্মান ছিল না। কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে হত্যা করলেও সমাজে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত না। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে দাসী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়াটা ছিল মামুলি ব্যাপার। নারী স্বামী, সন্তান সকলের ঘরেই দাসীর চেয়ে বেশি কোনো মর্যাদা পেত না। তারা নারীকে যৌন দাসী, সেবা দাসী মনে করত। এককথায় পুরুষরা নারীকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করত।

---

[৫০] Will Durant. *Ibid.* pp. 367-368; M. H. Hart. 2000. *The 100.* Kuala Lumpur : Golden Books Centre SDN, BHD. p. 467.

নারী ছিল স্রেফ ভোগের বস্তু।[৫১] রোমান বা পারস্য সমাজে নারীর মর্যাদা আরব সমাজেরও সমান ছিল না।[৫২]

প্রাচীন জাতির অন্যতম সভ্য ও সংস্কৃতিবান এথেন্সবাসীদের কাছে স্ত্রী ছিল পণ্যবিশেষ যা অন্যের নিকট বিক্রয়যোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য ও উইলযোগ্য। নারীকে অনিষ্টকর বিবেচনা করা হত, যদিও গৃহকর্ম, সন্তান উৎপাদনের জন্য সে ছিল অপরিহার্য। আয়োনীয় গ্রিক সমাজে নারীদেরকে নির্জন প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হত, প্রায়ই তালাচাবি দিয়ে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হত এবং কখনও সাধারণ্যে বের হতে দেওয়া হত না। রোমান সামাজিক আইনে নারী ছিল পণ্যের মতো। রোমান সমাজে নারী বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করলে এই দুঃসাহসের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হত। কিন্তু প্রায় বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটত যা ছিল সামাজিক অবক্ষয়ের ফলশ্রুতি। গির্জার পাদ্রী-পুরোহিতরা কুমারী মেয়েদেরকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করত। খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস এই ছিল যে, নারীই পাপের মূল উৎস ও নরকে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। মানবজাতির দুর্দশার জন্য নারী জাতিই দায়ী। নারীরূপে জন্ম নেওয়াই নারীর অপদস্ততার কারণ হিসেবে যথেষ্ট।[৫৩] নারী সম্পর্কে এ ধরনের ভ্রান্ত ও পাপমূলক ধারণা পাদ্রী, পুরোহিত এবং ধর্ম-পণ্ডিতরাই ছড়িয়েছিলেন।[৫৪] সেকালে খ্রিস্টান ধর্ম যাজকরা নারীদের মধ্যে মানবত্মা রয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক করত। পারস্যে ভাই-বোন বিবাহ, আপন কন্যাকে বিবাহ করার রেওয়াজ ছিল যা একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি।

---

[৫১] মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল। ২০১০। *মহানবীর (সা.) জীবন চরিত*। আবদুল আউয়াল অনু. ঢাকা:ইফা।
পৃ. ৪৩৮।

[৫২] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৩৯; মুসতফা আস সিবাঈ। ২০১০। *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*। আকরাম ফারুক অনু. ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। পৃ. ৯-১৬।

[৫৩] W. E. H. Lecky.1913. *History of European Morals*. New York. Longmans:Green and Co. pp. 142.

[৫৪] বিস্তারিত দেখুন, ইফা। ২০০৮। *সীরাত বিশ্বকোষ*। ঢাকা:ইফা। পৃ. ৩০-৩২।

ইহুদি সমাজে নারীর অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। হিব্রু কুমারীগণ আপন পিতৃগৃহেও দাসীর চেয়ে বেশি মর্যাদা পেত না। নাবালিকা অবস্থায় পিতা তাদেরকে বিক্রি করতে পারত। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা তাদেরকে হস্তান্তর করতে পারত। পুত্র সন্তান না থাকলেই কেবল কন্যারা পিতার সম্পত্তির ভাগ পেত। কোনো কোনো ইহুদি গোত্র, যেমন ইয়ামানের অর্ধ-ইহুদি ও অর্ধ-সাবেয়ী গোত্রসমূহে নারীদের বহুবিবাহের প্রথা চালু ছিল।[৫৫] কোনো নারীর তার স্বামীর সাহায্যার্তে এগিয়ে আসা অমার্জনীয় অপরাধ বিবেচিত হত যার শাস্তি ছিল ঐ নারীর উভয় হাত কর্তন। নারী জাতীর দুর্দশার চিত্র দেখে পুরুষরা প্রার্থনাচ্ছলে বলত, 'প্রভু, তুমি আমাকে নারীরূপে সৃষ্টি কর নি, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

চীন : ধর্ম ও সমাজ

চীন দেশের অবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভালো ছিল না বরং আরো খারাপ ছিল। যে শিরক সকল ধ্বংসের মূল, চীন দেশ তার মধ্যেই ডুবে ছিল। অতি প্রাচীন কাল থেকেই চীনাদের মধ্যে প্রকৃতি পূজা, পুরোহিত পূজা ও পূর্বপুরুষ পূজা চালু ছিল। বস্তুত, নর-পূজাই ছিল তাদের প্রধান ধর্ম। চীন দেশে ধর্ম প্রচারক হিসেবে লাউতিশো ও কনফুসিয়াসের নাম শুনা যায় কিন্তু তাঁদের যে কী ধর্মমত ছিল তা বুঝে উঠা কঠিন। লাউতিশোর ধর্মমতে বাস্তব জীবনের পরিবর্তে তাত্ত্বিকতা ছিল বেশি ফলে এর অনুসারীরা ছিল জীবনবিমুখ ও সংসারবিরাগী। আত্মপ্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই লাউতিশোবাদ মূর্তিপূজাকবলিত হয়ে পড়ে। কনফুসিয়াসের ধর্মমতে বাস্তব জীবন অধিক গুরুত্ব পেলেও এতে পরকালীন জীবনের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে এর অনুসারীরাও নানা প্রকৃতি পূজায় আবর্তিত হতে থাকে। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে প্রবেশ করে কিন্তু তাতে অবস্থার পরিবর্তনের বদলে বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ চীনা সমাজজীবনে আরো ঘোরতর অধঃপতন ডেকে আনে। চীনারা এর ফলে নৈরাশ্যবাদী নাস্তিক হয়ে পড়ে। বুদ্ধের মূর্তি পূজা ও

---

[৫৫] প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২২।

নৃপতি পূজাই তাদের ধর্মে পরিণত হয়। এ যেন, মস্তিষ্কের চিকিৎসা করতে গিয়ে হৃদযন্ত্র কেটে ফেলার মতো। সারাংশ হল এই, 'লাউতিসীজম-কনফুসিয়াসীজম-বৌদ্ধিজম' চীনা সমাজকে উপহার দিল একেশ্বরবাদের এমনকি আস্তিকতার বদলে এমন এক ধর্মদর্শন যা ওহি বিহীন হওয়ার কারণে মনুষ্য জীবন গঠনের পথে ছিল মারাত্মক অন্তরায়। এসব দর্শন বরং মানুষ ও সমাজকে অধঃপতন ও ধ্বংসের জালে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল।[৫৬]

মধ্য-এশিয়া

পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল, তুর্কী, জাপানী ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী হয় বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল অথবা বর্বর মূর্তিপূজার অনুসারী ছিল। এদের মধ্যে কোনো জ্ঞান সম্পদ ও সভ্য শাসন ব্যবস্থা ছিল না ফলে এরা চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পক্ষান্তরে কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠী ছিল বেদুইন জীবনের স্তরে যারা চিন্তার শৈশবেই রয়ে গিয়েছিল। ফলে চিন্তারাজ্যের শৈশব পর্যায়ের এমন জাতিগোষ্ঠী কিভাবে গোটা বিশ্ববাসীকে আলোর পথ দেখাত?

ভারতবর্ষ : ধর্ম ও সমাজ

ইতিহাসবিদদের মতে, সুবিশাল ভারতবর্ষে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক ছিল ধর্ম, সমাজ ও নৈতিকতার দিক দিয়ে সবচেয়ে অন্ধকার ও অধঃপতিত যুগ। অধঃপতনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে ভারতবর্ষ কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকে বিভিন্ন পূজা, ব্রত পালন করা হত। হরপ্পাতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বুঝা যায়, ভারতীয় অনার্য জনগোষ্ঠী অন্যান্য দেশের অনেক অধিবাসীদের মতো– বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করতেন; এখনো এদেশে খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল

---

[৫৬] গোলাম মোস্তফা। ২০১৩। *বিশ্বনবী*। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাইজ। পৃ. ৪০-৪১; সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৭-৮৮।

জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর নমুনা দেখা যায়।[৫৭] প্রাক-আর্য সময় থেকে ভারতবর্ষে আচরিত বিভিন্ন প্রকার পূজা ও কৃতোৎসরেব নাম এরকম ছিল– গ্রাম-দেবতা পূজা, ধর্মঠাকুর পূজা, মনসা পূজা, গাছপূজা, অম্বুবাচীর পার্বণ, যাত্রা, ব্রতোৎসব, হোলী বা হোলক উৎসব, জাঙ্গুলী, পর্ণশর্বরী, শবরোৎসব, ঘটলক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি। এরা স্থানীয় ব্রতাদিও পালন করতেন।[৫৮]

আমরা যে যুগের কথা বিশেষভাবে বলতে চাই সেই খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বেদে পূজ্য দেবতার সংখ্যা ছিল তেত্রিশ যা তেত্রিশ কোটিতে গিয়ে ঠেকে। নদবী রহ. ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে লেখেন, যে কোনো সুন্দর, আকর্ষণীয়, অভিনব বস্তু এবং জীবনের প্রয়োজনীয় যে কোনো উপকরণ উপাস্য দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। এভাবে মূর্তি ও প্রতিমা এবং দেবী ও দেবতার সংখ্যা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৫৯]

বর্ণপ্রথা

পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে শ্রেণিপ্রথা, দাসপ্রথা ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রিক, রোম, আরব প্রভৃতি স্থানে বর্বর দাসপ্রথার কথা আমরা জানি। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতভেদ বা শ্রেণিব্যবধান (caste), বর্ণের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস (stratification) পৃথিবীতে আর কোথাও এমনরূপে ছিল বলে জানা যায় না। বেদে বর্ণপ্রথার উল্লেখ দেখে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে হিন্দু সমাজের জাতপ্রথা বেদের থেকেও পুরনো।[৬০] বর্ণের ভিত্তিতে উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও সম্পাদনের রীতি আজকের হিন্দু সমাজে অনেকটা লুপ্ত হলেও

[৫৭] নীহাররঞ্জন রায়। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৭৮-৪৭৯।

[৫৮] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৮৩-৪৮৬; শীলা বসাক। ২০০৮। *বাংলার ব্রতপার্বণ*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি। পৃ. ৪১৯-৪২৬।

[৫৯] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৯১।

[৬০] এ আর. দেশাই। ১৯৯২। *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*। কলকাতা : কে. পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী। পৃ. ২১০।

বর্ণের জাতভেদপ্রথা এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর অনুসরণ এখনো লুপ্ত হয় নি।

বর্ণপ্রথার মাধ্যমে যে শ্রম বিভাজন ও দায়-দায়িত্ব নির্দেশিত হয়েছে তা হল: (১) প্রথমেই ব্রাহ্মণ যারা ভগবানের বা ব্রহ্মার 'মাথা' থেকে সৃষ্ট; ব্রাহ্মণরা হলেন পুরোহিত ও intellectual শ্রেণি। এঁরা প্রাণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (২) দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে ক্ষত্রিয় যারা এসেছে ব্রহ্মার স্কন্ধ ও বাহু থেকে, এরা যোদ্ধা শ্রেণি। রাজকর্ম, দেশ রক্ষা এদেরই কাজ। (৩) তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছে বৈশ্য যারা ব্রহ্মার উরুদেশ থেকে এসেছে, এরা বণিক শ্রেণি। (৪) সবশেষে রয়েছে শূদ্র যারা ব্রহ্মার পা থেকে এসেছে, এরা মেহনতি ও শ্রমজীবী শ্রেণি।[৬১] ক্ষিতিমোহন সেন লেখেন, তত্ত্বগতভাবে বর্ণ মাত্র চার রকমের: ব্রাহ্মণ– পুরোহিত, ধর্মজগতের গুরু, ক্ষত্রিয়– রাজা, যোদ্ধা, আর অভিজাতবর্গ, বৈশ্য– ব্যবসায়ী, বণিক, অন্যান্য কাজে যুক্ত মানুষ এবং শূদ্র– চাষি, দাস ইত্যাদি।[৬২] বৈশ্য ও শূদ্রের বেদমন্ত্র উচ্চারণ বা পাঠ করা তো দূরের কথা, শ্রবণেরও অধিকার নেই। ক্ষত্রিয়েরও কাউকে বেদ শিক্ষা দেওয়ার অধিকার নেই।[৬৩]

বর্ণভিত্তিক এই জাতপ্রথা হিন্দুসমাজকে অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন উঁচুনীচু পর্যায়বদ্ধ এবং জন্মসূত্রে নির্ধারিত গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিল।[৬৪] ভারতের এই জাতভেদ প্রথা এমনই প্রকট ছিল যে চরম দৈবদুর্বিপাকের সময়ও তা রক্ষা করা হত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রচলিত ত্রাণ ব্যবস্থায় উঁচু-নিচুর অবস্থান খেয়াল রেখে পছন্দমাফিক খাবার, পৃথক রান্না এবং আলাদা খাওয়ার জায়গা প্রভৃতিতে পার্থক্য করা হত। এ প্রসঙ্গে Max Weber তাঁর *Religion of India* গ্রন্থে লেখেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণের সময় যে খাবার

---

[৬১] James McKee. 1969. *Introduction to Sociology*. Michigan : Holt, Rinehart and Winston, Inc. pp. 254-255.

[৬২] ক্ষিতিমোহন সেন। ২০০৮। *হিন্দু ধর্ম*। কলিকাতা : আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লি.। পৃ. ১৯।

[৬৩] আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনু. ২০০৬। *আল-বেরুনীর ভারততত্ত্ব*। ঢাকা:দিব্য প্রকাশ। পৃ. ৬৯।

[৬৪] এ আর. দেশাই। *প্রাগুক্ত*।

দেওয়া হত তাতে খাওয়ার জায়গায় কোনো প্রতীক চিহ্ন এঁকে চারদিকে গণ্ডি কেটে বিভিন্ন জাতিদের জায়গা আলাদা করার চেষ্টা করা হত।[৬৫]

বর্ণের এই জাতপ্রথা ছিল খুবই অবমাননাকর ও নিষ্ঠুররকমভাবে কর্তৃত্বপরায়ণ। প্রত্যেক বর্ণ বা জাত ওপরের বর্ণ বা জাত থেকে নিকৃষ্ট এবং নিম্নতর জাত থেকে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। যে বর্ণ বা জাতে জন্ম হত তাই দিয়ে কারো মর্যাদা বিচার করা হত এবং এটি ছিল অপরিবর্তনীয়। ফলে জন্মসূত্রে যে মর্যাদা অর্জিত হত মেধা, সম্পদ– কোনো কিছু দিয়েই তার পরিবর্তন সম্ভব ছিল না।[৬৬] ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্ব এবং অনেক ধর্মগ্রন্থের এটি বিরোধী। আল বেরুনী তাঁর *কিতাবুল হিন্দ* গ্রন্থে ভারতের হিন্দু সমাজে অনুসৃত বর্ণপ্রথার কথা বেশ উল্লেখ করেছেন। বাবা সাহেব আম্বেদকর ভারতীয় সমাজের বর্ণপ্রথা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বর্ণ বা জাতভেদের ধর্মীয় তাৎপর্য না থাকলেও সমসাময়িক সমাজ এখনও তাদের বিয়ে, জীবনাচার প্রভৃতিতে এ প্রথাকে মেনে চলেন, ফলে এর সামাজিক প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখনও হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ আর বৈশ্য বা শূদ্রের মধ্যে বিয়েশাদি অসম্ভব ব্যাপার– অশিক্ষিত সমাজে তো বটেই।

নিরঙ্কুশ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়

মনুসংহিতা অনুসারে, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হল ব্রহ্মার প্রিয়পাত্র ও মানবকুল সম্রাট। এরা জগত অধিপতি ফলে জগতের সকল সম্পদের একচ্ছত্র অধিকারী। ব্রাহ্মণ শূদ্রদাসের যাবতীয় সম্পদ ইচ্ছেমতো দখল করতে পারেন, এতে কোনো পাপ নেই। কেননা দাসের কোনো মালিকানাস্বত্ব নেই, তার সম্পদের স্বত্ব আপন মনিবের।[৬৭] ঋগবেদ যে ব্রাহ্মণের মুখস্ত সে পাপমুক্ত,

---

[৬৫] Max Weber. *Religion of India.* Trans. and edt. by Hans H. Gerth and Don Martindale. Glencoe : The Free Press. 1958. pp. 35-36.
[৬৬] এ আর. দেশাই। *প্রাগুক্ত।*
[৬৭] *মনুসংহিতা*, ১ ও ৮ অধ্যায়।

যদিও পাপরাশি দ্বারা সে ত্রিলোক নাশ করে ফেলে। কঠিনতর মুহূর্তেও রাজার এক্তিয়ার নেই ব্রাহ্মণ থেকে কোনরূপ রাজস্ব বা কর গ্রহণ করার। রাজার অন্যতম কাজ হল ব্রাহ্মণদেরকে ক্ষুধার কষ্ট থেকে রক্ষা করা ও মরতে না দেওয়া। ব্রাহ্মণ যদি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করেন তবে তার শাস্তি হল কেবল মস্তক মুণ্ডন করা, পক্ষান্তরে অন্যদের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।[৬৮] ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বৈশ্য ও শূদ্র থেকে শ্রেষ্ঠতর হলেও ব্রাহ্মণ থেকে অনেক নিচে। যেমন মনু বলেন, দশ বছর বয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক একজন শতায়ু ক্ষত্রিয় থেকে উত্তম যেমন পিতা সন্তান থেকে উত্তম।[৬৯] দীনেশচন্দ্র সেন লেখেন ভারতে কৃষ্ণ-সমাশ্রিত যে আর্যধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল তাতে ব্রাহ্মণকে দেবতা হতেও উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছিল। এই গৌরব ও পূজার প্রধান পতাকাবাহী ও পুরোহিত ছিলেন– শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মতে মহাভারতের যুগের পর হতেই ব্রাহ্মণদের অপ্রতিদ্বন্দ্বি শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ভাবে প্রতিপন্ন হয়।[৭০] সুকুমার সেন লেখেন, এদেশে প্রায় সব দিক দিয়াই ব্রাহ্মণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৭১] বর্ণাশ্রিত সমাজে ব্রাহ্মণগণ এভাবে নিজেদের জীবনকে নিরাপদ করেছিলেন।

নিষ্পেষিত শূদ্র সম্প্রদায়

ভারতীয় সমাজে শূদ্র বা অচ্ছুতই সর্বনিকৃষ্ট সম্প্রদায় বলে বিবেচিত। চামার, চণ্ডাল, মুচি ইত্যাদি অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত ছিল যাদের অনেক নাগরিক অধিকার ছিল না। মহাভারতে অনুশাসন পর্বের দশম অধ্যায়ে লেখা হয়েছে: "হীন জাতিকে উপদেশ দেওয়া কখনই কর্তব্য নয়।" "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পরস্পরের অন্ন ভোজন করতে পারেন, কিন্তু কুকর্মান্বিত শূদ্রের অন্ন কখনই ভোজন করিবে না" (১৩৪ অধ্যায়)।[৭২] শূদ্রের জন্য ইহাই পরম সৌভাগ্য যে

---

[৬৮] *প্রাগুক্ত*, ২ ও ৯ অধ্যায়।

[৬৯] *প্রাগুক্ত*, ১১ অধ্যায়।

[৭০] দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯৯৩। বৃহৎ বঙ্গ। কলকাতা : দেজ। পৃ. ৪৯ ।

[৭১] সুকুমার সেন। ২০০০। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। ১ম খণ্ড। কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ১৬।

[৭২] উদ্ধৃতি, দীনেশচন্দ্র সেন। *প্রাগুক্ত*।

তারা ব্রাহ্মণ সেবায় নিয়োজিত হতে পারে, এছাড়া তাদের আর কোনো পুণ্য ও প্রাপ্তি নেই। অর্থ উপার্জন ও সম্পদ সঞ্চয়ের কোনো অধিকার শূদ্রের নেই। কারণ তা ব্রাহ্মণের মনঃকষ্টের কারণ।

শূদ্র যদি কোনো ব্রাহ্মণের উপর হাত তোলে বা ক্রোধান্ত হয়ে লাথি মারে তাহলে তার হাত-পা কেটে ফেলা হবে। আর যদি কোনো পাপিষ্ট শূদ্র কোনো ব্রাহ্মণের সম্মুখে বসার দৃষ্টতা প্রদর্শন করে তাহলে শাসকের অবশ্যকর্তব্য হবে তার পশ্চাদ্দেশে গরম লোহার দাগ দিয়ে দেশছাড়া করা। কোনো ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করা বা কটু কথা বলার সাজা হল তার জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলা। যদি সে দাবি করে, সে ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতে পারে তাহলে তার মুখে তপ্ত তেল ঢেলে দাও। কুকুর, বিড়াল, কাক, পেঁচা এবং কোনো শূদ্রকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্য সমান।[৭৩] মনুর ঘোষণা ছিল– স্রষ্টা তাদেরকে দাস করে সৃষ্টি করেছেন এবং এই সম্প্রদায়ভূক্ত কোনো লোককে তার প্রভু মুক্তি দিলেও সে স্বাধীন হতে পারে না; কেননা দাসত্ব তার স্বভাবদত্ত, কে তা থেকে মুক্ত করতে পারে।[৭৪]

ভারতে বৈদিক ধর্মের যাগযজ্ঞ- পূজাঅর্চনার বাড়াবাড়ি, ব্রাহ্মণ্য আর বর্ণপ্রথার নির্মমতার উপর বৌদ্ধ ধর্ম তার সাম্য আর মানবতার বাণী সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেন লেখেন, ভারতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় (খ্রি.পূ. ৩০০–২৩২) বৌদ্ধ ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। তবে তার পূর্বেই প্রাচীন বাংলায় কোথাও কোথাও বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল বলে মনে করা হয়।[৭৫] অন্তত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধ ধর্ম যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, মহাস্থান-শিলাখণ্ড-লিপিতে তার পাথুরে প্রমাণ বিদ্যমান আছে।[৭৬]

---

[৭৩] *মনুসংহিতা*। ৮, ১০, ১১ অধ্যায়।

[৭৪] উদ্ধৃতি, সৈয়দ আমীর আলী। ১৯৮৭। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২০-২১।

[৭৫] নীহাররঞ্জন রায়। ১৯৯৩। *বাঙালির ইতিহাস*। কলকাতা : দেজ। পৃ. ৪৯৪-৪৯৫।

[৭৬] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৯৪।

যাই হোক, বৌদ্ধ ধর্ম গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে রচিত। এই শিক্ষা দুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে দুঃখ হতে মুক্তি লাভের পন্থাই হচ্ছে নির্বাণ। বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকৃত অর্থাৎ, নিরীশ্বরবাদী, অবশ্য এ নিয়ে সংশয়ও আছে। গোস্তাব লী বোন লেখেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন রাজধানী তক্ষশীলার যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এটি সহজেই প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সভ্যতা তখন হয়ে পড়েছিল একান্তই প্রতিমাসর্বস্ব। তাঁর মতে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে বৌদ্ধসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অধ্যয়ন করা আবশ্যক। বইয়ের পাতা থেকে আসল সত্য বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইউরোপীয় গবেষকগণ যেসব তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের হজম করাতে চান তা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের দাবী হল এটি নিরীশ্বরবাদী ধর্ম, অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করেছে যে, বাস্তবে বৌদ্ধ ধর্ম হল প্রতিমাপূজা ও বহুউপাস্যবাদী ধর্মের পুরোধা।[৭৭]

এই ধর্মের কোনো ওহি নেই এবং বুদ্ধ প্রফেট ছিলেন কি ছিলেন না তার কোনো প্রমাণ নেই। উল্লেখ্য যে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার, সেই স্রষ্টার ওহি এবং মনোনীত প্রফেট বা নবী হল ধর্মের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বৌদ্ধ ধর্ম বহু আগেই মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে বসে। বস্তুত বৌদ্ধ ধর্ম এক সময় হয়ে পড়ে স্রেফ মূর্তিপূজার ধর্ম। সে পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে মূর্তি ও প্রতিমা সঙ্গে নিয়েই গিয়েছে। ঈশ্বর টোপা লেখেন, বৌদ্ধ ধর্মের ছায়ায় যে ব্যবস্থা ও দর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাতে ছিল বহু অবতার ও মূর্তিপূজার ছড়াছড়ি। বৌদ্ধভ্রাতৃসঙ্ঘের পরিবেশ-পরিমণ্ডল বারবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাতে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে।[৭৮] পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লেখেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ গৌতম বুদ্ধকে অবতাররূপে উপস্থাপন করেছিল, এমনকি স্বয়ং বৌদ্ধধর্মও এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুগমন করেছিল। আর বৌদ্ধভ্রাতৃসঙ্ঘ বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে বিশেষ কতিপয় গোষ্ঠীর

---

[৭৭] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৮-৮৯।
[৭৮] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৮-৮৯।

স্বার্থসিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে নিয়ম ও শৃঙ্খলার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।[৭৯] স্যার রাধাকৃষ্ণাণ বলেন, ব্রুগ্ন চিন্তাদর্শন বুদ্ধের শিক্ষার উপর এমন ছায়া ফেলে যে একসময় তা বুদ্ধের অনুসারীদেরও দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। অবস্থা হল, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-দর্শন আত্মপ্রকাশ করে এবং কিছুকালের জন্য এর অনুসারীদের মন-মগজ আচ্ছন্ন করে রাখে। তারপর ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে আর অন্য একটি চিন্তা তার স্থান দখল করে। এই উন্মেষ-বিলোপের ধারায় এক সময় বুদ্ধের শিক্ষাটিই হারিয়ে যায়।[৮০] ধর্মের প্রথম শর্তই যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব, বৌদ্ধ ধর্মে তা সংশয় ও বিতর্কের বিষয়রূপে রয়ে যায়। ফলে অনেক বৌদ্ধধর্ম পণ্ডিত ও বুদ্ধের জীবনীকার প্রশ্ন তুলেছেন যে, বিপুল মানুষের অনুসৃত একটি বিরাট ধর্ম কেবল কতিপয় নীতিশিক্ষার দুর্বল বুনিয়াদের উপর কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল যাতে ঈশ্বরচিন্তার স্থান নেই?

নৈতিকতার অধঃপতন

নদবী রহ. লিখেন, 'প্রাচীনকাল থেকেই যৌনতা ও কামকেলি ছিল ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত আর কোনো দেশ, ধর্ম ও সমাজে যৌনতা ও কামচর্চার এমন ছড়াছড়ি নেই যেমনটি রয়েছে ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে। ব্রহ্মার বিভিন্ন গুণের অভিপ্রকাশ, সত্যযুগের ঘটনা-মহাঘটনা এবং ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বরহস্য সম্পর্কে যেসব কাহিনী ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত এবং সমাজে আলোচিত হয়ে আসছে, তদুপরি দেব-দেবী এবং দেবতা ও মানবীদের কামলীলার যে অশ্লিল বিবরণ রয়েছে তাতে যে কেউ কানে আঙ্গুল দেবে এবং লজ্জায় মাথা নীচু করতে বাধ্য হবে। ধর্মানুরাগী মানুষ যখন ভক্তি-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এসবের চর্চা করে তখন অবচেতনভাবে তাদের আবেগ-অনুভূতিতে এর কী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা তো বলাই বাহুল্য। ..... কোনো কোনো ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে, 'কতিপয় সম্প্রদায়ের পুরুষেরা নগ্ন নারীদেহের এবং নারীরা নগ্নপুরুষদেহের

---

[৭৯] Jowharlal Neheru. *Discovery of India*. pp. 201-203.
[৮০] Cited, Neheru, *Ibid*.

পূজা করত। আর উপাসনালয়ের সেবায়েত, পুরোহিত ও পাণ্ডাদের লাম্পট্য ছিল এমনই চরমে যে, দেবতার সেবাদাসীদের তারা যৌনদাসীরূপে ব্যবহার করত; এমনকি উপাসনালয়ে আগত পূজারিণীদের সতিত্বসম্পদও তাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হত। বহু উপাসনালয় শাব্দিক অর্থেই ছিল পাপাচারের আখড়া। অসৎ লোকেরা তাদের মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকত এবং বিভিন্নভাবে তাদের যৌনলালসা মেটাত।'[৮১]

গোস্তাব লী বোন লেখেন, ধর্ম তাদের যাই হোক না কেন, আচার-অনুষ্ঠান তারা নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। তাদের মন্দির ও পূজাঘর অসংখ্য উপাস্য বস্তুতে পরিপূর্ণ। সেগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য হল লিঙ্গ ও যোনী, যা সঙ্গম ও যৌনতার ইঙ্গিতবহ। অশোকস্তম্ভকেও লিঙ্গপ্রতীক বলে বিশ্বাস করা হয়।'[৮২] নদবী রহ. লেখেন, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং উপাসনালয়ের অবস্থা যদি এই হয় তাহলে অনুসারীদের বাস্তব জীবন আর রাজার রাজপ্রাসাদ ও ধনীদের রঙ্গমহলের চালচিত্র কী হতে পারে? রাজপ্রাসাদ ও ধনীদের রঙ্গমহলে তো রীতিমতো মহড়া চলত। নাচগানের জলসায় মদের নেশায় সবাই যখন চুর তখন লজ্জা ও লোকলজ্জার তো কোনো বালাই থাকত না। সম্ভ্রম ও হায়া-শরম হয়তো নিজেই তখন মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজে পেত না। এভাবে সমগ্র দেশ ভেসে গিয়েছিল পাপাচার ও অবাধ যৌনতার তোড়ে এবং নৈতিকতা ও চরিত্রে নেমে এসেছিল বিরাট ধ্বস।[৮৩]

নারীজাতির অবস্থা

লী বোন লেখেন, মনুশাস্ত্রে নারী জাতিকে দুর্বল ও বিশ্বাসঘাতিনী এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রাত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। মনু বলেন, নারীজাতির রয়েছে অপবিত্র ক্ষুধা, তারা দুর্বল নমনীয়তা ও মন্দ আচরণের অধিকারিণী। দিবারাত্র

---

[৮১] দয়ানন্দ সরস্বতী। *সত্যার্থ প্রকাশ*। পৃ. ৩৪৪, উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। ৯৪।

[৮২] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*।

[৮৩] *প্রাগুক্ত*।

তাদেরকে অধীন করে রাখতে হবে। ইহলোকে মানুষকে দূষিত করাই নারীর স্বভাব। মনুযুগে নারীর মর্যাদা দাসীর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, ছিল নানা বঞ্চনা, গঞ্জনা ও নির্মম অত্যাচার-লাঞ্ছিত। জুয়া খেলায় স্ত্রীকে বাজি রাখা হত এবং হেরে গিয়ে স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া হত। বিধবাদের দ্বিতীয় বিয়ের অধিকার ছিল না ফলে এদের জীবন ছিল বিভীষিকাময়। পরিবার-সমাজের লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ছিল বিধবাদের ভাগ্যলিপি। মৃত স্বামীর ঘরে দাসিবৃত্তি করেই তাদের জীবন পার করতে হত। বিধবা নারীকে স্বর্গ লাভের লোভ দেখিয়ে বশ করে বা জোর করে পৈশাচিক পদ্ধতিতে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ফেলে নিধন করে ধর্মের মহত্ব কীর্তন করা হত। চলত উচ্চস্বরে বাদ্য-কীর্তন- বাধ্য-কীর্তনের নিচে অসহায় বিধবাদের করুণ আর্তনাদ চাপা পড়ত। বিধবারা এভাবে জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করত। অবশ্য যে সাধ্বী-স্ত্রী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতেন তিনি সমাজে শ্রেষ্ঠ সতীর আসনে অধিষ্ঠিত হতেন ও উপাসনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতেন। এর নাম ছিল সতিদাহ প্রথা। আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র সেদিন অর্থাৎ, রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে, এর আরো পরে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) প্রচেষ্টা ও আন্দোলনে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ভারতীয় হিন্দু সমাজে নারীর সম্পদে কোনো উত্তরাধিকার নেই, পিতার ও স্বামী-সন্তানের কারো সম্পত্তিতেই তার কোনো উত্তরাধিকার স্বীকৃতি পায় নি।

বৌদ্ধধর্মে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয় নি। বুদ্ধের উপদেশ ছিল– নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থি। বুদ্ধের শিক্ষায় স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য ফুটে উঠেছে, ধর্মান্বেষী ব্যক্তিদেরকে অবিবাহিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে এসব-ই

মানবস্বভাব বিরোধী। চীন-জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরে লেখা থাকত– ঘোড়া, গবাদিপশু ও নারীর এখানে প্রবেশাধিকার নেই।[৮৪]

ভারতবর্ষে ধর্মের নামে এমন বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও শ্রেণিবৈষম্য ছিল, পৃথিবীতে যার নজির নেই। পৃথিবীতে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রিক নীতিবাদী দার্শনিক যেমন, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল প্রমুখগণের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রণালীবদ্ধ আলোচনা না পাওয়া গেলেও ভারতীয়, পার্সিয়ান ও চৈনিক দার্শনিকগণ কর্তৃক গ্রিকদের পূর্বে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ে আলোচনা করার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৮৫] ভারতবর্ষে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চর্চা সম্পর্কে কোনো কোনো আরব ঐতিহাসিক প্রসংশা করেছেন।[৮৬] কিন্তু, ষষ্ঠ শতকে যখন ইসলামের নবী বিশ্বমানবের কাছে তাঁর শান্তির পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন তখন আর্যজাতির সর্বাপক্ষো মেধাবিশিষ্ট একটি অংশ ও জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সংক্ষেপে এই ছিল।[৮৭] সত্যধর্মের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে ভারতবর্ষের মানুষ নানা অনাচার ও কুসংস্কারের অন্ধকার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে এমন একটি জনগোষ্ঠী, যারা নিজেরাই দিশেহারা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তাদের পক্ষে অন্যকে আলোর পথ দেখানো কী করে সম্ভব হতে পারত?

আরবজাতি

আমরা যে সময়কালের বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা করছি যে সময় আরবজাতির এমন কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্যও ছিল যা অন্য কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায় না। ভাষাসৌন্দর্য ও কাব্যপ্রতিভা, স্বাধীনচেতা মনোভাব, সাহসিকতা ও বীরত্ব,

---

[৮৪] ইফা। ২০০৮। *সীরাত বিশ্বকোষ*। ১৪ খণ্ড। ঢাকা:ইফা। পৃ. ২৯।

[৮৫] Vernon J. Bourke. 1966. *Ethics*. New York: The Macmillan Company. pp.4.; অমর্ত্য সেন। ২০০৭। *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*। কলকাতা : আনন্দ। পৃ. ৪৬-৮১।

[৮৬] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৯৯-১০০।

[৮৭] সৈয়দ আমীর আলী। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২১।

বিশ্বাসের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও প্রবল উদ্দীপনা, বদান্যতা ও অতিথিসেবা, স্পষ্টবাদিতা ও দৃঢ়তা, অনাড়ম্বরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিশ্বস্ততা এবং অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তি ছিল আরবদের কিছু ব্যতিক্রমি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হলে কী হবে, যে রিসালতের শিক্ষা ও আদর্শ সভ্যতার প্রাণ, গোটা বিশ্বের ন্যায় এ থেকে আরবরাও ছিল বহু দূরে। তারা অনুসরণ করে চলেছিল তাদের বাপ-দাদার ভুল ধর্ম ও জাতিগত নানা আচার-কুসংস্কারের। এভাবে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে তারা অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল যার নযিরও পৃথিবীতে খুব একটা ছিল না।

মূর্তিপূজার নিকষ কালো অন্ধকার

আরবে ইহুদি ও ঈসায়ী ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও আরবদের ওপর এগুলোর তেমন প্রভাব ছিল না। আরবদের দু'ইদিকে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু আরবরা খ্রিস্ট, এমনকি যরথুস্ত্র কোন ধর্মই গ্রহণ করেনি। মূর্তিপূজাই ছিল আরবের সাধারণ ধর্ম। আল্লাহর সঠিক পরিচয় না জেনেও একদিকে তারা আল্লাহকে মানত এবং বিশ্বাস করত যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক। যেমন আল-কুরআনে তাদের এই বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হয়েছে:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ۝ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝﴾

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।" (যুখরুফ : ০৯।)
"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ, অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" (যুখরুফ : ৮৭।)

কালের পরিক্রমায় আরবদের চিন্তা-চেতনায় যুগের জাতিগত নানা জাহেলী রীতি-নীতি বদ্ধমূল হয়; খালিক ও মাখলুকের সম্পর্ক স্থাপন ও চাওয়া-পাওয়ার যে ওহিপ্রসূত নীতিমালা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তাদের কাছে কোনো স্পষ্ট ধারণা অবশিষ্ট

ছিল না। ফলে কোনো মাধ্যম ছাড়া স্রষ্টার কাছে কিছু পাওয়া যায়, এটি তারা কল্পনাও করতে পারত না। দুনিয়ায় রাজা-বাদশার কাছে যেতে হলে বা কিছু পেতে হলে কোনো না কোনো মাধ্যম লাগে, এভাবে উর্ধ্বজগতের বিষয়কে তারা বস্তুজগতের মানদণ্ডে বিবেচনা করত। এ সর্বনাশা চিন্তা থেকেই তারা দেব-দেবী ও বিভিন্ন মূর্তিকে আল্লাহর কাছে পৌছার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিল, আর এগুলো যেহেতু অভিষ্ট লাভের মাধ্যম সুতরাং এদেরকে তারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে তাদের উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন উপাসনা করত। এভাবে শিরকের ধাপে ধাপে এক সময় তারা দেব-দেবীকে আল্লাহ ছাড়াও ইলাহ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নেয় এবং বিশ্বাস করতে থাকে যে এদেরও জগতের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের নিজস্ব শক্তি রয়েছে। ইবাদত-বন্দেগির যত বহিঃপ্রকাশ ছিল যেমন, দোয়া, সিজদা, কুরবানী এসব তখন দেব-দেবীর নামে তারা করত। আরবের ঘরগুলো ছিল তখন নানা দেব-দেবীর প্রতিমা বা মূর্তির আখড়া। কোথাও যেতে হলেও তারা তাদের পছন্দনীয় কোনো মূর্তি কাঁদে নিয়ে বের হত। প্রত্যেক গোত্রের ও জনপদের ছিল আলাদা মূর্তি। এভাবে দুর্বল চিন্তাশক্তির ফলে আরবের প্রায় সমস্ত জনপদ হয়ে পড়ে মূর্তি ও প্রতিমা পূজার নিঘরে বন্দি। খোদ বায়তুল্লাহর ভিতরে ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল, আরবরা এদের পূজা করত। বায়তুল্লাহর সম্মুখে নরবলিও হত।

ঐতিহাসিক কালবি লেখেন, মক্কার প্রত্যেক পরিবারের ছিল নিজস্ব দেবতা, পরিবারের ভেতরেই শুধু এই পারিবারিক দেবতার উপাসনা হত। কারো সফরকালে শেষ কাজ ছিল এই গৃহদেবতার স্পর্শ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করা এবং সফর থেকে বাড়ি ফিরে কাজ ছিল দেবতার স্পর্শ গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা। সফরে কোথাও থামার পর চারটি পাথর বাছাই করা হত এবং সবচেয়ে সুন্দরটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা হত, বাকি তিনটিকে বানানো হত চুলার পায়া। চলে যাওয়ার সময় অবশ্য সবগুলোকেই ফেলে যাওয়া হত।[৮৮]

---

[৮৮] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১০২-১০৩।

ইমাম বুখারীর রহ. বর্ণনায় এদের কথা এভাবে উল্লেখ আছে, আমরা সুন্দর পাথরের পূজা করতাম, যখন আমরা সুন্দর পাথর পেতাম তখন পূর্বেরটি ছেড়ে নতুনটির পূজা শুরু করতাম। এমনকি যুতসই পাথর না পেলে মাটি জড়ো করে তার উপর বকরীর দুধ দোহন করতাম এবং দুধভেজা মাটির স্তূপকেই তাওয়াফ করতাম।[৮৯] এছাড়াও আরবদের উপাস্যের তালিকায় ছিল– ফেরেশতা, জ্বীন-পরি, চন্দ্র-সূর্য, তারকা, বিশেষ রাশি প্রভৃতি ও কল্পিত নানা দেব-দেবী। ফেরেশতাকে আরবরা আল্লাহর প্রিয় কন্যা বিশ্বাস করত।

নবুয়ত ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান সম্পর্কে আরবদের ছিল কাল্পনিক কিছু ধারণা ও বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস ছিল– নবী-রাসূল হলেন এমন এক সত্তা যারা পানাহার, বিয়ে-শাদি করেন না, সন্তান জন্ম দেন না, বাজারে বিচরণ করেন না ইত্যাদি। অথচ মানবীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যতীত কোনো সত্তা যে মানুষের আদর্শ বা মডেল হতে পারেন না, অর্থাৎ মানুষের নবী মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়– এই সহজ-সরল সত্য আরবদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরা দিত না। তাদের দুর্বল চিন্তায় এটাও ধরত না যে মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন থাকা আবশ্যক যার ফলে মানুষের যথাযথ প্রাপ্য- শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করা যায় যা দুনিয়ার জীবনে অসম্ভব। তাদের ধারণা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআনের ভাষায় তারা বলত:

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝ (জাছিয়া) وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ (আল-ইসরা) ﴾

অর্থাৎ, তারা বলে, "আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ, আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে, তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।" (জাছিয়া : ২৪) "যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব?" (বনি-ঈসরাইল : ৪৯)

---

[৮৯] *প্রাগুক্ত।*

আরব জাহেলিয়াতের সেই যুগে তখনও যে কয়জন মুষ্টিমেয় লোক সৃষ্টিকর্তা ও মূর্তিপূজার এসব জঞ্জাল-ধ্বংসের মধ্যে পার্থক্য করে চলত তারা ছিল ধর্মজ্ঞানী শিক্ষিত কিন্তু সমাজ-বিচ্ছিন্ন শ্রেণি।

মদ-সুদ-জুয়ার সমাজ

এই তিনে মিলে ছিল আরব সমাজ। বলা যায়, আরবরা এগুলোর পূজা করত আর এগুলো তাদের জীবনকে গ্রাস করত। মদ-জুয়ার স্থান দিনরাত ঝাণ্ডা উড়িয়ে খোলা রাখা হত যাতে লোকজন সহজে চিনতে পারে। মদ-জুয়া সম্পর্কে নিচে তাদের নিজের পংক্তিগুলো লক্ষ করুন:

১. 'কত রাত ভোর হল বন্ধুদের জলসায়, মদের ফোয়ারায়! কত পানশালায় ছিল আমার অভিসার 'ঝাণ্ডা' তোলা মাত্র! দুর্লভ মদিরায় পূর্ণ ছিল পাত্র! এবং আমি ছিলাম বন্ধুদের মধ্যমণি!' (কবি লাবীদ, ষষ্ঠ শতক।)

২. 'চমকদার ও চটকদার পোশাক জড়িয়ে, ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে ছুটেছি 'তাজিরের' পানশালে। এভাবেই এসেছি গোটা জীবন কাটিয়ে'। (জাহেলী যুগের কবি ইমরুল কায়েসের বন্ধু আমর বিন কোমায়আ।)

৩. 'রায়তার পুত্র! আমাদের লজ্জা দাও উটনীর দুধ-গোশতের কথা বলে! এতে লজ্জার কী হল! অসব তো বন্ধু, আর অতিথির জন্য! তারপর যা থাকে তা উড়াই মদে ও জুয়ায়।' (কবি সুবরা বিন ওমায়র, জাহেলী যুগ।)

৪. 'যদি মরে যাই তবে হে প্রেয়সী! এমন কারো সঙ্গ গ্রহণ করো না, যার হাতে নেই সম্পদ এবং যে বসে থাকে জুয়ার আড্ডা থেকে দূরে।' (কবি হুজুর বিন খালিদ, জাহেলী যুগ।)

বিখ্যাত তাবেঈ কাতাদাহ র. বলেন, জাহেলী যুগে মানুষ নিজের সম্পদ ও পরিবারের উপর বাজি ধরে জুয়া খেলত। তারপর সর্বস্ব হারিয়ে হায়-

আফসোস করত। যখন সবকিছু অন্যের দখলে দেখতে পেত তখন বুকে হিংসার আগুন জ্বলে উঠত এবং দুশমনি ও খুনখারাবি শুরু হত।[৯০]

হিজাযের অধিবাসী আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপক সুদের কারবার ছিল। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ উসুল করা হত এবং অনাদায়ে অবলীলায় নিষ্ঠুর ও পাশবিক আচরণ করা হত।[৯১] প্রচলিত ব্যবসা বা বেচাকেনা ও সুদের মধ্যে মানুষ কোনো পার্থক্যই মনে করত না বরং উপমা দিয়ে বলত, قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا "…..বেচাকেনা তো সুদেরই মতো।" (বাকারা : ২৭৫) পানশালায় নারীদেহ উপভোগের ব্যবস্থা থাকত।[৯২]

অভিশপ্ত নারী-জীবন

জাহেলী আরবে নারীদের উল্লেখযোগ্য কোনো ইজ্জত-সম্মান ছিল না; বিশেষত অশ্লিলতার দিক থেকে পৃথিবীর অপরাপর দেশ ও জনপদের চেয়ে হেজাযের নারী সমাজ পিছিয়ে ছিল না মোটেও। নারীর নিজস্ব সম্পদ বলতে কিছু ছিল না, দেহসৌন্দর্যই ছিল নারীর সম্পদ যাকে পশুসম্পদের মতো ভোগ-দখল করা হত। যতদিন দেহসৌন্দর্য ও দেহবল আছে কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত এটি দিয়ে কোনো না কোনো ভাবে মনিব উপকার লাভ করতে পারে ততদিন তার কদর হত, বরং বলা ভাল- এ ছিল প্রহসনের কদর, তা না হলে সমাজে তার কোনো স্থান নেই, আশ্রয় নেই। যিনা ও বিবাহ বহির্ভূত সম্ভোগ তথা ব্যভিচার দোষের ছিল না, এটি বিরলও ছিল না। বস্তুত, ব্যভিচারকে সেকালে অপরাধ মনে করা হত না। অভিজাত শ্রেণিতে স্ত্রীর বাইরে উপপত্নি রাখা, দেহব্যবসা ইত্যাদি ছিল। দাসীকে জোরপূর্বক দেহব্যবসায় নামিয়ে মনিব তার দেহ-উপার্জন ভোগ করত। মীরাছ ও উত্তরাধিকার বলতে কোনো কিছু হেজাযের নারীদের ছিল না। স্বামীর মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীর

---

[৯০] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত* । পৃ. ১০৭।

[৯১] *তাফসীরে তাবারী*। ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬৯। উদ্ধৃতি, নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১০৭।

[৯২] *প্রাগুক্ত*। ১৮ খণ্ড, পৃ. ৪০১। উদ্ধৃতি, নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১০৮।

দ্বিতীয় স্বামী পছন্দের কোনো অধিকার থাকত না বরং বস্তুগত সম্পদের মতো নারীও মীরাছরূপে হস্তান্তর হত। পুরুষরা তাদের অধিকার ষোলআনা আদায় করত কিন্তু নারীর অধিকার হত লুণ্ঠিত। অনেক আহার্যদ্রব্য পর্যন্ত নারীর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। পুরুষরা ইচ্ছামতো যত খুশি সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত কিন্তু স্ত্রীদের মধ্যে অধিকার ও সমতা রক্ষার কোনো ইচ্ছাই পরিলক্ষিত হত না। অবশ্য একই নারী একই সময়ে বিভিন্ন পুরুষকে বিয়ে করে উৎকট সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দিত, এতে কেউ কিছু মনে করত না।[৯৩] আরবে কন্যা সন্তানকে অভিশাপ ও লজ্জা-কলঙ্কের বিষয় মনে করে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। অনেকে দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। এক্ষেত্রে পিতারা চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করত না।

অন্ধ গোত্রপ্রীতি, বংশ গরিমা ও দাস প্রথা

আরব সমাজে গোত্রপ্রীতি ও বংশ গরিমা এমন ছিল যা অনিবার্যভাবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহে পর্যবসিত হত। আরবে প্রাচীনকাল থেকে এ কথা প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত ছিল যার ওপর তারা আমল করত: 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, হোক সে যালিম বা মযলুম'- অর্থাৎ তোমার ভাই যালিম হলেও তার পক্ষ নিয়ে মজলুমকে নিঃশেষ করে দাও, আর তোমার ভাই মজলুম হলে ন্যায়ের কোনো পরোয়া না করে প্রতিশোধের আগুনে পারলে সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দাও। পরে লক্ষ করব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে এমন পশুত্বকে মনুষ্যত্বের ন্যায়ে রূপান্তরিত করেছিলেন। বংশ গরিমায় তারা পরস্পরের ওপর গর্বে টইটুম্বুর থাকত। এটি ছিল আরব সমাজের আরেকটি জাহেলী মানসিক রোগ যা তাদেরকে ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ন্যায় জাত-বেজাত, উচু-নীচু, ভদ্র-অভদ্র শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল। যেসব পরিবার, গোত্র ও বংশ নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত মনে করত এবং যাদেরকে নিজেদের সমকক্ষ ভাবত না তাদের সঙ্গে মেলামেশাকে অগৌরব ও অসম্মানের বিষয় বিবেচনা করত। যেমন কোরায়শরা অনেক ক্রিয়াকর্মে

---

[৯৩] মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৩৮।

সাধারণ হাজীদের থেকে আলাদা অবস্থান করত। আরাফার মাঠে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে অবস্থানকে তারা অগৌরব মনে করত। তাই আগমন ও প্রস্থান অগ্রে পশ্চাতে সম্পন্ন হত। একটি শ্রেণি ছিল জন্মগতভাবে বংশপরম্পরায় প্রভুত্বের অধিকারী, আরেক শ্রেণি ছিল জন্মগতভাবেই নিম্নশ্রেণির যাদেরকে বেগার খাটানো দোষের ছিল না। অভিজাত শ্রেণির চোখে এসব শ্রেণির কোনো মর্যাদাই ছিল না।

আরবে দাসপ্রথা ও এর ব্যবসা ছিল এক ভয়াবহ ব্যাধি। হাট-বাজারে পণ্যের মতো দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হত। মনিবের উপর দাসের কোনো অধিকার ছিল না পক্ষান্তরে দাসের ব্যাপারে মনিবের অধিকার ছিল নিরংকুশ। দাসকে দিয়ে পশুর মতো চাকর খাটানো, প্রহার করা এমনকি মেরে ফেললেও কারো কোনো ক্ষমতা ছিল না এর বদলা নেওয়ার বা প্রতিকার চাওয়ার।

যুদ্ধের স্বভাব আসক্তি

লড়াই, হামলা, লুণ্ঠন, মারামারি, খুনখারাবি ছিল আরব জাতির স্বাভাবিক প্রকৃতি। সভ্যতা থেকে বহু দূরে মরুচারী জীবনের স্বতঃস্ফুর্ত চাহিদাও ছিল এগুলো। আরব দস্যুদের লুণ্ঠন থেকে জান-মাল, ইজ্জত-আবরু রক্ষা পাওয়ার উপায় ছিল না। কেউ জানত না যে কখন কে খুন হবে বা লুণ্ঠনের শিকার হবে। আরব মরুদস্যুদের লুণ্ঠন থেকে বাণিজ্য কাফেলা ও প্রেরিত দূতদের রক্ষা করার জন্য পারস্য সম্রাটেরও বিকল্প কোনো উপায় ছিল না। আর যুদ্ধবিগ্রহ যে কেবল আরবদের জীবন-জীবিকার তাগিদেই প্রয়োজন ছিল তা নয় বরং এ ছিল তাদের গৌরব ও মর্যাদারও সোপান। অধিকন্তু এটি ছিল সম্ভবত তাদের আনন্দ-বিনোদন, উচ্ছ্বাস-উল্লাসের সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম। যুদ্ধ ছাড়া তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না এবং এ ছাড়া তাদের মরণও সম্ভব ছিল না। কারণ তরবারির আঘাত ছাড়া যে মরণ, শত্রু-মিত্র সবার চোখে তা ছিল কাপুরুষের মরণ। তাইতো জাহেলিয়াতের কবি বলতে পারেন:

> কখনও ঝাঁপিয়ে পড়ি আমাদের ভাই বনু বকরের উপর
> যখন ভাই ছাড়া কাউকে না পাই।

আরেক কবি বলেন:

> আমার ঘোড়া যখন হবে জোয়ান ও তেজীয়ান
> যুদ্ধ দেবতা যেন ছড়িয়ে দেয় যুদ্ধের আগুন
> আমার ঘোড়া যেন দেখাতে পারে তেজ
> আর তলোয়ার দেখাতে পারে ধার।

আরবদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত এমনই সাধারণ বিষয় ছিল যে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের রক্তাক্ত লেলিহান শিখা দাবানলের মতো জালিয়ে-পুড়িয়ে মারত তাদের। জাহেলিয়াতের চল্লিশ বছর ব্যাপি সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কুখ্যাত যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল একটি উটনীর উলান লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারাকে কেন্দ্র করে। এর প্রতিশোধে উটনীর মালিক জাস্সাস বিন মুররাহ তীর নিক্ষেপকারী কোলায়বকে হত্যা করে বসে আর এতেই বেঁধে গেল দুই গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ যা স্থায়ী হয়েছিল চল্লিশ বছর। কোলায়বের ভাই মুহালহালের মুখে সেই যুদ্ধের পরিণতি ছিল:

> দুই কবিলা ফানা হয়ে গেল।
> মায়েরা হল পুত্রহারা, সন্তানেরা হল পিতৃহারা।
> (চারদিকে ছিল শুধু এতিম-বিধবা।) কে মুছে দেয়
> চোখের পানি, আর কে দাফন করে বে-কাফন লাশ।

দাহিছ যুদ্ধ বেঁধেছিল আরো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে। কায়স বিন যুহায়র ও হোযায়ফা বিন বদরের মধ্যে ঘোর দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়েছিল। কায়সের তেজী ঘোড়া 'দাহিছ' যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন হোযায়ফার ঈঙ্গিতে আসাদ গোত্রীয় কেউ একজন আগে বেড়ে দাহিছের মুখে আঘাত করে ফলে দাহিছের দৌড়ের গতি ব্যহত হলে অন্যান্য ঘোড়া এগিয়ে যায়। এতেই শুরু হল খুন, খুনের বদলা খুন। প্রত্যেক গোত্র যার যার গোত্রের পাশে দাড়াল, শুরু হল তুমুল যুদ্ধ এবং উজার হল কবিলার পর কবিলা। নিহত হল হাজার হাজার যোদ্ধা, শেষে যুদ্ধ থেমে গেল যোদ্ধার অভাবে। মুসোলিনী বলেছিলেন, 'যুদ্ধই শান্তি যুদ্ধই সর্বজনীন।' মনে হয় আরবরাও কথাটি জানত!

জাহেলী যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

পৃথিবীতে মানুষ শোষণের ইতিহাস প্রাকৃতিক দুর্যোগের থেকেও বেদনাধায়ক। যেখানেই লিখিত ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে, সেখানেই রয়েছে মানুষের উপর মানুষের শোষণের করুণ কাহিনী। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে কিংবা এককথায় জাহেলী যুগে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল তা গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষকে শোষণের মধ্যে দিয়ে।

সর্বনাশা একনায়কতন্ত্র ও রাজতন্ত্র

পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত অপশাসন দেখা গিয়েছে, স্বেচ্ছাচারী একনায়কতন্ত্র ও রাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে সেসবের অন্যতম। এমনকি আধুনিক তথাকথিত গণতন্ত্রও একটি প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিচয় দিতে আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে নিরপরাধ জনসাধারণকে শাসনের নামে বর্বর শোষণ, নাগরিক অধিকার ও বাক-স্বাধীনতা হরণ, রাষ্ট্রের সম্পদ তথা জনগণের সম্পদকে শাসকের নিজস্ব মৌরসী মিরাছ মনে করে নিজস্ব খেয়াল খুশিমতো ভোগ-দখল ও লুণ্ঠন, জনগণকে মৌল মানবিক অধিকার থেকে চরমভাবে বঞ্চিত রেখে শাসকের অকল্পনীয় বিলাসী জীবন-যাপন, নিরপরাধ জনসাধারণকে কারণে-অকারণে হত্যা-নির্যাতন ইত্যাদির যে নিদারুণ মর্মন্তুদ কাহিনী লিখিত রয়েছে সেসব চলত স্বৈরাচারী এসব শাসনের মাধ্যমে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক তো বটেই, বিংশ শতক পর্যন্ত এই পৃথিবীকে মুসোলিনী, হিটলারের মতো একনায়ককে দেখতে হয়েছে। যাই হোক, আমরা বিশেষত যে ষষ্ঠ শতকের কথা বলতে চাই, স্বেচ্ছাচারী নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রই ছিল সে যুগের একমাত্র প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি বিষয়ে রাজ-আজ্ঞাই ছিল প্রথম ও শেষ কথা। এসব শাসন ব্যবস্থা বংশের অতি-মানবীয় মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করত। যেমন, পারস্যে সাসানী রাজবংশের দাবী ও বিশ্বাস ছিল যে রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে মৌরসী অধিকার যা ঐশী সমর্থনপুষ্ট। প্রজাসমাজেও এ বিশ্বাস তারা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করত এবং এতে তারা সফলও হয়েছিল। একসময় পারস্যের প্রজাসাধারণ এই পবিত্র রাজ-অধিকার শুধু স্বীকারই নয়, এটি তাদের ধর্মবিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য

অংশে পরিণত হয়েছিল। এমন রাজতন্ত্র কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বয়ং সম্রাটের নিরঙ্কুশ অতি-মানবীয় মর্যাদার উপর। যেমন, চীনে সম্রাটকে প্রজারা আকাশের পুত্র বলে বিশ্বাস করত। প্রজাদের বিশ্বাস ছিল যে আকাশ ও পৃথিবী হল নর ও নারী যাদের মিলনে সৃষ্টিকূলের উদ্ভব। সম্রাট প্রথম 'খাতা' হচ্ছেন পিতামাতারূপ আকাশ-পৃথিবীর মিলনের প্রথম ফল। সুতরাং সম্রাট হলেন প্রজাকূলের একমাত্র পিতা যার নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে যে কোনো ইচ্ছা করার ও কার্যকর করার। সম্রাটের প্রতি সম্মোধন রীতি ছিল– 'আপনিই আমাদের পিতা-মাতা' একথা বলে। সম্রাট লীয়ান কিংবা তাইশুঙের মৃত্যুতে সমগ্র চীন এমন শোক প্রকাশ করেছিল যার নযির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। কেউ সুঁই দিয়ে চেহারা রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করেছে, কেউ কফিনে মাথা ঠুকে নাক-মুখ জখম করেছে ইত্যাদি। গগণ বিধারী কান্নার রোল তো ছিল অতি সাধারণ। কখনও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হত বিশেষ কোনো দেশ ও ভূখণ্ডের অতিমানবীয় মর্যাদার উপর। রোমান সাম্রাজ্য এর দৃষ্টান্ত।

রোম ও রোমান জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছিল সাম্রাজ্যের মৌলিক বিধানের অন্তর্ভূক্ত, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ছিল রোমান জাতীয়তার সেবাদাস। তাদের পুরোপুরি এই অধিকার ছিল যে কোনো আইন লঙ্ঘন করার, যে কারো অধিকার হরণ ও সম্ভ্রম লুণ্ঠনের। রোমান ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য পোষণের পরও অন্য লোকদের রোমানদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পাবে এমন নিশ্চয়তা ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বিজিত জাতির স্বায়ত্বশাসন বা মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের কোনো উপায় ছিল না, বরং এ ধরনের চিন্তা করাও ছিল রাজদ্রোহিতা এবং ফাঁসিযোগ্য অপরাধ। নদবী রহ. চমৎকার লেখেন, বিজিত প্রতিটি অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী যেন ছিল সেই উটনী যা ভার বহন করবে, দুধও দেবে। বিনিময়ে পাবে শুধু বেঁচে থাকার এবং ওলানে দুধ জমা হওয়ার মতো দানাপানি।[৯৪] Robert Briffault লেখেন: রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও

---

[৯৪] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১২১।

ধ্বংসের মূল কারণ ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ছিল না, বরং প্রকৃত কারণ এই ছিল যে, দুর্নীতি, মন্দাচার ও বাস্তববিমুখতা ছিল তাদের স্বভাবপ্রবণতা যা সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বিকাশের শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। যে কোনো মানবসমাজ বা মানব প্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের ভুল বুনিয়াদ ও ভ্রান্ত ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে তাহলে নিছক মেধা ও কুশলতা দ্বারা, তা যত বিপুল পরিমানেই হোক, তাকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে না। যেহেতু অনাচার ও মন্দাচারই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি-বুনিয়াদ সেহেতু একদিন না একদিন তার পতন ও ধ্বংস অনিবার্য ছিল। বহুমুখী যোগ্যতা এবং বিচার ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতার মতো গুণ-বৈশিষ্ট্য এ সাম্রাজ্যে থাকলেও সাম্রাজ্যকে তার বুনিয়াদী গলদের নির্মম পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে নি, পারার কথাও নয়।[৯৫]

মিশর ও সিরিয়া

পূর্বেই বলেছি যে ৩৯৫ খ্রি. থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে উসমানী তুর্কীদের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রোমান বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল গ্রীস, বলকান অঞ্চল, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, সমগ্র উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল। সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্যে ট্যাক্সের বোঝা রীতিমতো ছিল করনৈরাজ্যের নামান্তর যে কারণে প্রজাসাধারণ বরং অন্য কোনো শাসনের আকাঙ্ক্ষা করত যা হয়তো তাদের দুর্দশা লাগব করবে। Alfred Butler লেখেন, মিশরে রোমান শাসনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শাসকদের ভোগ-বিলাসের জন্য প্রজা-শোষণ ও সম্পদ লুণ্ঠন। জনগণের সুখ-শান্তি ও জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করার চিন্তা তাদের ছিল না, বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন তো অনেক পরের কথা, এমনকি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়েও তাদের কোনো ভাবনা ছিল না। এ ছিল সম্পূর্ণ এক সামরিক শাসন যেখানে প্রজাহিতৈষী বলতে কিছুই ছিল না।[৯৬]

---

[৯৫] Robert Briffault. *Ibid.* p. 159.
[৯৬] A. J. Butler. *Ibid.*

রোমান শাসনে সিরিয়ার অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ যা আজ কল্পনা করাও অসম্ভব। কর-খাজনা নৈরাজ্যের কারণে সিরিয়রা কোলের সন্তান পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হত। রোমানদের কাজই ছিল সিরিয়দের দাস বানানো ও বেগার খাটানো যাদের ছিল না কোনো নাগরিক অধিকার। রোমানরা সিরিয়াকে কখনও রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেনি, কিন্তু শাসন-শোষণ সবই করেছে। ফলে সিরিয় ভূখণ্ড যেমন রোমান ভূখণ্ডের মর্যাদা পায় নি তেমনি সিরিয়রাও পায় নি কখনও কোনো নাগরিক অধিকার। সিরিয়ায় ৩৬৭ বছরের গ্রিক শাসন ছিল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ৭০০ বছরের রোমান শাসন ছিল বিবাদ-গোলযোগ, হানাহানি প্রভৃতিতে চরমভাবে নিমজ্জিত। অথচ সিরিয়া ছিল শান্তিপূর্ণ দেশ। গ্রিক ও রোমান শাসন সিরিয়দের জন্য ছিল চরশ অভিশাপ।[৯৭] রোমান সাম্রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। তার উপর ছাপানো হত নিত্য-নতুন করের বোঝা। এর মধ্যে ছিল লাগামহীন শোষণের হাতিয়াররূপে ইজারাদারি ও সম্পদ বাজেয়াপ্তের ব্যবস্থা। মিশরের ক্ষেত্রে শুধু এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে, রোমানরা মিশরকে গ্রহণ করেছিল শুধু দুধের বকরীরূপে। তারা দুধ দোহন করত শেষ ফোঁটা পর্যন্ত। ঘাস ও দানা-পানি যা খাওয়াত তা শুধু এজন্য যে ওলানে দুধ যেন ভালো করে জমে। মিশরে রোমকদের একমাত্র কাজ ছিল মিশরীয়দের সম্পদ লুণ্ঠন ও রক্তশোষণ।[৯৮]

Historian's History of the World গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখন চরম অবক্ষয় ও অরাজকতার শিকার হয়ে পড়েছিল, এর কারণ ছিল মাত্রাতিরিক্ত কর ও রাজস্ব আদায়, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি, কৃষি ও চাষাবাদে অবহেলা এবং পরিণতিতে জনপদের ক্রমহ্রাসমানতা।[৯৯] স্বাভাবিকভাবে এতে রোমান সাম্রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ধূমায়িত প্রজা অসন্তোষের

---

[৯৭] *Ibid.*

[৯৮] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৭৬।

[৯৯] *Historian's History of the World.* Vol. 7. p. 175.

আড়ালে জনগণের মধ্যে বরং বিদেশী শাসন কাম্য হয়ে উঠেছিল।[১০০] ফলশ্রুতি ছিল ব্যাপক গোলযোগ ও বিদ্রোহ। উদাহরণস্বরূপ, ৫৩২ খ্রিস্টাব্দে এক দাঙ্গা-গোলযোগে শুধু রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীতেই মারা পড়েছিল ত্রিশ হাজার মানুষ, সমকালিন জনসংখ্যার হিসেবে এ সংখ্যা মোটেও কম ছিল না।[১০১] মোটকথা রোমান ও পারসিক উপনিবেশসমূহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়ে ছিল সর্বনাশা ধ্বংসের কবলে আবদ্ধ।

পারস্যের কর-খাজনা ব্যবস্থা

পারস্যে কর-খাজনা আদায়ে কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করা হত না, বলা উচিত যে এতে কোনো নিয়ম-নীতিই ছিল না। রাজস্ব ব্যবস্থা রাজকর্মচারীদের খেয়ালখুশিমতো চলত, ফলে এ ব্যবস্থা ছিল মারাত্মক শোষণমূলক ও অস্থিতিশীল। A. L. Christensen লেখেন, 'কর নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীরা সততা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দিত না, তারা শোষণ ও লুণ্ঠনের মানসিকতা পোষণ করত। যেহেতু কর ও রাজস্বের পরিমাণ প্রতি বছর পরিবর্তিত হত ও ওঠানামা করত সেহেতু রাজ্যের আয়-ব্যয় কখনও পরিকল্পিত ও স্থিতিশীল হত না। যেমন খুশি আয় যেমন খুশি ব্যয়– এই ছিল অবস্থা। এমনও হত যে যুদ্ধ বেঁধে গেছে, অথচ রাজকোষ শূন্য। তখন 'যুদ্ধব্যয়' নামে নতুন কর চাপানো হত। প্রায় সময় পশ্চিমের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো এবং বিশেষভাবে বাবেল এই করনৈরাজ্যের শিকার হত।'[১০২]

কর-খাজনার এই নৈরাজ্য পারস্যের কৃষক সমাজকে এমন পর্যুদস্ত করেছিল, ফলে তারা কর-খাজনা ও বাধ্যতামূলক সেনাভর্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে কৃষি কাজ ছেড়ে ধর্মীয় উপাসনালয়ে আশ্রয় নিত। এসব হতভাগ্য

---

[১০০] Arthur Goldschmidt, JR. 2008. *A Breif History of Egypt.* New York : Infobase Publishing. pp. 37-38.

[১০১] Encyclopedia Britanica. *Justin.*

[১০২] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১২৩।

কৃষকদের বড় বড় দলকে ভারবাহী কাজের জন্য সেনাদলের পেছনে পেছনে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে চলতে হত, এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। ভূ-স্বামীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল নিছক মনিব-দাসের। এর ফলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যেত। A. L. Christensen লেখেন, কৃষকদের পরিচয় ছিল নিজ নিজ ভূমির সঙ্গে বাঁধা ভূমিদাস।[১০৩]

রাজকোষ না রাজার কোষ?

রাজকোষের একচ্ছত্র মালিক হতেন সম্রাট ফলে রাজকোষের অর্থ-সম্পদের ব্যবহার হত সম্রাটের খেয়াল-খুশিমতো। রাজকোষ থেকে প্রজাসাধারণের জন্য অতি অল্পই ব্যয় করা হত। সম্পদ জমা কর রাজকোষে নয়, রাজার ভাণ্ডারে– এই ছিল নীতি। বিশেষত, নগদ অর্থ, সোনাদানা, মূল্যবান সামগ্রী ইত্যাদি তো সম্রাটের ব্যক্তিগত ভাণ্ডারের বাইরে জমা করার কোনো সুযোগই ছিল না। পারস্যের সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর ব্যক্তিগত সম্পদ যখন মাদায়েনে নবনির্মিত প্রাসাদে স্থানান্তর করা হয় তখন শুধু স্বর্ণের পরিমাণই ছিল ৪৬ কোটি ৮০ লাখ মিছকাল (৩৭ কোটি ৫০ লাখ ফ্রাংক স্বর্ণমুদ্রা)। তার রাজত্বের তের বছর পূর্তির পর এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৮০ কোটি মিছকাল। সম্রাট সাহেবের রাজমুকুটে ব্যবহৃত কেবল স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ১২০ পাউন্ড (প্রায় দেড় মন।)। রাজমুকুটটি সোনাদানা, হিরা, পান্না, মোতি দ্বারা তৈরি ছিল। বেচারা সম্রাট বটে! এ ধরনের চিত্র রোমান, পারস্য, ভারতীয় সকল রাজ-সাম্রাজ্যেই প্রায় একইরকম ছিল।

ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের নগ্ন সহাবস্থান

আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করছি সে সময় রোমান, পারস্য, ভারতীয় প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। যেহেতু সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় পরিবার ও ব্যক্তির মধ্যে আবর্তিত হত

---

[১০৩] *প্রাগুক্ত*। ১২৬।

এবং অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র প্রজাগোষ্ঠীর জীবন পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছাই রাজা বা সম্রাটের থাকত না ফলে ধনী-দরিদ্রের এই মনুষ্যসৃষ্ট ফাঁরাক ঘুচার কোনো সুযোগ ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, গ্রাম ও শহরের সাধারণ জনগণ রোমকদের অত্যাচারে মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। ভূমিদাস প্রথার বদলে ঔপনিবেশিকতা স্থান নিয়েছিল– তারা স্বাধীনতা ও দাসত্বের মাঝামাঝি অবস্থা দখল করেছিল। এ অবস্থা জনগণের তেমন কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে নি, বরং বলা উচিত যে এসব কোনো কিছুই তখন জনগণের কল্যাণের চিন্তায় কেউ করত না। জনগণ তাতেও ছিল দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার বা দেশের দাস। তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধীন ছিল। এভাবে এক দাস-ব্যবস্থা থেকে অন্য দাস-ব্যবস্থায় বৃহত্তর জনগণের জীবন আবর্তিত হত। জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের অবস্থা তাই শোচনীয় ছিল। বিপরীতে রাজপরিবার, পরিষদবর্গ, উচ্চ রাজ-কর্মচারী ও ধনীরা দাসদাসী পরিবৃত্ত সুশোভিত ভিলায় চরম আনন্দ-বিলাসে জীবন উপভোগ করছিল। আমীর আলী লেখেন, এই বিলাসীতা ও প্রাচুর্যের দৃশ্য জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার পাশে এক ভয়াবহ বৈসাদৃশ্যের চিত্র উপাস্থাপিত করেছিল।[১০৪]

সম্রাট নওশেরাঁওয়াকে পারস্যের সুশাসন ও সুবিচারের ক্ষেত্রে একজন আদর্শ সম্রাট মনে করা হত। তার আমলের চিত্র সম্পর্কে A. L. Christensen লেখেন, সম্রাট নওশেরাঁওয়া রাজ্যের অর্থব্যবস্থার যে সংস্কার সাধন করেছিলেন তা প্রজাসাধারণের কোনো কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে রাজকোষের স্বার্থই বেশি রক্ষা করেছিল। ফলে প্রজাসাধারণ পূর্বের মতোই অবজ্ঞা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে জীবন-যাপন করত। Christensen আরো লেখেন, যেসব বাইজান্টাইন দার্শনিক পারস্যে রাজ-আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, অচিরেই তারা কতিপয় আচার-প্রথা অর্থাৎ, কন্যা-ভগ্নিবিবাহ এবং মৃতদেহ উন্মুক্ত ফেলে রাখার জন্য পারস্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন; কিন্তু এসব

---

[১০৪] সৈয়দ আমীর আলী। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৬।

দার্শনিকদের নিছক এ জাতীয় কারণে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে পারস্যের উচু-নীচু জাতপ্রথা, সমাজের অনতিক্রম্য শ্রেণি-বৈষম্য, চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশাগ্রস্ত জন-জীবন, দুর্বলের প্রতি সবলের অবর্ণনীয় যুলুম-অত্যাচার প্রভৃতির জন্য প্রকৃত বীতশ্রদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। এসবই ছিল পারস্য সমাজের প্রতি মর্মপীড়ার আসল কারণ।[১০৫] মোটকথা, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে রোমান, পারস্য এসব সাম্রাজ্য ছিল ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের নগ্ন-সহাবস্থানের নিকৃষ্টতম ভূমি।

R. V. C. Bodly তাঁর *The Messenger : The Life of Muhammad* গ্রন্থে ইসলামের আবির্ভাবকালীন সময়ের বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে লেখেন:

> 'যদিও আরবজাতি প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল তবু খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের বিশ্বে তাদের কোনো আলাদা গুরুত্ব ছিল না। কারণ, ঐ সময় ছিল মানব সভ্যতার জন্য একটি মুমূর্ষুকাল, যখন পূর্বইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার বিশাল দুই সাম্রাজ্য হয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিংবা তাদের রাজকীয় শাসন বিলুপ্তির প্রান্তসীমায় এসে পড়েছিল। সেটা ছিল এমন এক পৃথিবী যা তখনও গ্রিকদের ভাষা-অলঙ্কার, পারস্যের তাপ ও প্রতাপ, এবং রোমের জৌলুস ও জাঁকজমক দ্বারা বিমোহিত ছিল। কোনো কিছু, এমনকি কোনো একটি ধর্মও এমন ছিল না, যা ঐগুলোর কোনো একটির স্থান গ্রহণ করতে পারে।
>
> ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছিন্নমূল এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন অবস্থায় ঘুরে মরছিল। পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও তাদের সহ্য করা হত, আর কখনও তাদের উপর যুলুম নির্যাতন চালানো হত। নিজের বলতে তাদের কোনো দেশ ছিল না। তাদের ভবিষ্যত তখনও ছিল অনিশ্চিত যেমনটি আছে আজও। মহামতি পোপ গ্রেগরির প্রভাবলয়ের বাইরে খ্রিস্টানরা তাদের সহজ-সরল ধর্মবিশ্বাসে বিচিত্র সব জটিল তত্ত্ব উদ্ভাবনে তৎপর ছিল এবং

[১০৫] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১২৪-১২৫।

এ নিয়ে পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠেছিল। শুধু পারস্যে সাম্রাজ্য বিনির্মাণের একটি শেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সম্রাট দ্বিতীয় খসরু তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত করে তিনি কাপাডোসিয়া, মিশর ও সিরিয়া দখল করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া ৬২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাইতুল মাকদিস ধ্বংস করে পবিত্র ক্রুশ লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে তিনি সম্রাট প্রথম দারা- এর রাজপ্রতাপ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যেন মধ্যপ্রাচ্যেও শৌর্য-সাহস নতুন প্রাণ লাভ করেছে। অবশ্য বাইজান্টাইন রোমকরাও তাদের অতীত শৌর্য তখনও কিছুটা ধারণ করেছিল। পারস্য সম্রাট খসরু যখন কনস্টান্টিনোপলের নগরপ্রাচীরের কাছে তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত, তখন তারা সংগ্রাম ও প্রতিরোধের একটা চূড়ান্ত প্রচেষ্টার প্রদর্শনী করেছিল।

দূরপ্রাচ্যের পরিবেশ-পরিস্থিতিও বিশ্বে কোনো সন্তোষজনক ছাপ ফেলতে পারছিল না। হিন্দুস্থান তখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চীনারা ছিল পারস্পরিক সজ্ঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত। সুঈ বংশের উত্থান হল, পতনও হয়ে গেল, তার স্থান দখল করল তাঙ বংশ যারা শাসন ক্ষমতায় ছিল তিনশো বছর। স্পেন ও ইংল্যাণ্ড ছিল গুরুত্বহীন ক্ষুদ্র দেশ। স্পেনে ছিল ভিসিগথদের শাসন যারা মাত্র কিছুকাল আগে ফ্রান্সের বিরাট এলাকা দখল করেও সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। স্পেনে তারা ইহুদিদের উপর চরম যুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল, যা শতাব্দীকাল পরের মুসলিম অভিযানের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।'[১০৬]

Shell লেখেন, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের বিশ্বে ন্যায় ও সুবিচার বাজারে পণ্যের মতো কেনা বেচা লত। ঘুষ-দুর্নীতি, আমানতের খেয়ানত, দুষ্কৃতি মানুষের উৎসাহের ফসলে পরিণত হয়েছিল।[১০৭] G.H.Denson লিখেন, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সভ্য পৃথিবী নৈরাজ্যের ধ্বংস-গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়েছিল। কেননা যে সকল ধর্ম বিশ্বাস সভ্যতার বিনির্মাণে সহায়ক হয় সেগুলোই বিকৃত হয়ে

---

[১০৬] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১১৭-১১৮।
[১০৭] Shell. *Ibid.* p. 72.

পড়েছিল। সেখানে উল্লেখযোগ্য এমন কিছু ছিল না যা সেসবের স্থান পূরণ করতে পারে। তখন মনে হল যে, যে সভ্যতা গড়ে তুলতে চার হাজার বৎসরের চেষ্টা-সাধনা ব্যয় হয়েছিল তা ছিন্নভিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং মানবজাতি আবার অসভ্যতা ও বর্বরতার পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে যাচ্ছে। গোত্র ও সম্প্রদায় ছিল কেবল পারস্পরিক সজ্ঘর্ষে লিপ্ত, আইন-কানুন বলতে কিছু ছিল না। ... সভ্যতা যেন ছিল ডালপালা ছড়ানো এক বিরাট বৃক্ষ, যার ছায়া সারা বিশ্বে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তা দাঁড়িয়ে থাকলেও পতনুন্মোখ ছিল এবং বিনষ্টি তার মর্মমূলে পৌঁছেছিল। এই ব্যাপক বিপর্যয় ও ধ্বংসের মধ্যেই সেই মানুষটি[১০৮] জন্মগ্রহণ করলেন যিনি সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।[১০৯] সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে জনৈক মিশরিয় কবি আপন সমাজের দূরাবস্থা দেখে পরম পরিতাপে একদিন লিখেছিলেন:

To whom do I speak today?
Brothers are evil,
Friends of today are not of love.
To whom do I speak today?
Hearts are thievish,
Every man seizes his
neighbour's goods.
To whom do I speak today?
The gentle man perishes
The bold-faced goes
everywhere...
To whom do I speak today?
When a man should arouse
wrath by his evil conduct
He stirs all men to mirth,
although his iniquity is wicked.

আমি আজ কাকে বলব?
ভাইয়েরা মন্দ।
আজকের বন্ধুদের হৃদয়ে প্রেম নেই।
আমি আজ কাকে বলব?
মানুষের হৃদয় তস্করসুলভ।
প্রতিবেশী গ্রাস করছে প্রতিবেশীর মাল।
আমি আজ কাকে বলব?
সজ্জনেরা লোপ পাচ্ছে।
নির্লজ্জরা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।
আমি আজ কাকে বলব?
কেউ তার কুআচরণে অন্যের ক্রোধের উদ্রেক করলে
সবাই হাসছে যদিও এই অন্যায় আচরণ আক্রোশপূর্ণ।[১১০]

[১০৮] লেখক এখানে আখেরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বুঝিয়েছেন।
[১০৯] G.H.Denson. উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *প্রাগুক্ত*।
[১১০] Will Durant. 1963. *Our Oriental Heritage*. New York: Grove Press. p. 195.

কবির ভাগ্য ভাল, তাকে ষষ্ঠ শতকের বিশ্ব দেখতে হয় নি। ষষ্ঠ শতকের ভয়ানক পরিবেশ দেখলে কবি কী লিখতেন তা আজ অনুমান করা কঠিন। পঞ্চম, ষষ্ঠ শতকের সমাজ তো ছিল এমন:

> মাটিতে, পানিতে কোথাও শান্তি নেই, নেই স্বস্তি
> আছে শুধু বাঘের থাবা আর কুমিরের হাঁ।[১১১]

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি, মানবীয় বোঝ-বুদ্ধি, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সকল প্রশ্নে পঞ্চম এবং বিশেষত ষষ্ঠ শতকের বিশ্ব ছিল জাহেলিয়াতের সর্বনিকৃষ্ট যুগ। এসব যুগের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল: প্রথমত, সভ্যতার প্রাণ তাওহীদের পরিবর্তে সর্বনাশা শিরক ও মূর্তিপূজার নিষককালো দৈত্যের লালন-পালন এবং দ্বিতীয়ত, সমাজ সংস্কার ও মানবমুক্তির বিকল্পহীন দূত ওহিভিত্তিক-রেসালতের পরিবর্তে মনগড়া-রেসালতের অনুসরণ। এর ফল কী হয়েছিল?

ফল হয়েছিল মানবতা ও সমাজ বিনষ্টকারী নিকৃষ্ট স্বৈরতান্ত্রীক সরকার ও রাজনীতি, মানুষ শোষণ করে রাজার বা কতিপয়তন্ত্রের ভোগ-বিলাসের অর্থনীতি, জোর যার মুল্লুক তার বা দুর্বলের উপর সবলের যুলুম-অত্যাচার, বিচারের বাণী নিরবে-নিভৃতে কাঁদা এবং বিচারের নামে অবিচার ও অত্যাচার, জানমাল, ইজ্জত-আবরুর উলঙ্গ লুণ্ঠন প্রভৃতি। গোটা বিশ্ব মানবসমাজ যেন আত্মহত্যার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। আল-কুরআনের ভাষায়: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ অর্থাৎ, "স্থলে ও জলে (সর্বত্র) মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, যেন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (রুম : ৪১)

---

[১১১]উদ্ধৃতি, আকরব আলী খান। ২০১৭। *অবাক বাংলাদেশ:বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*। ঢাকা:প্রথমা।পৃ. ৩২।

জোনাকী পোকার আলোর মতো যা কিছু ভালত্ব পৃথিবীর নানা প্রান্তে তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তা গোটা মানববিশ্বকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য সক্ষম ছিল না মোটেও, বরং এই আলোও সর্বগ্রাসী ধ্বংসের বিষবাস্পে নিবু নিবু ছিল। গোটা পৃথিবীর এই অবস্থায় এমন কোনো একটি উচ্চস্তরের কল্যাণশক্তির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল– যা বিশ্বমানবতাকে মুমূর্ষু দশা থেকে বাঁচাতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের জন্য এর পূর্বে এত অধিক প্রয়োজন আর কখনও অনুভূত হয়েছে বলে মনে হয় নি, সময়ও এত উপযুক্ত হয়নি।

২

অন্ধকার থেকে আলোর পথে

মুহাম্মদী ﷺ নবুয়তের আবির্ভাব

অধঃপতন যখন তীব্রতার সর্বশেষ বিন্দুতে পৌঁছে, আসমানী ফয়সালা তখনই জমিনে অবতীর্ণ হয়। ষষ্ঠ শতকে আমরা তেমনটিই লক্ষ করি। নদবী রহ. যথার্থই লেখেন, গোটা বিশ্বমানবতা যখন মুমূর্ষুদশায় উপনীত হয়েছিল, বিশ্ব মানবসমাজ যখন তার সমস্ত চাকচিক্যসহ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল, গোটা মানবজাতি যখন আলোহীন হয়ে অন্ধকারে দিশেহারা মুসাফিরের মতো ঘুরে মরছিল এবং মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না, বরং উপায় খোঁজার যোগ্যতাও ছিল না, ঠিক সেই চরম মুহূর্তে নিখিল বিশ্বের স্রস্টা তাঁর রহমতের দরজা খুলে দিলেন। মুমূর্ষু বিশ্বমানবতাকে সকল পাপাচার ও ধ্বংস থেকে উদ্ধার করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমতরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।[১১২] অর্থাৎ, মুহাম্মদী নবুয়ত-ই হল সেই উচ্চস্তরের কল্যাণশক্তি যা মুমূর্ষু মানববিশ্বকে অসভ্যতার অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলোর পথে পরিচালিত করার জন্য ষষ্ঠ শতকে তার বৈশ্বিক অভিযানের শুভ সূচনা করেছিল। মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান ও পবিত্র আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ (আম্বিয়া) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۞ (আহযাব) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ (সাবা) قُلْ يَا أَيُّهَا

---

[১১২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৩৯।

النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۞ (আরাফ) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۞ (আহযাব)

অর্থাৎ, আমি আপনাকে [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়াঃ ১০৭) হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (আহযাব:৪৫-৪৬) আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সাবা ২৮) বলুন, হে মানব মণ্ডলী, আমি গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। (আরাফ : ১৫৮) মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবী। (আহ্যাব : ৪০)

নবুয়ত লাভের সময় যে পৃথিবীর তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন সে সময়ে পৃথিবীটা যেন ছিল এক বিশাল ভবন যা প্রবল কোনো ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে, যার আসবাবপত্র সব তছনছ হয়ে গিয়েছে। কোনো কিছুই যথাস্থানে নেই, বরং যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কোনো কিছুই ব্যবহার উপযোগী নেই, হয় ভেঙেচুরে না হয় দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। ধ্বংসস্তুপ ছাড়া সেখানে কিছুই নেই।[১১৩] আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়তের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকালেন তখন দেখতে পেলেন এমন সব মানব সম্প্রদায় এর বাসিন্দা যারা চিরন্তন একত্ববাদকে বেশুমার ভুলে শিরকের অতল গহ্বরে ডুবে গিয়ে নিজেদের মানবীয় পরিচয়কেই ভুলে গিয়েছে, যাদের চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি হয়ে গেছে বিকৃত ফলে শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণের ফারাক এমনকি এর প্রয়োজনই তারা ভুলে গিয়েছে। তিনি দেখলেন এমন এক সমাজ যা শাসনের নামে কুশাসনের আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, যা নানা মন্দাচার, শোষণ ও যুলুম-অত্যাচার, বিচারের নামে চরম অবিচার প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি জর্জরিত। তিনি দেখলেন এমন এক সমাজ যা মদ-সুদ-জুয়া, জান-মাল-ইজ্জত ও সম্পদ লুণ্ঠন, রাহাজানি, রক্তের

[১১৩] উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৪০।

বলিখেলা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত। তিনি দেখলেন, শাসক, ধর্মের ধ্বজাধারী সবাই একেকজন রাঘব বোয়াল যাদের কাজই হল প্রজাসাধারণকে শোষণ করে ভোগ-বিলাসের জীবন উপভোগ করা। নদবী রহ. সুন্দর করে লেখেন, পৃথিবীর সব জাতি-গোষ্ঠী যেন ছিল রাখালহীন মেষপাল, যাতে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে বারবার। রাজনীতি ছিল লাগামহীন পাগলাঘোড়া এবং শাসন ক্ষমতা যেন মাতালের হাতে তলোয়ার যা জখম করে আপন-পর সবাইকে, এমনকি নিজেকে।[১১৪] গোটা ঐ সমাজ বা সভ্যতাকে যদি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কল্যাণ ও অগ্রগতির নীরিখে দেখা হয় তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ঐ সমাজ ও বিশ্ব ছিল সামগ্রিকভাবে কল্যাণ ও অগ্রগতিবিহীন এক মুমূর্ষু লাশ, আর এর মূল কারণ ছিল গোটা মানবগোষ্ঠীর বিবেক, চিন্তা-চেতনা, বুঝ-বুদ্ধির বিকৃত, অমানবীয় হয়ে যাওয়া। এমন একটি গোটা মানব-পরিবার সমাজের সর্বাঙ্গিন সংশোধন ও পরিচালনা কীভাবে হতে পারত? এ কাজ অসম্ভব না হলেও সহজ ছিল না মোটেও। বিশেষত সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে এমন সমাজের সংশোধন সম্ভবই ছিল না। নিঃসন্দেহে এজন্য প্রয়োজন ছিল এর চেয়ে উচ্চস্তরের কোনো বিধি-ব্যবস্থার। মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের মাধ্যমে পাথহারা বিশ্বমানবতা সেই ব্যবস্থা লাভে ধন্য হল। যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেন:

الر ۚ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞

"আলিফ-লাম-রা: এটি সেই কিতাব যা আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।" (ইব্রাহিম : ০১)

---

[১১৪] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৪১।

সমাজ সংস্কারে মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত প্রচেষ্টার ব্যর্থতার রহস্য

পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজ সংস্কারে অসংখ্য মনুষ্যরচিত ইজম, তত্ত্ব ও দর্শন বাস্তবায়িত হতে আমরা দেখেছি, বর্তমানেও এই চেষ্টা অব্যাহত আছে, ভবিষ্যতেও নিশ্চয় হবে। আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে এসব সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ করি তাহলে দেখি, এসব প্রচেষ্টা মানব সমাজের নানা রোগ-ব্যাধীর স্থায়ী সমাধান করতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে দু'একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে।

কার্ল মার্কসকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীদের একজন মনে করা হয় এবং তাঁর গ্রন্থ *Das Capital* কেও সেরকম বিবেচনা করা হয়। সমাজে সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানা উচ্ছেদের মাধ্যমে শ্রেণি কর্তৃক শ্রেণি শোষণ ও বৈষম্য নির্মূল করে একটি সাম্যময় সোনালী বিশ্ব-মানবসমাজ বিনির্মাণের নিমিত্তে মার্কস দর্শনপ্রসূত কমিউনিষ্ঠ আন্দোলন এক সময় মানব সমাজকে কিছুটা নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এই আলোড়ন ছিল ধুমকেতুর মতো, উদিত হয়েছে, হারিয়েও গিয়েছে। আজ মার্কসের এই দর্শন ও প্রচেষ্টার ফল পৃথিবীর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। বাধ্য না হলে তাঁর গ্রন্থ আজ আর তেমন কেউ পড়ে না। মহাত্মা গান্ধী নিকট অতীতের আরেকজন রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষণজন্মা পুরুষ যাঁর দর্শন ছিল অহিংসাবাদ প্রতিষ্ঠা ও অচ্ছুৎবাদ নির্মূলকরণ। এ দু'ই বিষয়ে গান্ধিজী আমরণ সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু এর ফল? আমরা দেখি গান্ধিজীর দর্শন ও চেষ্টা তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নি। বরং তিনি নিজের চোখে দেখে গিয়েছেন সাতচল্লিশের ভারতের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পাশবিক মুসলিম নিধনযজ্ঞ যাতে রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিল, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠনের আর্তনাদে মন্দিরের চূড়াও লজ্জাবনত হয়ে পড়েছিল। সেই একটিমাত্র দাঙ্গায় পাঁচ লাখেরও বেশি মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছিল। মহাত্মাজী নিজের চোখেই দেখেছেন, তাঁর অহিংসার চিতা কীভাবে সেদিন জন্মভূমির মাটিতে জ্বলেপুড়ে মরেছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় দর্শন ছিল ভারতীয় সমাজে যুগ যুগ ধরে গেড়ে বসা

চুৎ-অচ্ছুতের কুৎসিত প্রথা নির্মূল করা। এক্ষেত্রেও গান্ধিজী কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

কেন এমন মনীষীদের মতবাদ ও সংগ্রাম-সাধনা সাফল্যের মুখ দেখে নি তা নিরীক্ষার দাবি রাখে। এর কারণ হল তাঁদের সংস্কার প্রচেষ্টার পদ্ধতিগত ত্রুটি যা তাঁরা অনুসরণ করেছেন। মার্কস বা গান্ধিজী সমাজ সংস্কারে যে মূলনীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা তাঁদের নিজস্ব মনমগজ প্রসূত, তাঁরা যা ভাল মনে করেছেন সেটাই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য নিশ্চয় মহৎ ছিল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা মানুষ ছিলেন তাই প্রকৃতিগতভাবে তাঁরা মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। মানুষ এক বিচিত্র সৃষ্টি। ফলে তার সমাজও এমন বৈচিত্র্যময় ও জটিল। মানব মনস্তত্ব ও স্বভাব অগণিত দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম-জটিল, বহুমুখী-বহুরূপী, নিয়ত পরিবর্তনশীল, পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য দ্বারা আচ্ছন্ন, তাতে রয়েছে দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য চোরা পথ ও ফাঁক-ফোকর। মানব মনস্তত্ব ও স্বভাবের আসল দুর্বলতা চিনতে পারা ও তার কেন্দ্রবিন্দুকে চিহ্নিত করতে পারা যুগের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও সহজ কাজ নয়। কেননা জনে জনে, ক্ষণে ক্ষণে এটি পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এজন্যই দেখা যায় কত মনীষী একটি বিষয়ের সংস্কারেই গোটা জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন আর তাতে একটি বা দু'টি ব্যাধির উপশম হয়েছে। কিন্তু সে উপশম স্থায়ী হয় নি, অন্যদিকে সমাজদেহের আসল ব্যাধিই থেকে গেছে। এভাবে সংস্কারকের জীবনই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ফাসাদ ও মন্দের শিকড় থেকেই যায়। নবী-রাসূল নন এমন যে কোনো মনীষীর বেলায় এক-ই কথা, ব্যর্থতার এটিই মূল কারণ। সুতরাং, এসব সংস্কার প্রচেষ্টা খণ্ডিত প্রয়াস যা পরিণামে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক সময় আমেরিকায় মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মদ বিরোধী প্রচারণায় ব্যয় হয়েছিল ৬০ মিলিয়ন ডলার, প্রকাশিত বইপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল দশ বিলিয়ন, মদ নিষিদ্ধকরণ আইন কার্যকর করার পেছনে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছরে সরকারের ব্যয় ছিল ২৫০ মিলিয়ন ডলার। আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনশজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কারাগারে নিক্ষেপ

করা হয়েছিল ৫,৩২,৩৩৫ জনকে। অর্থ জরিমানার পরিমাণ ছিল ষোল মিলিয়ন ডলার, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের পরিমাণ ছিল চারশো চার মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এতকিছুর পর ফলাফল হিতে বিপরীত অর্থাৎ, দেখা গেল মার্কিন জাতির মদাসক্তি বেড়েই চলেছে। জীবনের মূল্যেও তারা মদের পেয়ালা ছাড়তে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে ১৯৩৩ সালে মদ বিরোধী আইন প্রত্যাহারের মাধ্যমে ঘোষণা করা হল– 'এখন থেকে মার্কিন মুল্লুকে মদ নিঃশর্তভাবে বৈধ।'[১১৫] কেন এমন আইন ও উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, এর রহস্য কী? রহস্য এটিই যে, এদের অন্তরে আল্লাহর সঠিক পরিচয় ও ভয় এবং পরকালের জবাবদিহিতার ভয় নেই। বস্তুবাদ-ভোগবাদই তাদের ধর্ম-জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। এরকম ভ্রান্ত জীবনদর্শনের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে বিশুদ্ধ জীবনদর্শনের কর্ষণের ফল কী হয়েছিল তা এই অধ্যায়েই লক্ষ করা যাবে।

সমাজ সংস্কারে নববী পদ্ধতি

নবী-রাসূলগণ দুনিয়াবী নেতা ও সংস্কারকদের মতো ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কোনো জাতীয় বা আঞ্চলিক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। তিনি যদি নবী না হয়ে তাই হতেন তাহলে কী করতেন? অন্তত নিচের তিনটি পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করতে পারতেন।[১১৬]

১. জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠা?

হয়তো শতধা-বিচ্ছিন্ন আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ভাষাভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদের ডাক দিতেন। তখনকার বাস্তবতায় এটি খুবই স্বাভাবিক ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় আল্লাহর বাণী প্রচার করা শুরু করেন সে সময় আরবদের ভূমি ও সম্পদ তাদের নিজেদের হাতে

---

[১১৫] উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৪৪।

[১১৬] সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ.। ২০১৭। *ইসলামি সমাজ বিপ্লবের ধারা*। ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী। পৃ. ৩৬-৪১।

ছিল না, অন্যদের কুক্ষিগত ছিল। উত্তারঞ্চলে সিরিয়া রোমানদের দখলে ছিল। অনুরূপভাবে দক্ষিণাঞ্চলে ইয়ামন ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। স্থানীয় আরবগণ পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে ঐ অঞ্চল শাসন করছিল। শুধুমাত্র হিজাজ, তিহামা ও নজদ এলাকায় আরবদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই এলাকাগুলো ছিল নিছক মরুভূমি। কয়েকটি মরুদ্যান ছাড়া সমগ্র এলাকাটাই ছিল পানিবিহীন বালুকাময় প্রান্তর।[১১৭]

এটিও সর্বজনবিদিত যে, জন্মভূমির মানুষ, নেতা অ-নেতা সকলে তাঁর যুবক বয়সেই তাঁকে আল-আমীন, আছ-ছাদিক প্রভৃতি মর্যাদায় ভূষিত করেছিল এবং তাদের জীবনের এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের যুদ্ধাংদেহী সময় তাঁকে সবাই নেতা ও বিচারক সাব্যস্ত করেছিল। আবুল হিকাম ইবনে হিশাম ওরফে আবু জাহিল, উতবা বিন রাবীয়া, আবু সুফিয়ান[১১৮] সকল নেতৃবৃন্দই তাঁকে বিচারক সাব্যস্থ করে অবনত মস্তকে তাঁর ফয়সালা মেনে নিয়েছিল। তারা সবাই সমস্বরে বলেছিল, এই যে আমাদের আল-আমীন, আমরা তাঁর ফয়সালা মেনে নিলাম। আর তিনি সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত হাশেমী গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সুতরাং এটি স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব জাতীয়তাবাদের ধ্বনি তুলে অতি সহজেই সে সমাজের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন। কুরাইশগণ খুব সহজেই আরব ঐক্যের ডাকে সাড়া দিত। কারণ গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতের বিরামহীন ধারা তাদের পিষ্ট করে রেখেছিল।

তিনি শতধা-বিচ্ছিন্ন আরবদেরকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের দখলকৃত আরব ভূমি উদ্ধার করতে পারতেন এবং একটি সম্মিলিত আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। যদিও মেনে নেওয়া হয় যে, দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া প্রজ্ঞার পরিচায়ক হত না, তাহলে অন্তত ইয়ামান, হাবশা ও

---

[১১৭] সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ.। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৬।

[১১৮] পরে মুসলমান হয়ে সাহাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

অন্যান্য প্রতিবেশী অঞ্চল নিয়ে এক আরব সাম্রাজ্য গড়ে তোলা কিছু মাত্র কঠিন ছিল না। এভাবে হিজাজ ভূমি নতুন পরিচয় লাভ করত, তিনি হতেন মহামান্য আরব সম্রাট আর এভাবে তিনি এগিয়ে যেতেন। এভাবে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর জনগণকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বাণ করতেন। রোম বা পারস্য সম্রাটদের মতো আরব সম্রাটের ধর্মমতই হত আরবদের ধর্মমত। মক্কায় অনুসারীসমেত তের বছরের নিষ্ঠুর নির্যাতন-নিপীড়নের বদলে এটিই ছিল দীন প্রতিষ্ঠার সহজ রাস্তা। কিন্তু সর্বজ্ঞ ও সঠিক জ্ঞানের আধার আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ পথ ধরে চলতে দেন নি। কারণ তিনি জানতেন যে এটি প্রকৃত পদ্ধতি নয়।

২. শ্রেণি-বিপ্লব ও দীন প্রতিষ্ঠা?

হয়তো দুনিয়াবী নেতা বা সংস্কারকদের মতো কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লব বা আন্দোলনের ডাক দিতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত লাভের সময় পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় আরবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ব্যবধান ও বৈষম্য ছিল অতীব প্রকট। সম্পদের সুষম বন্টনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সুবিচারও ছিল না। সম্পদ ছিল মুষ্টিমেয় লোকের কব্জায় যা তারা সুদী কারবারের মাধ্যমে বাড়িয়ে চলছিল। বিপুল সংখ্যক দেশবাসী ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জালে বন্দী। ধনী ব্যক্তিদেরকেই সম্ভ্রান্ত মনে করা হত। বাদবাকি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কোনো মানবীয় মর্যাদা ছিল না। হতদরিদ্ররা দাসের জীবন-নিগড়ে প্রহর গুনত। সুতরাং এটিও বলা যেতে পারে– হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমন অমানবিক শ্রেণি-বৈষম্য বিলোপের লক্ষ্যে সমাজের সম্ভ্রান্ত তথা ধনিক শ্রেণির বিরুদ্ধে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব পরিচালনা করতে পারতেন। এতে সমাজ ধনী ও দরিদ্র– এই দু'ই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যেত। অনিবার্যরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণি ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করত। কেননা তারা গুটিকয়েক ধনবান, সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী ব্যক্তির অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। এভাবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের সমর্থনে তিনি হতেন অবিসংবাদিত নেতা, আর নেতৃত্ব দিয়ে ধনীদের সম্পদ ছিনিয়ে এনে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারতেন। এভাবে অবিসংবাদিত নেতা হওয়ার পর মানুষের কাছে দীনের

বাণী প্রচার করতে পারতেন। এ অবস্থায় তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার কারণে লোকজন সহজেই এই দীন গ্রহণ করে নিত। কিন্তু সর্বজ্ঞ ও সঠিক জ্ঞানের আধার আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ পথ ধরে চলতে দেন নি। কারণ তিনি জানতেন যে এটিও প্রকৃত পদ্ধতি নয়।

৩. নীতিবাদী সংস্কার আন্দোলন ও দীন প্রতিষ্ঠা?

অথবা, কোনো নীতিবাদী সংগঠন গড়ে তুলতেন এবং এর নামে একটি আন্দোলন দাঁড়া করতেন। আরব সমাজে নীতি-নৈতিকতা বলতে প্রকৃত কিছু ছিল না। ঐ সমাজ ছিল মদ-সুদ-জুয়া, জীবন্ত কন্যা সন্তান হত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতির অভিশাপে কলুষিত সমাজ যার পরিচয় আমরা প্রথম অধ্যায়েই পেয়েছি। সুতরাং, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের চারিত্রিক উন্নতি, সমাজ শুদ্ধিকরণ ও আত্মশুদ্ধির কর্মসূচী নিয়ে একটি নৈতিক সংস্কার আন্দোলনও শুরু করতে পারতেন। প্রত্যেক সমাজ সংস্কারকের মতো সংশোধনকামী কিছু সাহসী ও কর্মতৎপর যুবক-তরুণ-পৌঢ় ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করা অসম্ভব ছিল না। নির্দ্বিধায় বলা যায়, এ ধরনের আন্দোলন শুরু করলে আল্লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ কিছু লোক জড়ো করতে পারতেন। এতে একদিকে আরবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ব, বীরত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হত অন্যদিকে অংশগ্রহণকারী লোকগুলো উন্নত নৈতিক মানের দরুন সহজেই তাওহীদের বাণী গ্রহণ ও পরবর্তী দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হত। এভাবে আরবে সহজেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত, ততটা তীব্র বিরোধীতার মুকাবেলা করতে হত না। কিন্তু সর্বজ্ঞ ও সঠিক জ্ঞানের আধার আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ পথ ধরে চলতে দেন নি। কারণ তিনি জানতেন যে এটিও প্রকৃত পদ্ধতি নয়।

অধিকন্তু, প্রতাপশালী কুরাইশরা ওতবার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে পাঠিয়েছিল যে, যদি রাজত্ব তোমার অভিলাষ হয় তাহলে আমাদের বল, আমরা আমাদের পতাকা তোমার হাতে তুলে দেব। আজীবন তুমিই হবে আমাদের নেতা। লক্ষণীয় যে, কুরাইশ বা সম্ভ্রান্ত

আরবরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করত, মিথ্যা বলা বা প্রতারণা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। কুরাইশ নেতারা আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারেও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এজন্য মিথ্যা বলেনি যে লোকে বলাবলি করবে, নেতা হয়ে মিথ্যা বলে। অথচ এসময় মিথ্যা বললে তাদের অনেক লাভ হত। কিন্তু কুরাইশদের প্রস্তাবের প্রতিউত্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নিচের বাণী শুনিয়ে দিলেন:

حم • تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ • بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ • وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ • قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ • فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ • وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ • الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ • إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ •

অর্থাৎ, "হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। তারা বলে আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, (তবে) আমার প্রতি ওহি আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।" (হা-মীম সিজদাহ : ১-৮)

ওপরে বর্ণিত প্রতিটি পথের সমসাময়িক যথেষ্ট যৌক্তিকতা আরব সমাজে ছিল। এসব যে কোনো পথে হাঁটলে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিরাট গ্রহণযোগ্যতার কারণে নিঃসন্দেহে সফল হতেন। অধিকন্তু তাঁকে স্ব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বাণও জানানো

হয়েছিল। কিন্তু এসবের কোনো পথেই তিনি অগ্রসর হলেন না। তিনি কোনো কীর্তি ও কৃতিত্বও দাবী করেন নি। অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ ও সঠিক জ্ঞানের আধার আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব পথ ধরে চলতে দেন নি। কারণ তিনি জানতেন যে এসব একটিও সমাজ সংশোধনের প্রকৃত পদ্ধতি নয়।

প্রথমত, প্রথম পদ্ধতির প্রেক্ষিতে বলতে হয়– নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে এজন্য প্রেরিত হন না যে মানুষকে এক গোলামী থেকে মুক্ত করে আরেক নব্য গোলামীতে বন্দী করবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগতে এজন্য প্রেরিত হন নি যে মানুষকে রোম-পারস্যের গোলামী থেকে মুক্ত করে আরবীয় গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবেন। দেশী-বিদেশী সব নির্যাতনই এক ও অভিন্ন। মানুষকে মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসাই রেসালতের লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রেক্ষিতে বলতে হয়– আল্লাহর কর্তৃত্ব তথা আনুগত্য অস্বীকার করে যে সমাজ নির্মিত হয় সেখানে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কোনো সর্বজনীন মানদণ্ড ও সুযোগ নেই। সেখানে নিজ নিজ মত অনুসারে এমনকি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নীতি ও সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একমাত্র আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই সামাজিক সুবিচার আসতে পারে যেখানে ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলে আল্লাহর ইনসাফপূর্ণ বন্টননীতি মেনে নেবে।

তৃতীয়ত, তৃতীয় পদ্ধতির প্রেক্ষিতে বলতে হয়– আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতেই সত্যিকার নৈতিকতা গড়ে ওঠে। ঈমানই ভালমন্দের মানদণ্ড ও নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারণ করে।

ঐসব পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কার শুরু হলে মানব স্বভাবের ফিতরতের কারণে ঈমানী চেতনা পিছনে পড়ে যেত এবং এটি বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও ধর্মাচারকে যুগে যুগে নতুন চ্যালেঞ্জ ও ফিতনার মুখে ঠেলে দিত। ফলে জেহালতের রোগ-জীবাণু অনিবার্যভাবে থেকেই যেত। কেননা, আদর্শ সমাজ বিনির্মানের মূল

ভূমি হল মানব-হৃদয় যার পবিত্রতা-অপবিত্রতার ওপর সমাজের পবিত্রতা-অপবিত্রতা নির্ভর করে; আর ঈমান বা বিশ্বাসের নূরই একমাত্র মহৌষধ যা ছাড়া মানব-হৃদয় পবিত্র ও সুন্দর হতে পারে না। বিশ্বাস হতে হবে– তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস এবং আল্লাহর সঠিক পরিচয় ও বিশ্বাস অর্জনের জন্যে রিসালত অর্থাৎ, নবী-রাসূলের আ. প্রতি বিশ্বাস। হৃদয়ে আল্লাহর পরিচয় ও ঈমান পাকাপোক্ত হলে মানুষ নিজেকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সার্বক্ষণিক নজরদারীতে রয়েছে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, অন্তরে পরকালের পুরস্কার ও কঠিন আযাবের ধারণা বদ্ধমূল হয়। এর ফলে মানুষ কলুষমুক্ত হয়ে নৈতিকতার সুউচ্চ দিগন্তে উন্নিত হয়। তাই ঈমানই ভাল-মন্দের মানদণ্ড ও প্রকৃত নৈতিকতা নির্ধারণ করে। একমাত্র ঈমানের ভিত্তিতেই সকল কালের, সকল দেশের– সকল শ্রেণির আদর্শ ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। আল্লাহর আনুগত্যশীলদের কাছে একটিই পুরস্কারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, সেটি হল জান্নাত, দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগসম্ভার নয়। সুতরাং এই ঈমান আনার অর্থই হল আল্লাহর যে কোন বিধি-বিধান অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে জীবন-যাপন করা, এর বিরুদ্ধে যে কোনো বিধি-ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহর বিধি-বিধানের বাইরে আদর্শ কোনো বিধি-ব্যবস্থা হতেই পারে না। তাই এ পথেই গড়ে উঠতে পারে সত্যিকার আদর্শ মানুষ ও সমাজ। নদবী রহ. লেখেন:

> সত্যিকার সংস্কার সম্ভব হতে পারে শুধু মানবমনে উর্ধ্বজাগতিক মহাশক্তির বিশ্বাস উৎপাদন ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা মৌলিক মানসিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে, অন্য কোনভাবে নয়। অর্থাৎ, সমাজ সংস্কার ও জাতি সংশোধনের সঠিক পদ্ধতি সেটাই যা নবী-রাসূলগণ অনুসরণ করে গেছেন, আর সে পথেই কেবল গড়ে উঠতে পারে আদর্শ সমাজ ও মহৎ জাতি।[১১৯]

ওপরে উল্লিখিত কুরআনের বাণী থেকে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল দায়িত্ব-ই হল নানা অপবিশ্বাসের ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া মাটির মানুষগুলোকে ঈমানের আলোয় সোনার মানুষে পরিণত করা।

---

[১১৯] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৪৩।

অর্থাৎ জাহেলিয়াতের যতসব আত্মিক রোগব্যাধির ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র– সবকিছু ধ্বংসের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল, একত্ববাদ- এর বিশ্বাস উৎপাদন ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা সেইসব রোগব্যাধি নির্মূল করে একটি আদর্শ সমাজ বিণির্মান করে দেওয়া ছিল তাঁর কাজ। আল্লাহর সঠিক পরিচয়, দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের পারস্পরিক হাকিকত উপস্থাপন করা ব্যতীত এবং এই শিক্ষা এক নববী তরবিয়তে সম্পন্ন হওয়া ছাড়া এই উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। সুতরাং, নবুয়তের পূর্ণ জালাল ও প্রতাপ নিয়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা প্রচার করতে লাগলেন– 'হে বিশ্ব মানবসমাজ, বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাহলে লাভ করবে সফলতা'। এই আহ্বান বিশেষ কোনো দেশ ও জাতির প্রতি ছিল না, ছিল গোটা মানব জাতির জন্য। আদর্শ সমাজ বিনির্মানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্কার প্রচেষ্টা নিজস্ব মনমগজপ্রসূত ছিল না, এ ছিল আল্লাহর রেসালতের আহ্বান। যেমন: আল্লাহ কুরআনে বলেন:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

অর্থাৎ, তিনি [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজস্ব ইচ্ছায় কিছু বলেন না, তা তো শুধু ওহী যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়। (নাজম্ : ৩-৪)

এজন্য এই সংস্কার প্রচেষ্টায় কোনো ফাঁক-ফোকর থাকা সম্ভবই নয় যা নবী-রাসূল নন এমন যে কোনো মনীষীর বেলায় অনিবার্য। অতএব, মানব স্বভাবের বদ্ধ তালা তিনি সঠিক চাবি, অর্থাৎ আসমানী ওহি দিয়ে খুলেছিলেন। ফলে সঠিক পদ্ধতিও অনুসরণ করেছিলেন। পরিণামে পৃথিবীতে এমন এক স্থায়ী শান্তির বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহিত শান্তিময় বাতাসের মতো বহমান থাকবে, নিঃসন্দেহে এর দ্বিতীয় নজির নেই আর হবেও না। এর দালিলিক প্রমাণ পরবর্তী আলোচনায় লক্ষ করা যাবে।

কুরআনী নূরের ঝর্নায় : বিস্ময়কর সূচনা

ষষ্ঠ শতকে বিশ্ব-জাহেলিয়াতের যে ঘনঘোর অন্ধকার আমরা অবলোকন করেছি সে সময় একজন নিরক্ষর আরব যদি নিজের নামে একটি ধর্ম প্রচারে

কিংবা সমাজ সংস্কারে নামতেন তাহলে আপন সমাজের প্রতি তার বক্তব্য কী দিয়ে শুরু হত? যার ওপর ওহির সূচনা হবে তাঁকে উম্মী বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাঁচশত বৎসর পর ওহির সূচনা হচ্ছে এমন এক সমাজে যেখানে আছে শুধু অজ্ঞতা, মূর্খতা, রক্তের বলি খেলা, কন্যা শিশু হত্যা, সুদ-মদ-জুয়া প্রভৃতির নামে অসভ্যতার নিকষ কালো অন্ধকার। ইহুদিরা তাদেরকে উম্মী বা নিরক্ষর বলে নিন্দা করত। গোটা মক্কা নগরী খুঁজে তখন দু'একটি কলম পাওয়াও ছিল কঠিন। তারা হাজার দেবতার উপাসনায় মত্ত, এমনকি যে ঘরকে তারা স্রষ্টার ঘর বলে বিশ্বাস করত তার সামনে নারী-পুরুষ উলঙ্গ হয়ে উপাসনা করত। সুতরাং যাবতীয় বিষয় বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়- মূর্তিপূজা, যিনা-ব্যভিচার, দস্যুবৃত্তি, অকারণ হানাহানি, কন্যা শিশু হত্যা ইত্যাদি নির্মূলের কথা দিয়েই ঐ আরব তাঁর বক্তব্যের শুভ সূচনা করতেন। এ কথা কারো চিন্তায় উঁকি দিত না যে সর্বপ্রথম ওহির সূচনা হবে 'পড়াশোনা', ইলম ও কলম দিয়ে। অথচ, এটি কী পরম বিস্ময়কর নয় যে এমন এক সময় ও সমাজে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে ওহির সূচনা হল এই কথা দিয়ে:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

অর্থাৎ, "পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (আলাক : ১-৫)

আজ আমরা বুঝতে পারি যে, জ্ঞানই সকল শুভ কর্মের সূচনা ঘটায়। এজন্যই বলা হয়- জ্ঞানই পূণ্য। অজ্ঞানতাই বিভ্রান্তি ও অসভ্যতার অন্ধকার ডেকে আনে। যার ওপর ওহি নাযিল হচ্ছে সেই সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হবে মানবতার উৎকর্ষের যুগ। তাঁর রিসালতই সর্বশেষ রিসালত আর এটি বহাল থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত যখন মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার সাধিত হবে। এ অবস্থায় মানুষ ও সমাজের উন্নতি-অবনতি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। আর

অতি অবশ্যই এই জ্ঞানচর্চা আসমানী ওহির জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হবে না, তাকে কেন্দ্র করে চালিত হবে। ষষ্ঠ শতকের বিশ্বে কুরআনের এমন বিস্ময়কর সূচনা নিঃসন্দেহে তার অলৌকিকতার নিদর্শন প্রকাশ করে।

হক-বাতিল সংঘাতের সূচনা

মানবসমাজকে জাহেলিয়াতের পচা অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি অবতীর্ণ করা শুরু করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদিন গোপনে সত্য প্রচার করছিলেন। পৃথিবীর জমিনে তখন মুসলমান মাত্র চার জন: তিনি নিজে, নিজ স্ত্রী মহিয়সী খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, তাঁর পরিবারের সদস্য আপন চাচাত ভাই কিশোর আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং স্ত্রীর ক্রিতদাস, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আযাদকৃত হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহর মিশনকে জোরদার করার জন্য, এবং প্রথমত নিকটজনদের মধ্যে আরো প্রকাশ্যে সত্য প্রচার করার জন্য প্রত্যাদেশ হল:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ (হিজর) وَأَنْذِرْعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۞ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۞ (শুয়ারা)

অর্থাৎ, আপনার প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশ প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের কোনো পরোয়া করবেন না। (হিজর : ৯৪) আপনি আপনার পরিবার-পরিজন ও নিকট আত্মীয়গণকে (আল্লাহ্ পাকের) ভয় প্রদর্শন করুন। যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে তবে বলে দিন, তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই। (শু'আরা : ২১৪-২১৬)

এবার নির্দেশমতো প্রকাশ্যে কাজ শুরু করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দিক নির্দেশনায় মানুষকে শিরক ও কুফরির পচা অন্ধকার থেকে সত্যধর্মের দিকে প্রকাশ্যে আহ্বান করতে থাকেন। কাবার চত্বরে, মাঠে-ময়দানে, বাজারে, ভোজসভায় সর্বত্র তিনি আল্লাহর মহিমা প্রচার করে

যেতে লাগলেন। এই দুই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কার সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে উচ্চকণ্ঠে কুরাইশদেরকে আহ্বান করেন। আহ্বানে কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকজন পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন: "আমি যদি বলি যে তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য পাহাড়ের পেছনে একদল সৈন্য অবস্থান করছে তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?" সবাই সমস্বরে বলে উঠল, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। কেননা আমরা তোমাকে কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে দেখিনি।

তিনি বললেন, 'আমি বলি, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না কর তাহলে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হবে। আরো বললেন, পৃথিবীর কোনো লোক তার জাতি ও গোত্রের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো উপহার নিয়ে আসতে পারে নি যা আমি নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে এই সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতে। আল্লাহর কসম, আমি যদি দুনিয়ার সমস্ত লোকের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতাম তবুও তোমাদের সামনে মিথ্যা বলতাম না, আমি যদি পৃথিবীর সকলকে ধোঁকা দিতাম, তবু তোমাদেরকে কখনও ধোঁকা দিতাম না। সেই পুতঃপবিত্র সত্তার শপথ যিনি একক, যার কোনো তুল্য ও অংশীদার নেই। আমি তোমাদের প্রতি এবং সকল পৃথিবীবাসীর প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত নবী ও রাসূল।'[১২০]

আবু লাহাব ছিল কট্টর পৌত্তলিক ও রগচটা লোক। সে পাথর নিক্ষেপ করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কপাল থেকে রক্ত ঝড়িয়েও ক্ষান্ত হল না, সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে উঠল, "তোমার ধ্বংস হোক।" (না'উযুবিল্লাহ!) মহান আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে ওহী নাযিল করে জানিয়ে দিলেন:

---

[১২০] *দুরুসুস্ সীরাত*। পৃ. ১০, উদ্ধৃতি, মুফতী মুহাম্মদ শফী। ২০০২। *সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া*। ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা। পৃ. ৪৫।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ۞

"আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।" (সূরা লাহাব)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ছিল শিরক, কুফর এবং জাহেলিয়াতের যত রীতি-নীতি আছে সবকিছুর বিরুদ্ধে, মহান, পবিত্র পরাক্রমশালী এক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান। জাহেলিয়াতের মোড়লরা এই আহ্বানের এই হাকিকত নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল যে এক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ হচ্ছে মনগড়া বাতিল রীতি-নীতির উপর গড়ে উঠা তাদের বংশ-গৌরব, নেতৃত্ব, মিথ্যা অহমিকা ও সম্মান, অর্থ-বিত্ত ছেড়ে তাদের চোখে 'সহায়-সম্বলহীন' মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একত্ববাদের পতাকাতলে এসে দাড়াঁতে হবে। আল্লামা শিবলী নোমানী লেখেন, অশিক্ষিত ও বর্বর জাতিগোষ্ঠীর বিশেষত্বই হল তাদের পূর্বপুরুষের বিশ্বাস ও প্রথার পরিপন্থী কোনো আন্দোলন শুরু হলে তারা মারাত্মকরূপে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, বিরোধিতা শুধু তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং রক্তাক্ত যুদ্ধ ও ধ্বংস ছাড়া তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা স্তিমিত হয় না।[১২১] মুর্খতার অন্ধকারের কারণে এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও এর বিরোধীতা করা নিঃসন্দেহে আত্মহত্যার নামান্তর যা এসব জাতিগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে করে আসে। সত্য প্রত্যাখ্যানের বাহ্যিক যত কারণই থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এটিই মূল কারণ। এজন্য বলা হয়, যে যে বিষয়ে অজ্ঞ সে সে বিষয়ের শত্রু। সুতরাং, জাহেলী সমাজে সর্বত্র ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়ে গেল এবং নবী ও তাঁর রেসালতের বিরুদ্ধে সাজ সাজ রব পড়ে

[১২১] আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সুলায়মান নদবী রহ.। *সীরাতুন্নবী সা.* /২০১২। ঢাকা:মদীনা পাবলিকেশন্স। পৃ. ৯৭।

গেল। অস্তিত্বের সঙ্কায় শঙ্কিত জাহেলিয়াত জান-মাল নিয়ে জীবন-মরণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে তাদের এমন মূর্খতা ও এর পরিণতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে:

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۞ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۞ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ۞ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۞

অর্থাৎ, তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন আর কাফিররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর। সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের মোড়লরা এই বলে বেরিয়ে পড়ল যে, চল চল এবং তোমাদের দেবতাদের জন্য প্রাণপণ কর। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য (তাওহিদের আহ্বান) কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনি নি, এটা মনগড়া ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। (ছোয়াদ : ৪- ৭)

শুরু হল ভীষণ শত্রুতা

এতদিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জাতিগোষ্ঠীর কাছে ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মানুষ। তাঁর শহরের লোকেরা তাঁর সত্যবাদিতার কসম করত। তাঁকে সবাই ভালবাসত। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন তিনি তাদের চোখে চরম শত্রু হয়ে গেলেন। কেন? এর কারণ অদ্ভূদ যে, তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ নেই, অভিযোগ কেবল একটি, তা হল– তিনি বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য অন্য কোনো মাবুদ নেই– মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে আস। এটিই সাফল্যের চাবিকাঠি। অথচ এটি কোনো অভিনব কথা নয়, এটি পূর্ববর্তী সকল নবীগণই বলে গিয়েছেন।

আল্লাহর নবী-রাসূলগণের সঙ্গে শত্রুতা করা স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতার শামিল যা সর্বনিকৃষ্ট কুফরি আর এর নিশ্চিত পরিণতি হল জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। জাহেলিয়াতের ধারক-বাহক, চেলা-চামুণ্ডারা এবার সর্বনাশা এই ঘৃণ্য কাজে দলবেঁধে নেমে পড়ল। একদিকে তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করত, এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করার প্রাণান্ত চেষ্টা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেখানেই দেখা যায় সেখানেই নানা অভদ্র ঘৃণ্য আচরণ ও কথায় কষ্ট দেওয়া ছিল তাদের রুটিন-কাজ। এক বৃদ্ধা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর চলার পথে প্রতিদিন কাঁটা বিছিয়ে রাখত। একদিন পথে কাঁটা দেখতে না পেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার খোঁজে তার বাড়ি গিয়ে দেখেন সে অসুস্থ, এজন্য আজ কাঁটা বিছাতে পারে নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেবা-শুশ্রুষা করে মহিলাকে সুস্থ করে তুললেন। মহিলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণে বিষ্মিত হয় এবং মুসলমান হয়ে যায়।

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা তার ঘরের সব ময়লা-আবর্জনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ছুঁড়ে মারত, তাঁর যাতায়াতের পথে ফেলে রাখত। আবু লাহাব ছিল এক্ষেত্রে আরো এগিয়ে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যের বাণী প্রচার করতে দেখলে সে পিছু নিত এবং নানা কটু কথা বলতে থাকত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে ধূলাবালি নিক্ষেপ করত, হট্টগোল সৃষ্টি করে মানুষকে সত্য থেকে ফিরিয়ে রাখত।

আবু জেহেল ছিল আরো পাষাণ। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানা গালমন্দ তো বলতই বরং বিভিন্ন সময় প্রাণে মারারও চেষ্টা করত। একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরের সামনে নামাজ পড়ছিলেন। পাষণ্ড আবু জেহেল বধ্যভূমি থেকে মৃত পশুর নাড়িভুঁড়ি কুড়িয়ে এনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ফেলে দেয়, এতে নবীজীর খুব কষ্ট হয়। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা

মর্মাহত হৃদয়ে কেঁদে কেঁদে প্রাণপ্রিয় পিতার শরীর ও কাপড় পরিষ্কার করে দেন। আরেক দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে সিজদারত ছিলেন। এ সময় নরপশু উকবা ইবনে আবী মুঈত মরা উটের নাড়িভূঁড়ি এনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের উপর চাপিয়ে দেয়। এগুলোর ভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা তুলতে পারছিলেন না। খবর পেয়ে কন্যা ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এসে সব সরিয়ে পিতাকে ভারমুক্ত করেন। এসব ঘটনায় মা-হারা কন্যা ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার অশ্রু দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েকে লক্ষ করে শুধু বললেন, মা, তোমার পিতার অপমান দেখে কষ্ট পেও না।

তায়েফে

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটবেলা তায়েফে ছিলেন, তায়েফের আলো-বাতাস, দুধ-মা হালিমাতুস্ সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, বোন শায়মার স্নেহ-ভালবাসা শিশু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে লেগেছিল। কুরাইশদের অত্যাচারে মর্মাহত হতে হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় যায়েদ ইবনে হারেসাকে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে নিয়ে প্রিয় তায়েফে তাশরীফ আনেন এই আশায় যে, হয়তো সেখানকার লোকজন তাঁর কথা বোঝার চেষ্টা করবে এবং মনগড়া ধর্ম বাদ দিয়ে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু আশা দূরাশায় পরিণত হল। এরা অসভ্যতায় কুরাইশদেরকেও ছাড়িয়ে গেল। তায়েফের মোড়লরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনা তো দূরের বিষয়, তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে পিছনে অসভ্য দুষ্ট ছেলেদেরকে লেলিয়ে দেয়।

যিনি জাহান্নামগামী জনগোষ্টীকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতী বানানোর জন্য তাশরীফ আনলেন, মূর্খতার কারণে সেই জনগোষ্ঠীই তাঁর সঙ্গে জাহেলীয়াতের এক নিকৃষ্ট আচরণ করে বসল। দুষ্ট ছেলেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর নিক্ষেপ করে এমনভাবে রক্তাক্ত করে যে পবিত্র শরীরের রক্ত পায়ে জমাট বেঁধে জুতার সঙ্গে এমনভাবে লেগে যায় ফলে জুতা

থেকে পা খোলা সম্ভব হচ্ছিল না। ক্ষত-বিক্ষত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে গেলে পাষণ্ডদের দুজন তাঁর দুই হাত ধরে তুলে দিত আর অন্য পাষণ্ডরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর মারত। আঘাতের যন্ত্রনায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্ধচেতন অবস্থায় কোনরকমে এক বাগানে আশ্রয় নেন। হযরত যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাণপ্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নির্যাতন থেকে বাঁচাবার প্রাণপন চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি একা আর কতটুকুইবা করবেন। নরপিচাশদের নারকীয় কাণ্ডে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠল, আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণ অবতরণ করে তায়েফবাসীকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার কথা জানালেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত নামাজ পড়ে মুনাজাতে হাত তুললেন। তায়েফের দূরাচারদের এমনকি এই জনপদের ধ্বংস কামনা করার এই তো প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু তিনি তো রাহমাতুল্লিল আলামীন, মুনাজাতে কী বললেন তা মন খুলে শোনা উচিত:

اَللّٰهمّ إلَيْک أشْكُوْا ضَعْفَ قُوّتِيْ، وَ قِلّةَ حِيْلَتِيْ، وَهوَانِيَ عَلىَ النّاسِ، يَآ أرْحَمَ الرّاحِمِيْنَ أنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأنْتَ رَبِّيْ إلَى مَنْ تَكِلُنِيْ؟ إلى بَعِيْدٍ يَتَجَهمُنِيْ، أم إلى عَدُوٍّ مَلّكْتَهُ أمْرِيْ؟ إن لَمْ يَكُنْ بِک عَلَيّ غَضَبٌ فَلا أبَا لِيْ، وَلَكِنْ عَافِيَتُک هِيَ أوسَعُ لِيْ، أعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهک الّذِيْ أشْرَقَتْ لَهُ الظّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أمْرُالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِنْ أنْ يَنْزِلَ بِيْ غَضَبُک، أوْ يَحِلَ عَلَيّ سَخَطُک، لک الْعُتْبَى حَتّٰى تَرْضٰى وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلاّ بِک

"হে আল্লাহ! আমার অসহায়তা, ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা সম্পর্কে তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি। হে রাহমানুর রাহীম, তুমি দুর্বলের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক। তুমি আমাকে কাদের হাতে তুলে দিচ্ছ। তারা তো আরো দুর্বল করে দেবে। তুমি কি আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিচ্ছ? হে আল্লাহ্, তুমি যদি আমার এই অবস্থায়ও আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও, তাতেই আমি নিরাপদ মনে করছি। তোমার অনুগ্রহ অসীম। হে আল্লাহ, তোমার আলো অন্ধকারকে আলোকিত করেছে, যে আলোতে ইহকাল ও পরকাল নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা লাভ করেছে, আমি সে আলোতে অবস্থান করার প্রবল প্রত্যাশী। হে পরম করুনাময়, তুমি আমাকে তোমার অভিশাপ ও অসন্তোষ থেকে নিরাপদ রাখ।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর বললেন, হে আল্লাহ্, এরা আমাকে চিনে না, তুমি এদেরকে মাফ করে দাও। এরা আমার দাওয়াত গ্রহণ না করলেও, হতে পারে এদের উত্তর-প্রজন্ম সত্যধর্ম ইসলামের অমিয় সুধা পান করে তোমার সন্তুষ্টির ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। মহানুভবতা ও মানবপ্রেমের এমন দৃষ্টান্ত এভাবে আর কেউ রেখে যেতে পারেন নি। অথচ তায়েফের কষ্ট এমন ছিল যা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, 'আমি একদিন হযরতকে জিজ্ঞেস করলাম, ওহুদ রণাঙ্গনের অবস্থা অপেক্ষা কঠিনতর অবস্থা আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হয়েছিল কি? উত্তরে হযরত তায়েফবাসীদের নির্যাতনে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখপূর্বক তাহাদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী তুলে ধরলেন।'[১২২] উহুদের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত ভেঙেছিল, মাথা ফেটেছিল, সারা দেহে লেগেছিল শতের অধিক আঘাত। প্রিয় পিতৃব্য হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন, বক্ষ ছিড়ে তাঁর কলিজা হিন্দা কর্তৃক চিবানোর দৃশ্য, সত্তরজন সাহাবীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম শাহাদাতের মানসিক আঘাত ইত্যাদি হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিল। নিকটবর্তী সময়ের উহুদের এমন ঘটনার পরিবর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয় বৎসর পূর্বের তায়েফের দুঃখ-কষ্টের দিনের কথার উল্লেখ থেকে বুঝা যায়- ঐ ঘটনা কত হৃদয়বিদারক ছিল।

শেব- এ আবী-তালিব

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলাম ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করতে থাকে। অবিশ্বাসীরা কোনভাবেই ইসলামের অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারছেনা। এবার তারা বনি হাশিমকে সমূলে ধ্বংস করার মানসে একজোট হয়ে বনী হাশিম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবকে যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক ও লেনদেন থেকে বয়কট করে। আজকের অনেক রাষ্ট্র যেভাবে হীন স্বার্থে সাঙ্গপাঙ্গদেরকে সঙ্গে নিয়ে

---

[১২২] বুখারী : ১৫১৪।

অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষমতার জোরে বয়কট, অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, ইতিহাসের ঐ বয়কট, নিষেধাজ্ঞা, অবরোধ তারই পূর্বপ্রজন্ম হয়তো ছিল। এই পরিস্থিতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের নেতৃত্বে বনী হাশিম ও বনী আব্দুল মুত্তালিব আবু তালিব গিরি সংকট বা উপত্যকায় (শে'ব- এ আবী তালিব) গিয়ে অবরোদ্ধ অবস্থায় আশ্রয় নেয়, একমাত্র বনী হাশিমের আবূ লাহাব ইবনে আব্দুল মুত্তলিব তার সঙ্গী দূরাচারদের সঙ্গে থাকে। এ অবস্থায় তিন বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ বনী হাশিম ও বনী আব্দুল মুত্তালিব নারী শিশু পুরুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করেন। কুরাইশরা ব্যবসায়ীদেরকে উত্তেজিত করে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম এতোটা বাড়িয়ে দেয় যাতে অবরুদ্ধবাসীর পক্ষে তা সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে অবরুদ্ধ লোকজনকে গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণের চেষ্টা করতে হয়। ক্ষুধায় অস্থির শিশুদের কান্না বহুদূর থেকে শোনা যেত। তিন বছর পর দূরাচারেরা পরাজয়ের লজ্জায় অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়। মক্কার তের বছরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই দুরাচারদের হাতে নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

নবুয়তের শান

হে মুসলমান, তুমি তোমার প্রাণ দিয়ে একটিবার এ কথাটি চিন্তা কর, বাবা নেই, মা নেই, প্রিয় দাদা ছিলেন তিনিও প্রয়াত, আবু তালিবের মতো পিতৃব্য বিদায় নিয়েছেন, মহিয়সী দূরদর্শী স্ত্রী সান্ত্বনাদাত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা- তিনিও পাশে নেই, ঘরে আছে মাতৃহারা কন্যাগণের বিষাদমাখা মুখ। মক্কার দূরাচারদের নিত্য অত্যাচার-লাঞ্ছনার মুখে দুনিয়ায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কোনো দরদী নেই যে এই দুর্দিনে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে। ঘরে-বাইরে কোনো সহায়-সম্বল নেই, আছে শুধু অন্ধকার। তিনি যেন সর্বহারা। বিপরীতে চারপাশে আছে শুধু নরপশুদের অকথ্য অত্যাচার নিপীড়ন। এমন একজন মানুষ, পৃথিবীতে বলতে গেলে যাঁর কেউ নেই, তাঁর মাথায় ন্যস্ত হয়েছে নবুয়তের এমন এক মহা-দায়িত্ব যা

সম্পাদনের উপর নির্ভর করে গোটা পৃথিবীর পথভোলা পাপী-তাপীর পরিত্রাণ, সারা জাহানের সুখ-শান্তি, স্থিতি-অস্থিতি !

জাহেলিয়াতের আবু জেহেলদের অবর্ণনীয় হিংস্রতার মুখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য প্রচারের প্রশ্নে ছিলেন এমন অটল-অবিচল, পাহাড়-পর্বতও যার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। কুরাইশদের চাপের মুখে চাচা আবু তালিবও যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছুটা নমনীয় হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের পূর্ণ জালাল ও প্রতাপ নিয়ে বলেছিলেন: "হে চাচা, আল্লাহর কসম, যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনেও দেওয়া হয় তবু আমি এ কাজ ছাড়ব না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে জয়ী করেন কিংবা এ পথেই আমার জীবন চলে যায়।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সংগ্রামী জীবনে ধৈর্যের যে স্বাক্ষর রেখেছেন তা কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষেই সম্ভব। আল্লাহ বলেন:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে, যেন এ দীনকে অপরাপর দীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (তাওবাহ : ৩২-৩৩)

সাহাবা رضي الله عنهم জামাতের উপর নির্যাতন

ইসলাম গ্রহণের কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম যে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন তা আজ কল্পনা করা কঠিন। হযরত বিলাল হাবশী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ইসলাম গ্রহণের কারণে মনিব উমাইয়া তাঁর উপর হামলে পড়ত এবং চাবুকের আঘাতে

বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সারা শরীর রক্তাক্ত করে তুলত। উমাইয়া মরুভূমির দুপুরের উত্তপ্ত রোদে হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। সাইয়্যেদুনা হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এতে কোনো ভাবান্তর নেই, তাঁর মুখে একই কালেমা- আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। এতে উমাইয়ার পাশবিকতার মাত্রা হিংস্র থেকে আরো হিংস্রতর হত। সে কোনো সময় পশুর কাঁচা চামড়ায় লেপটাইয়া, কোনো সময় লৌহবর্ম পরাইয়া অগ্নিবৎ রোদ্রে হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ফেলে রাখত। কখনও গলায় বেড়ি পড়িয়ে রশি বেঁধে অসভ্য ছেলেদের হাতে তুলে দিত, এই কুলাঙ্গারের দল হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রশি ধরে টেনে টেনে সারাদিন মক্কার অলি-গলিতে হৈ হৈ রবে তামাশা করে বেড়াত, অতপর সন্ধায় রক্তাক্ত আধমরা অবস্থায় পাষণ্ড উমাইয়ার বাড়িতে দিয়ে আসত।

এমন অগ্নি-পরীক্ষার আরেক শিকার হযরত খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন উম্মে আনমার নামীয় এক দুরাত্মা নারীর ক্রিতদাস। সেই দুরাত্মা তাঁকে সর্বদা নির্যাতনে পিষ্ট করত। একদিন জলন্ত অঙ্গার বিছিয়ে তার উপর হযরত খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শুইয়ে দেয়, আরেক পাষণ্ড তাঁর বুকের উপর পা দিয়ে চেপে রাখে। হযরত খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর গায়ের চর্বি বিগলিত হয়ে অগ্নি-অঙ্গার নির্বাপিত হয়ে যায়। কখনও লৌহবর্ম পড়িয়ে, কখনও উলঙ্গ শরীরে অগ্নিময় মরু-বালিতে শোইয়ে রাখা হত, এতে গরমের উত্তাপে গায়ের চামরা গলে চর্বি বের হয়ে পড়ত।

ইসলামের জন্য পাশবিক নির্যাতন ভোগের আরেক শিকার ছিলেন আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার। আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পিতা-মাতা মক্কায় অতিশয় দুর্বল ও নিম্নশ্রেণির পরিগণিত হতেন। সত্যধর্ম গ্রহণের অপরাধে প্রথমত আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পিতা ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন। এরপর, মা সুমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে একদিন অগ্নিময় মরু- রৌদ্রে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল, এসময় নরপশু আবু জেহেল তাঁর লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। এতে সুমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা শাহাদাত বরণ করেন।

অনেকের মতে ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম যাঁর রক্তে জমিন রঞ্জিত হয় তিনি হলেন হযরত সুমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা। বেঁচে আছেন কেবল আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আর তাঁকেও একই নির্যাতন ভোগ করতে হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন, "হে আগুন, আম্মারের জন্য শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাও যেরূপ ইব্রাহিমের জন্য হয়েছিলে।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের কষ্ট দেখে বলতেন, হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্য ধর, কখনও দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্, ইয়াসির পরিবারের মাগফিরাত করে দাও। কখনও বলতেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, জান্নাত তোমাদের আকাঙ্ক্ষায় রয়েছে।[১২৩]

আবু ফোকায়হাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যরীনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা আরো দু'টি পবিত্র নাম যাঁরা সত্য গ্রহণের অপরাধে নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে অপরাধীদের ষ্টীমরোলার থেকে সম্ভ্রান্তগণও রেহাই পান নি। সাইয়্যেদুনা হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। মক্কার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সাধু চরিত্রের এই লোকটিও ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফিরদের রোষানল থেকে রেহাই পান নি।

প্রাথমিক অবস্থায় নির্যাতনের আশঙ্কায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে মুসলমানগণ তাদের ইসলাম গ্রহণকে গোপন রাখতেন। মুসলমানদের সংখ্যা যখন উনচল্লিশজন তখন হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইসলাম প্রচারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রথমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন নি কিন্তু তাঁর বারবার অনুরোধে পরে অনুমতি প্রধান করেন। অনুমতি পেয়ে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবদীক্ষিত সবাইকে নিয়ে কাবা গৃহের সম্মুখে হাজির হয়ে বক্তৃতা শুরু

---

[১২৩] উদ্ধৃতি, মাওলানা আজিজুল হক অনু.। ২০০৫। *বুখারী শরীফ*। ৫ম খণ্ড। ঢাকা : হামিদিয়া লাইব্রেরি। পৃ. ১১৩-১১৪।

করলেন। বক্তৃতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক হতে কাফিরগণ এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। মক্কা নগরীতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কাফিরগণ তাঁকে এমন শারিরিক নির্যাতন করে যে তাঁহার চেহারা, নাক-কান সবকিছু রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। অবর্ণনীয় নির্যাতনে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এই খবর শুনে বনী তাইমের লোকজন এসে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যায়। বনী তাইম হারাম শরীফে দাড়িয়ে ঘোষণা করে যে এই নির্যাতনে যদি আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যু বরণ করেন তাহলে আমরা উহার প্রতিশোধস্বরূপ ওতবা ইবনে রবিয়াকে হত্যা করব। যেহেতু আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মারধরের ব্যাপারে ওতবা ইবনে রবিয়ার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অচেতন অবস্থায় ছিলেন। তাঁর বাঁচার আশা সকলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবাণীতে তিনি জ্ঞান ফিরে পান।

সাইয়্যিদুনা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তিনি সত্যধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর পিতৃব্য তাঁকে হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করত। বাধ্য হয়ে তিনি দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। এমন সম্ভ্রান্ত, সম্পদশালী ও প্রভাবশালী লোকজনের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে নিম্নশ্রেণির লোকজনের উপর দিয়ে অত্যাচারের কেমন তুফান অতিবাহিত হয়েছে তা বোধ হয় কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

এই অবস্থায়ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ধৈর্য ধরতে বলতেন এবং অতীতে এর চেয়েও পাশবিক নির্যাতনের শিকার নবীগণের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। অত্যাচার নির্যাতন যখন সহ্যের সকল সীমা অতিক্রম করে তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৬ জনের একটি দলকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেন। সর্বহারারূপে এঁরাই প্রথম হিজরতকারী সৌভাগ্যবান সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাত যারা দীন ও ঈমান রক্ষার জন্য জন্মভূমি, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়স্বজন সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে দেশান্তরিত

হয়েছিলেন। মক্কার কাফিরগোষ্ঠী কিন্তু বসে থাকে নি, তাঁদের পিছু নেয় এমনকি তাঁদেরকে ফিরিয়ে এনে অত্যাচারের জালে আবদ্ধ করার ঘৃণ্য মানসে আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে গিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু সম্রাট ছিলেন ভাল লোক, তিনি প্রকৃত বিষয় বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে এ বিষয়ে কুরাইশগণ ব্যর্থ হয়।

দূরাচার কুরাইশদের সকল প্রলোভন ও সমঝোতার আয়োজন যখন একে একে ব্যর্থ হল তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গোটা মক্কায় যেন হিংস্রতা ও পাশবিকতার আগুন জ্বলে উঠল যাতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত থেকে মানুষকে দূরে রাখা সম্ভব হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা যেন অন্তত প্রাণের ভয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। এই অবস্থায় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর কাফেলায় শরীক হওয়া ছিল প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া কিংবা অঙ্গার হাতে নেওয়া। কিন্তু এটি যেহেতু ছিল আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত তাই আগুন ও অঙ্গারের মধ্যে দিয়েও সে পথ করে নিল। ধীরে ধীরে আরবের এমন সব মানুষ সত্যের পানে এগিয়ে আসতে থাকলেন যাদের ঈমানী চেতনার শক্তির কাছে বাতিলের সকল তাণ্ডব, প্রলোভন ও আয়োজন হার মানতে বাধ্য হল। তাঁদের (সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহুম আনহু) সম্মুখে ছিল আল-কুরআনের বাণী:

الم ج أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۝ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

অর্থাৎ, আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কী ধরে নিয়েছে, ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, কোনো পরীক্ষা করা হবে না? অথচ, আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে, আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বেপরওয়া। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। (আনকাবুত : ১-৭)

কুরাইশদের হিংস্রতা ও পাশবিকতা যত ভয়ঙ্কর হল আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীগণের ঈমানের দৃঢ়তা ও শক্তি ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। এটি যেন আল-কুরআনের ভাষায় এমনই ছিল:

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾

"মুমিনরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।" (আহযাব: ২২)

নির্যাতনের ব্যথার চেয়ে ঈমান না আনার ব্যথা অধিক

স্বয়ং নিজের ওপর, নিরপরাধ অনুসারীদের ওপর এমন অত্যাচার বর্বরতার পরও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় অবিশ্বাসীদের জন্য কাঁদত। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যানের পরিণতি তাদের জন্য মানাত্মক অশুভ ফল বয়ে আনবে। অবিশ্বাসীদের এই মন্দ পরিণামের কথা চিন্তা করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ খুব মনঃকষ্টে ভোগতেন, মনে হত যেন অবিশ্বাসীদের চিন্তায় তিনি নিজেই প্রাণাতিপাত করবেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাঁর মানসিক অবস্থার কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ

نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا অর্থাৎ, "তারা যদি এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে পরিতাপ করতে করতে সম্ভবত আপনি নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।" (কাহাফ : ৬) অবিশ্বাসীদের ভবিষ্যৎ পরিণতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন পীড়া দিত তা উপলব্ধি করার জন্য এই একটি আয়াতই যথেষ্ট।

সাহাবীগণের ﷺ ঈমানী তরবিয়াত : মক্কা পর্ব

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন যাদের অন্তঃকরণ ছিল সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতার অন্ধকারে আবদ্ধ। সে অন্তরজগত নববী শিক্ষা ধারণ করার মতো উপযুক্ত ছিল না। মক্কী জীবনে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পরিবর্তে এক্ষেত্রে নববী শিক্ষার সেই শাশ্বত নীতির প্রয়োগই আগে প্রযোজ্য ছিল যাতে সত্য ধারণ করার জন্যে ময়লা অন্তরগুলো সকল শিরক ও কুফর থেকে আগে পবিত্র হয়ে যায়। নির্যাতন নিপীড়নের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত সাহাবাগণকে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সত্যধর্মের তালিম দিতে থাকেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে সাহাবাগণকে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহর কালাম কুরআনের চিরন্তন বাণী শুনিয়ে দিতেন যা সর্বকালে সকল জ্ঞানের, ইহ-পরকালে প্রকৃত সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার, অন্যদিকে তাঁদেরকে দৈনিক পাঁচবার প্রকৃত মালিক আল্লাহর সম্মুখে দাঁড় করাতেন। এতে খালিক-মালিকের মধ্যে যোগসূত্র তৈরির মাধ্যমে ভ্রষ্টতার সকল জঞ্জাল মুহুর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যেত। সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জন্য এই তরবিয়াতের সর্বাপেক্ষা অমূল্য সম্পদ ছিল আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মাহবুব নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ বা সোহ্‌বত। আল্লাহ বলেন:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۞ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۞ يَهْدِي بِهِ

اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (মায়েদা) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝ (আহযাব)

অর্থাৎ, হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন, তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। (মায়েদা : ১৫-১৬।) হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা (জান্নাতের) ও সতর্ককারীরূপে (পরকালের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে) প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (আহযাব : ৪৫-৪৬)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে যেসব ভাগ্যবান মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ছুটে এসেছিলেন, তাঁরা হিদায়াতের আলোকবর্তিকা আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং এর বাস্তব নমুনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিসবত ও দীক্ষায় দিনে দিনে হয়ে উঠছিলেন আকাশের জ্যোতিষ্কের মতো। ফলে মাটির মানুষ হয়েও মানব-আদর্শে তাঁরা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন নূরের ফেরেশতাদের। তাঁদের কাছে সত্য-মিথ্যার ফাঁরাক দিনেদিনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এ অবস্থায় বাতিলের প্রতিরোধে তাঁরা জিহাদের ময়দানে উপনীত হতে চাইতেন। মুশরিকদের অত্যাচারে চরম অতিষ্ট হয়ে কেউ কেউ আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আবেদন জানাতেন। কিন্তু তাঁরা তো ছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত কাফেলা। ফলে মক্কী জীবনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বদলে বিপদে ধৈর্য ধরতে ও ছবর করতে নির্দেশ দিতেন এবং একইসঙ্গে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সাহায্য আসার শুভ সংবাদও শোনাতেন।

আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করে চরম বিপদে সংযমের এই শিক্ষা তাঁদেরকে জীবনের ভবিষ্যত কঠিন ময়দানে অবিচল থাকার দীক্ষা দিয়েছিল। অথচ, প্রতিঘাতে-প্রতিশোধে জ্বলে ওঠাই ছিল তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তলোয়ার চালনা ও যুদ্ধোন্মাদনা, কারণে-অকারণে খুন-খারাবি ছিল তাদের মজ্জাগত, একেকটি যুদ্ধে রক্তের বন্যা বয়ে যেত। এই হিংস্র স্বভাব ও আরবীয় অহমিকাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই অবদমিত করে এনেছিলেন যে মানবস্বভাব বিরুদ্ধ এসব হিংস্রতার কথা যেন তাঁরা ভুলেই গেলেন। কুরাইশ জুলুমাতের তাণ্ডবলীলা তাঁরা নিরবে-নিবৃতে সয়ে গেলেন মোট তেরটি বছর। তের বছরের মক্কী জীবনে একজন মুসলমানও শত্রুর বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলেছেন এমন নজির নেই। এ ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও শিক্ষা মাথা পেতে নেওয়া।[১২৪] সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মক্কী জীবনে সংযম ও সহনশীলতার এই যে চূড়ান্ত প্রকাশ, মানবেতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। মানবজাতীর ইতিহাসে মানব স্বভাবের এমন বিপ্লবের উদাহরণ বিরল।

বিশ্বনবী ﷺ মদীনার পথে

দূরাচারদের কোনো প্রচেষ্টাই যখন ফলপ্রসূ হচ্ছে না তখন তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসে। ঠিক এ সময় মদীনায় হিজরতের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হন। নরপশুরা যে রাতে তাদের ঘৃণ্য মিশন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয় সে রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে নির্বিঘ্নে বের হয়ে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে উপনীত হন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, গোটা মানবজাহানের পরিত্রাণ দাতা, যার কারণে আল্লাহ্ সকল কুল-মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, শেষ

---

[১২৪] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৬০-১৬১।

পর্যন্ত জন্মভূমি ত্যাগ করে পরবাসে যান। বার বার পিছন ফিরে তাকান, ধীরে ধীরে প্রিয় আল্লাহর ঘর, জন্মভিটা, জন্মভূমি- গোটা মক্কা নগরী চোখের আড়াল হয়। মর্মব্যথায় অশ্রুভেজা নয়নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করেন, "হে মক্কাতুল মুকার্‌রমা, জগতে তুমি ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আমার দেশবাসী আমাকে বিতাড়িত না করলে কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না!"

মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে সওর গুহায় সঙ্গী হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন অবস্থান করেন। দুর্গম গিরি-মরু পার হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবাসীরূপে মদীনায় গিয়ে উপনীত হন। মদীনার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবা পল্লীতে ১২ বা ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছুলেন। মদীনার আবালবৃদ্ধবণিতা প্রতিদিনই রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথপানে চেয়ে থাকতেন। অবশেষে একদিন তাদের প্রতিক্ষার প্রহর শেষ হল। মরু দুলাল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসওয়া উটের পিঠে চড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন আর মদীনার নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক-যুবতি সকলের ঢল নেমেছে মরু দুলাল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ-প্রান্তরে। নিষ্পাপ শিশুরা গাইছে:

মোদের পরে পূর্ণ চাঁদের হয়েছে উদয়
সানিয়াতুল-অদা পথে দেখবি যদি আয়।
শোকর করব মোরা সদা সর্বজনে
ডাকবে যাবত ধরা পৃষ্ঠে কেহ আল্লাহ পানে।
মহান তুমি আসছ ধরায় মোদের শান্তি নিয়ে
করব বরণ তোমায় মোরা প্রাণটি ঢেলে দিয়ে।

প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র

মদীনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘর তৈরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে মেহমান হলেন। মদীনায় ইসলাম এর পূর্বেই পৌঁছেছিল। মদীনাতুল মুনাওয়ারায় ইসলাম অল্প দিনের মধ্যেই এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে আবির্ভূত হল, ফলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখন আর কেউ আগের মতো চোখ তুলে কথা বলার সাহস রাখে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

মক্কায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ ছিল না। কেননা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মানুষ তৈরি হওয়া চাই। মুসলমানদের মক্কার তের বৎসরের জীবন ছিল আগুনে পুড়ে সোনা হওয়ার, তাকওয়া অর্জনের সাধনার সর্বপ্রথম ও মূল পর্যায়। পাশবিক নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, অবরোধ ও সমাজচ্যুত প্রভৃতি অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মুসলমানগণ সে সাধনায় এমনই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, আল্লাহর পথে যে কোনো চরম বিপদ-বিপর্যয়ের সম্মুখে ধৈর্যে-সবরে পাহাড়ের ন্যায় অটল-অবিচল থাকার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন যে, মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে তাঁদের শানে অসংখ্য প্রশংসনীয় ও দিক-নির্দেশক আয়াত নাযিল করেন (এসব পরে আমরা লক্ষ করব)। আল্লাহর পথে জন্মভূমি, ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্বল, আত্মীয়-পরিজন, এমনকি স্ত্রী-সন্তান বিসর্জন দিয়ে হিজরতের মাধ্যমে ত্যাগের যে স্বাক্ষর তাঁরা রেখেছেন, একমাত্র আল্লাহকে পাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই, কোনো প্রশংসাই তাদের সেই ত্যাগের বিনিময় হতে পারে না। **"আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট"**– কুরআনের এই আয়াত নিশ্চয়ই তাঁদের সেই বাসনা চরিতার্থের আগাম দলিল, আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তাঁদের তাকওয়ার এই পরীক্ষা কঠিনভাবে মদীনায়ও হয়েছে। তাই মক্কার পর মদীনায় অনেক ত্যাগ ও মূল্য দেওয়াকে স্মরণ রেখে বলা যায়, সাহাবা কেরামের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বিপ্লবী জীবনপ্রবাহ যেন ছিল: মক্কায় তাকওয়ার

ইমারত তৈরির পর মদীনায় এর চারদিক রং-রূপ, ফুলে-ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠল। মূল শর্ত তাকওয়া এবং অন্যান্য নানা যোগ্যতার প্রশ্নে তাঁরা যখন ভারসাম্যের চূড়ায় উঠলেন তখনই তাঁদেরকে মহান আল্লাহ দুনিয়ারও সম্রাট বানিয়ে দেওয়া শুরু করলেন, দুনিয়ার সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য তাঁদের পায়ে লুঠাতে শুরু করল। মদীনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল।

মক্কায় সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল-ই'বাদ- এর নববী প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন কিন্তু একটি সুসংঘবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে দিয়ে এই চিরন্তন দীন ইসলামকে কায়েম করা এবং চারদিকে সেটি ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালনের সুযোগ ছিল না। মুসলমানগণ যেহেতু এমন এক উম্মত যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ অর্থাৎ, "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (আলে-ইমরান : ১১০) ভবিষ্যতে তাঁদেরকে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে হবে। এই নেতৃত্ব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক– সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হবে। যোগ্যতা অর্জনের পর সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এখন মদীনায় স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ইসলামের বহুমুখী মিশন সুষমরূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অবলোকনের মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত হলেন।

সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রথম আনুষ্ঠানিক পরিচয় পেলেন মদীনা শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে। মদীনার পরিবেশ-পরিস্থিতিও ভাল ছিল না। মদীনার আওস ও খাযরাজের মধ্যে ছিল চির শত্রুতা। এরা ছিল একে অন্যের রক্ত পিপাসু, বুআছ যুদ্ধের মলিন পোশাক তখনও তাদের দেহে, তখনও যেন যুদ্ধের বিভীষিকা আর ফোটা ফোটা রক্ত ঝরছে তলোয়ার থেকে। বিশেষ করে মনে

রাখতে হবে যে, মদীনায় ফেরেশতার মতো অল্প সংখ্যক আনসারী মুসলমানের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বিপরীতে ছিল ইতিহাসের সেই ইহুদি জাতিগোষ্ঠীও যাদের জাতিগত স্বভাবের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় একটি অতি সূদুরপ্রসারী চুক্তি সম্পাদন করলেন। ইতিহাসে এটি মদীনা সনদ হিসেবে খ্যাত হলো। ষষ্ঠ শতকে এরকম একটি চুক্তি হতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। চুক্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা এখানে উল্লেখ করা হল।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এটা কুরায়শ ও ইয়াসরিবের মুমিন ও মুসলমানদের মধ্যে এবং যারা তাদের অধীনে, তাদের সাথে শামিল হবে বা তাদের সাথে জিহাদে মিলেমিশে কাজ করবে তাদের সকলের মধ্যে সম্পাদিত সনদ।

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সকল অন্য সকলের মুকাবিলায় এক বলে গণ্য হবে।

২. ইহুদিদের মধ্যে যারা অনুগত থাকবে তারা সমান অধিকার ও সাহায্য লাভ করবে। তাদের প্রতি যুলুমও হবে না আর তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করাও চলবে না।

৩. ইহুদিদের বিভিন্ন গোত্র ও তাদের অনুসারীরা এবং মুমিনগণ একই রাষ্ট্রের নাগরিক। ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম থাকবে এবং মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম থাকবে। তারা পরস্পরে নাশকতা বা অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হবে না।

৪. কেউ মক্কার মুশরিকদের আশ্রয় দেবে না বা তাদের জানমালের যিম্মাদার হবে না।

৫. কোনো পক্ষ তার মিত্র পক্ষের অপকর্মের জন্য দায়ী হবে না। অত্যাচারিতই সাহায্যের হকদার বলে গণ্য হবে।

৬. ইয়াসরিব উপত্যকা এই চুক্তিনামার সকল পক্ষের কাছে পবিত্র ভূমি বলে গণ্য হবে।

৭. চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াসরিব আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে।

৮. এ চুক্তিনামা কোনো অত্যাচারী বা অপরাধীর সহায়ক বিবেচিত হবে না।

৯. কোনো মুমিন ব্যক্তি অন্য মুমিন ভাইয়ের অনুমতি না নিয়ে অন্য কারো সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে না।
১০. কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট সমর্পণ করতে হবে। [বিস্তারিত জানতে সীরাতে ইবনে হিশাম দেখুন।]

শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হল। কিন্তু ইসলামকে দুনিয়া থেকে নির্মূল করার অপচেষ্টা বন্ধ হল না। মক্কার কাফিরগোষ্ঠী এবার মদীনার ইহুদিদেরকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করে নতুন কার্যক্রম, এবারও উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ ইসলামকে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দেওয়া। ইহুদিরা তাদের জাতিগত প্রতারণা ও শঠতার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর মেরে, বিষ প্রয়োগ করে নানাভাবে হত্যার একাধিক চেষ্টা করেছে। মানবতার মুক্তির দূত নবী-রাসূলগণের সঙ্গে ইহুদিদের এমন অসংখ্য কর্মকাণ্ড ইতিহাসের পাতায় অভিশপ্তরূপে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু নবুয়তের প্রতাপ, সাহাবিগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ঈমানী নূর ও আখলাক, মুহাজির-আনসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মুখে কোনো অপতৎপরতাই ফলপ্রসূ হতে পারে নি; বিজয়ী হয়েছে, দিনে দিনে বিকশিত হয়েছে আল্লাহর প্রেরিত নূরের মশাল যার ওয়াদা আল্লাহ্ নিজে করেছেন:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۞

অর্থাৎ, "তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে, যেন এ দীনকে অপরাপর দীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (তাওবাহ : ৩২-৩৩)

যুদ্ধ না শান্তি ?

মিথ্যা যখন সত্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, এমনকি এটি যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন মিথ্যার বিরুদ্ধে দুর্বারচিত্তে বীরবিক্রমে দাঁড়ানোই মানুষের পরম কর্তব্য। মানব দেহের কোনো অংশে পচন ধরলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তা কেটে ফেলতে হয়, তা না হলে ধীরে ধীরে গোটা দেহটাই পচে-গলে ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজও মানবদেহের মতো, এতেও কখনও কখনও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, মিথ্যা বা বাতিলের নানা পচনকে দূর করে গোটা সমাজকে রক্ষা করার জন্য। অপরাধীকে শাস্তি দানের রীতির মাধ্যমে সমাজের অপরাপর মানুষকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছে গেলেন এবং কিছুটা সুখে-শান্তিতে সত্য প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন তখন শত্রুদের প্রতিহিংসার জাহেলী আগুণ গুণ-বহুগুণ বেড়ে গেল। কুরাইশরা মদীনার মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদিদেরকে নানা কৌশলে হাত করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশনকে নস্যাৎ করা এবং স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার আয়োজনে মেতে উঠল। কুরাইশরা মদীনার স্বাধীন রাষ্ট্র ইসলামি প্রজাতন্ত্র অবরোধসহ নানা চক্রান্তের জাল বুনা শুরু করে। আল্লাহ এবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাতকে বাতিলের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ কুরআনে জানিয়ে দিলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থাৎ, "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে, কারণ তারা অত্যাচারিত, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।" (হজ্জ: ৩৯)

ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ ছিল শান্তির জন্যে অনিবার্য যুদ্ধের, ধ্বংসের বিরুদ্ধে গড়নের, অস্থিতির বিরুদ্ধে স্থিতির সংগ্রামের- চিরন্তন রীতির আদর্শ। বদর যুদ্ধ থেকে নিয়ে বিশ্বনবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের আগ পর্যন্ত ঐ জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেসব মিলিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সর্বমোট শহীদ হয়েছিলেন ২৫৯ জন, শত্রুবাহিনীর সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ছিল ৭৫৯ জন। নিচের সারণিতে (২.১) ২ থেকে ৬ পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি যুদ্ধের নিহতের পরিসংখ্যান দেখানো হল, এর সঙ্গে যদি পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রে চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন যুদ্ধ বা গণহত্যা যেমন, ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, বসনিয়া, চেচনিয়া প্রভৃতির এবং অপরাপর যুদ্ধ-বিগ্রহের ধ্বংসযজ্ঞের পরিসংখ্যান যোগ করা হয় তাহলে কোনো মন্তব্য করার শক্তিই থাকবে না।

সারণি থেকে দেখা যায় ১ নং যুদ্ধসমূহে সব মিলিয়ে মাত্র ১০১৮ জন লোক মারা গিয়েছিল। সারণির অন্যান্য ক্রমিকের যুদ্ধের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না। কেবলমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল কমপক্ষে ১ কোটি লোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি। ক্রমিক ২ থেকে ৬ পর্যন্ত যুদ্ধসমূহে আলাদাভাবে যে পরিমাণ মানুষ ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল তা সামনে রেখেও যদি সারণির ১ নং যুদ্ধসমূহের ক্ষয়ক্ষতির দিকে লক্ষ করা যায় তাহলে এ সরল সত্যই ফুটে উঠে যে, নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য মানুষ হত্যা ও ধ্বংস ছিল না, যা অপরাপর যুদ্ধ-বিগ্রহের লক্ষ্য হয়ে থাকে ও ছিল।

সারণি : ২. ১ বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা

ক্র.নং	বিশ্বে বিভিন্ন যুদ্ধ	মৃতের সংখ্যা
১.	বিশ্বনবীর ﷺ জীবদ্দশায় ঘটা বদর থেকে নিয়ে সকল যুদ্ধ	১০১৮
২.	ইংল্যান্ড-ফ্রান্স (শত বছর) যুদ্ধ (১৩৩৭-১৪৫৩)	৩৫,০০০০০
৩.	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-২০)	৮,৫৪৫,৮০০-২১,০০০,০০০
৪.	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)	১৫,৮৪৩,০০০-৮৫,০০০,০০০
৫.	ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-৭৫)	৮০০,০০০-৩,৮০০,০০০
৬.	কোরিয়া যুদ্ধ (১৯৫০-৫৩)	১,২০০,০০০+

সূত্র: List of wars by death From Wikipedia, the free encyclopedia.

নবী-রাসূলগণের যুদ্ধের সঙ্গে অন্যান্য যুদ্ধের বড় পার্থক্য হল, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ যুদ্ধ করেছেন সভ্যতা বিনির্মাণ ও বিকাশের মূল শক্তি মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্যে, এর পেছনে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক কোনো স্বার্থ ছিল না। পক্ষান্তরে অপরাপর যুদ্ধ-বিগ্রহ কী কী কারণে সংঘটিত হয়েছিল? দু'ই দু'টি বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিয়ে অন্যান্য যতসব যুদ্ধ বিশ্বে সংঘটিত হয়েছে তার সবই ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লোভ-লালসা হাসিলের কিংবা পেশিশক্তি প্রদর্শন এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। এসব যুদ্ধ কোটি কোটি নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, ধ্বংস করেছিল জনপদের পর জনপদ। এসব যুদ্ধ বিশ্বের জন্য বয়ে এনেছিল কেবলই অভিশাপ আর অভিশাপ।

মক্কা বিজয় : মহান শিক্ষা

প্রায় দশ হাজার সঙ্গী-সাথী নিয়ে রক্তপাতহীন পরিবেশে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করলেন। এটি সেই জন্মস্থান যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুষ্টিমেয় অনুসারী দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার-লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। মক্কার জমিন থেকে তখনও মজলুমের রক্তের দাগ শোকায় নি। মক্কাবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই ভাবল যে এবার তাদের প্রতিশোধে পিষ্ট হওয়ার পালা। বিজয়ী-বিজিতের মধ্যে দুনিয়ায় এটিই হয়ে থাকে। পৃথিবীতে চেঙ্গিস খান, আলেকজান্ডার, হিটলার, মুসোলিনী এবং আরো কত নেতা-সম্রাটের অভিযান, বিজয়াভিযান লেখা হয়েছে। বিজীতকে, বিজীত ভূমিকে ধূলায় মিশিয়ে দেওয়াই এসব অভিযানের রীতি। কিন্তু তিনি তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে সম্বোধন করে বললেন, কুরাইশগণ, বল, আজ তোমরা কি ভাবছ? তারা বলল, দীর্ঘদিন ধরে আমরা তোমার উপর যে অত্যাচার করেছি, আজ তুমি তার প্রতিফল দিবে- তাই ভাবছি। অন্য বর্ণনায়, তাঁরা এও বলল যে, আমরা আপনার নিকট সদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আপনি শরীফ ভাই এবং শরীফ ভাইয়ের ছেলে। মক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা

মুক্ত।'[১২৫] শত্রু হাতের মুঠোয়- কিন্তু কোন প্রতিশোধ নেই, কোন ঘৃণা নেই, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোন মতলব নেই। এত বড় করুণা, এত বড় মহিমা- জগতে কে কোথায় দেখেছে! কুরাইশদের মুখে কোনো কথা নেই, তারা জাগ্রত না স্বপ্নাচ্ছন্ন বুঝতে পারল না। সকলে কোন্ এক অলৌকিক মোহমায়ায় অভিভূত হয়ে পড়ল! অশ্রুসজল নয়নে দলে দলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে লুঠিয়ে পড়ে তারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)![১২৬]

বিশ্বনবীর ﷺ যুদ্ধ ও বন্দী নীতিমালা

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ নীতিমালার বিধান ছিল যেমন: নারী, শিশু, বৃদ্ধকে হত্যা করা যাবে না, যাকে যুদ্ধে জোরপূর্বক আনা হয়েছে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না, পালিয়ে গেলে পিছু ধাওয়া করে হত্যা করা যাবে না, অঙ্গ বিকৃতি করা যাবে না, আত্মসমর্পণ করলে আর হত্যা করা যাবে না, গাছপালা, পশু, সম্পদ বিনষ্ট করা যাবে না ইত্যাদি। যুদ্ধের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরোপিত এরকম হাজারো নীতিমালা বা শর্ত লক্ষণীয় যা তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ গোটা জীবন শতভাগ পালন করে গেছেন। বন্দী নীতিমালায় শর্ত ছিল এরকম, বন্দীকে নির্যাতন বা হত্যা করা যাবে না, কষ্ট দেওয়া যাবে না, সাধ্যমতো স্বাস্থ্যসম্মত থাকা-খাওয়া দিতে হবে, মুক্তিপণ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে বন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে ইত্যাদি। যেমন, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী একজন বলেন, তারা (মুসলমানরা) নিজেদের পরিবার পরিজনের চেয়েও আমাদেরকে ভাল খাবার খাওয়াতেন এবং নিজেদের লোকদের আগে আমাদের আরাম-আয়েশের চিন্তা

[১২৫] মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৫৩০-৫৩১; ইফা। ২০০৩। *সীরাত বিশ্বকোষ*। ৭ম খণ্ড। পৃ. ৪১০-৪১১।

[১২৬] গোলাম মোস্তফ। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৬০-২৬১।

করতেন।[১২৭] মুক্তিপণেরও এমন দৃষ্টান্ত মুসলিম জীবনে সংরক্ষিত আছে যার কোনো তুলনা হয় না। যেমন, মুসলমানদের হাতে লেখাপড়া জানা যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে নিরক্ষর মুসলমানকে অক্ষরজ্ঞান দান করাও মুক্তিপণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছিল। সংক্ষেপে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ ও বন্দী নীতিমালার যে পরিচয় দেওয়া হল তা এককথায় অতুলনীয়।

অপরাপর যুদ্ধ-বিগ্রহে এমন উদারনীতি কখনই কল্পনা করা যায় না, বরং সেসবে থাকে কেবল হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংস। এসব যুদ্ধে নিরপরাধ মানুষকে অকাতরে মরতে হয় এবং সম্মুখে পড়া যে কোনো সহায়-সম্পদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারকার করা হয়। এই ধ্বংসের সত্যিকার কোনো পরিসংখ্যান নেই। ১ নং সারণিতে ২-৬ পর্যন্ত যুদ্ধে কিংবা কেবল ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে এসব যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিভৎসতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ, স্থাপনা ও সকল সম্পদ ধ্বংসের কথাও এখানে স্মরণযোগ্য। এসব যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যেসব আচরণ করা হয় তাও একই রকম বিভৎস ও পৈচাশিক। এক্ষেত্রে কেবল আবু-গারাইব কারাগারে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যে ধরনের গা শিউরে-উঠা পাশবিক আচরণ করা হয়েছে তা স্মরণ করাই যথেষ্ট। আজকের পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যে ধরনের বর্বর আচরণ করে থাকে তা যদি কোনো সুস্থ মানুষও দেখে তাহলে হয়তো হার্টফেল করে মারা যাবে। এসব রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর এক্ষেত্রে কাজই থাকে কীভাবে কত বিচিত্র ধরনে, কত বেশি যন্ত্রণা বন্দীদেরকে দেওয়া যায়। উলঙ্গ করে রাখা, কুকুর দিয়ে খাওয়ানো, যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা, নারী বন্দীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করা, প্রচণ্ড গরম বা ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রাখা, উপোস রাখা ইত্যাদি হল এসব রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের কিছু সাধারণ ধরন যা তারা যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে

---

[১২৭] উদ্ধৃতি, কাজী সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী। ২০০৬। *রাহমাতুল লিল আলামীন।* ঢাকা:মদীনা পাবলিকেশান্স। পৃ. ৩০৫।

করে থাকে; বাস্তবে এদের নির্যাতনের ধরন-প্রকৃতি আরো ভয়াবহ ও পৈচাশিক- যা না দেখলে কারো পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, আর এক্ষেত্রে মুক্তিপণ বলে কিছু নেই। এসব বন্দীর মুক্তি বা মৃত্যু সম্পূর্ণই বন্দীকারীদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। এই বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে ইসলামের যুদ্ধ ও বন্দী নীতি যার শতভাগ প্রয়োগ বিশ্বনবী ও তাঁর সাহাবীগণের দ্বারা হয়েছিল, এবং অপরাপর যুদ্ধের নীতি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এ দুইয়ের তুলনার কোনো সুযোগ নেই, বরং তুলনা করা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

সাহাবীগণের ﷺ হিজরত : সত্যের টানে মদীনার পানে

মক্কার তের বছরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ঈমানটুকু ছাড়া আর সব হারিয়েছিলেন। ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্বল এমনকি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভালবাসা ও সহানুভূতি সবকিছু হারিয়ে তারা পথে নেমেছিলেন। যারা হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন তাঁরা তাদের বাড়ি-ঘর, রুটি-রুজি, স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সহায়-সম্বল বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন। এভাবে সত্যের টানে যারা মদীনায় হিজরত করলেন তাঁরা সকলে ছিলেন বাস্তুহারা, সর্বহারা। তাঁদের হিজরত ছিল এমন– যারা তাঁদের প্রাণ ও ঈমান ছাড়া কিছুই নিয়ে আসতে পারেন নি, সহায়-সম্বল তো বটেই, এমনকি স্ত্রী-সন্তান পর্যন্ত আল্লাহর জন্য বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন। কেউ শুধু পরিধেয় কাপড়টুকু নিয়ে এসেছেন, কেউ এসেছেন অর্ধ-উলঙ্গ বা প্রায় উলঙ্গ শরীরে।

মুসয়াব ইবনে উমাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সম্পদশালী পরিবারের বাবা-মায়ের অতি আদরের সন্তান। পিতা-মাতার আদরে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত মক্কার অন্যতম সুদর্শন যুবক ছিলেন তিনি। মক্কায় যত রকমের সুন্দর ও উৎকৃষ্ট পোশাক ও খুশবু ছিল সবই তিনি ব্যবহার করতেন। মক্কায় তাঁর চেয়ে সুদর্শন ও উৎকৃষ্ট পোশাকধারী আর কেউ ছিল না। একদিন মুসলমানদের একটি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসা ছিলেন। এমন সময় পাশ দিয়ে মুসায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হেঁটে গেলেন। দীন-দরিদ্র কাঙাল বেশ, পড়নে পূর্বের দামি অভিজাত পরিধেয়ের বদলে অঙ্গ-আবরণ

আছে শুধু এক টুকরো ছেড়া কম্বল। মুসায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সংকোচচিত্তে হাঁটেন, কারণ এই এক টুকরো অঙ্গ-আবরণও এমন যে ঠিকমত দাঁড়াতে গেলে খুলে যায় কিনা সন্দেহ। মুসায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে বৈঠকের সবার অন্তর মুহূর্তে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, চোখে নামল বেদনার অশ্রু। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসহায় মুসায়য়েব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ত্যাগের অবস্থা দেখে ও তাঁর পূর্বের অবস্থা স্মরণ করে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

হযরত সুহাইব রুমী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতো যারা কুরাইশদের মতে প্রবাসী মক্কী ছিলেন এবং মক্কায় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনী হয়েছিলেন, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মদীনায় হিজরতের সময় এই বলে তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল যে, তুমি যেতে পার কিন্তু তোমার সম্পদ নয়, যেহেতু এসব মক্কায় থেকে উপার্জন করেছ। প্রকৃত সত্য হল, হযরত সুহাইব রুমী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রবাসী ছিলেন না, আরব ছিলেন। যাই হোক, তিনি সব সম্পদ বিসর্জন দিয়ে মদীনায় হিজরত করলেন। তিনি কুবায় পৌঁছুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে বললেন, তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে হে আবু ইয়াহইয়া, তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি তিনবার বললেন। আনন্দের সঙ্গে হযরত সুহাইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার আগে আপনার নিকট কেউ আসেনি আর জিবরাইল ছাড়া আর কেউ এই সংবাদ দেয় নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কথা সত্য ছিল, আসমানী ওহি তার সত্যায়ন করেছে।[১২৮] তাঁর শানে আল্লাহ তায়ালা বললেন:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾

---

[১২৮] আব্দুর রহমান রাফাত পাশা। ২০১৩। *আলোর কাফেলা সমগ্র*। নাসীম আরাফাত ও মাসউদুয যামান অনু. ঢাকা:মাকতাবাতুল আশরাফ। পৃ. ৫৭-৫৮।

"আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।" (বাকারা : ২০৭)

হযরত আবু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শ্বশুর ও পিতৃ পক্ষীয় লোকজন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে এই বলে কেড়ে নিয়েছিল যে, তুমি হিজরত করে মদীনায় চলে যাও কিন্তু আমাদের বংশের মেয়ে ও সন্তানদেরকে নিয়ে যেতে পারবে না। তারা তাঁর স্ত্রী-সন্তানদেরকে কেড়ে নিয়ে গেল। হযরত আবু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনিময়ে এসবকে খুব তুচ্ছই মনে করলেন। তিনি বললেন, হে আমার পিতা ও শ্বশুর বংশের লোকসকল, তোমরা মনে করেছ, স্ত্রী-সন্তান কেড়ে নিলে আমি মদীনায় যাওয়া থেকে বিরত হব। কিন্তু এ তোমাদের ভুল ধারণা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে এসব তো অনেক কম মূল্য! এই বলে সত্যের সৈনিক মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন। পরে অবশ্য স্ত্রী-সন্তানরা তাঁর সঙ্গে মদীনায় গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। সত্যের জন্যে এমন ত্যাগ পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় নি।

সাহাবীগণের رضي الله عنهم ঈমানী তরবিয়াত : মদীনাতুল্ মুনাওয়ারা

মদীনাতুল্ মুনাওয়ারা, মদীনাতুন্ নবী, মদীনাতুর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এমন কত প্রেমময় শ্রদ্ধাস্পদ নামে এই পবিত্র ভূমি আজ স্মরিত বরিত। কিন্তু এই শহর তো একসময় এমন ছিল না, ছিল উল্টো- দূষিত পরিবেশ, রোগ-শোক, জরা-ব্যাধির শহর। জ্ঞানীদের শিক্ষার জন্য ইসলাম ও এর মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কত যে নিদর্শন স্রষ্টা সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছেন তা কে উপলব্ধি করবে? মদীনা শহরের ইতিহাস থেকে, বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের আগমনের পূর্বের ও পরের, এই শিক্ষা সহজেই কী প্রতিভাত হয়ে ওঠে না? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর এই শহরের জন্য আল্লাহর কাছে রহমত ও বরকতের দোয়া করলেন। তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, মদীনায় মক্কার দ্বিগুণ বরকত দাও।" ইতিহাস প্রমাণ করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকতেই এক সময়ের বসবাস অযোগ্য ইয়াসরিব শহর

অনাবিল শান্তি ও নিরাপদ শহরে পরিণত হয়ে ওঠে। নিচের কবিতায় (সংগৃহীত) বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে:

সোনার মদীনা আমার প্রাণের মদীনা ॥ সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।
ইয়াসরিব নামে তুমি ছিলে অলক্ষণের দেশ ॥ বড়ই মারাত্মক ছিল তোমার পরিবেশ॥
নবীর ছোয়া লেগে তুমি সোনার মদীনা ॥ সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।
আরশে-মুয়া'ল্লার চেয়ে বড় তুমি হও ॥ খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও॥ কেন?
তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে-মদীনা ॥ সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।
জান্নাতের বাগান তোমায় নবী বলেছেন ॥ খাকে শিফার অধিকারী তোমায় করেছেন॥
তোমার বুকে প্রবাহিত নূরেরই ঝরনা ॥ সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।

মদীনায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরি করলেন। দুই ইয়াতিম বালকের এক টুকরো জমি তাঁদের সম্মতির ভিত্তিতে ক্রয় করে মসজিদ তৈরি করা হল। সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সঙ্গে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মসজিদ তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করলেন। মসজিদে নামাজ আদায় করা ছাড়াও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মসজিদই ছিল তখন সকল কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল এই মসজিদ। শিক্ষা-দীক্ষার নববী পেয়ালা থেকে দিবানিশি জ্ঞানসূধা পানের জন্য মসজিদের এক পাশে বাড়তি স্থানে ঐতিহাসিক আসহাবে সুফফার সদস্যরা বাস করে গেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরশে মদীনা অনাবিল শান্তির শহরে পরিণত হলেও ইসলামের বিপক্ষে বিরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন ছিল তা একটু পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম দ্বীনি তরবিয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় মদীনায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, নৈতিক ও মানবিক চরিত্র গঠনের এক অভূতপূর্ব শিক্ষালয় গড়ে ওঠে যার মাপকাঠি ছিল আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা আদর্শ। এই শিক্ষালয় থেকেই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত বের হয়েছে, কোনো

যোগ্যতায়ই যাদের সমকক্ষ দ্বিতীয় আর কোনো জামাত পৃথিবী দেখেনি, ভবিষ্যতেও দেখবে না। তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ছিল একটিই, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহর রাসূল তাঁদের সামনে এমন এক শিক্ষামালা উপস্থাপন করলেন যা ছাড়া মানুষ মানুষ হতেই পারে না। তা ছিল একদিকে মহাগ্রন্থ কুরআনের বাণী, সঙ্গে সহজ-সরল কিন্তু চিরন্তন নববী ব্যাখ্যা ও ব্যবহার তথা হাদিস ও সুন্নাহ, এ হল মানুষ ও সমাজ গঠনের মূল বুনিয়াদ। কিছু দৃষ্টান্ত নিচে উল্লেখ করছি। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

"হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" (হুজুরাত : ১৩)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে মানুষ আরব-অনারব চিন্তাজগতে মহাবিপ্লব সৃষ্টিকারী বাণী শুনতে লাগল; তিনি বললেন, মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাকওয়া ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে একের উপর অন্যের কোনোরকম শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তিনি আরো বলেন, তোমরা সবাই আদমের বংশধর। আদম মাটির তৈরি। যারা পূর্বপুরুষের কৌলীন্যে গর্ব করে তারা যেন নিবৃত্ত হয় নতুবা এরা আল্লাহর নিকট মলের কীট হতেও ঘৃণ্য হবে।[১২৯] আরব জাহেলিয়াতের মর্মমূল উচ্ছেদকারী আরো বাণী উৎসারিত হতে লাগল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের নীচতা ও বংশগর্বের কুপ্রথা দূর করে দিয়েছেন। মানুষের শ্রেণি এখন শুধু দু'টি– নেক ও মুত্তাকী

[১২৯] *তাফসিরে ইবনে কাছির*। প্রাগুক্ত। সূরা হুজুরাত।

যারা আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান এবং মন্দ ও দুর্ভাগা যারা আল্লাহর কাছে মর্যাদাহীন।[১৩০] এক হাদিসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "انْظُرْ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى،

অর্থাৎ, হযরত আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁকে বললেন, দেখো, তুমি কিন্তু সাদা ও কালো, কারো চেয়ে উত্তম নও এবং নও অভিজাত, তবে আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া দ্বারা যদি কারো চেয়ে অগ্রগামী হতে পার।[১৩১]

রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন প্রভুর সান্নিধ্যে মুনাজাতে নিমগ্ন হতেন তখন একথাও নিবেদন করতেন: আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে তোমার বান্দারা সকলে ভাই-ভাই।[১৩২] জাহেলিয়াতের শেষ শিকড় তিনি উপড়ে ফেলেছিলেন এবং ইসলামি সমাজে অনুপ্রবেশের সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই অবিনাশী উদাত্ত ঘোষণার মাধ্যমে: 'যে সাম্প্রদায়িকতার ডাক দেবে সে আমাদের দলভূক্ত নয় এবং যে সাম্প্রদায়িকতার উপর লড়াই করবে সেও আমাদের দলভূক্ত নয় এবং সেও আমাদের দলভূক্ত নয় যে সাম্প্রদায়িকতার উপর মারা যাবে।'[১৩৩] হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা কোনো এক যুদ্ধে ছিলাম। হঠাৎ এক মুহাজির এক আনসারীকে কিছু একটা বলে বসলেন, আর আনসারী চিৎকার দিলেন– ইয়া লালআনসার! মুহাজিরও ডাক দিলেন– ইয়া লালমুহাজিরীন! এ ডাক শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অসন্তুষ্টচিত্তে

---

[১৩০] তিরমিযি : ৩১৯৩।
[১৩১] মুসনাদে আহমদ : ২০৪৩৮।
[১৩২] আবু-দাউদ : ১২৮৯।
[১৩৩] আবু-দাউদ : ৪৪৫৬।

সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বললেন– সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান বর্জন কর, এ তো শুধু দুর্গন্ধ।[১৩৪]

জাহেলিয়াতে ছিল কেবল অন্ধ গোত্রপ্রীতি। জাহেলিয়াতের আরবে নিয়ম ছিল- 'জালিম হোক আর মজলুম হোক সাহায্য কর তোমার ভাইকে'– ন্যায়-অন্যায় বলে কোনো মানদণ্ড এতে ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আঘাত হানলেন এবং ন্যায় ও সত্যকে পক্ষাবলম্বনের মাপকাঠি ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, 'যারা অন্যায়ের উপর আপন কওমের পক্ষাবলম্বন করবে তাদের দৃষ্টান্ত হল সেই উট যা কুয়ার ভিতর ঝাঁপ দিতে চায় আর তার লেজ ধরে তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়।' অর্থাৎ, লেজ টেনে যেমন পতন রোধ করা অসম্ভব তেমনি ঐ ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ»

অর্থাৎ, 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, হোক সে যালিম বা মজলুম।' সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পেরেশান হয়ে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মজলুমকে সাহায্য করা বুঝলাম, কিন্তু যালিমকে? তখন তিনি বুঝিয়ে বললেন, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে, এটিই হবে তাকে সাহায্য করা।[১৩৫]

দুনিয়ার সর্বত্র নারীর যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, কুরআন সেসব প্রত্যাখ্যান করে নারীর মর্যাদার ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিল:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝

---

[১৩৪] বুখারী : ৫৪২৫; মুসলিম : ৪৫২৭।
[১৩৫] মুত্তাফাকুন আলাইহি।

অর্থাৎ, তারা (নারী) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পুরুষ) তাদের পরিচ্ছদ। (বাকারা:১৮৭) যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (নিসা:১২৪)

কুরআনের অন্যতম বিশেষত্ব হল, তা একদিকে দুনিয়ার মূল্য মানুষের সামনে তুলে ধরেছে অন্যদিকে পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির কথা তুলে ধরেছে। যেমন কুরআন কী অপরূপভাবে প্রকাশ করছে:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ط وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ط ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

অর্থাৎ, "জেনে রাখ, পরকালের মুকাবিলায় পার্থিব জীবন কিছুতেই কাম্য হবার যোগ্য নয়। কেননা, এটা নিছক ক্রীড়া-কৌতুক, বাহ্যিক সাজ-সজ্জা, শক্তি, সৌন্দর্য ও কলাকৌশল নিয়ে পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। অর্থাৎ, পার্থিব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই: শৈশবে ক্রীড়া-কৌতুক, যৌবনে জাঁকজমক ও অহমিকা এবং বার্ধক্যে ধন ও জনের প্রবল বড়াই থাকে। এসব উদ্দেশ্য ধ্বংসশীল ও কল্পনা-বিশ্বাস মাত্র। এর উপমা হল যেমন, বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভারের জন্য কৃষক খুশী হয়, অতপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তা তুমি পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। এমনি ভাবে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, এরপর পতন ও অনুশোচনা মাত্র। পক্ষান্তরে পরকালে আছে দু'টি বিষয়: একটি [অবিশ্বাসীদের জন্য] কঠিন শাস্তি এবং অপরটি [মু'মিনদের জন্য] আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। এই উভয় বিষয় চিরস্থায়ী পক্ষান্তরে পার্থিব জীবন নিছক ধোঁকার সামগ্রী। [কাজেই] তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি ধাবিত হও, এই জান্নাত আকাশ ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত। এটি প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটি দান করেন। আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।" (হাদীদ : ২০-২১)

ওপরের আয়াত দু'টিই একজন মানুষের শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। কুরআনের আলো ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীক্ষায় সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জাহেলী যুগের সকল অন্ধকার, আমিত্বের অহংবোধকে ঝেড়ে ফেললেন এবং নিজেদের জান-মাল, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে শতভাগ সমর্পন করে দিলেন। তাঁদের স্বভাব ও মানসিকতার এমনই পরিবর্তন হল, এখন তারা ঐসব জাহেলী আচরণ আর কোনভাবেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। এই শিক্ষার ফলে সেই সৌভাগ্যবান মানুষগুলো হয়ে উঠেছিলেন যেন মানবফুলের তোড়াস্বরূপ, আলোর কাফেলা। সেই সোনালী জামাতের কিছু নমুনা নিচে লক্ষ করা যাবে।

ভ্রাতৃত্বের অপরূপ মহিমায়

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম যারা মুহাজির হয়ে মদীনায় এলেন তাঁরা ছিলেন এক কথায় সর্বহারা শ্রেণি যেকথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার অধিবাসী আনসার সাহাবীগণকে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মুহাজির সাহাবীগণকে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম দীনি ভাইরূপে গ্রহণের আহ্বান জানালেন। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। সাধারণত এরকম ভিটে-মাটিহীন দুর্গত শরণার্থীদেরকে মানুষ উটকো জঞ্জাল মনে করে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না, এটি দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের রুচি পরিপন্থী। সর্বত্রই দেশী-ভিনদেশীর প্রশ্ন ওঠে। আধুনিককালেও এর অসংখ্য উদাহরণ আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যকে একদিকে ধ্বংসস্তুপ ও মরণফাঁদে পরিণত করা হয়েছে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সেইসব হতভাগা মানুষ যখন জান ও ইজ্জত রক্ষার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয়ের জন্য ছুটেছে তখন অধিকাংশ দেশই তাদেরকে গ্রহণ করেনি, অনেকের সলিল সমাধি পর্যন্ত হয়েছে। মেক্সিকোর দরিদ্র মানুষ যখন জীবন বাঁচানোর তাগিদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছে তখন তাদেরকে কুকুর-বিড়ালের মতো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রবেশপথ নিশ্চিদ্র করতে সীমান্তে দেয়াল খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু সেদিনের আনসারগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম

মুহাজিরগণকে কেবল স্থানই দেননি বরং ইজ্জত ও সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁদেরকে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে বসবাসের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের ধনসম্পদে অংশীদার করেছিলেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেওয়ার জন্য এক সাথে একাধিক আনসার আবেদন করতেন ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমেও এর নিষ্পত্তি হত। মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্বের অপরূপ মহিমায় সেদিন জগত কেমন উদ্ভাসিত হয়েছিল তা বর্ণনার অতীত। ভ্রাতৃত্ববোধের এমন দৃষ্টান্ত অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত সা'আদ ইবনে রবী আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সা'আদ ইবনে রবী আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, "হে ভাই, আমি মদীনাবাসীদের মধ্যে অধিক সম্পদের অধিকারী। আমার দু'টি বাগান আছে। দু'জন স্ত্রী আছে। সুতরাং দেখ কোন বাগানটি তোমার অধিক পছন্দ, আমি সেটি তোমাকে দিয়ে দেব। আর আমার কোন স্ত্রী তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়, আমি তাকে তোমার জন্য তালাক দিয়ে দেব। জবাবে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আনসারী ভাইকে বললেন, আল্লাহ তোমার ধনসম্পদ ও পরিজনে বরকত দান করুন। তুমি শুধু আমাকে বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দাও।"

ফায়- এর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আনসারগণকে জড়ো করে এক ভাষণ দিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ ও সালাতের পর আনসারদের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ বনু-নুযায়িরের সম্পদ আমার করতলগত করে দিয়েছেন। যদি আপনারা চান তবে আমি এই সম্পদ মুহাজির ও আনসার সবার মধ্যে বন্টন করে দেব এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহেই বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এই সম্পদ কেবল গৃহ ও

সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বন্টন করে দেব এবং এরপর তাঁরা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে নিজেদের আলাদা গৃহ তৈরি করে নেবে। এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দুই প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও সা'দ ইবনে মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের অভিমত এই যে, এই ধনসম্পদ আপনি সম্পূর্ণই কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদ্বয়ের কথা শুনে উপস্থিত আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা এই অভিমতে সম্মত ও আনন্দিত ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করলেন এবং ধনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারগণের মধ্যে কেবল দুই ব্যক্তি সহল ইবনে হানীফ ও আবু দুজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্থতার কারণে অংশ দিলেন। গোত্রনেতা সা'দ ইবনে মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ইবনে আবি হাকিকের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হল।[১৩৬]

অন্যদিকে যখন বাহরাইন বিজিত হল তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাপ্ত ধনসম্পদ পুরোটা আনসারগণের মধ্যে বন্টন করে দিতে চাইলেন। কিন্তু আনসারগণ তাতে রাজি হলেন না বরং বললেন, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইদেরকেও এই ধনসম্পদ থেকে অংশ দেওয়া না হয়। এমন বিস্ময়কর ও অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব তাঁদের মধ্যে কীভাবে স্থাপিত হল, অথচ এরাই সেই জাহিলী সমাজের সম্প্রদায় যাদের কথা আমরা পূর্বে জেনে এসেছি? আল-কুরআন এর রহস্য পরিষ্কার করে দিয়েছে, আল্লাহ বলেন:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

---

[১৩৬] *তফসিরে মাযহারী*, উদ্ধৃতি মুফতি মুহম্মদ শফি রহ. *তফসীরে মা'আরেফুল-কুরআন*। প্রাগুক্ত। সূরা হাসর।

"আর তিনি প্রীতি-বন্ধন সৃষ্টি করেছেন তাদের হৃদয়ে। যদি তুমি পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করে ফেলতে তাহলেও তাদের হৃদয়ে বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতে না, আসলে আল্লাহ তাদের মনে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।" (আনফাল : ৬৩)

মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

"আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর তাহলে দুনিয়াতে দেখা দিবে ফিতনা ও বিরাট ফাসাদ।" (আনফাল : ৭৩)

একটি ঘটনা এমন ছিল- জনৈক আনসারীর গৃহে রাত্রীকালে একজন মেহমান এলেন, কিন্তু গৃহে শুধু বাচ্চাদের খাওয়ার মতো পরিমাণ কিছু খাবার ছাড়া কিছু ছিল না। আনসারী সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সম্মুখে খাবার দিয়ে আমরাও সঙ্গে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় টের না পায়, আমরা শুধু খাওয়ার ভান করব। সেমতে মেহমান আহার করলেন। সকালে আনসারী সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, গতরাতে মেহমানের সঙ্গে তুমি যে ব্যবহার করেছ তাতে আল্লাহ্ অত্যধিক খুশি হয়েছেন। মহানুভবতার এমন বিস্ময়কর ঘটনা পৃথিবীর আর কোথাও কখনও দেখা যায় নি।

আনসারগণের সকলেই ধনী ছিলেন না, তাদের মধ্যে অনেকেরই অর্থ-সম্পদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন, নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন, যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্থ ও দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। এজন্য তাঁরা অন্তরে কোনো ঈর্ষা বা ব্যথাও অনুভব করতেন না। এমন পরোপকারী মানুষদের প্রশংসা করে আল্লাহ কুরআনে বলেন:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ
وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا
أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" (হাশর : ৮-৯)

বিবেকের শাসন

সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীক্ষায় এমন ঈমানী চেতনা লাভ করেছিলেন, ফলে যে কোনো অপরাধ ও অসুন্দরের বিপক্ষে তাঁদের মানবিক মূল্যবোধ ঝলকে উঠত। মানবীয় দুর্বলতার কারণে নিজের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ অমলিন চিত্তে স্বীকার করে শাস্তি ভোগ করে পরকালীন সাফল্যের জন্য দ্রুত পাক-সাফ হয়ে যেতে বিলম্ব করা তাদের সহ্য হত না। কারণ কুরআন তাঁদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছিল যে পরকালের সাফল্যই প্রকৃত বড় সাফল্য। দুনিয়াতে প্রকৃত প্রতিযোগিতা কেবল গুণাহ ত্যাগের মাধ্যমে এই সাফল্য তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই পরিচালিত হওয়া উচিত। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝ (বুরুজ) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۝ ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ (হাদিদ)

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ, এটাই মহাসাফল্য। (বুরুজ: ১১) যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে, বলা হবে: আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই মহাসাফল্য। (হাদিদ: ১২)

নিম্নের ঘটনায় এটি বুঝা যাবে যে কীভাবে বিবেকের শাসন সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কেরামের জীবনধারাকে পরিচালিত করত। মাইয বিন মালিক আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, নিজের উপর যুলুম করে যিনা করে ফেলেছি! দয়া করে আমাকে এই গোনাহ থেকে পবিত্র করুন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। একই আরয নিয়ে পরদিন তিনি আবার আসলেন এবং মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দ্বিতীয়বারও ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর গোত্রে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, তোমরা কি তাঁর মস্তিষ্কে কোনো ত্রুটির কথা জান? তোমরা তাঁর থেকে কোনো অস্বাভাবিক আচরণ দেখেছ? তারা জানাল, আমরা কোনো ত্রুটির কথা জানি না, বরং তিনি তো আমাদের সমঝদার লোকদের একজন। মাইয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাস্তি বরণ করার জন্য তৃতীয়বার এলেন আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাঁর সম্পর্কে খোজ নিয়ে একই তথ্য পেলেন। চতুর্থবার যখন একই কথা হল তখন তাঁকে রজম করে শাস্তি কার্যকর করা হল।

এক মহিলা সাহাবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে যিনার গোনাহ থেকে পবিত্র করুন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সাহাবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন? সম্ভবত যে কারণে মাইযকে সে কারণে? অথচ আল্লাহর কসম, আমি তো গর্ভবতী! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে যাও, প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা কর। প্রসবের পর কাপড়ে জড়ানো নবজাতককে উপস্থিত করে

বললেন, এই যে আমি সন্তান প্রসব করেছি, এবার তো আমাকে পাপের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও, দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত স্তন্য দান কর। দুধ ছাড়ানোর পর তিনি বাচ্চা নিয়ে হাজির হলেন আর বাচ্চার হাতে ছিল রুটির টুকরো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই যে তাকে দুধ ছাড়িয়েছি, এখন সে অন্য খাবারে অভ্যস্ত। তারপর তাঁকে রজম করা হল।

ঈমানী চেতনায় পরাভূত ভোগবাদ

ইসলামের প্রথম জামাতের ঈমানী অবস্থা ছিল তাঁরা ঈমান আনতেন আর জান্নাতের জন্য শতভাগ প্রাণপন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও সংস্পর্শ তাদের মধ্যে যে ঈমান গেড়ে দিয়েছিল তার কোনো তুলনা নেই, দুনিয়া এর কাছে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ। কারণ তাঁদের সম্মুখে ছিল কুরআনের এ ধরনের বাণী:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

অর্থাৎ, "বস্তুত: তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (আ'লা: ১৬-১৭)

তাবারী উল্লেখ করেন, মাদায়িন বিজিত হওয়ার পর বিজয়ী মুসলিম বাহিনী যখন মালে গনীমত জমা করতে লাগল তখন জনৈক মুজাহিদ নিজের হিস্সার গনীমত এনে তত্ত্বাবধায়কের কাছে জমা করলেন। লোকজন বলল, এত মূল্যবান গনীমত! এর সামনে তো আমাদেরগুলো কিছুই না। তারা জিজ্ঞেস করল, তুমি কিছু রেখে দিয়েছ কি না? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর ভয় না থাকত তাহলে তো আমি তোমাদের কাছে আসতামই না। তোমরা এর খবরই পেতে না। লোকেরা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি পরিচয় প্রকাশ করব না। কারণ এতে তোমরা আমার প্রশংসা করবে, অথচ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই! পরে জানা গেল তিনি ছিলেন হযরত আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

ফোযালাহ বিন ওমায়র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে (নাউযুবিল্লাহ) উদ্যত হল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। ফোযালাহ যখন নিকটবর্তী হল তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে, ফোযালাহ? সে বলল, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, মনে মনে কী মতলব করছ? সে বলল, না, কিছু না, আল্লাহর যিকির করছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিয়ে বললেন, তাওবা কর, তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পবিত্র হাত তার বুকে স্থাপন করলেন। ফলে ফোযালার কল্‌ব্ শান্ত ও স্থির হয়ে গেল। পরে ফোযালাহ বলতেন, আল্লাহর কসম, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুক থেকে তাঁর হাত সরানোর আগেই মনের অবস্থা এমন হল যে আমার কাছে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়ে প্রিয় কোনো মানুষ নেই। ফোযালাহ বলেন, আমি স্বগোত্রে ফিরে গেলাম। পথে ঐ নারীর সঙ্গে দেখা হল যার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। সে বলল, এস না আলাপ করি! আমি বললাম, না। কারণ ইসলাম এটা অনুমোদন করে না।

হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে রোমকদের সন্ধিচুক্তি ছিল। কিন্তু সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সীমান্তে সন্য সমাবেশ করলেন যাতে মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্র সীমান্ত অতিক্রম করে শত্রুর ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়া যায় এবং অপ্রস্তুত রোমক বাহিনী খুব সহজেই পর্যুদস্ত হয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনী অযথা রক্তক্ষয় থেকে বেঁচে যায়। তাঁর ধারণাই সত্য হল। অতর্কিত আক্রমণের তীব্রতায় রোমক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে শুরু করে এবং অল্প সময়ে সহজেই রোমের বিস্তীর্ণ এলাকা মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দখল করে নেন। এমন চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্তে সাহাবি হযরত আমির বিন আবাসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে এসে বললেন, 'বিশ্বাস রক্ষা করা মুমিনের স্বভাব, বিশ্বাস ভঙ্গ করা নয়।' মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ কথার হেতু জানতে চাইলে সাহাবি আবাসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি শুনিয়ে দিলেন যেখানে বলা হয়েছে, 'দু'ই পক্ষে সন্ধি হলে

মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোনো পক্ষই সন্ধি বিরোধী তৎপরতা চালাতে পারে না।' সুতরাং হাদিস অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে অতঃপর অতর্কিতে আক্রমণ করে ইসলামের নীতি লঙ্ঘন করেছেন। হাদিস শুনামাত্র বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিলেন, 'যুদ্ধ থামাও এবং ফিরে চল।' হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে গোটা বিজিত এলাকা শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে ইসলামি সৈন্যবাহিনী সীমান্ত রেখার অভ্যন্তরে ফিরে এল। পৃথিবীর আর কোনো জাতির ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে কিনা জানা নেই।

একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাফেলাকে কোথাও পাঠালেন, সবাইকে কিছু কিছু পাথেয় দিলেন কিন্তু হযরত হোদায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কথা হয়তো ভুলে গেলেন। সাহাবীও আর কিছু বলেননি, খালি হাতেই কাফেলার সঙ্গে রওয়ানা হলেন। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর বলতে লাগলেন, হে আমার মাওলা, আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু দেননি আর আমিও চাইনি। আপনি তো জানেন, আমার কাছে কোনো খাবার-দাবার নেই, এখন আপনিই আমার সব ব্যবস্থা করে দেন, আমার পাথেয় আপনিই হয়ে যান। এটাই আমার খাবার, এটাই আমার পথের সম্বল। সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই তাসবিহ পড়েন আর পথ চলেন। হঠাৎ, হযরত জিবরাঈল আ. ছুটে আসলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার সাহাবী হোদায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ডাকে তো আল্লাহর আরশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, আপনি তাঁকে কোনো পাথেয় দেননি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে হোদায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য লোক দিয়ে পাথেয় পাঠালেন। লোকটি দ্রুত উঠ ছুটিয়ে কাফেলাকে ধরলেন। তিনি হোদায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ভাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে খেয়াল করতে ভুলে গিয়েছিলেন, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন আর এই পাথেয় আপনাকে দিয়েছেন। সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো গ্রহণ করে আকাশের দিকে চোখ উঠিয়ে এখন দ্বিতীয় আরেক অমর দোয়া করলেন- হে

আমার মাওলা, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। আরশের উপরে থেকেও আপনি আমাকে মনে রেখেছেন, আমার ক্ষুধা ও দুর্বলতার প্রতি আপনার দয়া হয়েছে। হে আল্লাহ, হোদায়েরকে যেভাবে আপনি ভুলে যান নি, হোদায়েরকেও এই তাওফীক দান করুন, সে যেন কখনও আপনাকে ভুলে না যায়। ঈমান যদি এমন হয় তাহলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কও এমন-ই হয়।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত ইকরিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রাসূলকে যখন চিনিনি তখন প্রাণপণ সত্যের বিরোধীতা করেছি, আর আজ যখন সত্য চিনতে পেরেছি তখন কী পালিয়ে যাব? না, তা কখনই হতে পারে না। এরপর যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

নিশ্চিহ্ন হল মাখলুকের ভয়

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় সাহাবিগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হৃদয় মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নূরে-জালাল ও জামালের জ্ঞানে এমনই পূর্ণ হয়েছিল ফলে তাঁরা সর্বক্ষণ এই মহান জাতকে পুরোপুরি হাজির-নাজির মেনে জীবন অতিবাহিত করতেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির মুখে যে কোনো মাখলুককে নিজেদের মতো স্রেফ একটি অতি-দুর্বল, সদা পরমুখাপেক্ষি সৃষ্টি ছাড়া কিছুই ভাবেতেন না। কুরআনের আলোয় তাঁরা এমনই জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিলেন ফলে কোনো পার্থিব শক্তি, রাজশক্তি তথা গায়রুল্লাহর ভয়-শঙ্কা অন্তর থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছিল, তাঁরা গায়রুল্লাহর সামনে মাথা নত করার বদলে থাকতেন চির উন্নত শির। দুনিয়াবী জাঁক-জমক ও শান-শওকত তাঁদের কাছে ছিল মূল্যহীন তুচ্ছ বস্তু। তাঁরা যখন কোনো রাজদরবারে যেতেন তখন অকল্পনীয় জাঁক-জমক ও শান-শওকতকে অবলোকন করে মনে করতেন তাঁরা এসব প্রাণহীন কোনো ছবি বা মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যাকে মানুষের পোশাকে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন কুরআনের এই বাণীর নমুনা:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

অর্থাৎ, "যাদেরকে লোকেরা বলে যে, তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে, তাদের ভয় কর তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী।" (আল-ইমরান: ১৭৩)

হযরত আবু মূসা বলেন, আমরা হাবসায় হিজরতকারী মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য সম্রাট নাজ্জাসীর দরবারে গেলাম। নাজ্জাসী তখন বিরাট জাঁক-জমক ও শান-শওকতপূর্ণ দরবারে সিংহাসনে সমাসীন। কুরায়েশ দূত আমর ইবনুল আস ও আম্মারাহ ছিল সম্রাটের ডানে ও বায়ে, সভাসদ ও ধর্মনেতাগণ ছিলেন দুই সারিতে উপবিষ্ট। আমর ও আম্মারা বলে উঠলেন, এরা তো বাদশাকে সেজদা করে না। ধর্মনেতাগণ মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কথা কি সত্য? সায়্যিদুনা জাফর বিন আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সকলের পক্ষে নিঃশঙ্কচিত্তে জানিয়ে দিলেন, হ্যাঁ, কথা সত্য, আমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করি না। সমকালীন সমাজ-পরিবেশে এমন জবাব মোটেও সহজ ছিল না।

কাদেসিয়া যুদ্ধের পূর্বে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাবিই বিন আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দূতরূপে সেনাপতি রুস্তুমের কাছে প্রেরণ করেন। ইতিহাসের কিংবদন্তিতুল্য বীরপুরুষ রুস্তুম ছিলেন তৎকালীন পারস্য সম্রাটের প্রধান সেনাপতি, আজকের যুগে যাকে বলে কোনো রাষ্ট্রের সেনাপ্রধান। সেইকালে এমন লোকদের দরবার, বাসভবন ইত্যাদি এমন জাঁক-জমক ও শান-শওকতপূর্ণ হত যে, যে কারো চোখ তাতে ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। প্রথম অধ্যায়ে এসবের কিছু বিবরণ আমরা পেয়েছি। স্বয়ং সেনাপতি মূল্যবান মণিমুক্তা-খচিত পোশাক ও জাঁক-জমকপূর্ণ মুকুট পরিধান করে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। পক্ষান্তরে মাথায় শিরোস্ত্রাণ, হাতে সাধারণ ঢাল-বর্ম আর জীর্ণ সস্তা লেবাস পরিহিত রাবিই বিন আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি খর্বাকৃতির ঘোড়ায় চড়ে অমন সেনাপ্রধান রুস্তুমের মূল্যবান গালিচা মাড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তারপর তাকিয়ায় ঘোড়া বেঁধে সেনাপতি রুস্তুমের দিকে অগ্রসর হলেন। দরবারের

লোকেরা বিরক্ত কণ্ঠে বলল, অন্তত যুদ্ধের পোশাক তো খুলে ফেল! মুসলিম দূত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, দেখ, আমি নিজে থেকে এখানে আসিনি, তোমাদের আহ্বানে এসেছি। তোমাদের পছন্দ হলে ভাল, নয়তো আমি ফিরে যাই। রুস্তুম বললেন, তাঁকে আসতে দাও। মুসলিম দূত বর্শায় ভর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন আর বর্শার আঘাতে মূল্যবান পারস্য-গালিচা ছিদ্র হতে লাগল। নদবী রহ. মন্তব্য করেন, সম্ভবত তাতে তাদের অন্তরের ভূমিও ছিদ্র হচ্ছিল।[১৩৭] সেনাপতি জানতে চাইলেন, কী উদ্দেশ্যে তোমাদের এ ভূমিতে আগমন? মুসলিম দূত রাবিই বিন আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেদিন পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তির সেনাপ্রধানের চোখে চোখ রেখে নিঃশঙ্কচিত্তে যে জবাব দিয়েছিলেন তা যদি আজকের মুসলমানরা ধারণ করতে পারত! হযরত রাবিই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন:

لقد ابتعثنا اللهُ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন যেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, বের করে আনি মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে, জাগতিক সঙ্কীর্ণতা থেকে পরকালীন প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।[১৩৮]

কাদেসিয়ার যুদ্ধে ইরানী ফ্রন্টের সর্বাধিনায়ক মহাবীর হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর কাছে পারস্য সেনাপ্রধান রুস্তুমের বিরাট বাহিনীর সকল ক্ষমতা ও প্রতিরোধ ব্যূহ তছনছ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা একের পর এক যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করেছিল। মুসলিম বাহিনী সাসানী সাম্রাজ্যের বাহ্‌রাসীর দখল করে আছে। এ বাহ্‌রাসীর ও মাদায়েনের মধ্য দিয়ে উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ দজলা নদী প্রবাহিত। হযরত সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন যে সম্রাট

---

[১৩৭] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৭৩।

[১৩৮] ইবনে কাসীর রহ.। ২০০৫। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*। ৭ম খণ্ড। ঢাকা : ইফা। পৃ. ৪০।

ইয়াজদিগির্দ রাজধানী মাদায়েন থেকে সকল মূল্যবান সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে। হযরত সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সৈন্য বাহিনী নিয়ে দ্রুত মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন। দজলা তীরে এসে দেখেন, পারসিকরা নদীর পুল পূর্বেই ধ্বংস করে দিয়েছে। নদী পারাপারের বিকল্প কোনো পথ নেই। সেনাপতি মহাবীর হযরত সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দজলার তীরে মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্য শিক্ষনীয়। ভাষণের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ওহে আল্লাহর বান্দারা, দ্বীনের সিপাহীরা! সাসানী শাসকরা আল্লাহর বান্দাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মিথ্যা ও বানোয়াট কথার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা করতে বাধ্য করছে। তাদের ঘামঝরা কষ্টোপার্জিত সম্পদ নিজেদের পুঞ্জিভূত করেছে। তোমরা যখন তাদের পরিত্রাণদাতা হিসেবে উপস্থিত হয়েছ তখন তারা পালাবার পথ ধরেছে এবং দরিদ্র জনসাধারণের ধন সম্পদ ঘোড়া ও গাধার পিঠে বোঝাই করেছে। আমরা কখনও তাদের এমন সুযোগ দেব না। তাদের বাহনের ওপর বোঝাইকৃত ধন-ভাণ্ডার যাতে আমরা ছিনিয়ে নিতে না পারি এজন্য তারা পুল ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু ইরানিরা আমাদের সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তারা জানে না, আল্লাহর ওপর ভরসাকারীরা, মানবতার সেবকরা পুল বা নৌকার ওপর ভরসা করে না। আমি পরম দয়ালু-দাতা আল্লাহর নামে আমার ঘোড়াটি নদীতে নামিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমার অনুসরণ কর। একজনের পেছনে অন্যজন, একজনের পাশে অন্যজন সারিবদ্ধভাবে তোমরা দজলা পার হও। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য ও হেফাজত করুন।[১৩৯]

মুসলিম বাহিনী আল্লাহর সাহায্যে অনায়াসে দজলা পার হয়ে মাদায়েন কুলে পৌঁছে যায়, মনে হল যেন তাঁরা কোনো নদী নয় বরং এক শুকনো মাঠ বা প্রান্তর পাড়ি দিয়েছে। পরসিকরা এই দৃশ্য দেখে বলতে থাকে, দানব, দানব, পালাও! পালাও! হযরত সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নির্জন শ্বেতপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ যেন ছিল শিক্ষা ও উপদেশের স্মারক।

[১৩৯] আবদুল মাবুদ। ২০১৩। *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*। ১ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। পৃ. ৮৫।

হযরত সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল কুরআনের এই আয়াতগুলি:

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

"তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান। কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। এমনটিই হয়েছিল এবং আমি ওগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।" (দোখান : ২৫-২৮।)

হযরত সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তথায় প্রবেশ করে আট রাকাত 'সালাতুল ফাতহ' আদায় করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার ফলে তাঁর আদেশে শাহী প্রাসাদে জুমার জামাত অনুষ্ঠিত হল। পারস্যে এটিই ছিল প্রথম জুমার নামায।[১৪০]

অপূর্ব বীরত্ব, তুচ্ছ দুনিয়া

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহর জন্য বীরত্বের যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা পৃথিবী এর আগে কখনও দেখেনি। তাওহিদ-রিসালাত-আখিরাত এই তিন বিশ্বাস তাঁদের অন্তরকে দুনিয়ার প্রতি এমনই ভাবলেশহীন আর পরকালের প্রতি এমনই পাগলপারা করে তুলেছিল যে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন আল-কুরআনের এই বক্তব্যের বাস্তব নমুনা:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ

---

[১৪০] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৬।

وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

অর্থাৎ, "জেনে রাখ, পরকালের মুকাবিলায় পার্থিব জীবন কিছুতেই কাম্য হবার যোগ্য নয়। কেননা, এটা নিছক ক্রীড়া-কৌতুক, বাহ্যিক সাজ-সজ্জা, শক্তি, সৌন্দর্য ও কলাকৌশল নিয়ে পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। অর্থাৎ, পার্থিব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই: শৈশবে ক্রীড়া-কৌতুক, যৌবনে জাঁকজমক ও অহমিকা এবং বার্ধক্যে ধন ও জনের প্রবল বড়াই থাকে। এসব উদ্দেশ্য ধ্বংসশীল ও কল্পনা-বিশ্বাস মাত্র। এর উপমা হল যেমন, বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভারের জন্য কৃষক খুশী হয়, অতপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তা তুমি পীৎবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। এমনি ভাবে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, এরপর পতন ও অনুশোচনা মাত্র। পক্ষান্তরে পরকালে আছে দু'টি বিষয়: একটি [কাফিরদের জন্য] কঠিন শাস্তি এবং অপরটি [মু'মিনদের জন্য] আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। এই উভয় বিষয় চিরস্থায়ী পক্ষান্তরে পার্থিব জীবন নিছক ধোঁকার সামগ্রী। [কাজেই] তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি ধাবিত হও, এই জান্নাত আকাশ ও পৃথিবীর মতপ্রশস্ত। এটি প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটি দান করেন। আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।" (হাদীদ : ২০-২১)

আখিরাত ও জান্নাতের দৃশ্য যেন তাঁরা দিব্য চোখে দেখতে পেতেন আর সেজন্য ডানা মেলা পাখীর মতো আপন নীড়ের প্রতি ধাবিত হতেন প্রতিনিয়ত। তাঁদের কাছে দুনিয়া হয়ে উঠেছিল কারাগারের মতো, আপন বাসস্থান জান্নাত ছাড়া যাদের কোনো বিকল্প থাকতে পারে না। কিছু ঘটনা থেকে বিষয়টি বুঝা যাবে।

১. উহুদের যুদ্ধে বিপর্যয়ের মুখে হযরত আনাস বিন নজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাদ বিন মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে বললেন, 'হে সাদ, জান্নাতে চল। কাবার রবের কসম, আমি উহুদের ময়দান থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' হযরত আনাস বিন নজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দ্বীনের শত্রুদের প্রতি বীরবিক্রমে ধাবমান হলেন এবং শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়ে সেই সুঘ্রাণের জান্নাতে পৌঁছে গেলেন। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

যুদ্ধের পর তাঁর শরীরে আমরা আশিটির বেশি অস্ত্রের আঘাতের জখম পেয়েছি, শুধু তাঁর বোন আঙুলের নিশানা দ্বারা তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন।[১৪১]

২. বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» . قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ» قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا، رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» . قَالَ: فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ ، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ. قَالَ: ثُمَّ رَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

অর্থাৎ, 'এগিয়ে যাও জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান-যমিনের মতো।' ওমায়র ইবনুল হুমাম আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসমান-জমিনের প্রশস্ততার মতো জান্নাত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আনন্দের আতিশয্যে ওমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন বাখ্ বাখ্ বলে উঠলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, বাখ্ বাখ্ বলছ কেন? তিনি বললেন, আর কিছু নয় ইয়া রাসূলুল্লাহ, শুধু এই আশায় যে, আমি তাহলে জান্নাতের কাতারে শামিল হব। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো আহলে জান্নাতের একজন! ওমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থলি থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে শুরু করলেন। কিন্তু একদু'ই কামড় দিয়েই বলে উঠলেন, খেজুর খাওয়া পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তো জিন্দেগি অনেক লম্বা হয়ে যাবে [জান্নাতে পৌঁছা বিলম্বিত হয়ে যাবে]! তিনি খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।[১৪২]

২. আবু বকর বিন আবু মুসা আশ'আরী রহ. বলেন:

---

[১৪১] *বুখারী*, *কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার*, হাদিস : ২৫৯৫; *কিতাবুল মাগাযী*, হাদিস : ৩৭৪২।
[১৪২] মুসলিম : ৩৫২০; মুসনাদে আহমাদ।

سَمِعْتُ أَبِي ، بِحَضْرَةِ العَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ رَثُّ الهَيْئَةِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ ، قَالَ: نَعَمْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ، وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

"আব্বাকে আমি দুশমনের মুখোমুখি অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাত তরবারির ছায়াতলে!' তখন জীর্ণশীর্ণ একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবু মুসা, আপনি কি নিজে তাঁকে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন সেই লোক তাঁর সাথীদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের (বিদায়ী) সালাম জানাচ্ছি। তারপর তিনি তলোয়ার বের করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।"[১৪৩]

৪. হযরত আমর ইবনুল জামূহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মারাত্মক রকমের পঙ্গু ছিলেন। এজন্য তাঁর পুত্ররা তাঁকে উহুদের গাযওয়ায় যেতে এই বলে বারণ করল যে, আল্লাহ তো ওজরের কারণে আপনার জন্য রোখছত রেখেছেন। সুতরাং আপনার ঘরে থাকাই ভাল, আমরাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট। হযরত আমর ইবনুল জামূহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পুত্ররা আমাকে আপনার সঙ্গে গাযওয়ায় বের হতে বাঁধা দিচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি আশা করি, শহীদ হয়ে এই পঙ্গু পা নিয়ে জান্নাতে বিচরণ করব! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আল্লাহ তো তোমার উপর থেকে জিহাদের আবশ্যিকতা রহিত করেছেন। তারপর তাঁর পুত্রদের বললেন, তোমরা তাঁকে বাঁধা না দিলে ক্ষতি কী! হয়তো আল্লাহ তাঁকে শাহাদাত নছীব করবেন! তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উহুদের যুদ্ধে যোগ দিলেন এবং আকাঙ্ক্ষা মতো শহীদ হলেন।[১৪৪]

---

[১৪৩] মুসলিম : ৩৫২১; তিরমিযি : ১৫৮৩।

[১৪৪] হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম। *যাদুল মায়াদ*। ১৯৯০। ১ম খণ্ড। ঢাকা:ইফা। পৃ. ১৮৫।

৫. হযরত খায়ছামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, একদিন স্বপ্নে দেখলাম আমার ছেলে অত্যন্ত সুন্দর জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাকে সেজেগোজে জান্নাতের বাগানে ফল খেয়ে বেড়াচ্ছে এবং ঝর্ণাধারার ওপরে পরিভ্রমণ করছে। সে একথা বলছিল যে, আমার প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি সত্যে পরিণত করেছেন! এ স্বপ্ন দেখে আমি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, **আমি আমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উদগ্রীব**। আপনি দোয়া করুন যেন আমি শাহাদাতবরণ করে জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করি। আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করলেন।[১৪৫]

৬. এক বেদুইন রাখাল মাত্র মুসলমান হয়েছেন আর তখনই খায়বার বিজয়ের গনীমতের হিস্‌সা তাঁকে দেওয়া হল। তিনি হিসসা নিতে অস্বীকার করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো এজন্য আপনার অনুগমন করিনি। বরং এজন্য করেছি যে, এখানে (কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে) একটি তীর এসে লাগবে আর শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করব! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি আল্লাহর সঙ্গে সত্য বলে থাক তাহলে তিনি তোমার কথা সত্য করে দেখাবেন। তারপর সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন আর বেদুঈন সাহাবি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নিহত অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির করা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সে? সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আল্লাহর সঙ্গে সত্য বলেছে, তিনিও তাঁর কথা সত্য করে দিয়েছেন।[১৪৬]

---

[১৪৫] *প্রাগুক্ত*।

[১৪৬] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৯০।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীগণ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশ্নে কেমন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার সামান্য কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হল। তাঁদের অবিনাশী কীর্তি বলে ও লিখে শেষ করার নয়।

ন্যায়নিষ্ঠ দায়িত্বশীল সমাজ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবিয়তে এমন এক দায়িত্বশীল ও ন্যায়ানুগ সমাজ গড়ে উঠেছিল যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ এবং অপরের সকল ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন পরস্পর দায়বদ্ধ যা তাঁদের অন্তরে জন্ম নেওয়া জবাবদিহিতা ও নির্মল কর্তব্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ছিল। তাঁদের সম্মুখে ছিল কুরআনের এ ধরনের বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۝ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۝ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাক, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জন করতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটি আল্লাহ-ভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (মায়েদা:৮)

তাঁরা তৈরি হয়েছিলেন কুরআনের এসব নির্দেশ, অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুমহান শিক্ষার উপর:

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: - وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থাৎ, 'তোমরা প্রত্যেকে শাসক এবং আপন শাসিতের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত (ও দায়বদ্ধ)। [সুতরাং] ইমাম তার জনগণের শাসক এবং আপন শাসিতের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে এবং স্বামী তার পরিবার-পরিজনের শাসক এবং আপন শাসিতের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, আর স্ত্রী তার স্বামীগৃহের শাসক এবং আপন শাসিতের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তদ্রূপ সেবক তার মনিবের সম্পদের ব্যবস্থাপক এবং তার অধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[১৪৭]

নিম্নের দু'টি ঘটনা থেকেই বুঝা যাবে যে ইসলামের আলোকে সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কেমন ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয় কাজে মদীনা থেকে বায়তুল মাকদিসের পথে যাত্রা করেছেন। বাহন একটিমাত্র উট। যাত্রী দু'জন, তিনি নিজে ও তাঁর ভৃত্য। খলিফা ভৃত্যকে বললেন ভাই, আমি কিছু পথ উটে চড়ব আর তুমি উটের রশি টানবে। অতঃপর তোমার পালা, তখন তুমি কিছু পথ উটে চড়বে আর আমি উটের রশি টানব। ভৃত্য বলল, হুজুর এ কেমন কথা! ভৃত্য উটে চড়ে যাবে আর স্বয়ং আমিরুল মুমিনীন সেই উটের রশি টেনে টেনে হেঁটে চলবেন, এ অসম্ভব। কিন্তু তাঁরা তো ছিলেন সত্যিকারের মুসলমান- সোনার মানুষ। অতএব আমিরুল মুমিনীনের কথামতই যাত্রা সমাপ্ত হল। বায়তুল মাকদিসের মুসলিম, ইহুদি-খ্রিস্টানরা যখন আমিরুল মুমিনীনকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সমবেত হল তখন দেখা গেল এক হৃদয়বিদারক কিন্তু অনাবিল দৃশ্য- এক ভৃত্য উটের পিঠে চড়ে আছে আর স্বয়ং আমিরুল মুমিনীন সেই উটের রশি টেনে টেনে হেঁটে আসছেন। স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান যদি এমন হন তাহলে সে রাষ্ট্র ও এর জনগণ তাহলে কেমন ছিল সেটি কিছুটা অনুমান করা যায়। এজন্যই বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে সেদিন শান্তি আসবে যেদিন বিশ্বনবীর সা. সাহাবীগণের রা. মতো শাসক জুটবে।

---

[১৪৭] বুখারী : ৮৪৪।

বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাসবিদ ওয়াকিদী (৭৪৭-৮২৩ খ্রি.) লেখেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের যারা আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন তারা পানি খেতে চাইলেন। কিছু পরিমাণ পানি আনা হল। আহত সকলেরই তখন পানির বড্ড প্রয়োজন। একজনের নিকট পানি আনা হলে অন্যজনকে দেখিয়ে বললেন, পানি আগে তাঁকে দিন। তাঁকে দেওয়া হলে তিনি অন্যজনকে দেখিয়ে বললেন, পানি আগে তাঁকে দিন। তৃতীয়জনকে দেওয়া হলে তিনি চতুর্থ একজনকে দেখিয়ে বললেন, তাঁকে দিন। এভাবে তাঁরা একে অন্যজনকে পানি পাঠাতে লাগলেন আর নিজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কারোরই আর পানি পান করা হল না এবং এভাবে সবাই শহীদ হয়ে গেলেন।[১৪৮] এরূপ ন্যায় ও দায়িত্বশীলতার নজির অতুলনীয়। আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

এভাবে এমন এক ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গড়ে উঠেছিল যেখানে কর্তব্যবোধ আর জবাবদিহিতা সমভাবে ছিল শাসক শাসিত সকলের মাঝে। খলীফার প্রতি তাঁরা ছিল পূর্ণ আনুগত্যশীল যার ভিত্তি ছিল আল্লাহর আনুগত্য। শাসকের প্রতি তাদের আনুগত্য ততক্ষণ বজায় থাকত যতক্ষণ খলীফা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকতেন। কখনও খলীফা বা শাসক আল্লাহর অবাধ্য হলে তার প্রতি আনুগত্যের কোনো অবকাশ নেই। ঐ সমাজের শাসক শাসিতের সম্পর্কের মূলনীতি ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অমর বাণী– 'খালিকের অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের আনুগত্য নেই।' এমন কর্তব্য ও দায়বোধ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজের প্রতি, অপর সকলের প্রতি এবং নিজের ও অন্যের বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি সকল কিছুর প্রতি।

রাসূল হন সমাজ ও সভ্যতার প্রাণ

পৃথিবীর যে সমাজচিত্র আমরা প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ করেছি, এককথায় তা ছিল সীমাহীন অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা, লাঞ্ছনায় ভরপুর। রাজ্যের সংখ্যাগুরু

---

[১৪৮] উদ্ধৃতি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*। প্রাগুক্ত। "ইয়ারমুকের যুদ্ধ।"

অসহায় জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতার প্রতাপ ও প্রতারণার ধোঁকায় রেখে শোষণের মাধ্যমে ভোগ-বিলাসের জিন্দেগী উপভোগ করাই ছিল রাজা-বাদশা ও সুবিধাভোগী কতিপয় শ্রেণির জীবনকর্ম; প্রজাসাধারণের প্রতি কোনো মমত্ববোধ তাদের ছিল না। এমন সমাজে শাসকদের প্রতি প্রজাদেরও সত্যিকার কোনো ভালবাসা থাকার কথা নয়, ছিল কেবল বুকভরা সুপ্ত হিংসা-বিদ্বেষ আর ঘৃণা। নদবী রহ. সুন্দর করে লেখেন, 'হৃদয়ের প্রেরণা-স্ফুলিঙ্গ নিভে গেল, আবেগ-অনুভূতি এবং উদ্যম-উদ্দীপনা শীতল হয়ে গেল। কপটতা, প্রতারণা ও লৌকিকতা স্বভাবে পরিণত হল। অবজ্ঞা ও হীনতা এবং লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার জীবনে মানুষ এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ল যে এর বিপরীত কিছু কল্পনা করতেও তারা অক্ষম ছিল।'[১৪৯] হৃদয়ের ভালবাসায় নয়, আনুগত্য ও ধন-জন যদি বাধ্য হয়ে বিসর্জিত হয় এমন সব পথে যে পথ ও পথের ধারক-বাহকদের প্রতি আছে কেবল হিংসা-বিদ্বেষ আর ঘৃণা, তাহলে এর পরিণতি কী হতে পারে? যা হবার তাই হয়েছিল। মানবীয় আবেগ ও অনুরাগের প্রেমময় বন্ধন ছাড়া যে মানব-সমাজ প্রাণহীন, স্থবির, ঐ পরিবেশ এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতর ধ্বংস বইয়ে দিয়েছিল। নদবী রহ.- এর ভাষায় আবারও বলতে হয়:

মানব হৃদয়ের যে সহজাত আবেগ মানুষকে সর্বদা কল্যাণের পথে অনুপ্রাণিত করেছে এবং ইতিহাসের সব অধ্যায়ে অবিস্মরণীয় সব কীর্তি ও কর্মের গৌরব দান করেছে, তার নাম প্রেম ও ভালবাসা। কিন্তু বহুদিন থেকে মানবহৃদয়ে প্রেম-ভালবাসার স্রোতধারা শুকিয়ে গিয়েছিল, কিংবা মানবকল্যাণের পরিবর্তে তা অন্যখাতে প্রবাহিত হয়েছিল। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে পশুর স্তরে নেমে গিয়েছিল। এভাবেই যুগের পর যুগ বিগত হয়েছে। রাজার পর রাজা এসেছে, বহু রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়া হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের মঞ্চে এমন কোনো মহামানবের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি হৃদয়ের শুকিয়ে যাওয়া এ প্রেমধারা নতুনভাবে প্রবাহিত করতে পারেন এবং মানবতার কল্যাণের জন্য তা ব্যবহার করতে পারেন; যিনি তাঁর পরিপূর্ণ গুণ ও সৌন্দর্য এবং সমুন্নত স্বভাব ও চরিত্র দ্বারা মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করতে পারেন এবং মানবহৃদয়ের প্রেম, ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধার অধিকারী হতে পারেন। এই যে শূন্যতা, এর ফলে মানুষের হৃদয়ে প্রেম ও ভালবাসা যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তার একমাত্র আরাধ্য বিষয় হয়ে পড়েছিল প্রকৃতির

---

[১৪৯] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত* / পৃ. ১৮৯।

সৌন্দর্য, নারীর রূপ-লাবণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের কৃত্রিম উচ্ছ্বাস-উচ্ছলতা। এ কারণেই আমরা দেখি, নারী ও প্রকৃতি এবং জীবন ও যৌবনই হল প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কবিদের কবিতার প্রধান উপজীব্য।[১৫০]

এমন একটি দিকভ্রান্ত ও শোষিত মানবসমাজে আখেরী নবীরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হলেন। তিনি সব বেড়াজাল ছিন্ন করে যাবতীয় জঞ্জাল সাফ করলেন, গড়ে দিলেন এমন এক মানবসমাজ যার তুল্য কিছু এর আগে এই দুনিয়া দেখেনি। তাঁর রূপ-গুণের বর্ণনায় বক্তাগণ শুধু বলতে পেরেছেন, 'তাঁর আগে ও পরে তাঁর কোনো তুলনা আমি দেখিনি।' তাঁর ব্যক্তিসত্তায় আল্লাহ গুণ, সৌন্দর্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ঐশ্বর্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের এমন সর্বোত্তম সুষম সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, মানবজাতির মধ্যে যার দ্বিতীয় তুলনা আর নেই। তিনি জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপনকারী একক মহত্ত্বের অধিকারী আর সে তুলনায় গোটা মানব সম্প্রদায় একান্তই হীন ও অক্ষম।[১৫১] দূর থেকে মানুষ তাঁকে ভয় করত কিন্তু নিকটসান্নিধ্যে এসে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। পৃথিবীতে যুগে যুগে অগণিত সমাজ সংস্কারক, মনীষী এসেছেন আবার চলেও গেছেন। আপন আপন কীর্তিতে অনেকে অনেক খ্যাতিও লাভ করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খ্যাতি, ভালবাসা ও আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তা তুলনাহীন, এই কীর্তি অন্য কারো ভাগ্যে কখনও জুটেনি আর ভবিষ্যতেও কারো ভাগ্যে জুটার কোনো সম্ভাবনা নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ সকলেই তাঁর সম্মুখে সব সময় বলতেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি ও আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক।"– এ কথা বলে তাঁরা রাসূলের সঙ্গে কথা বলতেন, এমন সম্বোধন আর কারো ভাগ্যে কখনও জুটেনি।

---

[১৫০] *প্রাগুক্ত।*

[১৫১] মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.। *তাফসিরে মারেফুল কুরআন*। প্রাগুক্ত। সূরা আরাফ।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম নবীর উপর ঈমান আনয়নের পূর্বে এক বিভীষিকাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে বসবাস করতেন যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ফলে মানুষ হিসেবে তাদের বেশিরভাগের কোনো সভ্যতার ধারক-বাহক হওয়া সম্ভবই ছিল না; ব্যতিক্রম হিসেবে দু'একজন ভাল মানুষ থাকলেও এর কোনো বিশেষত্ব ও অনুসরণযোগ্যতা ছিল না। কিন্তু তাদের যে-ই নবীকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছেন, এমনকি শুভ অন্তকরণে নবীর চেহারা অবলোকন করেছেন তিনিই অপবিত্র থেকে রাতারাতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র মানুষে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এর প্রমাণ পবিত্র কুরআন, হাদিস ও নির্ভেজাল ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। নদবী রহ. লেখেন, তাঁর আগমনে মানব হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের বিশুষ্ক ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হল এবং হৃদয় ও আত্মা তাঁর প্রতি এমন আকৃষ্ট হতে লাগল যেন চুম্বকের এক আকর্ষণ রয়েছে আর তৃষিত আত্মা তাঁরই প্রতিক্ষায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাকুল ছিল। তাঁর সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের এমন অনুপম প্রদর্শনী করেছে যার কোনো তুলনা হয় না। মূর্খতার কারণে যারা তাঁকে চিনতে না পেরে প্রাণপণ শত্রুতা করেছে তারাই চিনার পর তাঁর জন্য জান বাজি রেখেছে। বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের এমন সব ঘটনা ঘটেছে এবং সম্পদ, সন্তান, পরিবার ও আপন প্রাণ উৎসর্গ করার এমনসব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে যা এর পূর্বে কেউ দেখেনি। নিচের দৃষ্টান্ত থেকে এটি কিছুটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।[১৫২]

অপূর্ব প্রেম ও প্রাণ নিবেদন

মদীনা থেকে আগত লোকজন যখন আকাবায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে গেলেন তখন আসআদ ইবনে যুরার বললেন, হে ইয়াসরিবের লোকজন থামুন, আমরা উটের পিঠে আরোহণ করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর

---

[১৫২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত।*

রাসূল। তবে কথা হল, আজ যদি আপনারা তাঁকে এখান (মক্কা) থেকে নিয়ে যান তবে আরবের সকলেই আপনাদের শত্রুতে পরিণত হবে, আপনাদের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো নিহত হবে, তীক্ষ্ণ তরবারি আপনাদের গর্দান উড়াবে। এই অবস্থায় আপনারা যদি এই অঙ্গিকারে অবিচল থাকতে পারেন তাহলে তাঁকে নিয়ে যান, ফলশ্রুতিতে আল্লাহর নিকট সওয়াব পাবেন। আর যদি আপনারা নিজেদের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে থাকেন, তাঁর পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানে অক্ষমতার ভয় করেন, তবে তাঁকে রেখে যান। আল্লাহর কাছে ওজর পেশ করার জন্য এটিই হবে সহজতর।

উপস্থিত লোকজন বলল, হে আসআদ, তুমি সরে যাও, আমরা এই বায়আত ত্যাগ করব না এবং কষ্মিনকালেও এর বরখেলাপ করব না। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এর বিনিময়ে আমরা কী পাব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জান্নাত পাবে! তারা বলল, আমরা এতে খুশি ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু হাইছাম ইবনে তায়হান বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন তো হবে না যে সার্বিক বিজয় লাভের পর আপনি আমাদেরকে ছেড়ে আপনার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেন: "তোমাদের রক্ত আমার রক্ত। আমার জীবন তোমাদের জীবন, আমার ধ্বংস তোমাদের ধ্বংস। আমি তোমাদের তোমরা আমার। তোমরা যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আর তোমরা যার সঙ্গে সন্ধি করবে আমি তার সঙ্গে সন্ধি করব।"[১৫৩]

মক্কা নগরীতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁকে এমন শারীরিক নির্যাতন করা হয় যে তাঁর সমস্ত চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। অবর্ণণীয় নির্যাতনে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই খবর শুনে বনী তাইমের লোকজন এসে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যায়। বনী তাইম হারাম শরীফে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যে

---

[১৫৩] ইবনে হিশাম। ২০১৩। *সীরাতুন্ নবী (সা.)*। ২য় খণ্ড। ঢাকা:ইফা। পৃ. ১১৪; ইবনে কাসীর। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*। ৩য় খণ্ড। পৃ. ২৯৮।

এই নির্যাতনে যদি আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আমরা উহার প্রতিশোধস্বরূপ ওতবা ইবনে রবিয়াকে হত্যা করব। যেহেতু আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মারধরের ব্যাপারে ওতবা ইবনে রবিয়ার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অচেতন অবস্থায় ছিলেন। তাঁর বাঁচার আশা সকলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু খোদার মেহেরবাণীতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞান ফিরে পেলেন। সন্ধ্যার সময় হুশ ফিরে পেয়েই আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম কথা ছিল– আমার প্রিয় নবী কি অবস্থায় আছেন? কী অতুলনীয় নবীপ্রেম আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর!

উপস্থিত লোকদের অনেকে তাঁকে এই বলে তিরস্কার করতে শুরু করল যে যার জন্য এই মরনাপন্ন অবস্থা এখন জীবন ফিরে পেয়েই তাঁর নাম নিচ্ছ? আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এদেরকে কী বলবেন? কারণ তিনি তো সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আর এরা তো নবীকে চিনতে পারে নি! আবু বকরের মাতা ছেলের জন্য কিছু খাবার তৈরি করে আনলেন। কিন্তু নবী প্রেমিক আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মুখে একই কথা, আমার নবীর অবস্থা কি? তিনি কি ভালো আছেন? আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবরাখবর নিয়ে আসতে বললেন এবং সঙ্গে এই শপথ করলেন যে, আমার নবীকে না দেখা পর্যন্ত আমি কিছুই খাব না।

মা ছেলের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাতের আঁধারে আবু বকরকে নিয়ে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে পৌঁছলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁকে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ভালবাসার এই অশ্রু উপস্থিত সকলের চোখে অশ্রু জড়ালো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ চোখে দেখার পরই কেবল আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শান্ত হলেন এবং খাবার গ্রহণ করলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীজীকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইনি আমার মা, আপনি

তাঁর হিদায়াতের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহর রাসূল সেমতে দোয়া করলে আবু বকরের মাতা উম্মুল খায়ের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। রাতে অন্ধকারে মরুভূমির পথ ধরে চলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। আবু বকর একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যান, একবার পেছনে, আবার যান বামে আবার ডানে, এভাবে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পথ চলেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর, তুমি এমন করছ কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সামনে থাকলে আশঙ্কা হয় যদি শত্রু পেছন দিক থেকে আপনাকে আঘাত করে তাই পেছনে চলে যাই, তখন আশঙ্কা হয় যদি শত্রু সামন থেকে আঘাত করে তাই সামনে চলে যাই। আশঙ্কা হয় যদি ডান দিক দিয়ে আঘাত করে তাই আপনার ডান দিকে যাই, আবার আশঙ্কা হয় যদি বাম দিক থেকে আঘাত করে তাই বাম দিকে চলে যাই, আবু বকর জবাব দিলেন! অর্থাৎ, কিছু হলে আমি আবু বকরের হোক, কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন নিরাপদ থাকেন! অন্যান্য সাহাবীদের ক্ষেত্রেও এধরনের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

বনী নায্যারের একজন মহিলা সাহাবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বাপ-ভাই, স্বামী উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি উহুদে যেতে রাস্তায় বের হলেন। পথে একজন বললেন, যুদ্ধে তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন! তিনি শুনে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, বলুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তারপর আরেকজন তাঁকে সংবাদ দিল, আপনার ভাই শহীদ হয়েছেন, তিনি বললেন, আলহামদুল্লিাহ! বলুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তারপর তৃতীয় আরেকজন সংবাদ দিল, আপনার স্বামী যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তিনি বললেন, আলহামদুল্লিাহ! বলুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? এভাবে তিনি যাকেই দেখেন তাকেই জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা বলে, তিনি তেমন আছেন যেমন তুমি কামনা কর। তিনি বললেন, আমাকে দেখাও, নিজ চোখে তাঁকে দেখতে চাই। তিনি অতঃপর দেখলেন, আর বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার নিরাপধ থাকার পর সব বিপদই আমার কাছে তুচ্ছ!

হযরত খোবায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাঁকে যখন শূলে চড়ানো হল তখন কুরাইশরা উল্লাস ধ্বনিতে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি চাও যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার স্থানে হউক আর তোমাকে ছেড়ে দেই? বীরদর্পে খোবায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন– 'না, আল্লাহর কসম, না! আমি তো এমনও চাইব না যে আমার মুক্তির জন্য তাঁর পায়ে সামান্য কাঁটা বিধুঁক।' লোকজন তাঁর কথায় উপহাস শুরু করল আর আবু সুফিয়ান (কাফির অবস্থায়) বলে উঠল, আল্লাহর কসম, কেউ কাউকে এমন ভালবাসতে আমি দেখিনি যেমন মুহাম্মদের সঙ্গীরা তাঁকে ভালবাসে।

হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদের দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাদ বিন রাবীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খোঁজ নিতে পাঠালেন এবং আদেশ করলেন, তাঁকে পেলে আমার সালাম বলবে আর বলবে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, নিজেকে তুমি কী অবস্থায় পাচ্ছ? হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিহতদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তীর তলোয়ারের অসংখ্য আঘাতে তিনি তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন। আমি তাঁকে বললাম, হে সাদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম বলেছেন, আর বলেছেন, আমাকে জানাও, নিজেকে তুমি কী অবস্থায় পাচ্ছ? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলকে আমার সালাম বল আর বল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' অতঃপর এক অমর বাণী ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, আর আমার আনসারী কাওমকে বলবে, 'যদি তোমাদের একজনেরও চক্ষু খোলা থাকে, অথচ আল্লাহর

রাসূলের কিছু হয় তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনই কৈফিয়ৎ থাকবে না।' একথা বলেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

উহুদের যুদ্ধে শত্রুরা যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল তখন আবু দুজানা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে (রাসূলের সম্মানের কারণে) মুখ করে ঢাল হয়ে গেলেন, তীর এসে তাঁর পিঠে বিঁধতো। তিনি ভাবলেন, 'আমার পিঠ ঝাঁঝরা হোক আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ থাকুন।'

উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের আঘাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত হলেন। হযরত মালিক আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের রক্ত চুষে নিচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থুথু করে রক্তটা ফেলে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি থুথু ফেলব না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নবীর রক্ত যার শরীরে মিশে যায় তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর একদিন আবু সুফিয়ান মদীনায় এলেন এবং আপন কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ঘরে গেলেন। তিনি যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসতে গেলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে উম্মে হাবীবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বিছানা গুটিয়ে ফেললেন। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে বললেন, হে কন্যা, জানি না বিছানাকে আমার অনুপযুক্ত ভেবেছ, না আমাকে বিছানার! উম্মে হাবিবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'এটি আল্লাহর রাসূলের বিছানা, আর আপনি নাপাক, মুশরিক।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো সাহাবী ঘরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসতেন

আর বলতেন 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে না দেখে থাকতে পরি না! এক সাহাবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নিজের শিশু সন্তানকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই যে আমার আদরের সন্তান, তাকে আপনি যুদ্ধে নিয়ে যান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই শিশু তো যুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। সাহাবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি তা জানি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে এজন্য নিয়ে এসেছি যে, যুদ্ধে শত্রুরা না জানি আপনাকে কত তীর নিক্ষেপ করবে, তখন আমার এই সন্তানকে আপনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করুন যাতে আপনার পবিত্র শরীরে কোনো তীর না বিঁধে!

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উরওয়া ইবনে মাসউদ কাফিরদের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে এসেছিলেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি কাফিরদের লক্ষ করে বলেছিলেন, "আমি বড় বড় রাজা-বাদশাদের দরবারে প্রতিনিধি ও দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। কিসরা, কায়সার, নাজ্জাসীর দরবার দেখেছি। আল্লাহর কসম, আমি কোনো রাজা-বাদশার দরবারে কাউকে রাজা-বাদশাদেরকে এত সম্মান করতে দেখিনি যেমনভাবে মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসারীরা তাদের নবীকে করতে দেখেছি। তিনি কোনো হুকুম করলে তা পালনের জন্য প্রত্যেকেই এমনভাবে দৌড়ে আসে যেন পরস্পরে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। তিনি অযু করেন আর লড়াই শুরু হয়ে যায় অযুর পানি গ্রহণ করার জন্য। তিনি যখন কথা বলেন তখন নিস্তব্ধ নীরবতা নেমে আসে। তাঁর আজমত ও মহত্বের কারণে সৃষ্ট আদবের প্রাবল্যের ফলে তাঁর প্রতি তারা দৃষ্টি উঠিয়ে তাকাতেও পারে না।"[১৫৪]

তুলনাহীন আনুগত্য

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিংবা তাঁর প্রবর্তিত বিধি-বিধানের প্রতি এমন আনুগত্য উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি সাধারণত দুনিয়ার

---

[১৫৪] ইবনে কাসীর। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*; হাফিজ ইবনে কায়্যিম। *যাদুল মাআদ*।

শাসকদের প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়, বরং এমন আনুগত্যই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ, অন্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা এতো অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর আনুগত্য-অনুসরণে মানবসত্তা বাধ্য হয়ে যায়।[১৫৫] আমরা দেখিয়েছি, এমন শ্রদ্ধাবোধ ও পবিত্র ভালবাসার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। সুতরাং, উপরোক্ত সাধারণ সমীকরণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ এমন ছিল যা আজকের যুগের মানুষের পক্ষে বুঝে উঠাও অনেক দূরূহ। ঐ আনুগত্য ছিল এক কথায় বিস্ময়কর এবং অপূর্ব। কিছু দৃষ্টান্ত কেবল উপস্থাপন করা যেতে পারে।

মুসলমানদের সংখ্যা যখন ছিল হাতে গোনা, ঘোড়া, হাতি, অস্ত্রও তেমন ছিল না তেমন প্রবল বিরূপ সময়েই বদর যুদ্ধের আবশ্যিকতা দেখা দিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ করছিলেন। বাস্তবতা বিচারে স্বাভাবিকভাবেই তিনি খুব চিন্তান্বিত ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তা দেখে হযরত সাদ ইবনে মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন:

فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ،

"... সেই সত্তার কসম করে বলছি, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন তাহলে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিও এর থেকে পেছনে থাকবে না...।"[১৫৬]

---

[১৫৫] মুফতি মুহাম্মদ শফি। *তাফসিরে মারেফুল কুরআন*। *প্রাগুক্ত*।
[১৫৬] বুখারী।

আরেক সাহাবি হযরত মিকদাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন:

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ} وَلَكِنِ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ ، «فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

"ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা মুসার কওমের মতো কখনই বলব না যে, মুসা, তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা বলব, আপনি ও আপনার প্রভু যুদ্ধ করুন এবং আমরাও আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আমরা আপনাদের ডানে-বায়ে, সামনে-পিছনে থেকে যুদ্ধ করব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি সে সময় অত্যাধিক আনন্দে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা চমকে উঠতে দেখি।"[১৫৭]

তাবুকের গাযওয়া থেকে পিছিয়ে থাকা তিন জনের সঙ্গে যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতে নিষেধ করলেন তখন সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম তা এমনভাবে পালন করলেন ফলে শাব্দিক অর্থেই মদীনা ঐ তিন জনের জন্য হয়ে গেল কবরের নীরবতা সদৃশ। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে না, কেউ তাঁদেরকে একটুও ডাকা এমনকি ইশারা-ইঙ্গিতও করে না, কোনো সাড়াও দেয় না। পরবর্তীতে তিনজনের একজন হযরত কাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, 'যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করলেন। ব্যস, লোকেরা আমাদের সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে লাগল এবং সবকিছু আমাদের জন্য অন্যরকম হয়ে গেল।

এই জমিন আমাদের জন্য হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অশান্তিময়। এ যেন আমাদের পরিচিত সেই প্রিয় ভূমি নয়। মানুষের উপেক্ষা যখন আমার জন্য অসহনীয় দীর্ঘ হয়ে গেল তখন একদিন আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকে ভেতরে

---

[১৫৭] বুখারী : বদর যুদ্ধ।

ঢুকলাম। সে ছিল আমার চাচাতো ভাই এবং আমার অন্যতম প্রিয় মানুষ। তাকে সালাম দিলাম, আল্লাহর কসম, সে কোনো জবাব দিল না। আমি বললাম, হে আবু কাতাদা, আল্লাহর দোহাই দিয়ে জানতে চাই, তুমি কি জানো যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? সে নীরব, আবার দোহাই দিলাম, সে নীরব। তৃতীয়বার সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল জানেন। তখন আমার চোখে অশ্রুর ঢল নামল এবং আমি আবার দেয়াল টপকে বের হয়ে এলাম। এক সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহক হযরত কাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এসে জানালেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে স্ত্রী থেকে পৃথক হওয়ার আদেশ করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তালাক দেব না কী করব? জানানো হল, শুধু পৃথক থাকুন কাছে যাবেন না। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও, এ বিষয়ে আল্লাহর কোনো ফয়সালা না আসা পর্যন্ত সেখানেই থাক।'

এই ঘটনায় গাস্সানের বাদশাহ তাঁকে প্ররোচণা ও সান্ত্বনা দিয়ে তার কাছে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। এ ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু হযরত কাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতো ভালবাসতেন তাই তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর নিজের ভাষায়: মদীনার বাজারে হাঁটছি, এমন সময় সিরিয়াবাসী এক লোক যে মদীনায় খাদ্যপন্য বিক্রি করতে এসেছে, বলতে শুনলাম, কে আমাকে কাব ইবনে মালিকের খোঁজ দেবে? লোকেরা আমাকে দেখিয়ে দিল আর সে কাছে এসে গাস্সানের বাদশার এক পত্র আমাকে দিল। তাতে লেখা আছে– আমি জানতে পেরেছি তোমার মনিব তোমার প্রতি বিরূপ আছেন। আল্লাহ তো তোমাকে হীনতা ও বঞ্চনার ভূমিতে থাকার জন্য সৃষ্টি করেন নি। সুতরাং আমার কাছে চলে এসো, যোগ্য সমাদর পাবে। আমি ভাবলাম, এ তো আরেক ফিৎনা (পরীক্ষা)। তাই পত্রটি চুলায় নিক্ষেপ করলাম।[১৫৮]

---

[১৫৮] মুত্তাফাকুন আলাইহি; আবু-দাউদ।

আদেশ পাওয়ামাত্র আনুগত্য করার আরেকটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত হল মদ নিষিদ্ধ হওয়ার। হযরত আবু বোরায়দা তার আব্বা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, শরাবের মজলিসে আমরা শরাব পানে বিভোর ছিলাম। এক সময় আমি উঠলাম যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির হয়ে সালাম পেশ করব। এরই মধ্যে মদ হারাম হওয়ার এই আয়াত নাযিল হল:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ, মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক শর এসব শয়তানের কাজ ছাড়া কিছু নয়, অতএব, এগুলো পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারে। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা কি (মদ হতে) নিবৃত্ত হবে?" (মায়িদাহ : ৯১)

তখন আমি বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে ঐ আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনালাম। বর্ণনাকারী বলেন, কেউ কেউ পানরত ছিল, কিছুটা মুখে, কিছুটা ঠোঁটে, কিছুটা পেয়ালায়, এমন অবস্থা! তো তারা মুখ, ঠোঁট এমনকি গলা থেকে মদ উগড়ে ফেলে দিল, পেয়ালার মদ উপুড় করে ফেলে দিল আর বলতে লাগল- বিরত হলাম ইয়া রব, বিরত হলাম! অথচ, কিছুক্ষণ পূর্বেও মদ ছিল তাঁদের নিত্য জীবন-সঙ্গী?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিঃশর্ত আনুগত্যের আরেকটি ঘটনা মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর। ইবনে জরীর রহ. তাঁর নিজস্ব সনদে ইবনে যায়দ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, তুমি কী শুনেছ তোমার পিতা কি বলেছে? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার প্রতি আমার মা-বাবা কুরবান, কী বলেন তিনি? তিনি বললেন, সে বলে, 'যদি

আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তখন অবশ্যই অভিজাত লোকেরা সেখান থেকে ইতর লোকদের বের করে দেবে।' আবদুল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অবশ্যই সে সত্য বলেছে। আল্লাহর কসম, আপনিই অভিজাত আর সে-ই যলীল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো মদীনায় এসেই পড়েছেন। তাহলে ইয়াছরিব জানে যে, তাদের মধ্যে আমার চেয়ে পিতানুগত কেউ নেই। তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যদি সন্তুষ্ট হন যে আমি তার মাথা কেটে আনি, তাহলে আমি অবশ্যই তার মাথা হাযির করব। তিনি বললেন, না, এটা কর না।

যখন লোকেরা মদীনায় উপনীত হল তখন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদীনার প্রবেশ পথে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে তাঁর পিতাকে বললেন, তুমিই কি বলেছ, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তখন অবশ্যই অভিজাত লোকেরা সেখান থেকে যলীল লোকদের বের করে দেবে? আল্লাহর কসম, এখনই তুমি জানতে পারবে যে, মর্যাদা তোমার জন্য নাকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য! আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া তুমি মদীনায় তোমার ঘরের ছায়া পর্যন্ত পাবে না।

মুনাফিক উবাই চিৎকার করে বলতে লাগল, হে আহলে খাযরাজ, দেখো, আমার পুত্র আমাকে ঘরে যেতে বাধা দেয়! হে আহলে খাযরাজ, দেখো, দেখো আমার পুত্রের কাণ্ড! লোকেরা তাঁকে বুঝালো, কিন্তু তাঁর একই কথা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। লোকেরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘটনা অবগত করল। তিনি বললেন, গিয়ে বল, সে যেন তাকে আসতে দেয়। লোকেরা এসে তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান শুনাল। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ যখন এসেছে তখন ঠিক আছে।[১৫৯]

---

[১৫৯] *তাফসীরে তাবারী।* *প্রাগুক্ত।*

আদর্শ মানুষ, আদর্শ সমাজ

আল্লাহর ওহি আল-কুরআন ও মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একনিষ্ঠ অনুসরণে, অনুকরণে এভাবে গড়ে উঠল এক আদর্শ সমাজ। সমস্ত জেহালতকে অন্তরে-বাহিরে পরিত্যাগ করে গড়ে উঠল নতুন মানুষ, নতুন জাতি, নতুন সমাজ– আগে ও পরে যার কোনো তুলনা নেই। যারা ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত এখন তাঁরাই বিশ্বকে আলো দিয়ে পথ দেখাতে লাগলেন। আল-কুরআনের ভাষায়:

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

"যারা মৃত ছিল, অনন্তর আমি তাদেরকে জীবন দান করলাম এবং তাদের নূর দান করলাম, যা দ্বারা তারা মানব সমাজে পথ চলতে লাগল, তারা কি হতে পারে ঐ ব্যক্তির মতো যে হারিয়ে গেছে বিভিন্ন অন্ধকারে, আর তা থেকে বের হতেই পারছে না। এমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।" (আনআম : ১২২)

অল্প সময়েই এমন সব ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হল, ইতিহাস স্বাক্ষী, যারা সত্যিকার অর্থেই ছিলেন ইতিহাসের মহাবিস্ময় ও মানবতার অমূল্য সম্পদ। কিছু নমুনা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, আরো কিছু নিচে উল্লিখিত হচ্ছে। নদবী রহ. বড়ো চমৎকারভাবে এমন কিছু বিবরণ লিখে গিয়েছেন, সেখান থেকে উল্লেখ করছি[১৬০]:

উমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি বকরী পাল চরাতেন। মরুভূমির প্রচণ্ড রোধ থেকে বাঁচতে উটের পিছে দাঁড়াতেন আর উট তার গায়ে মলমূত্র ত্যাগ করত। এমন আহাম্মকির জন্য পিতার কাছ থেকে অকর্মন্য, অপদার্থ ইত্যাদি তিরস্কার শুনতেন। শক্তি, মর্যাদা ও আভিজাত্যে যিনি কুরায়শের মধ্যস্তরের ছিলেন,

---

[১৬০] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২০০-২০২।

সমাজে সমবয়সীদের মধ্যে যার আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। সেই সাধারণ উমর হঠাৎ সারা বিশ্বকে আপন প্রতিভা, যোগ্যতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাক লাগিয়ে দিলেন; সমকালীন দুই পরাশক্তি কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্য তছনছ করে তাদের রাজমুকুট ছিনিয়ে আনলেন এবং এমন এক ইসলামি সালতানাত গড়ে তুললেন যা যুগপৎ উভয় সাম্রাজ্যের উপর বিস্তৃত, অথচ সুশাসন ও সুব্যবস্থায় উভয় সাম্রাজ্যের উর্ধ্বে যার অবস্থান। অন্যদিকে তাকওয়া ও ধার্মিকতা এবং ইনছাফ ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তো তুলনার কোনো প্রশ্নই আসে না, এমনকি সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মধ্যেও এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট।

খালিদ বিন ওয়ালিদ, জাহিলী যুগে কী ছিলেন? খুব বেশি হলে কুরায়শের উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক যুবক, স্থানীয় ও গোত্রীয় যুদ্ধে যার যথেষ্ট খ্যাতি। সেই সুবাদে গোত্র ও গোত্রপতির কাছে আলাদা কদর আছে, কিন্তু এই গণ্ডি পেরিয়ে আরব উপদ্বীপেও তার বিশেষ কোনো পরিচিতি নেই। সেই সাধারণ এক যোদ্ধা খালিদ থেকে হয়ে গেলেন খালিদ সাইফুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, 'আসমানী তলোয়ার' হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে এমন ঝলসে উঠলেন, যা সামনে আসে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, যাকে প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো ছিল না। এই খোদায়ী তলোয়ার অদ্বিতীয় বিশ্ব পরাশক্তি অত্যাচারী রোমান সাম্রাজ্যের উপর বিজলী হয়ে এমন চমকালো যে, ইতিহাসের দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ছড়িয়ে থাকল শুধু তারই খ্যাতি ও সুখ্যাতি।

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, যার সততা, বিশ্বস্ততা ও কোমলতার প্রশংসা ছিল, ছিল গোত্রে ক্ষুদ্র বাহিনী পরিচালনার অভিজ্ঞতা, এই পর্যন্তই। হঠাৎ তিনি হয়ে উঠলেন আমীনুল উম্মাহ! উম্মতের বিশ্বস্ততম ব্যক্তি! মুসলমানদের বৃহত্তম বাহিনী পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হল তাঁর উপর আর তিনি এমন বিস্ময়কর যোগ্যতার পরিচয় দিলেন যে, রোমক বাহিনী তাঁর সম্মুখে ঠিকতে না পেরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এমনকি সমগ্র সিরিয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটল, আর বিদায়কালে রোমসম্রাট হেরাক্লিটাস সিরিয়ার

উপর অসহায় দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, 'হে সিরিয়া, তোমাকে বিদায়ী সালাম, এমন বিদায় যার পর নেই কোনো মিলন।'

আমর ইবনুল আস, কুরাইশে যার বুদ্ধির খ্যাতি ছিল, কিন্তু তার কীর্তি শুধু এই যে, হাবশার রাজদরবারে দূতরূপে গিয়েছেন হিজরতকারী মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় অত্যাচারের জালে বন্ধি করতে, ফিরেছেন ব্যর্থতার লজ্জা নিয়ে। ইসলাম গ্রহণের পর সেই তিনি হলেন ফাতিহে মিসর, মিসর বিজয়ী এবং অখণ্ড ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ইাসলামপূর্ব জীবনে যার বড় কোনো যুদ্ধের খবর কেউ জানে না, সেই তিনি হয়ে গেলেন কাদেসিয়ার বিজয়ী বীর। এমনই বীর যিনি 'বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহিম' বলে ঘোড়ায় চড়ে গোটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্থাল তরঙ্গ বিধৌত দজলায় নেমে গিয়েছিলেন আর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এমনভাবে পানির উপর দিয়ে দজলা পার হলেন যে, পারসিকরা দেখে বলেছিল, দানব! দানব! পালাও পালাও! মাদায়েনের চাবি শোভা পেল তাঁর হাতে। ইরাক ও ইরানকে ইসলামি সালতানাতের সবুজ মানচিত্রে অন্তর্ভূক্ত করে পেলেন 'ফাতিহে আযম'- এই অনন্য উপাধি।

সালমান ফারসী, যিনি ছিলেন পারস্যের এক বস্তির অগ্নিপূজারী ধর্মীয় নেতার পুত্র। নিজের এলাকার বাইরে যার কোনো পরিচিতি ছিল না। তিনি পারস্য থেকে বের হলেন আর দাসত্বের পর দাসত্ব, বিপদের পর বিপদ বরণ করে অবশেষে মদীনায় এলেন এবং আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে খ্রিস্টান পাদ্রীদের বর্ণনার প্রমাণ নিজ চোখে অবলোকন করে ইসলাম গ্রহণ করলেন আর স্বদেশভূমি পারস্যের রাজধানী মাদায়েনের আমীর ও প্রশাসক হলেন! গতকালের সাধারণ এক প্রজা আজ তিনি শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিকারী শাসক! তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এমন শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁর তাকওয়া ও ধার্মিকতায় এবং নির্মোহতা ও অনাড়ম্বরতায় আসেনি সামান্যতম কোনো পরিবর্তন। পারস্যের বিমুগ্ধ মানুষ

অবাক হয়ে দেখে, তাদের শাসক ঝুপড়িতে বাস করেন এবং বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারে আসা যাওয়া করেন।

হাবশী দাস বিলাল, যার কোনো মূল্য ছিল না এমনকি বেচাকেনার বাজারেও। ইসলামের ঝর্ণালোকে স্নাত হয়ে গুণ ও যোগ্যতায় এবং সততা ও ধার্মিকতায় তিনি এমন উচ্চস্তরে উপনীত হলেন যে, হয়ে গেলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, এমনকি মক্কা বিজয়ের পর ক্বাবার ছাদে উঠে আযান দেওয়ার অবিস্মরণীয় সৌভাগ্য অর্জন করলেন। আমিরুল মুমিনীন উমর উবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত তাঁকে 'আমাদের সর্দার' বলে সম্মোধন করতেন।

আবু হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন সালিম, আরব জাহেলিয়াতে যার আলাদা কোনো পরিচয় ছিল না। ইসলাম তাঁকে এমনই সুউচ্চ মর্যাদায় বরণ করল যে, খলীফা উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহনেরও উপযুক্ত মনে করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম যদি বেঁচে থাকত তাহলে তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে যেতাম।'

যায়েদ ইবনে হারিছা, যিনি এক কাফেলা থেকে লুণ্ঠিত হয়ে দাস বাজারে বিক্রি হয়েছিলেন। তিনি-ই মুতার যুদ্ধে ছিলেন মুসলিম সেনাবাহিনীর সেনাপতি যেখানে ছিলেন জাফর বিন আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতো অভিজাত কুরাইশ বীর। আর তাঁর পুত্র উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এমন আরেক বাহিনীর প্রধান যাতে ছিলেন আবু বকর ও উমর- এর মতো সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা।

আবু যর, আল মিকদাদ, আবুদ্-দারদা, আবু হুরায়রা, আবু আইয়ুব আনসারী, আম্মার বিন ইয়াসির, মুয়াজ ইবনে জাবাল, উবাই বিন কাব এরকম– জাহিলী যুগের অসংখ্য সাধারণ মানুষগুলোর উপর দিয়ে যখন ইসমলামের সুরভিত বায়ু প্রবাহিত হল, তাঁরা হয়ে গেলেন যুহদ ও তাকওয়ার আদর্শ এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)

আলী ইবনে আবু তালিব, আয়েশা বিনতে আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়দ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এরকম অনেকে উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়ে প্রত্যেকে হয়ে গেলেন মুসলিম উম্মাহর এমন জ্ঞানের মশাল যে আলোতে উদ্ভাসিত হল সারা বিশ্ব। তাঁদের আত্মা থেকে প্রবাহিত হল ইলমের এমন ঝরনাধারা এবং যবান থেকে নিঃসৃত হল হিকমত ও প্রজ্ঞার এমন অমীয় বাণী যার কোনো তুলনাই চলে না। (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)

এভাবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, নদবী রহ- এর ভাষায়: এক কথায় তাঁদের পরিচয় হল, হৃদয়ের দিক থেকে মানব সমাজে পবিত্রতম, ইলম ও প্রজ্ঞার দিক থেকে গভীরতম এবং লৌকিকতার দিক থেকে সহজতম। তাঁরা যখন কথা বলতেন, যামানা নিশ্চুপ হয়ে শুনত এবং ইতিহাসের কলম তা লিখে রাখত।[১৬১]

সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাতের এমন ঈমান, তাকওয়া, আল্লাহর পথে বীরত্ব প্রভৃতি যাবতীয় গুণাবলির জন্য তাঁরা কুরআন-হাদিসে নানাভাবে প্রশংসিত হয়েছেন, তাঁদের ঈমানকে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের ঈমান-আমলের মাপকাঠি বানিয়ে দিয়েছেন। যেমন:

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝

"তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন, তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন, পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।" (হুজরাত: ০৭)

---

[১৬১] *প্রাগুক্ত* / পৃ. ২০২।

লক্ষ করুন সাহাবিগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে আল্লাহর কী অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ কুরআনে ব্যক্ত হয়েছে, সুবহানাল্লাহ্।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন, তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন, তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে। তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে- চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে- যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।" (ফাতাহ : ২৯)

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহা সাফল্য।" (তাওবাহ: ১০০)

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ... ۝

"অতএব তারা (কিয়ামত পর্যন্ত আগত যে কোনো মানুষ) যদি ঈমান আনে, তাঁদের (সাহাবীদের) ঈমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে..... ।" (বাকারা: ১৩৭)

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ط لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

"যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে শোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (হুজুরাত: ৩)

কী সৌভাগ্য যে, এই আয়াতের উপর সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ছাড়া অন্য কারো আর কোনোদিন আমল করার সৌভাগ্য হবে না।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

"কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে তাকওয়া অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (ফাতাহ : ২৬)

সাহাবিদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে এরকম অনেক আলোচনা কুরআনে রয়েছে। এবার হাদিস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

"হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ ও জামাত আমার (গঠিত) যুগ ও জামাত (তথা আমার ছাহাবীগণের যুগ)। তার পর ঐ যুগ সংলগ্ন যুগ (অর্থাৎ ছাহাবীদের হাতে গঠিত তাবেয়ীনের যুগ ও জামাত)। তার পর এই দ্বিতীয় যুগ সংলগ্ন তৃতীয় যুগ (অর্থাৎ তাবেয়ীনের হাতে গঠিত তবে-তাবেয়ীনের যুগ ও জামাত)। এই যুগটির উল্লেখ রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন কি না সে সম্পর্কে বর্ণনাকারী সন্দিহান রয়েছেন। এই সব উত্তম যুগ চলে যাবার পর এমন যুগের সৃষ্টি হবে যে, লোকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও পরিণামের চিন্তা মোটেই থাকবে না...।[১৬২] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: মানব সমাজের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ আমার (গঠিত) সমাজ ও যুগ, অতপর যে যুগ তার সংলগ্ন, তার পর যে যুগ এই দ্বিতীয় যুগের সংলগ্ন। তার পর এমন লোকগণ সৃষ্টি হবে যাদের মধ্যে দীন ও শরীয়তের মোটেই কোনো প্রভাব মর্যাদা থাকবে না...।[১৬৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ"

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সাবধান, সাবধান! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিও। খবরদার, খবরদার! আমার পরে আমার সাহাবীদেরকে তোমরা সমালোচনার পাত্রে পরিণত কর না। যে কেউ আমার সাহাবীদেরকে ভালোবাসবে সে আমাকেই ভালোবাসল; আর যে কেউ তাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে তা আমার প্রতি পোষণ করা গণ্য হবে। যে কেউ তাঁদেরকে ব্যথা দিবে সে ব্যথা আমাকেই দেওয়া হবে, আর যে আমাকে ব্যথা দিবে সে যেন আল্লাহকে ব্যথা দিল এবং যে আল্লাহকে ব্যথা দিবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করবেন।"[১৬৪]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ আমাকে বাছাই করেছেন (নবীগণের শ্রেষ্ঠরূপে), আমার সাহাবীগণকেও বাছাই করেছেন

---

[১৬২] বুখারী : ১৮১৩।
[১৬৩] বুখারী : ১৮১৪।
[১৬৪] তিরমিযী।

(নবীর পরে সমগ্র মানব শ্রেষ্ঠরূপে)। তাদেরকে আমার এত ঘনিষ্ঠ বানিয়েছেন যে, আমার শ্বশুর, জামাতা সব তাদের মধ্য হতেই বানিয়েছেন এবং তাদেরকে আমার সাহায্যকারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। হে আমার উম্মতগণ, আমার পরে এমন এক শ্রেণির লোক সৃষ্টি হবে যারা আমার সাহাবীদের প্রতি সম্মানহানীকর কথা উচ্চারণ করবে। সাবধান, সাবধান! এই শ্রেণির লোকদের মেয়ে তোমরা বিয়ে করবে না এবং তাদের নিকট তোমাদের মেয়ে বিয়ে দিবে না। তাদের সঙ্গে তোমরা নামাজ পড়বে না, তাদের জানাযাও পড়বে না। এদের উপর আল্লাহর লানত।"[১৬৫]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا تسبوا أحدا من أصحابي ﷺ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه

অর্থাৎ, "হে আমার ভবিষ্যৎ উম্মত, তোমরা আমার কোনো সাহাবীকে মন্দ বলিও না; তোমরা যদি উহুদ পরিমাণ সোনাও দান-খয়রাত করো তাহলেও তাদের কোনো একজনের মাত্র এক মুদ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) পরিমাণ যবের সমানও হবে না।"[১৬৬]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ : الْجَمَاعَة

وفي رواية: قيل: فمن الناجية ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي

অর্থাৎ, "মুসার উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল, আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে এক দল জান্নাতী, বাকি সবাই জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হল, তারা

[১৬৫] মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী।
[১৬৬] মুত্তাফাকুন আলাইহি।

কে? বললেন, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মত-পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"[১৬৭]

প্রখ্যাত তাবেঈ আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. জ্ঞান শিখেছিলেন আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীর কাছ থেকে। যেমন উস্তাদ তেমন শিষ্য। কুফার একজন বিশিষ্ট আলিম ও আবিদ মুহাম্মদ ইবনে সুকাহ তাঁর দর্শনার্থীদেরকে বর্ণনা করেন, একদিন ইবনে রাবাহ রহ. আমাকে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমাদের পূর্বসুরীগণ [সাহাবায়ে কেরাম রা] শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাই বলতেন ও শুনতেন। অপ্রয়োজনীয় কথা তাঁরা মোটেও পছন্দ করতেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে চাচা, তাঁদের মতে 'প্রয়োজনীয়' ও 'অপ্রয়োজনীয়' বিষয় দু'টোর একটু ব্যাখ্যা দিবেন কি?

ইবনে রাবাহ বলেন, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় কথা ছিল পাঁচ ধরনের- ১. কিতাবুল্লাহ্‌র তিলাওয়াত ও তার আলোচনা, ২. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের রিওয়ায়াত ও তার আলোচনা, ৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, ৪. ইলমের আলোচনা এবং ৫. জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় কথা। এগুলো ছাড়া আর সবই ছিল তাঁদের কাছে অপ্রয়োজনীয়।[১৬৮] এরপর তিনি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কি কুরআনের এসব আয়াত অস্বীকার করবে– 'অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে, সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।' (ইনফিতার : ১০-১১)

---

[১৬৭] মিশকাত।

[১৬৮] আব্দুর রহমান রাফাত পাশা। ২০১৪। *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন*। মাসউদুর রহমান অনু.। ঢাকা : রাহনুমা প্রকাশনী। পৃ. ২১-২২।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাত একইসঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে এবং নফসের বিরুদ্ধে- নিরন্তর এই দু'ই জিহাদের মাধ্যমে এমন-ই আলোকিত মানুষে রুপান্তরিত হয়েছিলেন ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব জগতের পদ-পদবী, সম্পদ, এমনকি নিজের সন্তান ও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া তাদের জন্য খুব সহজ হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন লক্ষ্যে কুরআনের এমন এমন বাণী অবতীর্ণ হত যা তাঁদের আচার-অভ্যাসের অনুকূল ছিল না এবং এতে তাঁরা অভ্যস্থও ছিলেন না। কখনও তাঁদের জানের ওপর, কখনও মালের ওপর, কখনও সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে এমন আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হত যা পালন করা শুধু কঠিনই ছিল না, বরং অসম্ভবও ছিল। কিন্তু ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাঁরা সেসব আদেশ-নিষেধ অম্লান বদনে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাত ছিলেন মানবজাতি বা মানবসভ্যতার প্রয়োজনের সকল দিকে পরিপূর্ণ ও সুসম্পূর্ণ। কোথাও কোনো খুঁত নেই এবং কমবেশি করার সুযোগ নেই। বিশ্বের কাছে তাদের নেই কোনো প্রয়োজন, অথচ তাদের কাছে বিশ্বের রয়েছে অনিবার্য প্রয়োজন আর তা সর্ব-বিষয়ে।[১৬৯] এই নতুন মানবগোষ্ঠী এমন এক সরকার ও রাষ্ট্র, শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন যাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সভ্যতার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। সমকালীন কোনো জাতি, রাজা ও রাজ্যের কাছ থেকেও কোনো মেধা ও মানুষ তাঁরা ধার করেননি। সম্পূর্ণ আত্মশক্তি ও আত্মযোগ্যতায় তাঁরা এমন সভ্যতা গড়ে তুললেন যা বিস্তৃত ছিল দুই মহাদেশের বিশাল এলাকায়। আর তাঁদের দেখিয়ে দেওয়া আদর্শে যতদিন মানুষ অবিচল ছিল ততদিন তারাও এই সভ্যতা নিয়ে রাজত্ব করেছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। প্রতিটি স্থান এমন সব মানুষ দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল যারা যোগ্যতা ও ধার্মিকতায় ছিলেন অপূর্ব সুষম মানব কাফেলা।

---

[১৬৯] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২০৩।

এই বিশাল-বিস্তৃত সাম্রাজ্য পরিচালনা ও রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বোচ্চ যোগ্যতার অসংখ্য মানুষের। অথচ এই উম্মতের উদ্ভবের এটি ছিল শিশুকাল আর সেটিও পার হয়েছে কেবল প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা এবং জিহাদ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেল, নব-আবির্ভূত উম্মাহ কীভাবে সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসনযন্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে কেমন যোগ্যতম মানুষ সরবরাহ করেছে। বিশ্ব দেখেছে আদর্শ শাসক ও প্রশাসক, সুদক্ষ পরিচালক ও ব্যবস্থাপক, বিশ্বস্ত কোষাগার রক্ষক, ন্যায়পরায়ন বিচারক, সুদক্ষ সেনাপতি ও একনিষ্ঠ সৈনিক। সর্বোপরি ধার্মিকতা ও সাধুতায় এবং সরলতা ও উদারতায় অতুলনীয়। আল্লাহর আযমত, পরকালের শাস্তি ও জবাবদিহিতার ভয় তাঁদের অন্তরে এমনই বদ্ধমুল হয়েছিল যে, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, রাজত্ব কোনো কিছুই তাদের পরকালের সাফল্যের প্রতিযোগিতায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। আল-কুরআনের ভাষায় তাঁদের যথার্থ পুরষ্কার:

رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'

এ এমন সন্তুষ্টি যার পরে কোনো অসন্তুষ্টি নেই।[১৭০]

আলোর উৎস : সমুজ্জ্বল কিতাব সমুজ্জ্বল নূর

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও সোহবতে এমন এক আলোকিত সমাজ নির্মিত হয়েছিল, এক অভিনব বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, মানব ইতিহাস যার দ্বিতীয় নমুনা আজও দেখাতে পারে নি। এই বিপ্লবের মূল শক্তি বা উৎস ছিল একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ, অর্থাৎ আল্লাহর ওহি আল-কুরআন

---

[১৭০] ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.। ২০১৫। *খুতুবাতে হাকিমুল ইসলাম*। ৭ম খণ্ড। ঢাকা:বইঘর। পৃ. ১৯৭-২০০; বিশেষভাবে দেখতে পারেন: মাওলানা ইউসুফ কান্দলভী রহ. রচিত *হায়াতুস্ সাহাবা*, মাওলানা যাকারিয়া রহ. রচিত *হেকায়াতে সাহাবা* ইত্যাদি গ্রন্থ।

এবং দ্বিতীয়ত, একটি সমুজ্জ্বল জ্যোতি, অর্থাৎ এর শিক্ষক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুরআনে সেদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

"তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল কিতাব।" (মায়েদা:১৫)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি সম্পন্ন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। ফলে কিতাব বর্তমান থাকলেও তিনি দেহসত্তায় বর্তমান নন। তিনি যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের, সকল মানুষের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলে এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শের অনুসরণই হবে তাঁকে অনুসরণ। ইসলামের মূল উৎস ও শক্তি হল কিতাবুল্লাহ্ অর্থাৎ, আল্লাহর কালাম আল-কুরআন এবং রিজালুল্লাহ্ অর্থাৎ, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা আদর্শ। ইবনে ইসহাক বলেন, বিদায় হজ্বের ভাষণে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কুরআন ও আমার সুন্নাহ রেখে যাচ্ছি, এ দু'টি আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না।[১৭১] পরবর্তী তথ্য-উপাত্তে দেখা যাবে, পৃথিবীতে আল-কুরআন একমাত্র অবিকৃত আল্লাহর বাণী বা ধর্মগ্রন্থ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। ফলে সর্বকালে একমাত্র এগুলোর অনুসরণের ওপরই বিশ্ববাসীর ইহ-পরকালীন সাফল্য নিহীত আছে।

অলৌকিক কুরআন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ বিশ্বে নেই, পূর্বেও নয় পরেও হবে না। এতে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের জ্ঞান যেমন আছে তেমনি আছে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের, সকল সমাজের সকল সমস্যার

[১৭১] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৭৬।

সর্বাঙ্গিন অভ্রান্ত সমাধান ও সংশোধনের মূলনীতি। আল-কুরআন বিশ্বে একমাত্র অবিকৃত ওহি যা কোনো মানুষ পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে পারে। আল্লাহর বাণীর বিকৃতি-অবিকৃতি প্রমাণ করার উপায় হল– মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, পবিত্র, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল ফলে তাঁর বাণীর মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবেই:

* সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে গ্রন্থটি কোনো নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই নবী এটিকে যেভাবে রেখে গেছেন সেভাবে অবিকৃত রয়েছে।

* আল্লাহর বাণীকে পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও সঠিক, এমন কি বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি হতেও মুক্ত হতে হবে।

* আল্লাহর বাণীকে যাবতীয় অসঙ্গতি, অবাস্তব ও অযৌক্তিক বর্ণনা হতে মুক্ত হতে হবে।

* আল্লাহর বাণীকে গরমিল, বৈসাদৃশ্য ও স্ববিরোধী বক্তব্য হতে মুক্ত হতে হবে।

* আল্লাহর বাণীকে অনৈতিক, অশালীন ও বিশ্রী গাল-গল্প ইত্যাদি হতে পবিত্র হতে হবে।

* আল্লাহর বাণীকে বিকৃতি যথা– সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অপব্যাখ্যা প্রভৃতি হতে মুক্ত হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা কোনো ওহির বিধান পৃথিবীতে বাস্তবায়িত রাখতে চান ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি যে কোনো প্রকার বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে।

* আল্লাহর বাণীতে বৈজ্ঞানিক যেসব বক্তব্য বা তথ্য রয়েছে তা অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হতে হবে। হয় তা ইতোমধ্যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে নয়তো এমন হবে যে বিজ্ঞান এখনও সে পর্যন্ত পৌছুতে পারেনি ইত্যাদি।

কোনো ওহি বা আসমানী গ্রন্থে যদি উপরিউল্লিখিত যে কোনো একটিও ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটি মূলেই কোনো ওহি নয় অথবা সেটি আল্লাহর অবিকৃত গ্রন্থ বা বাণী নয়, সেটি অবশ্যই বিকৃত। ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ যে মারাত্মকভাবে বিকৃত হয়েছে তা প্রমাণীত। অন্যদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের কোনো ওহি বা আসমানী গ্রন্থ নেই, নবীও নেই। সুতরাং এসব ধর্মগ্রন্থকে পরীক্ষা করারও কোনো প্রয়োজন নেই।

এখন আমরা কুরআনের ওপর মনোনিবেশ করতে পারি। পবিত্র কুরআনের প্রথমেই একটি ব্যতিক্রমি বিষয় হল, পবিত্র কুরআন শরীফ নিজেই দাবি

করছে যে এটি আল্লাহর বাণী বা ওহি এবং তিনি নিজে একে সংরক্ষণ করবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ* "আমি [মহান ও পবিত্র আল্লাহ্] স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজে [মহান ও পবিত্র আল্লাহ্] এর হিফাজতকারী (সূরা: হিজর, আয়াত: ৯)।" পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ* "এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।" অর্থাৎ, এটি যে ওহি তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর সে কারণে এতে কোনো ভুল-ত্রুটিও নেই। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২) অন্যত্র বলা হয়েছে:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۝

"কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না– সম্মুখ থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়।" (হা-মিম-সিজদাহ:৪২)

এমন সত্যায়ন ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আল-কুরআনুল কারিম আজ থেকে প্রায় পনেরশত বৎসর আগে নাজিল হয়। দেখা যায়, মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন- ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক, এবং সেটি কিয়ামত পর্যন্ত, তার সবকিছুরই মূলনীতি এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে রয়েছে যা একশ বছর আগেও মানুষ কল্পনা করতে পারত না। কুরআনে রয়েছে জীববিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা। মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির পর্যায় তথা ভ্রূণতত্ত্ব, বায়ু তত্ত্ব, পানি তত্ত্ব, সৌরজগত, গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন, উদ্ভিদ ও কীটপতঙ্গ, আকাশের স্তর ও মহাশূন্য, মহাবিশ্বের সৃষ্টি (big-bang) ও এর ক্রমসম্প্রসারণশীলতা, সময় ও দিন-রাত্রির আবর্তন প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্ভুল বৈজ্ঞানিক আলোচনা রয়েছে কুরআনে। এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হচ্ছে।

নমুনা- ১: পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্যের আবর্তন নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগেও বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। কেউ বলেছিলেন এগুলো আবর্তন করে কেউ বলেছিলেন এসব স্থির। কিন্তু প্রায় পনেরশত বৎসর পূর্বে কুরআন বলেছে যে সূর্য, চন্দ্র এসব আপন আপন অক্ষে আবর্তনশীল এবং বিজ্ঞান আজ এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে। কুরআন বলছে:

وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۞ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন কক্ষপথ নির্ধারিত করেছি অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের; প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে আবর্তন করে।" (ইয়াসিন:৩৮-৪০)

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ*

"সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে।" (আর-রহমান : ৫)

শুধু তাই নয়, সূর্য ও চন্দ্র যে একই প্রকৃতির নয়, সূর্য নিজেই আলোর আধার, কিন্তু চন্দ্র সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার যে আল-কুরআনে চন্দ্র-সূর্যের জন্য এক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, সূর্যকে বলা হয়েছে প্রদিপ যার নিজের আলো আছে আর চন্দ্রকে বলা হয়েছে আলো যা ধার করা। চন্দ্র-সূর্যের এই ভিন্ন প্রকৃতি না হলে উভয়কেই একই শব্দে উল্লেখ করার কথা ছিল। কুরআন বলছে:

أَلَمْ ط تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞

"তোমরা কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহ কিভাবে আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।" (নূহ : ১৫-১৬)

একই ধরনের বক্তব্য কুরআনের আরো আয়াতেও রয়েছে যেখানে সূর্যকে প্রদীপ বা সিরাজ এবং চন্দ্রকে আলো বা ক্বামার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো মানুষের পক্ষে সেকালে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পনরোশত বছর পূর্বে এরকম চন্দ্র-সূর্যের প্রকৃতি জানা ও সেমতে পার্থক্য করে শব্দ চয়ন করার প্রশ্নই ওঠে না।

নমুনা- ২: শেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) তাঁর *Henry The Fourth* নাটকে মৌমাছির প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন, পুরুষ মৌমাছিদের একজন রাজা থাকে যা পুরুষ মৌমাছিদের ভিতর থেকেই নির্ধারিত হয়। রাজা মৌমাছি ছাড়া অন্যান্য মৌমাছিরা হল সৈনিক মৌমাছি যাদের কাজ হল মৌছাক নির্মাণ, মধু সংগ্রহ থেকে সব। রাজার নির্দেশ মতো সৈনিক মৌমাছি সকল কাজ সম্পাদন করে। শেক্সপীয়ারের আমলে এবং ১৯৭৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের স্রেফ ধারণা ছিল যে মৌমাছি দুই প্রকার, পুরুষ ও স্ত্রী, স্ত্রী মৌমাছি কেবল সন্তান জন্ম দেয়, আর বাদবাকি সব কাজ করে পুরুষ মৌমাছিরা। ১৯৭৩ সালে অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী Karl Von Frisch মৌমাছির জীবনচক্র নিয়ে এক বিস্ময়কর গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করেন। এই গবেষণা মৌমাছি সম্পর্কে পূর্বের সব ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে দেয়। বিজ্ঞানী ফটোগ্রাফি ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে দেখালেন যে লিঙ্গভেদে মৌমাছি পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই প্রকার হলেও কর্মের ভিত্তিতে মৌমাছি তিন প্রকারের। পুরুষ মৌমাছি, স্ত্রী মৌমাছি এবং বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছিদের বলা হয় রাণী মৌমাছি বা Queen bee। Karl Von প্রমাণ করেন যে এই রাণী মৌমাছিদের প্রজনন তথা সন্তান উৎপাদনে অংশগ্রহণ ছাড়া পুরুষ মৌমাছিদের আর কোনো কাজ নেই। মৌচাক নির্মাণ, মধু সংগ্রহ থেকে নিয়ে আর সব কাজ করে বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছিরা যারা প্রকৃতিগতভাবে সন্তান জন্ম দানে অক্ষম। Karl Von এদের নাম দিয়েছেন working bee বা কর্মী মৌমাছি। সুতরাং রাণী ও বন্ধ্যা মৌমাছি উভয়েই স্ত্রী মৌমাছি, পার্থক্য কেবল একটাই যে একটি সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং শুধু এই কাজটিই করে অন্যটি অক্ষম এবং এ ছাড়া বাদবাকি সক কাজ করে থাকে। Karl Von দেখান কর্মী মৌমাছিরা ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে যখন বের হয় তখন অদ্ভূত এক কাজ করে। তা হল

কর্মী মৌমাছি যে গাছ বা উদ্যান থেকে ফুলের রস সংগ্রহ করেছে, অন্য কর্মী মৌমাছিকে সে ঐ স্থানের খবর ও পৌছার রাস্তাটি হুবহু বাতলে দেয়, অন্যান্য মৌমাছিরা সে পথেই রস সংগ্রহে ঐ স্থানে গমন করে। এই কাজের জন্য Karl Von কে ১৯৭৩ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল ১৯৭৩ সালে যে জিনিসটি আবিষ্কৃত হল সেটিই প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বে কুরআন বলে রেখেছে। কুরআন বলছে:

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا

অর্থাৎ, "আপনার পালনকর্তা মধু মক্ষিকাকে আদেশ দিলেন, পর্বতগাহে, বৃক্ষে এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরি কর। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার সরল পথসমূহে চলমান হও।" (নাহল: ৬৮-৬৯)

এখানে গৃহ তৈরি, খাওয়া ও পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলা- এই তিনটি নির্দেশ একই সঙ্গে একই প্রকৃতির মৌমাছিকে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশবাচক তিনটি ক্রিয়াপদ হল, ইত্তাখিজি, কুলি এবং উসলুকি। আরবি ভাষারীতি অনুসারে এই তিনটি ক্রিয়াপদ স্ত্রীবাচক শব্দ, এগুলোর পুরুষবাচক হবে- ইত্তাখিজ, কুল ও উসলুক। অর্থাৎ, ঘর বানানো, যারা ঘর বানাচ্ছে তাদের খাওয়া, মধু সংগ্রহে সরল পথে চলার কাজে স্ত্রী মৌমাছিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুরুষকে নয়। অর্থাৎ, কুরআন মতে, ঘর বানানো, ফুলের রস সংগ্রহ এসব স্ত্রী মৌমাছি করছে। অন্যদিকে এক কর্মী মৌমাছি অন্য কর্মী মৌমাছিকে যে পথ বাতলে দেয় সেটাই তাদের জন্য সরল পথ যে পথে চলতে আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেছেন। সুতরাং দেখা যায়, বিজ্ঞানী Karl Von- এর গবেষণা সেটাই প্রমাণ করেছে যা আল-কুরআন প্রায় পনরোশত বছর পূর্বেই বলে রেখেছে।

নমুনা- ৩: আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) *Theory of Relativity* তথা *Time, Space-* এর সূত্র ধরে রাশিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী Alexander

Friedmann, Georges Lemaitre দাবি করেছিলেন যে এই মহাবিশ্ব স্থির নয় বরং ক্রমবর্ধমানশীল। Friedmann ১৯২২ সালে আবিষ্কার করেন যে আইনস্টাইনের স্থির-মহাবিশ্ব তত্ত্বে একটি ভুল রয়েছে, এটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় শূন্যদ্বারা বিভক্তিকরণ। আইনস্টাইনের সমীকরণের সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে তিনি দু'টি অস্থিতিশীল (non-static) মডেল প্রণয়ন করেন। এর একটি হচ্ছে কালের সাথে নিখিল বিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটছে এবং অন্যটিতে সংকোচন হচ্ছে।[১৭২] Friedman- এর পর Lemaitre আরো অগ্রসর হয়ে দাবি করেন যে মহাবিশ্ব একটি ক্ষুদ্র কণিক অবস্থা থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে (big bang) সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি ক্রমাগত সম্প্রসারণশীল। এদের কারোর কথাই তখন তেমন কেউ একটা পাত্তা দেয়নি, এমনকি স্বয়ং আইনস্টাইন পর্যন্ত এদের দাবি অস্বীকার করে বলেছিলেন, মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধমান নয় বরং স্থির। অথচ, আইনস্টাইনের তত্ত্বের সূত্র ধরেই এরা এসব কথা বলেছিলেন। এরপর ১৯২০ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Edwin Hubble আধুনিক টেলিস্কোপ কাজে লাগিয়ে ১৯২৯ সালে প্রমাণ করেন যে, আমাদের মহাবিশ্বের ছায়াপথগুলো ক্রমাগত পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। এতে তিনি Doppler Effect তত্ত্ব ব্যবহার করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি আলোকতরঙ্গের উপর ফেলা হয় তাহলে তরঙ্গ যদি লাল আলোর দিকে সরে আসে তাহলে বুঝতে হবে ছায়াপথগুলো পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। যদি নীল আলোর দিকে সরে যায় তাহলে বুঝতে হবে ছায়াপথগুলো পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে না, বরং কাছে চলে আসছে। বারবার এই পরীক্ষা করে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ছায়াপথগুলো পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। তছাড়া ছায়াপথের দূরত্ব ও এর পিছনে সরে যাওয়ার বেগের মধ্যে একটি রেখাগত (linear) সম্পর্ক আছে। একটি ছায়াপথের এই সরে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এর দূরত্ব বৃদ্ধি পায় (চিত্র- ১ দেখুন)। এটিকে হাবলের নিয়ম বা Hubble's Law বলা হয়।

---

[১৭২] ইফা। ২০১২। *আল-কুরআনে বিজ্ঞান।* ঢাকা : ইফা। পৃ. পরিশিষ্ট- ২।

চিত্রঃ ১ঃ হাবল আইন [Hubble's Law]

বিখ্যাত Mount Wilson Astro-laboratory- তে হাবল পরীক্ষাকালে Doppler Effect তত্ত্ব ব্যবহার করে ছায়াপুঞ্জের red-shift প্রত্যক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[১৭৩] আইনস্টাইন পরে স্বীকার করেন যে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য সঠিক অর্থাৎ, মহাবিশ্ব নিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখন বিজ্ঞান জগতে এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে, অর্থাৎ মহাবিশ্ব সর্বদা ক্রমসম্প্রসারণশীল। মহাবিশ্বের এই নিয়ত সম্প্রসারণশীলতা বিজ্ঞানীগণ এই সেদিন ১৯২৯ সালে আবিস্কার করেছেন বা জানতে পেরেছেন, অথচ এই মহা জটিল বিষয়টিই প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বে কুরআন বলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, যে মহা-বিষ্ফোরণ তথা big-bang- এর মাধ্যমে এই সম্প্রসারণ শুরু হল তার কথাও মানুষ বা বিজ্ঞানীরা এর পূর্বে জানতেন না। এ কথাও কুরআন পনেরোশত বছর পূর্বে বলে দিয়েছে। এবার শুনুন সে কথা। আল-কুরআন বলছেঃ

---

[১৭৩] *প্রাগুক্ত।*

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ (জারিয়াত) أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞(আম্বিয়া)

অর্থাৎ, "আমি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয়ই একে সম্প্রসারিত করে চলেছি।"(জারিয়াত:৪৭) অবিশ্বসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল, পরে আমরা[১৭৪] উহাদের পৃথক করে দিয়েছি...।

নমুনা- ৪: বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন স্তরের বিষয়টি আবিষ্কার করেন। এই স্তরগুলো হল: ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার। বিজ্ঞানী Sir Venn Allen প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের চারদিকে একটি শক্তিশালী Magnetic Field আছে যা পৃথিবীপৃষ্ঠের চারদিকে একটি বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। বিজ্ঞানীর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে Venn Allen Radiation Belt। এই বেল্ট আমাদের বায়ুমণ্ডলকে চারদিকে ঘিরে রেখেছে। বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরের নাম হল স্ট্রাটোস্ফিয়ার যার আছে বিস্ময়কর এক উপস্তর যা আজ ওজোন স্তর নামে সুপরিচিত। সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে যে বিস্ফোরণ ঘটে তার তেজস্ক্রিয়তা হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ফেলা দশ হাজার বিলিয়ন এটম বোমার সমান। অন্যদিকে মহাকাশে মারাত্মক তেজষ্ক্রিয় উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয় যার আঘাতে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো। অন্যদিকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারত না। আবার পৃথিবীতে নিষিক্ত সব কার্বনডাই-অক্সাইড মহাকাশে চলে গেলেও পৃথিবী বাস-অনুপযোগী ঠাণ্ডা হয়ে যেত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এসব বিপদের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে, এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের যে স্তরটি ছাদের ন্যায় এই সুরক্ষার কাজ করে যাচ্ছে তার নামই ওজোন-স্তর। অর্থাৎ, ওজোন-স্তর সূর্যের উপকারী তথা প্রয়োজনীয় তাপ বা

---

[১৭৪] আরবি ভাষারীতি অনুসারে 'আমরা' সম্মানার্থে একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়।

রশ্মি, বেতার তরঙ্গ প্রভৃতি, এক কথায় প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেয়, কিন্তু ক্ষতিকর বস্তুর প্রবেশ ঠেকিয়ে দেয়। অন্যদিকে পৃথিবীর ক্ষতিকর বস্তু যেমন অতিরিক্ত কার্বনডাই-অক্সাইড মহাকাশে নিক্ষিপ্ত করে দেয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় কার্বনডাই-অক্সাইড ভূ-পৃষ্ঠে ধরে রাখে। বাড়ির ছাদ যেমন অধিবাসীকে অধিক তাপ, বৃষ্টি, কোনো দুর্যোগ প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি বায়ুমণ্ডলের এই ওজোন-স্তর পৃথিবী ও তার অধিবাসীদেরকে উপরিউল্লিখিত নানা বিপদ ও ক্ষতি থেকে ছাদের মতো রক্ষা করে চলেছে। পরম আশ্চর্যের বিষয় যে কেবল আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা এই মহাসত্যটি আজ জানতে পেরেছি, অথচ প্রায় পনোরশত বছর পূর্বে কুরআন বলছে:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۝ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝

"আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ, অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।"

কুরআনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিয়ে এরকম আলোচনা করতে হলে পৃথক মহা-গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে শুধু নমুনাস্বরূপ আরো কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝

অর্থাৎ, "হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু বিশেষ শক্তি ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।" (আর-রহমান : ৩৩)

এখানে লক্ষ্য করুন, যদি শব্দের জন্য আরবিতে *ইন*, *লাও*- দুটিই ব্যবহার করা যায়, *ইন* তখনই ব্যবহৃত হয় যখন সে কাজটি আয়ত্তযোগ্য হয়। পক্ষান্তরে কাজটি করা অসাধ্য হলে *লাও* ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতে যদি'র জন্য আরবি ইন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মানে ভবিষ্যতে এসব কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজ মানুষ মহাকাশে ভ্রমণ করছে, চাঁদে, মঙ্গলে

বিচরণ করছে- এমন ঘটনা যে ভবিষ্যতে ঘটবে তা প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বে কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনা করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কুরআনে দিন-রাত্রির আবর্তন বিষয়ে বলা হয়েছে: তিনি কুণ্ডলির মতো জড়াইয়া দেন রাত্রিকে দিনের উপর এবং দিনকে রাত্রির উপর। তোমরা কী লক্ষ কর না আল্লাহ কীভাবে রাত্রিকে দিনের মধ্যে মিলিয়ে দেন এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে। দিন-রাত্রির পরিক্রমণের বেলায় বাস্তবে মহাশূন্যে কি ঘটে থাকে? হাল আমলে মার্কিন নভোচারিরা মহাশূন্য থেকে এটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার চিত্রও তুলে রেখেছেন। তাতে দেখা যায়, পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সূর্যের আলোয় পৃথিবীর সম্মুখ অংশ ও বিপরীত অংশের দিন-রাতের ধারাবাহিক পরিবর্তন হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দিন আর রাত হচ্ছে- দিন-রাত্রির দুই এলাকা একই সময়ে একই আবর্তনে ঘুরপাক খাচ্ছে। দিন-রাত্রির এই যে অবিরত আবর্তন, সেই বিষয়টিকেই আল-কুরআন উপরিউল্লিখিত ভাষায় প্রকাশ করেছে। পনেরোশত বছর পূর্বে কোনো মানুষের পক্ষে এসব কথা বলা অসম্ভব। আল-কুরআনুল কারীমে আরো বলা হয়েছে:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۞ (নূহ) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ۞ (যারিয়াত) وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۞ (ফুরকান) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۞ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (নাবা) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ط وَأَلْقَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۞ (লুকমান) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ط يَكَادُ سَنَا

بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ
يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ
فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ط يَكَادُ سَنَا
بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۝(নূর) وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط (আম্বিয়া)
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى۝
(তোয়াহা)وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝(হিজর) وَإِنَّ
لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا
خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۝ (নাহল) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
مُبِينٌ ۝(নাহল) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ط
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে কার্পেটের মত বানিয়েছেন যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার। (নূহ : ১৯-২০) পৃথিবীকে আমরা বিস্তৃত করেছি, কতই না উত্তমভাবে আমরা তাহা করেছি। (যারিয়াত : ৪৮) তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিয়ে দিয়েছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিস্বাদ। তিনি দুই দরিয়ার মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়- যা লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। (ফুরকান : ৫৩) আমি কি জমিনকে বিস্তৃত ও পর্বতমালাকে খুঁটি করি নি? (নাবা : ৬-৭) তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে [ভূতত্ত্ববিজ্ঞান অনুযায়ী পর্বতমালা খুঁটির মত জমিনকে নিঃসন্দেহে স্থিরতা দিয়েছে।]। (লুকমান : ১০) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং

তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়। (নূর : ৪৩) প্রাণবন্ত সবকিছুকে আমরা পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। (আম্বিয়া : ৩০) [তিনিই] আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষাণ এবং এর দ্বারা আমরা জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ জন্মাই,- একটি আরেকটি থেকে আলাদা। (ত্বোয়াহা : ৫৩) পৃথিবীতে আমরা সকল প্রকার সামগ্রী সৃষ্টি করেছি পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করে। (হিজর : ২০) নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তোমাদিগকে পানের জন্য দিয়েছি- যা তাদের দেহের অভ্যন্তরে- অন্ত্রের বস্তুনিচয় ও রক্তের সংযোগের ফলে দুগ্ধ হিসেবে আসে- যে পান করে তা তার জন্য খাঁটি ও উপকারী (দুগ্ধবিজ্ঞান অনুযায়ী পশুর দেহের অভ্যন্তরে দুধ প্রস্তুতের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া কুরআনের বর্ণনার অনুরূপ।)। (নহল : ৬৬) আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সামান্যতম শুক্রবিন্দু হতে। (নাহল : ৪) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আঁধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। (মুমিনুন : ১২-১৪)

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কুরআনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রমাণ করা নয়। কাজেই গ্রন্থের পরিধীর কথা চিন্তা করে সকল আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো না। যতটুকু আলোচনা হয়েছে, জ্ঞানীদের জন্য সেটাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। লক্ষণীয় হল, একশ বছর আগেও এসমস্ত বিষয় সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল সব ভুল ও ধাঁধায় ভরপুর। আর অনেক বিষয়ে মানুষের কোনো জ্ঞানই ছিল না। কুরআনে বর্ণিত অনেক বিষয় আদৌ সে যুগের আলোচিত বিষয় ছিল না বরং সেসব সত্য হয়ে ধরা পড়েছে কয়েক শতাব্দি পরে এসে। তাহলে দেড় হাজার বছর পূর্বে কোনো মানুষ এসবের নির্ভুল ধারণা কীভাবে দিতে পারে? একমাত্র ওহি না হলে এ সম্ভব নয়।[১৭৫] এজন্যই কুরআনের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে: "এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই

[১৭৫] মরিস বুকাইলি। ১৯৯৩। *বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান*। আখ্‌তার-উল্‌-আলম অনু. ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। পৃ. ১৭৩।

(এটি যে ঐশী গ্রন্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর সে কারণে এতে কোনো ভুল-ত্রুটিও নেই।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ২) অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরক্ষর ছিলেন, তিনি দুনিয়াবী কোনো প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম লেখাপড়াও শেখেন নি। একজন বিজ্ঞানীর পক্ষেও যেখানে এক/দু'শ বছর আগেও এসমস্ত বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব ছিল না সেখানে একজন মানুষের পক্ষে তাও নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কী করে দেড় হাজার বছর পূর্বে এমন বৈজ্ঞানিক সত্য কথা বলে দেওয়া সম্ভব হয়। কাজেই আসমানী গ্রন্থ ছাড়া এমনটি সম্ভব হতেই পারে না। তারপরও কুরআন বলছে:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ط أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۞

অর্থাৎ, "এ (কুরআন) সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও– এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার– অবশ্য তোমরা তা কখনও পারবে না– তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।" (বাকারা : ২৩-২৪)

আমরা দেখছি, প্রায় পনেরশত বৎসর পূর্বে কুরআন এই চ্যালেঞ্জ করেছে এবং পৃথিবীতে অসংখ্য পণ্ডিত থাকলেও আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে পারেনি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "আমি [মহান ও পবিত্র আল্লাহ্] স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজে [মহান ও পবিত্র আল্লাহ্] এর হিফাজতকারী (হিজর : ৯)।" অন্যত্র বলা হয়েছে: "কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না– সম্মুখ থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়।" (হা-মীম সিজদাহ : ৪২।) দেখা যায়, তাওরাত, যবুর ও বাইবেলে একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এগুলো আমি আল্লাহর বাণী হলেও [বিকৃত হওয়ার আগে মূল বাণী।] এসব সর্বদা অবিকৃত থাকবে। কিন্তু

কুরআনে স্বয়ং এর নাযিলকারী অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিজে বিকৃত হওয়া থেকে এর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলছেন যে- আমি নিজে এর হিফাজতকারী ফলে কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না– সম্মুখ থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়। এর কারণ কী?

এর কারণ হল- অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ সেটা ক্ষুদ্র বা বড় হোক, সেগুলো প্রেরিত হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সেই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সময়ের প্রয়োজনে নির্দেশনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন জরুরী ছিল। ফলে সেটি রদ করে দ্বিতীয় আরেকটি ওহি বা গ্রন্থ প্রেরণ করা হত। এ ধারা পবিত্র ইঞ্জিল শরীফ পর্যন্ত বহাল থাকল। কিন্তু মহাবিশ্ব ও এর সমুদয় সবকিছুর যেহেতু শেষ পরিণতি বা বিনাশ আছে কাজেই এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত বহাল থাকার সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই। অর্থাৎ, একটি পর্যায়ে গিয়ে ওহি ও নবী প্রেরণের ধারা বন্ধ করতেই হবে। তাই দেখা যায়, পবিত্র কুরআন শরীফ এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো ওহি আসেনি এবং আর কোনো নবীও আসেন নি– এর আর কোনো সুযোগ নেই। যেহেতু এই ধারা এক পর্যায়ে শেষ করতে হবে তাই মহান স্রষ্টা পবিত্র কুরআন শরীফ এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এই ধারার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে দিয়েছেন। এখন কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ এই পবিত্র কুরআন শরীফ এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শই বলবৎ থাকবে। কাজেই এটি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল এবং সময়ের প্রয়োজনে আরেকটি আসমানী গ্রন্থ যেহেতু পূর্ববর্তীর স্থান দখল করেছে তাই স্রষ্টার পূর্ববর্তী গ্রন্থকে সংরক্ষণ করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অর্থাৎ, বাইবেল পর্যন্ত কোনো আসমানী গ্রন্থেরই সংরক্ষণ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পবিত্র কুরআন শরীফ সম্পর্কে এ কথা খাটে না। কারণ, কুরআন শরীফ যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কাজেই এটিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা তা-ই করলেন অর্থাৎ, স্বয়ং তিনি নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সৃষ্টিকর্তা যেহেতু জানেন যে, মানুষের পক্ষে এই

সংরক্ষণের কাজ অসম্ভব [যেমন তাওরাত, যবুর, বাইবেল প্রভৃতির সংরক্ষণ মানুষ করতে পারেনি, বিকৃত করেছে।] তাই তিনি নানা কৌশলে এই সংরক্ষণের কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে সংরক্ষণ বলতে এর শব্দে ও মর্মে যে কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন তথা বিকৃতি থেকে হিফাজতকে নির্দেশ করে। যেমনটি এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, "আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজে এর হিফাজতকারী (হিজর : ৯)।"

লক্ষ করুন, বিশ্বে লক্ষ লক্ষ হাফিজে-কুরআন রয়েছেন যারা যুগ যুগ ধরে এই মহাগ্রন্থকে বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। এমন ঘটনা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে নেই। ফলে দুনিয়ার মুদ্রিত সকল কুরআন শরিফ বিনষ্ট করে ফেললেও (নাউ'যুবিল্লাহ্) কুরআন শরিফকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। আর যে কেউ এর একটি অক্ষরেও যোজন-বিয়োজন করলে কিংবা ভুল পড়লে হাফিজগণ সেটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন। লক্ষণীয় যে, বিশ্বব্যাপী ৭-১০ বছরের লক্ষ লক্ষ অবুঝ শিশুরা একটি বিশাল গ্রন্থকে শত শত বৎসর ধরে মুখস্ত করে যাচ্ছে, এটি তো নিঃসন্দেহে কুরআনের এক অলৌকিকত্ব ছাড়া কিছু নয়। কোনো বয়স্ক, শিক্ষিত লোক এই বিশাল গ্রন্থ মুখস্ত করলে (যেমনটি অনেকে করছেনও।) আমরা হয়তো তেমন অবাক হব না এই কারণে যে কঠিন হলেও বয়স্ক, শিক্ষিত লোকদের পক্ষে এ কাজ অসম্ভব নয়। কিন্তু ৭/৮ বছরের অবুঝ শিশু- যাদের এখনও কোনো বুঝ-বুদ্ধি হয় নি, যারা অনেকে কুরআন পড়া ছাড়া অন্য কোনো পড়ালেখাই জানে না এমন শিশুরা লক্ষ লক্ষ পরিমাণে একটি বিশাল গ্রন্থকে মুখস্ত করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যুগ যুগ ধরে যা আর কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে ঘটে না– এটিকে আমরা কী বলব? প্রিয় পাঠক, একটুও কী ভাবার নেই? কুরআন নাযিলকারী মহান আল্লাহ্ বলেছেন, আমি স্বয়ং কুরআনের হিফাজত করব; তাহলে এটিই কী মহাকৌশলী, মহাবিজ্ঞ স্রষ্টার হিফাজতের অতুলনীয় ব্যবস্থা?

কুরআনকে ফেরেশতা জিবরাঈলের (আ:) মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বৎসরে নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের যখন যা অবতীর্ন হত সঙ্গে সঙ্গে তা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মুখস্ত করে নিতেন এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে লিখে রাখতেন। আল্লাহর দূত জিবরাঈলের (আ:) কাছ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন মুখস্ত করার প্রবল তৎপরতা দেখে আল্লাহ তাঁকে কুরআন মুছে না যাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে জানালেন:

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۝إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾

অর্থাৎ,"তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি দ্রুত কুরআন আবৃতি করবেন না। [আপনার অন্তরে] এর সংরক্ষণ ও [আপনাকে দিয়ে] পাঠ করানো আমারই দায়িত্ব।" (সূরা: কিয়ামাহ, আয়াত: ১৬-১৭)

একই সূরার ২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: "অতঃপর [মানুষের সম্মুখে আপনার মুখ দিয়ে] কুরআনের বিশদ বর্ণনাও আমারই দায়িত্ব।" অর্থাৎ, আপনাকে মুখস্ত করানো, আপনার অন্তরে তা যথাযথরূপে সংরক্ষিত রাখা এবং প্রয়োজনের সময় তা অবিকল পাঠ ও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়ে দেওয়া– এসব আমি আল্লাহর দায়িত্ব।[১৭৬] আল্লাহ প্রদত্ত এই ক্ষমতাবলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন মুখস্ত করা ও স্মরণ রাখার এমন এক অতিমানবীয় ক্ষমতা অর্জিত হয়, ফলে তাঁর অন্তর কুরআন সংরক্ষণের এক মহা দুর্গে পরিণত হয়। ফলে কুরআনের একটি অক্ষরেরও এদিক-সেদিক হলে তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিতেন। এভাবে কুরআনের কোনোরূপ বিকৃতি সাধনের পথ শুরু থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে কুরআন নাযিল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীগণের (রা:) মধ্যে একদল হাফিজে-কুরআন তৈরি হয়ে যান। এ জামাতের মধ্যে– প্রথম চার খলিফা (রা:), হযরত তালহা (রা:), হযরত সা'আদ (রা:), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:), হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা:), হযরত সালিম (রা:), হযরত আবু হুরায়রা (রা:), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:), হযরত আমর ইবনুল আস (রা:), হযরত

---

[১৭৬] মুহাম্মদ শফি। *তফসীরে মা'আরেফুল-কুরআন*। অষ্টম খণ্ড। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৬৩৯।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:), হযরত মুয়াবিয়া (রা:), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা:), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব (রা:), হযরত আয়েশা (রা:), হযরত হাফসা (রা:), হযরত উম্মে সালামা (রা:)- এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।[১৭৭]

অন্যদিকে কুরআনের যখন যা অবতীর্ন হত সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট একাধিক সাহাবীকে (রা:) দিয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে লিখিয়ে রাখা হত যে কথা একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি। যেসকল মহান সাহাবী (রা:) কুরআন লিখে রাখার কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে– হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা:), প্রথম চার খলিফা (রা:), হযরত উবাই ইবনে কাব (রা:), হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা:), হযরত মুয়াবিয়া (রা:), হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা:), হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা:), হযরত সাবিত ইবনে কায়িস (রা:), হযরত আব্বাস ইবনে সায়ীদ (রা:)- এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭৮] আবার প্রত্যেক রমজান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ:)-কে সে সময় পর্যন্ত নাজিলকৃত কুরআন আবৃত্তি করে শুনাতেন এবং জিবরাঈল (আ:) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবৃত্তি করে শুনাতেন। মৃত্যুর পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ:)-কে গোটা কুরআন শরিফ দু'বার আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন এবং জিবরাঈল (আ:)- এর কাছ থেকে দু'বার আবৃত্তি শুনেছেন। অতএব দেখা যায়, কুরআন নাযিলের শুরু থেকে এর সংরক্ষণের জন্য স্বয়ং আল্লাহ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, ফলে কুরআনের যে কোনো প্রকার বিকৃত হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আজ আমাদের সম্মুখে যে কুরআন রয়েছে তা মহান ও পবিত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআনের অবিকৃত রূপ। এতদ্সত্ত্বেও কেউ যদি এতে কোনো সন্দেহ করতে চান তাহলে তিনি নিজে তা যাচাই করে দেখতে পারেন।

---

[১৭৭] *প্রাগুক্ত।* প্রথম খণ্ড। পৃ. ৩৫।
[১৭৮] *প্রাগুক্ত।*

ফরাসি বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলি দীর্ঘদিন গবেষণার পর *The Bible, the Quran and the Science* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। সে গ্রন্থে তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণার সিদ্ধান্ত এভাবে লিখেছেন:

> পৃথিবীতে যদি কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসরণ করতে হয় যা অবশ্যই আসমানী গ্রন্থ এবং যাতে কোনো বিকৃতি সাধন ঘটেনি তাহলে সেটি অবশ্যই পবিত্র কুরআন শরিফ। একমাত্র কুরআন ছাড়া আর সকল ধর্মীয় গ্রন্থেই বিকৃতি সাধন ঘটেছে। কিন্তু কুরআনে একটি শব্দও ভুল নেই, এর একটি কথাও কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারবে না, কুরআনে যেসব বৈজ্ঞানিক বক্তব্য রয়েছে তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কুরআনে যেসব বৈজ্ঞানিক বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে কুরআন নাযিলকালীন সময়ে কোনো মানুষের পক্ষে এসব বলা অসম্ভব। আর কুরআনের কোনো মানবীয় ব্যাখ্যা হতে পারে না। অর্থাৎ, কুরআন কোনো মানুষের রচনা হতে পারে না, এটি নিশ্চয় অবতীর্ণ এক আসমানী কিতাব।[১৭৯]

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, আল্লাহর বাণীকে চিনতে পারার বা সনাক্ত করার পরীক্ষার মধ্যে অন্যতম হল– মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, পবিত্র, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল ফলে তাঁর বাণীর মধ্যে ঐসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবেই। কেউ এসবের কষ্টিপাথরে কুরআনকে এখন পরীক্ষা করতে পারেন। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, একমাত্র কুরআনই এসব যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ। আর কোনো গ্রন্থ এসব বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ নয়। ফলে কুরআন যে আল্লাহ্র একমাত্র অবিকৃত বাণী তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাহলে, ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে কুরআনকেই একমাত্র গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য নয় কী?

---

[১৭৯] Maurice Bucaille. *The Bible, The Qur'an and Science.* Translated from French by Alastair D. Pannell and The Author. pp. 86, 163, 164. [To check the source, search in google by the book name.]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ : বিকল্পহীন সর্বজনীন আদর্শ

মুসলমানদের শক্তির দ্বিতীয় উৎস হলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইহ-পরকালে এই শক্তি দ্বারা যারা মুক্তি ও শান্তি পেতে চায় তাঁদের জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরন্তর শিক্ষামালা বা সিরাত অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। প্রথমত, নিচের বক্তব্যসমূহ অবলোকন করা উচিত:

> আল্লাহ বলেন, আমার সত্তা (জানার কেউ না থাকায়) অজানা ছিল। আমার ইচ্ছা হল আমাকে জানানো (আমার গুণাবলীর মাধ্যমে আমাকে প্রকাশ করা)। সেমতে আমি সৃষ্টি করি জগৎ। (রুহুল মাআনী : ১৪-২১।) আল্লাহ এই জগৎ সৃষ্টিরও পূর্বে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন নূরে-মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যোরকানীতে উল্লেখ আছে, হযরত যাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, সকল বস্তুর পূর্বে আল্লাহ সর্বপ্রথম কোন জিনিসটি সৃষ্টি করেছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম নিজ কুদরতী নূর হতে তোমাদের নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই নূর আল্লাহর কুদরতে আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীনে চলমান ছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, জীন-ইনসান, ফেরেশতা কিছুই ছিল না (১-৪৬)।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أنا سيد ولَد آدم يوم القيامة ۞ وأول مَن يَنشق عنه القبر۞ وأول شافع ۞ وأول مشفَّع

অর্থাৎ, আমি সকল আদম সন্তানের সর্দার, এর সুস্পষ্ট বিকাশ হবে কেয়ামতের দিন। আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হব, আমি আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হব এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে। (মুসলিম)

যুক্তিবিচার ও তথ্য প্রমাণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মানুষ জাতির মধ্যে সর্বার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন তাহলে তাঁর অনুসরণই হবে ইহ-পরকালের সাফল্যের মূল উপায়। প্রথমত, যুক্তিবিচার বা শাস্ত্রীয় প্রমাণে তত্ত্বগতভাবে বিচার করা যাক।

কবি গোলাম মোস্তফা লেখেন, শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ধারণা। এসব গুণে যে যতখানি অগ্রগণ্য সে ততখানি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।[১৮০] এককথায় বলা যায়, যত প্রকারের জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতা আছে সেসবে যে যত পরিপূর্ণ সে তত বেশি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষের মধ্যে শতভাগ পরিপূর্ণতা সম্ভবই নয়। পরমপূর্ণ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ হতে পারে না। তাই আল্লাহই আমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের ধ্রুব আদর্শ। এখন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এই আদর্শের পাশে রেখে বিচার করতে পারি। মানুষের মধ্যে যে-ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেন না কেন তাকে আল্লাহর গুণাবলি আয়ত্ব করতে হবে। এ ছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের অন্য কোনো আদর্শ উপায় নেই। অতএব আল্লাহর গুণাবলি যে সবচেয়ে বেশি আয়ত্ব করেছেন তিনিই মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিগণিত হবেন, এটিই স্বাভাবিক। এজন্যই এক হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আল্লাহর গুণাবলিতে গুণান্বিত হও। আমরা লক্ষ করি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এই মাপকাঠিতে মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন। এই শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের বিচারে নির্দিষ্ট হয়নি বরং খোদ মহান আল্লাহই এর স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনের নিচের বাণীগুলো লক্ষ্য করুন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝(আহযাব) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۝(কলম) قُلْ

---

[১৮০] গোলাম মোস্তফা। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৭৫।

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (আল-ইমরান)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে। (আহযাব:২১) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (কলম : ৪) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (আল-ইমরান : ৩১)

উপরের বাণীকে কেন্দ্র করে কেউ বলতে পারেন যে সকল নবীই একেকজন সর্বোত্তম ও মহান চরিত্রের অধিকারী এবং তাঁরা কখনও ভুল করেন না, অকার্যকর হন না। কিন্তু নিচের বাণীগুলো তো একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এমন খাস যা অন্য কোনো নবী বা রাসূলের বেলায় প্রযোজ্য নয়:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۝ (নজম) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ (আহযাব) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (সাবা) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝ (আরাফ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ط فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (মায়িদা)

অর্থাৎ, [তিনি] প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এ (কুরআন) হল ওহি, যা (তাঁর প্রতি) প্রত্যাদেশ হয়। (নজম : ৩-৪) মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (আহ্যাব : ৪০) আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সাবা ২৮) বলুন, হে মানব মণ্ডলী, আমি গোটা

পৃথিবীবাসীর জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। (আরাফ : ১৫৮) আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (মায়েদা : ৩)

সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি, কিন্তু উপরের বাণী মতে যিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল, যিনি প্রেরিত হয়েছেন সারা বিশ্ববাসীর জন্য, যার শিক্ষামালা প্রযোজ্য হবে পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত, তিনি যে সকল অর্থে সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ হবেন এবং সে কারণেই সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন তা সহজেই বোঝা যায়। এজন্যই উপরের আয়াতে তাঁর আনীত শরয়িতের পূর্ণাঙ্গতার সনদ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে যিনি সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ হবেন তাঁকে পরম পরিপূর্ণ আল্লাহর সর্বাপেক্ষা নৈকট্যশীলও হতে হবে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এসমস্ত কারণে এবং সুবিখ্যাত মেহরাজের মধ্যে দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যে পরিমাণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন তা অন্য কোনো পয়গম্বরের বেলায় ঘটেনি। অন্যদিকে পৃথিবীতে অনেক রাসূলের আবির্ভাব ঘটলেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন সর্বপ্রধান রাসূল। এর প্রমাণ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ط قَالُوا أَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۞ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞

অর্থাৎ, "আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান, অতঃপর তোমাদের নিকট একজন রাসূল আসবেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি' তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সেই হবে নাফরমান।" (আল-ইমরান : ৮১-৮২)

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, কারণ এখানে কোনো বিশেষ একজন রাসূলের কথা বলা হয়েছে যিনি সকল অর্থে শ্রেষ্ঠ হবেন যার উপর ঈমান আনা অন্য সবার জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। এখন লক্ষ্য করুন, এই আয়াতের উপর সকল নবীগণের আমল করতে হলে বিশেষ সেই রাসূলকে অবশ্যই সবার শেষে আসতে হবে। তা নাহলে এই রাসূলের ঠিক পূর্বের রাসূলের এর উপর আমল করার কোনো সুযোগই থাকে না। তাছাড়া সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের সবার শেষে না আসলে অন্যদের কিতাবকে সত্যায়ন কীভাবে করবেন? নিঃসন্দেহে এই বিশেষ রাসূল হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার উপর ঈমান না রাখাকে নাফরমানী হিসেবে সাব্যস্থ্য করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই বিশেষ রাসূল যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা স্পষ্ট হয়ে যায়।[১৮১]

আরেকটি বিষয় হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ এজন্যই সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ হতে হলে সর্বশেষে আসতে হয়। পরিপূর্ণতার মধ্যেই চরমত্ব নিহিত। চন্দ্র ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে অবশেষে যখন ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়, সর্বশেষও বটে। পূর্ণচন্দ্রের পরে আর কোনো পূর্ণতা নেই, কোনো অভিনবত্ব নেই। সুতরাং বিকাশের শেষ যেখানে শ্রেষ্ঠত্বও সেখানে। কোনো বৃত্ত যদি পরিপূর্ণ গোল হয় তাহলে এর পর আর অধিকতর গোল হতে পারে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের মধ্যে এসে আদি-অন্তের, সকল নবী-রাসূলগণের জ্ঞান ও আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এর পরে অনাদিকালে যেসব শ্রেষ্ঠ-মহাশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও

---

[১৮১] হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে আসবেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের প্রচারে কাজ করবেন।

আদর্শ আসবে সে এই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতার অনুকরণ হবে, অতিকরণ নয়। কুরআনের বাণী– 'তিনি সর্বশেষ নবী'– এর এটি এক অন্যতম অর্থ।[১৮২]

কবি গোলাম মুস্তফা তাঁর *বিশ্বনবী* সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন। তিনি একটি বাস্তবসম্মত বিচারবিন্দুতে জগতের সকল মনীষী ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মূল্যায়নের আহ্বান করেছেন।[১৮৩] তাঁর বিচারবিন্দুকে ভিত্তি করে নিম্নোক্ত বিচারবিন্দুটি (সারণি: ২.২) এ উদ্দেশ্যে প্রণীত হলো।

যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হবেন, অনুসরণের জন্য তাঁকে সকল অর্থেই আদর্শ হতে হবে। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে ২.২ সারণিতে প্রদর্শিত বিভিন্ন বিষয় প্রভৃতি যদি সেই মহামানবের মধ্যে আদর্শ পরিমাণে বা কমপক্ষে প্রয়োজন পরিমাণে না পাওয়া যায় ও সেসব তথ্যাদি সুসংরক্ষিত না থাকে তাহলে তিনি সারা বিশ্বের আবালবৃদ্ধবণিতার আদর্শ মডেল কীভাবে হবেন। গ্রন্থের সামগ্রিক আলোচনায় আমরা দেখব যে এই অপরিহার্য বিচারবিন্দুতে একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মহামানব নেই যিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন। পরীক্ষা করে দেখা যায়, অন্যান্য ব্যক্তিত্বগণের হয় এসব অধিকাংশই তাদের জীবনে নেই নয়তো কিছু কিছু থাকলেও তার কোনো সংরক্ষিত তথ্যভাণ্ডার নেই যাতে মানুষ নির্দ্বিধায় অনুসরণ করতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যেভাবে পরিপূর্ণরূপে পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, আর কোনো মনীষীর জীবনে এমনটি দেখা যায় না। সামগ্রিকভাবে একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, কর্ম ও বাণীতেই এসবের সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে, অন্য কারো নয়। এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেই বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।

---

[১৮২] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৩৮৩।

[১৮৩] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৩৮৯-৯০।

সারণি : ২.২ সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিমাপ বিচারবিন্দু

১.জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ, বংশ পরিচয় এবং সমগ্র জীবনের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ আছে কিনা।

২.মানবীয় উপাদান কতখানি আছে; অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে ঘর-সংসার করেছেন কিনা, সামাজিক, নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো আদর্শ রেখে গেছেন কিনা

৩.মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে গেছেন কিনা

৪.সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কিরূপ ব্যবহার করেছেন

৫.জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক কার্যের আদর্শ বা বিধান দিয়ে গেছেন কিনা

৬.সততা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-নীতি, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া, ক্ষমা, ত্যাগ, সেবা, সংযম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সৎসাহস, নির্ভীকতা, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতা- প্রভৃতি মহৎ গুণাবলির কি কি পরিচয় রেখে গেছেন

৭.আপন ধর্মমত প্রচার করার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার ও বিপদ বরণ করেছেন

৮.আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ কার কতখানি হয়েছিল

৯.কোনো ওহি লাভ করেছিলেন কিনা এবং তা অদ্যাবধি অবিকৃত আছে কিনা

১০.শিষ্যদের উপর কে কতখানি প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন; শিষ্যরাইবা কতখানি গুরুভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা দেখাতে পেরেছেন

১১.কার ধর্মবিধান বা আদর্শ বিশ্বমানবতার উপর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়েছে, অথবা বিশ্বজনীন আবেদন কোন ধর্মে অধিক আছে

১২.যুগসমস্যার সমাধানকল্পে কে কতখানি সহায়ক

১৩.ধর্ম ও কর্মের কিংবা ইহ-পরকালের সুসমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ মিলিত আদর্শ তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় কিনা

১৪.জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নর-নারী তাঁর মধ্যে জীবনের আদর্শ খুঁজে পায় কিনা, অন্য কথায় বিশ্বমানবের তিনি সর্বোত্তম পথ-প্রদর্শক কিনা

১৫.বহির্জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার গুণ কার ধর্মে কত বেশি

১৬.কার ধর্ম কত উদার ও কত ব্যবহার উপযোগী

১৭.জ্ঞান-সভ্যতায় কোন ধর্মের দান কতখানি

১৮.ইহ-পরকালের ব্যাপক পরিচয় কোন ধর্মে আছে

১৯.মানুষের অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী অধিক পরিমাণে কে মানবজাতিকে দান করেছেন

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল মহামানবকে আমরা এভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, তুলনায় তাঁরা কেউই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ ছিলেন না, শ্রেষ্ঠ তো নয়ই। এবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যেসব মনীষী জগতে এসেছেন তাঁদেরকে পরীক্ষা করা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পরে আর কোনো নবী জন্ম গ্রহণ করেন নি, এর সুযোগ নেই। কুরআনে (আহ্‌যাব : ৪০) আল্লাহ বলেন, "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" মার্টিন লুথার, শ্রী চৈতন্য, কবীর ছোট ছোট কোনো মতবাদ প্রচার করেছেন মাত্র। তাঁদের কারুরই জীবনের কার্য তত ব্যাপক নয়, অনেকে আবার ইসলামের নিকট হতে প্রেরণা লাভ করেই স্বীয় মতবাদ প্রচার করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না। আর কে বাকি আছেন? নেপোলিয়ন, পিটার, আকবর, হিটলার, মুসোলিনী, কার্ল মার্কস– এঁদের কথা তো আসতেই পারে না, কারণ তাঁরা ছিলেন কেবল রাজনৈতিক নেতা। মানব জীবনের দু'একটি দিক তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়, ধর্ম বা নীতির কোনো আদর্শ তাঁরা স্থাপন করেন নি। সুতরাং দেখা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও এমন কোনো মহামানব জন্ম গ্রহণ করেন নি যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ হতে পারেন, শ্রেষ্ঠত্বের তো প্রশ্নই উঠে না। এখন ভবিষ্যতের পানে কেবল সংশয়বাদীরাই অপেক্ষায় থাকতে পারেন![১৮৪]

শরীয়ত ও যুক্তিজ্ঞানের দিক দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিকল্পহীনতা প্রমাণীত হল, এখন বাস্তব জগতে বিশ্বজনীনরূপে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবন গোটা বিশ্বজগতের প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং করছে। ধূলার ধরনী হতে খোদার আরশ পর্যন্ত ছিল তাঁর কর্মভূমি। তাঁর মধ্যে সকলেই আদর্শ খুঁজে পেতে পারে। একদিকে তিনি রাখাল বেশে মাঠে মাঠে মেষ চড়াচ্ছেন অপরদিকে সম্রাট বেশে রাজ্য পরিচালনা করছেন। একদিকে মজুর সেজে মাটি কাটছেন, শ্রমের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রচনা করছেন অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছেন, সেবাসংঘ গঠন করে আর্তপীড়িতের

---

[১৮৪] *প্রাগুক্ত* / পৃ. ৩৮৯-৯০।

সেবা করছেন। একদিকে বিবাহ করে সংসার পেতেছেন, স্বামী, পিতা ও প্রতিবেশীর কর্তব্য পালন করছেন, দুনিয়াবী মানবীয় জীবন যাপন করছেন, একাধিক বিয়ের মাধ্যমে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করা, একাধিক বিয়ে অবশ্যম্ভাবী হলে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে আচরণের আদর্শ এবং স্ত্রী কুমারী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, নওমুসলিম হলে এই বিচিত্র ঘরানার বিচিত্র আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অনুপাতে আচরণের আদর্শ দেখিয়ে যাচ্ছেন অপরদিকে নিভৃত গিরিগুহায় বসে কঠোর সাধনায় মগ্ন রয়েছেন, রোযা রেখে পেটে পাথর বেঁধে দিন কাটাচ্ছেন, রাতে জায়নামাজে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একদিকে পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে ধৈর্য ও সবর অবলম্বন করছেন, হিজরত করে অত্যাচারীদিগের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন অপরদিকে যালিমকে বাঁধা দিয়ে, বাতিলের সম্মুখে দুর্বার গতিতে দাঁড়িয়ে মিথ্যার দমন ও সত্যের লালনের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করছেন। একদিকে সেনাপতি বেশে বীরের মতো যুদ্ধ করে শত্রু জয় করছেন অন্যদিকে পরম শত্রুকে ক্ষমা করে বক্ষে স্থান দিচ্ছেন। একদিকে সঞ্চয় করছেন অন্যদিকে সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছেন। একদিকে দুনিয়ার খবর রাখছেন অন্যদিকে অসীম রহস্যালোকে প্রবেশ করে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছেন। বস্তুত, রাখাল, ভিখারী, দাস-দাসী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, গৃহী, প্রতিবেশী, নাগরিক, কর্মী, জ্ঞানী, স্বদেশী-বিদেশী, যোদ্ধা-সেনাপতি, শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, জিন-ফেরেশতা, গওস-কুতুব, ফকীর-দরবেশ, মুসাফির, শিক্ষক-ছাত্র, নেতা, নবী-রাসূল সকলের জন্য তিনিই সর্বোত্তম আদর্শ।

মানুষের তিনটি মৌলিক সম্মন্ধ রয়েছে– আল্লাহর সঙ্গে সম্মন্ধ, মানুষের সম্মন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সম্মন্ধ। তিনদিকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মন্ধ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কর্মজীবনে, ধর্মজীবনে, ইহজীবনে, পরজীবনে, দৈহিক জীবনে, অধ্যাত্মিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে, নৈতিক জীবনে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জীবনে, সংস্কার সাধনে, জাতি গঠনে, রাষ্ট্র গঠনে, জ্ঞানে, পুণ্যে, প্রেমে, বীরত্বে, ক্ষমায়, সৎসাহসে, সংযমে, ত্যাগে, মুক্তি-সংগ্রামে, স্বাবলম্বনে, সততায়,

সত্যবাদিতায়, ন্যায় ও উদারতায়– যে কোনো দিক দিয়ে এমন পরিপূর্ণ আদর্শ আর কেউ নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য এসেছি।" তাইতো আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۝[১৮৫]

পবিত্র কুরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি মোবারক নাম 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' উল্লিখিত হয়েছে যার অর্থ যথাক্রমে প্রসংশিত ও প্রসংশাকারী। সর্বাধিক প্রসংশিত তিনিই হন যিনি সর্বার্থে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অন্যদিকে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হবেন তিনি মহান ও পবিত্র রবেরও সর্বাধিক প্রসংশাকারী হবেন। পবিত্র কুরআনে লক্ষ্য করা যায় যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে খোদ আল্লাহই তাঁকে সর্বাধিক প্রসংশিত তথা মুহাম্মদ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান ও পবিত্র আল্লাহর যে পরিচয় ও প্রসংশা বর্ণনা করেছেন তা অন্য যে কারো চেয়ে, অন্য যে কোনো ধর্মের চেয়ে অধিক প্রসস্ত ও স্বার্থক হয়েছে। এজন্যই খোদ আল্লাহই তাঁকে সর্বাধিক প্রসংশাকারী তথা আহমদ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং যে অর্থেই দেখি না কেন, ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তির জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই মানব জাতি ও তার সভ্যতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় আদর্শ, চিরকালীন একমাত্র বিকল্পহীন আদর্শ।

এ অধ্যায়ে আমরা মনুষ্য রচিত সংস্কার ব্যবস্থার অনিবার্য সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির প্রমাণ দেখেছি। বিপরীতে প্রায়োগিকভাবে ও তত্ত্বগতভাবে আদর্শ মানুষ ও সমাজ বিনির্মানে নববী ব্যবস্থার সাফল্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিকল্পহীনতা এবং এগুলোর চিরন্তনতার প্রমাণ দেখেছি। অতএব এটি প্রমাণ হল যে যুগে যুগে আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ বিনির্মানে কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু

---

[১৮৫] "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহযাব : ২১)

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা আদর্শ-ই হল একমাত্র নিখুঁত ব্যবস্থা। এই ওহীভিত্তিক ব্যবস্থার অনুসরণেই জাহেলিয়াতের সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত হয়েছিল।

৩

ইসলামি সোনালী সভ্যতা

নেতৃত্বের আসনে

প্রাক-ইসলামি বিশ্বের যে চিত্র আমরা প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরেছি তা থেকে দেখা যায়, ঐ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ ভোগ-দখল, শোষণ-বঞ্চনা ও অন্যায়-অবিচারের উপর, সর্বোপরি ঐ সমাজে কোনো ওহির নূর ও রেসালতের শিক্ষা ছিল না, যা কিছু নীতিবোধ বহাল ছিল তা ছিল তাদের মনমর্জির উপর ভিত্তি করে গঠিত। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এরকম কোনো সমাজের ধ্বংস অনিবার্য ছিল, এবং তা-ই হয়েছিল। পক্ষান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম মানবসম্পদ বিনির্মাণ করেছিলেন এমন মানবসম্পদের বিজয়ও অনিবার্য ছিল এবং তা-ই হয়েছিল। ঐ বিজয়ী সম্প্রদায় যেসব কারণে সকল মূর্খতা ও জাহেলিয়াতকে ধূলিস্যাত করে পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এক সোনালী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তা পূর্বে বর্ণিত তাদের নানামুখী অনন্য যোগ্যতার অবশেষ ফল ছিল।

ইসলামি সোনালী সভ্যতার প্রথম স্বার্থক জামাত প্রথমত ছিল আসমানী কিতাব ও শরীয়তের অধিকারী ফলে নিজেদের কোনো আইন ও বিধান তৈরির তেমন প্রয়োজন ছিল না, সময়ের পরিবর্তনে যা কিছু অর্জন করা প্রয়োজন ছিল তা তারা এই কিতাব ও নববী আদর্শের ভিত্তিতেই করতেন, চুল পরিমাণ এদিক-সেদিক করা তাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। দ্বিতীয়ত, শাসন ও নেতৃত্বের মহা কিন্তু জটিল দায়-দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছিলেন আধ্যাত্মিক তরবিয়াত ও সংশোধনের মাধ্যমে আদর্শের সর্বোত্তম মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর। তৃতীয়ত, এর ফলে তারা তাদের স্ব-স্ব নানামুখী জীবনব্যাপী দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রমসমূহকে, যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল পর্যায়ে বিন্যস্ত ছিল, পরকালীন জবাবদিহিতার প্রশ্নে সাফল্যের প্রথম ও শেষ একমাত্র সুযোগ ও পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দুনিয়ার জীন্দেগীর ময়দানে যার

যার কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্ব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের বাইরে সম্পাদন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটি ছিল তাঁদের কাছে জীবনব্যাপী জিহাদ যার উপর পরকালীন একমাত্র সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল যেখানে হেরে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। চতুর্থত, এই মানবগোষ্ঠী আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার সর্বোচ্চ স্তরে যেমন ছিলেন, পাশাপাশি দেহ ও আত্মার সহজাত মানবীয় চাহিদার মধ্যে এমন পরিশিলিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ মান অর্জন করেছিলেন যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এসবের প্রমাণ হল চিরন্তন আসমানী নূর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও এর শিক্ষক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতকে (আদর্শ) তারা শতভাগ অনুসরণ করেছিলেন।

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ط وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

অর্থাৎ, "ঐ পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করেছি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্যে রয়েছে শুভ পরিণাম। যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, তারা মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে। (কাছাছ : ৮৩-৮৪।)"

আসমানী গ্রন্থের এ ধরনের বাণীকে যারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান সাব্যস্ত করতে পারেন তাদের দ্বারাই কেবল বিশ্ব আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য প্রকৃত শান্তির আলয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। ইসলামি সোনালী যুগের ঐ জামাত ও তাদের কার্যধারা এর ঐতিহাসিক দলিল।

মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের হাতেখড়ি হয়েছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিলাফত বা রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনব্যবস্থাই ছিল সোনালী যুগের প্রথম

আদর্শ প্রকাশ। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের পরিচয় পেতে হলে প্রথমে এই শাসনব্যবস্থার পরিচয় তুলে ধরা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বনবীর ﷺ রাষ্ট্রব্যবস্থা

মনুষ্য রচিত মতবাদের বদলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল পরিপূর্ণরূপে কুরআনের ভিত্তিতে পরিচালিত। আল্লাহ কুরআনে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার যে বিধান নাযিল করেছেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল তার-ই সর্বোত্তম বাস্তব নমুনা। এ কারণে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রে যে ব্যবস্থা ছিল আজকের আধুনিক রাষ্ট্রে তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা স্বার্থক রাষ্ট্র। পার্থক্য এই যে সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধান অনুসারে পক্ষান্তরে আজকের রাষ্ট্রসমূহ পরিচালিত হয় সেক্যুলার বিধি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। নিচে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।[১৮৬]

রাষ্ট্রের নাম : ইসলামি প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রপতি: মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল উৎস: কুরআনুল-কারিম।

রাজধানী: মদীনাতুল্ মুনাওয়ারা (হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময় কুফায় স্থানান্তরিত।)

সার্বভৌমত্বের মালিক: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

সচিবালয়: মসজিদে নববী।

সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগ:

রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত বিভাগ: একান্ত সচিব ছিলেন হানযালা রাবী ইবনে আসাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আরেকজন সচিব ছিলেন- শুরাহবীল ইবনে হাসানা রাদ্বিয়াল্লাহু

---

[১৮৬] ইফা। ২০০৮। *সীরাত বিশ্বকোষ*। ১৩ খণ্ড। ঢাকা:ইফা। পৃ. ৫২৩-৫৪৯।

আনহু। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের দায়িত্বে ছিলেন আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তিনি মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনও ছিলেন।

অভ্যন্তরীণ শাসন বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ: প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রাদেশিক ওয়ালি বা শাসনকর্তার তত্ত্বাবধানে প্রদেশভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ছিল। ওয়ালিগণ স্ব-স্ব প্রদেশে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন।

আমিল: অন্যদিকে আমিল নামে প্রাদেশিক রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মচারিগণ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন। রাষ্ট্রের ২২টি আমিল শাসিত অঞ্চল ও গোত্র ছিল।

ওহি সংকলন বিভাগ: এই বিভাগের কাজ ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ তত্ত্বাবধানে নাযিলকৃত ওহি লিপিবদ্ধকরণ।

অর্থবিভাগ: এটি সে সময় বায়তুল-মাল হিসেবে পরিচিত ছিল যা ব্যাপক অর্থে অর্থবিভাগের কাজ করত। এই বিভাগের মাধ্যমে সরকারি আয়-ব্যয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হত।

পররাষ্ট্র বিভাগ: এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামের বাণী বা দাওয়াত পৌঁছানো, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে দূত প্রেরণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পন্ন হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পররাষ্ট্রনীতি ছিল- শান্তি প্রতিষ্ঠা, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, বিদ্যমান চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ন্যায়বিচার ও নিয়ম-নীতি মেনে চলা, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সীমানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন, সীমালঙ্ঘণ না করা, ইসলামের সার্বিক বিজয়ে শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা পরিচালনা, নিপীড়িতের সাহায্যকরণ ইত্যাদি।

পত্র ও নির্দেশাবলি লিখন ও অনুবাদ বিভাগ।

অভ্যর্থনা ব্যবস্থা: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশাসনিক দপ্তরে সর্বক্ষণ দেশি-বিদেশী লোকজনের ভীর লেগে থাকত। সেজন্য শৃংখলার স্বার্থে আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও রাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

দাওয়াত বিভাগ: এটি সম্পূর্ণরূপে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি স্বয়ং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে দীন প্রচারক, শিক্ষক হিসেবে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন।

আন্তঃগোত্র সম্পর্ক উন্নয়ন বিভাগ: এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যোগসূত্র ও সম্পর্ক রক্ষা ও উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হত। মুগীরা ইবনে শুবা রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু ও হাসান ইবনে নুমায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। মদীনা শান্তি চুক্তির কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি যা ছিল পৃথিবীর ইতিহসে প্রথম লিখিত সনদ।

শিক্ষা বিভাগঃ এই বিভাগ মসজিদে নববীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে দীন ও নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। লেখাপড়া জানা লোকদের দিয়ে নিরক্ষরদেরকে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা ছিল।

প্রতিরক্ষা বিভাগঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এই বিভাগের সর্বাধিনায়ক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় বেতনভূক্ত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যেককে একেকজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রয়োজনের সময় বাহিনী গঠন ও সেনাপতি মনোনীত করা হত।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগঃ অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা, অপরাধ দমন, বাজার পরিদর্শন, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ এই বিভাগ সম্পন্ন করত। নিয়মিত কোনো পুলিশ বাহিনী ছিল না, স্বেচামূলক নিরাপত্তা কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। প্রয়োজনে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হত।

সমরাস্ত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণ বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি তৈরি ও সংরক্ষণ করা হত।

কৃষি ও বন বিভাগ।

নগর প্রশাসনঃ প্রধানত নগরে অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিরোধ তথা বাজার ব্যবস্থাপনা এই বিভাগ তত্ত্বাবধান করত। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নগর উন্নয়নঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েই গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন বিভাগ স্থাপিত হয়েছিল। ঘর-বাড়ি তৈরির নকশা তখনও তৈরি হত। তাবাকাতে ইবনে সাদ হতে জানা যায়, মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির নকশা তৈরি করেছিলেন। বাড়িটি আজও সেই স্থানেই আছে বলে জানা যায়।

বিচার বিভাগঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রধান বিচারপতি। মসজিদে নববীতে বিচার কার্য পরিচালিত হত।

সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ মসজিদের প্রাঙ্গণে সামরিক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হত।

বন্ধি ও অপরাধী রাখার ব্যবস্থাঃ এ কাজে মসজিদে নববী ব্যবহৃত হত।

ওপরের তথ্যের দিকে নজর দিলে বিস্ময় জাগে যে আজ থেকে প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব ব্যবস্থা ও পদ্ধতি রাষ্ট্রশাসনে ব্যবহার করেছিলেন, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা সেসব ব্যবস্থার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। নিঃসন্দেহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

খিলাফতে রাশেদা : সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা

প্রাক-ইসলামি শাসন ব্যবস্থা যত অর্থে অনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিংবা হত এবং যে অনাচারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত, খিলাফতে রাশেদা ছিল ঠিক তাঁর বিপরীত। খিলাফতে রাশেদা ছিল 'মিনহাজুন্ নবুয়ত'-এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত যার একটি নমুনা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা খলীফা নামটি পর্যন্ত আল-কুরআন থেকে চয়ন করেছেন, এই উপাধি নামে ও ব্যবহারে কোনো অর্থেই মনগড়া নয়।

পৃথিবীতে যত সরকার ব্যবস্থা আছে ইবনে খালদুন সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১. প্রাকৃতিক সরকার যা শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাবি অনুযায়ী পরিচালিত হয়, ২. রাজনৈতিক সরকার যা হল দেশের মানুষকে বিবেকপ্রসূত চিন্তাচেতনা অনুযায়ী ইহলৌকিক কল্যাণ অর্জন করতে ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে বাধ্য করা এবং ৩. খিলাফত, এটি হল মানুষকে শরীয়তের চিন্তাচেতনা অনুযায়ী পরিচালনা করা যাতে তাদের পরকালের স্বার্থ পূরণ হয় এবং পূরণ হয় দুনিয়ার স্বার্থও, যার মূল লক্ষ্য পরকাল সুন্দর করা।[১৮৭] আমরা ইতোপূর্বে নববী সংস্কারের সফলতা আর মানব মস্তিষ্ক প্রসূত সংস্কারের ব্যর্থতার রহস্য যদি ভালভাবে খেয়াল করে থাকি তাহলে এখানেও খিলাফতের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ করতে পারব। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, আসল খলিফা ছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন তাঁর মধ্যস্থতায় খলিফা। খলীফারা এতই

[১৮৭] ইবনে খালদুন। *আল-মুকাদ্দিমা*। ১ম খণ্ড। গোলাম সামদানী কুরায়শী অনু. ২০১২। ঢাকা : দিব্য প্রকাশ। পৃ. ৩৫১-৩৬১।

সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে তাঁদেরকে কেউ খলিফাতুল্লাহ বললে, নিষেধ করে খলীফাতু রাসূলিল্লাহ বলার অনুমতি দিতেন। খলীফাদের কাজ কী হবে তা কুরআন বলে দিয়েছে:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত।" (হজ্জ : ৪১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) দায়িত্বশীল। যে দায়িত্ব তাঁর কাছে অর্পণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি [পরকালে] করতে হবে।[১৮৮] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন, যে পদ প্রত্যাশা করে তাকে সেটা দেওয়া হবে না। অর্থাৎ, নিজ থেকে পদ চাওয়া প্রার্থীর অযোগ্যতা প্রকাশ করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, অবশ্যই তোমরা আমীর হওয়ার জন্য লোভ করবে, অথচ বিষয়টি কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার কারণ হবে। কেননা, সে দুধ দানকারিণী খুব ভাল কিন্তু দুধ ছাড়ানিয়া খুব খারাপ।[১৮৯] অর্থাৎ, যখন নেতৃত্ব ও হুকুমত লাভ হয় তখন শবুতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু যখন হিসাব হয় তা দুনিয়ায় হোক বা আখিরাতে, তখন বুঝা যায় বিষয়টি কত মারাত্মক। হযরত আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলেছিলেন, আবু যর, তুমি দুর্বল। আর এই হুকুমত একটি আমানত এবং কিয়ামতের দিনের লাঞ্ছনা ও অপমান। তবে কেউ যদি এই আমানত যথার্থ তরীকায় গ্রহণ করে এবং আরোপিত শর্তাবলি ঠিক ঠিক আদায় করে [তা হলে ভিন্ন কথা]।[১৯০] আবার বলেন, আবু যর, আমি

---

[১৮৮] বুখারী : ৮৯৩।
[১৮৯] বুখারী : ৭১৪৮।
[১৯০] মুসলিম : ৪৮২৩।

দেখি তুমি দুর্বল। আর আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি, তোমার জন্যও তাই পছন্দ করি। তুমি কখনও দু'জন মানুষের উপরও আমীর নিযুক্ত হয়ো না এবং কোনো এতিমের মালের দায়িত্বও নিও না।[১৯১]

খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো জগৎ বিখ্যাত শাসক যাদের মতো ন্যায়বিচার ও সাফল্য জগতে আর কেউ কায়েম করতে পারে নি, তারা পর্যন্ত এসব দায়-দায়িত্বকে এক মহা-বিপদ মনে করতেন এবং এর থেকে দূরে থাকার শতভাগ চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁদের মতো মানুষ দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে জগতের বিরাট ক্ষতি হত এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁদের মতো মানুষের খলীফা হওয়া গোটা বিশ্বের জন্য ছিল অশেষ রহমতস্বরূপ।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যদি ফোরাত নদীর তীরে কোনো উট হারিয়ে মরে যায়, তা হলেও আমার ভয় হয় যে আল্লাহ আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।[১৯২] শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণের পূর্বে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করলে তিনি বলেন, আমার তামান্না হচ্ছে, আমি যেন (হুকুমতের এই দায়িত্ব থেকে) সমানে সমান রেহাই পেয়ে যাই, আমাকে পাকড়াও করা হবে না এবং আমার কোনো সওয়াবও হবে না।[১৯৩] তাঁর পরে তাঁর সুযোগ্য সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা মনোনীত করে যাওয়ার জন্য বলা হলে তিনি বলেন, উমরের খান্দানের জন্য যথেষ্ট যে, তাদের মধ্যে থেকে একজনের নিকট থেকে হিসাব নেওয়া হবে, তাকে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমি নিজেকে এই সঙ্কটে ফেলে দিয়েছি এবং এই কাজ আমার পরিবারের লোকজনের জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছি। আমি যদি কোনো রকমে এভাবে নিষ্কৃতি পেয়ে যাই

---

[১৯১] সুনানে আবু দাউদ : ৭১৪৮।

[১৯২] তবাকাত ইবনে সাআদ:৩/২৮৪, উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ তাকি উসমানী। *ইসলাম ও রাজনীতি*। মুহাম্মদ আব্দুল আলীম অনু. ২০১৩। ঢাকা:মাকতাবাতুল হেরা। পৃ. ২৩০।

[১৯৩] বুখারী : ৩৭০০।

যে আমার গুনাহও নেই সওয়াবও নেই তাহলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।[১৯৪]

তাঁদের ঈমানী শক্তি এতই বলিষ্ঠ ছিল যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর উদ্ভূত বিভিন্ন মারাত্মক সমস্যা যেমন, কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়া, কিছু লোকের যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি, ভণ্ড 'নবী' মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ও অন্যান্য সমস্যা প্রভৃতিকে তাঁরা নিমিষে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। অথচ, আজকের যুগে একটি রাষ্ট্রের জন্য যেসব সমস্যাকে সর্ববৃহৎ সমস্যা বলে মনে করা হয়, এগুলি ছিল ঠিক সেরকম কিংবা এর চেয়েও মারাত্মক। বিশেষত, ভণ্ড 'নবী' সমস্যা তো গোটা মানবসভ্যতার প্রতি এমন এক ফিতনা যা মানবতাকে আবার সেই আদীম জাহেলিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রথম খলিফা আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাজ্জাব ও তার সেনাবাহিনীর সঙ্গে অর্থাৎ, মিথ্যার সঙ্গে সত্যের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কাজ্জাবের বাহিনীকে পরাজিত করেন, কাজ্জাবের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল। ইতিহাসে লেখা আছে, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যাকাত প্রদান অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে অভিযানে নেমেছিলেন।

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হয়ে প্রত্যেক প্রদেশের গভর্নরকে একটি লিখিত নির্দেশ পাঠান, তাতে তিনি লিখেন, আমার মতে আপনাদের কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সালাত। এজন্য যে ব্যক্তি সালাত হিফাযত করবে ও এর ওপর অটল থাকবে সে তার দীন হিফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি সালাত বরবাদ করবে, তার অন্যান্য কাজ আরও বেশি বরবাদ হবে।[১৯৫] খলীফার এটি কোনো সাধারণ চিটি ছিল না, এটি ছিল সরকারি ফরমান যা তাঁর হুকুমতের সকল গভর্নরের কাছে আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু

---

[১৯৪] তারীখে তাবারী : ২/৫৮০, উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ তাকি উসমানী। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ২৩১।
[১৯৫] মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ৬।

আনহু কোন সালাত কোন সময়ে পড়তে হবে তারও বিস্তারিত বিবরণ এতে লিখেছিলেন। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে লোকজনের সামনে বসে তাদেরকে ওযুর সুন্নত তরীকা শিক্ষা দিতেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এমনটি বর্ণিত আছে।[১৯৬]

ইসলামি হুকুমতের ইতিহাসে এমন বহু অভূতপূর্ব ঘটনা আছে যে সাধারণ যে কেউ সরকার প্রধানের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করতে পারত যা আজকের যুগে কল্পনারও অতীত। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি তখন আমীরুল মুমিনীন, তাঁর একটি বর্ম হারিয়েছিল। সেটা তিনি এক ইহুদির কাছে দেখতে পান, কিন্তু ইহুদি হযরত আলীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাবী বরাবর অস্বীকার করে আসছিল। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালতে গড়ায়। বিচারক ছিলেন প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত শুরাইহ রহ.। এজলাসে ইহুদি আমীরুল মুমিনীনের দাবি অস্বীকার করলে বিচারক আমীরুল মুমিনীনের সাক্ষী তলব করেন। আমীরুল মুমিনীন দু'জন সাক্ষী উপস্থাপন করেন, একজন নিজের কাজের লোক, অন্যজন নিজের ছেলে। নিজের কাজের লোক ও ছেলে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, একথা বলে বিচারক সাক্ষী প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইহুদির পক্ষে রায় দেন। বাস্তবে বর্মটি ঠিকই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ছিল কিন্তু তিনি আদালতে তা প্রমাণ করতে পারলেন না। ইহুদির উপর এই বিচারের এমন প্রভাব পড়ল যে সে অপরাধ স্বীকারপূর্বক বর্মটি হযরত আলীকে ফিরিয়ে দেয় এবং বলে, যাদের বিচার এমন হয় তাদের ধর্ম যে সঠিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একথা বলে ইহুদি মুসলমান হয়ে যায়। এ ঘটনা তো খিলাফতে রাশেদার যুগের, এর পরের যুগেও এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

বিচারপতি খায়ের ইবনে নুআইমের সময়ে খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাঁর চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

---

[১৯৬] মুহাম্মদ তাকি উসমানী। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ২১৬।

মামলার শুনানীকালে খলীফা বিচারকের সঙ্গে তাঁর ফরাশে বসতে চান, কিন্তু বিচারক ইবনে নুআইম তাঁকে উঠিয়ে দিয়ে বলেন, চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে বসুন। খলীফা আবু জাফর মনসুরের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী বিচারক গাউস ইবনে সুলাইমানের আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং একজন উকিল নিযুক্ত করেন। বিচারক খলীফাকে আদালতে স্ত্রীর উকিলের সঙ্গে ফরাশে বসার নির্দেশ দেন এবং খলীফার বিরুদ্ধে রায় দেন।[১৯৭]

সমাজ সংশোধনের সর্বশ্রেষ্ঠ ওহিভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে যে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই জামাত এবং সর্বোপরি এই খিলাফতে রাশেদার মাধ্যমে বিশ্বসমাজ ইলম ও আমল– ধর্ম-কর্ম, চরিত্র ও নৈতিকতা, প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ, প্রতিভা ও যোগ্যতা প্রভৃতির সুষম সমন্বয়ে এমন এক সুসভ্য সমাজ ও শাসনব্যবস্থা লাভ করেছিল যার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে খোঁজে পাওয়া যায় না।

দিকে দিকে সত্যের প্রচার : সভ্যতার বিকাশ

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত খিলাফতের সময়কাল ছিল ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছরে মুসলমানরা পৃথিবীতে কী অসাধ্য সাধন করেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবি রেখে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলেই আজ মুসলমানদের সর্বপ্রথম পা ফেলার চিহ্ন আবিষ্কৃত হচ্ছে। সাহাবিগণের মূল কাজ ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রচার করা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে পৌঁছে দেওয়া। এই মহতী কাজে তাঁরা প্রায় গোটা দুনিয়ায় সত্যের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই তাঁর নির্দেশে সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সত্যের দাওয়াত

---

[১৯৭] মুহাম্মদ তাকি উসমানী। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২২৬।

নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আজ পৃথিবীর এমন কোনো দেশ হয়তো নেই যেখানে একজনও সাহাবীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কবর পাওয়া যাবে না। নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জন্মস্থান এবং কোথায় তাঁদের কবর হয়েছে তার চিত্র। এ থেকে সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে। তবে এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত নমুনা মাত্র, নয়তো প্রকৃত চিত্র যে কত বৃহৎ তার কোনো সঠিক তথ্য আমাদের হাতে নেই। গোটা বিশ্বের যেখানেই ঐ জামাতের কোনো সদস্য গিয়েছেন অধিবাসীদের প্রতি তাঁদের একমাত্র বার্তা হত এটি– আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন যেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন বের করে আনি মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে, জাগতিক সঙ্কীর্ণতা থেকে পরকালীন প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।[১৯৮]

সারণি : ৩.১ সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ইসলাম প্রচারের একটি নমুনা

সাহাবীর নাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	জন্মস্থান	কোথায় কবর হয়েছে
আবু আইয়ুব আনসারীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	মদীনা মুনাওয়ারা	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক
ওকবা ইবনে নাফের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	মক্কা মুকাররমা	সিদি ওকবা, আলজেরিয়া
আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	মক্কা মুকাররমা	উত্তর আফ্রিকা
মা'বাদ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	মক্কা মুকাররমা	উত্তর আফ্রিকা

[১৯৮] ইবনে কাসীর। *আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*। ৭ম খণ্ড। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪০।

দেখা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগে মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি অঞ্চলে ইসলামের আহ্বাণই শুধু পৌঁছে নি বরং ইসলামি হুকুমতও প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই জামাতের অন্তর আল্লাহ তায়ালা এমনই বদলে দিয়েছিলেন যে সাগর, পাহাড় কোনো কিছুই তাঁদের অভিযানকে আটকাতে পারে নি। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁদের সম্পর্কে বলেন, রাতে তাঁরা ইবাদতগুজার, দিনে রোযাদার। তারা ওয়াদা পূর্ণ করেন, সৎ কাজের আদেশ দেন ও মন্দ কাজে নিষেধ করেন আর পরস্পর ইনসাফপূর্ণ আচরণ করেন। অন্য একজনের মতে, দিনে তারা ঘোড়সওয়ার, রাতে ইবাদতগুজার। অধিকৃত এলাকায়ও তারা বিনামূল্যে কিছু গ্রহণ করেন না এবং বিনা সালামে কোথাও প্রবেশ করেন না। তৃতীয়জনের মতে, রাতে তারা সংসারত্যাগী, দিবসে অশ্বারোহী, তীর চালনায় পারদর্শী, বর্শা নিক্ষেপে কুশলী। তুমি যদি পাশের ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চাও, সে তোমার কথা বুঝতে পারবে না, কারণ চারপাশে শুধু তিলাওয়াত ও যিকিরের গুঞ্জন।[১৯৯] তাঁদের বক্তব্য হত– সকল বাতিল ও শোষণ-নিপীড়নের পথ পরিত্যাগ করে সত্যধর্ম ইসলামের দিকে এস, তা না হলে জিযিয়া দিয়ে ইসলামের হিফাযত ও নিরাপত্তা গ্রহণ কর। অন্যথায় মানবতা রক্ষা এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ফয়সালা তরবারীই করবে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা মুমূর্ষ বিশ্বমানবতার চিত্র অবলোকন করে এসেছি, এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তির পয়গাম আসার পর এটিই ছিল মুসলমানদের পরম কর্তব্য যা তারা শতভাগ পূরণের চেষ্টা করেছিলেন। এভাবে এই জামাত যখন সত্যের দাওয়াত দিতে লাগলেন তখন জরাগ্রস্থ মানুষ ও সমাজ সত্যকে গ্রহণ করতে শুরু করল। মুসলমানদের উন্নত চরিত্র, সহজ-সরল জীবন, সত্য ধর্মের আলোকচ্ছটা মানুষকে অনৈসলামিক সমাজে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে এক আল্লাহর গোলামীর দিকে ডেকে নিয়ে এল। লোকজন তখন

---

[১৯৯] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২১৮।

অনৈসলামিক নিপীড়নমূলক শাসনের পরিবর্তে বরং ইসলামি শাসনকে মনেপ্রাণে কামনা করত।[২০০] এর ফলেই প্রথম চার খলীফার যুগে মাত্র ত্রিশ বছরে গোটা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যসহ অসংখ্য দেশ ও অঞ্চল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ইসলামের যে দাওয়াতের ধারা শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন, ফলে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার শাসনামলেই ইসলামি সালতানাতের আয়তন দাঁড়ায় ২২ লক্ষ ৫১ হাজার ৩০ বর্গমাইল। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সত্য প্রচারের যে নকশা পোষণ করতেন, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তা ইরান, ইরাক-আরব, ইরাক-আযম, সিরিয়া (লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন), মিশর, আলজেরিয়া, আরমেনিয়া, আযারবাইজান, খুজিস্থান, কায়েস, কুরমান, খোরাসান, মরকান, বেলুচিস্তানের কিছু এলাকা প্রভৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মোটামুটি ১ লক্ষ ৩৬ হাজার শহর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে।

মানচিত্র-১: খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে মুসলিম সালতানাত

[২০০] মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী। ২০১৪। *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*। মুহিউদ্দীন শামী অনু. ঢাকা:ইফা। পৃ. ৪৩৫-৫১৪; টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড। ২০১২। *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*। মো: সিরাজ মান্নান ইব্রাহিম ভূঁইয়া অনু. ঢাকা:ইফা। পৃ. ৪৫৬-৪৭৫।

অবশ্য এসব বিশাল অঞ্চল এত অল্প সময়ে অতি মোলায়েম পন্থায় ইসলামের শান্তির ছায়ায় আসে নি, এজন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। মানুষকে মানুষের দাসত্ব ও শোষণ-নিপীড়নের নিগড় থেকে মুক্ত করতে গিয়ে সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাতকে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহেরও মুকাবিলা করতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মুতার যুদ্ধ

নবুয়তের ৮ম হিজরীতে জমাদিউল উলা মাসে, ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার মুতা নামক স্থানে হিরাক্লিয়াসের ২ লাখ রোমান বাহিনীর সঙ্গে ৩ হাজার মুসলিম বাহিনীর এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ইহুদি-খ্রিস্টান মিলিত শক্তি শুরু থেকেই ইসলামকে দুনিয়া হতে চির বিদায় করার চেষ্টা করতে থাকে। তাদের স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থে শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং তাঁর ওপর ঈমান আনার নির্দেশ থাকলেও হিংসুক ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ এটি অস্বীকার করতে থাকে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৪ জন সাহাবীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম একটি দল রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রান্তরে জাৎ-আৎলায় গমন করেন। এই দল লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেই লোকজন তাঁদেরকে আক্রমণ করে ১৩ জনকেই শহীদ করে দেয়। এই সময়ে আরেকটি হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য ধর্মের দাওয়াতপত্র দিয়ে প্রিয় শিষ্য হারিস বিন উমায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বসরার শাসনকর্তা শোরাহ্‌বিলের নিকট প্রেরণ করেন। পরম পরিতাপের বিষয় যে শোরাহ্‌বিল দূত হত্যা না করার রীতি ভঙ্গ করে এই সত্যের সৈনিককে নির্লজ্জরূপে হত্যা করে ফেলে। শুধু তাই নয়, সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রথম প্রথম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেও হয়তো পরিস্থিতির চাপে পড়ে তিনিও ইসলামের শত্রুতে পরিণত হন। দিকে দিকে ইসলামের মশাল বিস্তৃত হতে দেখে ইসলামকে মুছে ফেলার অশুভ চক্রান্তে তিনিও শরীক হয়ে যান।

সিরিয়ার মাআন প্রদেশের গভর্ণর ফারোয়া ইসলাম গ্রহণ করলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ইসলাম ত্যাগের নির্দেশ দেন। ফারোয়া ইসলাম পরিত্যাগ না করলে সম্রাট তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। খ্রিস্টানদের দুস্কৃতির এখানেই শেষ ছিল না। তারা মদীনা আক্রমণের ফন্দিও আঁটতে থাকে। সংবাদ পেয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সেনাপতিত্বে তিন হাজার মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। স্মরণ রাখা উচিত যে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্রিতদাস ছিলেন, কিন্তু ইসলাম এসব জাহিলী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে রাতারাতি তাঁকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধানে পরিণত করে দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলে সেনাপতি হবেন জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তিনি শহীদ হলে সেনাপতি হবেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তিনি শহীদ হলে তোমরা পরামর্শ করে পরবর্তী অধিনায়ক ঠিক করবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তোমরা নারী, শিশু, অন্ধদের হত্যা করবে না, কোনো বাসস্থান ধ্বংস করবে না- এমনকি কোনো বৃক্ষও কাটবে না। আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করুন। বিপদ-আপদ থেকে তোমাদের নিরাপদ রাখুন এবং নিরাপদে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন।"

মুসলিম বাহিনী মায়ানে পৌঁছে বিপুল রোমান বাহিনীর খবর জানতে পারে। রোমান সম্রাট কয়েক কোম্পানী গ্রিক ও অন্যান্য সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন করেন। রোমানদের বিপুল সৈন্যের খবর পেয়ে মুসলিম বাহিনীর কেউ কেউ আরো সৈন্য চেয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ পাঠাতে বলেন। মুসলমানরা এই প্রস্তাব মেনে নিতে যাচ্ছিলেন। এসময় আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ান। বীরত্ব ও বাগ্মিতায় তিনি ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্ব। সৈন্যদের লক্ষ্য করে তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে এক দারুন ভাষণ দান করেন যা সারা জীবন শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

বন্ধুগণ, বিস্ময়কর ব্যাপার! আপনারা শাহাদাত বরণের মহান ব্রত নিয়ে এখানে এসেছেন। আর এখন শাহাদাতের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। বন্ধুগণ! যুদ্ধোপকরণ, শক্তি কিংবা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে আমরা শত্রুর মুকাবিলা করি না। আল্লাহর প্রদত্ত ধর্ম বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে আমরা শত্রুর মুকাবিলা করে থাকি। আর এই ধর্ম বিশ্বাসের জন্যই আল্লাহ্ আমাদেরকে সারা বিশ্বে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন।

এই বলিষ্ঠভাষী কবির ভাষণ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সবাই একবাক্যে বলে উঠেন, "আল্লাহর শপথ! ইবনে রাওয়াহা যথার্থ বলেছেন।" মুসলিম বাহিনী সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হয়ে বল্লাকা সীমান্তে পৌঁছে। মুসলিম বাহিনী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করে মুতা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে শুরু হয় ঐতিহাসিক মুতার যুদ্ধ। হযরত যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি জানতেন যে হয়তো আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের গৌরবময় মৃত্যু হবে নয়তো গাজী বেশে বাড়ি ফিরব। যে শাহাদাতের মৃত্যুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মৃত্যু নেই, হযরত যায়েদের ভাগ্যে তা-ই নসিব হল।

এবার হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ও বীরপুরুষ ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল। তিনি দারুণ নৈপুণ্যে যুদ্ধ করতে লাগলেন। রোমান বাহিনী তাঁর ঘোড়াকে ঘেরাও করলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং ঘোড়ার এক পা কেটে ফেললেন। এরপর একহাতে ঝাণ্ডা ও অন্যহাতে তরবারি নিয়ে শত্রু ব্যূহে ঢুকে এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেন যা অতীত ইতিহাস কখনও দেখেনি। তাঁকে আটকানোর জন্য শত্রুরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিল, উপায়ন্তর না দেখে শত্রুরা হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যে হাতে ঝাণ্ডা ছিল, সেই হাতে আঘাত করে। ফলে তাঁর ঐ হাত কেটে পড়ে যায়। এবার তিনি বাঁ হাতে ঝাণ্ডা তুলে ধরেন এবং শত্রুর তরবারির আঘাতে সে হাতও হারান। এবার মর্দে মুজাহিদ [দন্ত দ্বারা কামড়ে ধরে] দুই বাহু দ্বারা ঝাণ্ডা আঁকড়ে ধরেন। এভাবে তিনিও শাহাদাতের শ্রেষ্ঠ

মৃত্যুকে বরণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এবার বীরকেশরী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে যান আর নিজেকে বলেন, "আমি শপথ করছি! হে আমার আত্মা! তুমি পছন্দ কর আর নাই কর, তোমাকে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটা কী হতে পারে, বন্ধুরা আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যাবে আর তুমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" তিনি কবিতার পংক্তি আওড়াচ্ছিলেন আর শত্রুসেনাদের ধরাশায়ী করছিলেন। এক সময় তাঁর ভাগ্যে শাহাদাতের মরণ-বরণ অর্জিত হল। এরপর এমন এক মুসলিম বীর সেনাপতির দায়িত্ব নেন, যার বীরত্বের তুলনা এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। তিনি মহাবীর হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

মহাবীর হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ ﵁

তিন তিন জন সেনাপতি শহীদ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সেনারা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। রণকৌশল ও বীরত্বে ছিলেন অতুলনীয়। তিনি দ্রুত সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর অনন্য রণকৌশল প্রয়োগ করা শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি দ্রুত সৈন্য বাহিনী পুনর্বিন্যাস করে ফেললেন। হযরত কোতায়বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জ্বালাময়ি ভাষণ দিয়ে মুসলিম সেনাদলকে উজ্জীবিত করলেন। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'চারটা আক্রমণ চালিয়ে খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রণাঙ্গনে টিকে থাকলেন। বিপুল শত্রু বাহিনী তাঁর ব্যূহে চিঁড় ধরাতে ব্যর্থ হল। রাতের অন্ধকার নেমে আসলে উভয় পক্ষ থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ মুলতবি ঘোষণা করা হল।

পরদিন সকালে সেনাপতি খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশকে রণাঙ্গন থেকে একটু দূরে সরিয়ে ফেললেন। ভোর হতেই তারা তকবীর ধ্বনি দিতে দিতে রণাঙ্গনে এসে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল। অন্যদিকে যুদ্ধ ব্যূহকে তিনি এমন ভাবে সাজান যে আগের দিনের সম্মুখের সৈন্য পিছনে আর পিছনের সৈন্য সম্মুখে

অবস্থান গ্রহণ করে। রণকৌশলী হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই কৌশল শত্রুদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলল, তারা মনে করল যে মুসলিম দলে আজ প্রচুর নতুন সৈন্য এসে যোগ হয়েছে। তারা ভাবল, গতকাল তিন হাজার সৈন্যেকে পরাজিত করা যায় নি, আমাদের অসংখ্য লোক নিহত হয়েছে। আজ তারা নতুন জনশক্তিতে বলীয়ান হয়ে রণাঙ্গনে এসেছে। সুতরাং আজ হয়তো আমাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হবে। এভাবে তারা ঘাবড়ে যায়। তারা মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং সামনে এক পাও এগুবার সাহস করেনি বরং পলায়ন করতে শুরু করে। মুসলমানগণ যখন দেখলেন শত্রুপক্ষ সামনে আসছে না তখন সেনাপতি খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ কৌশলের অংশ হিসেবে নিজ সৈন্যকে সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে না দিয়ে বরং মদীনার দিকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এই যুদ্ধে মুসলমানরা নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেনি, তবে দুই লাখ সমেত রোমানরাও বিজয়ীর গৌরব নিয়ে ফিরে যেতে পারে নি। বিরাট রোমান বাহিনীর সম্মুখে অনেক মুসলিম সৈন্য সেদিন মনোবল হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সৈন্যরা যদি সেই আল্লাহ-ভরসার রশিকে তিন তিন জন সেনাপতি হারানোর এমন কঠিন মুহূর্তেও শক্ত করে ধারণ করতে পারতেন তাহলে হয়তো মাত্র ৩ হাজার মুসলিম সৈন্যের সঙ্গে ২ লক্ষ সুসজ্জিত রোমান সৈন্যের নিরঙ্কুশ পরাজয়ের আরেক অভূতপূর্ব ইতিহাস রচিত হয়ে থাকত। মুসলমানদের জন্য কী তাহলে মহান আল্লাহর এটি একটি সর্বকালীন শিক্ষা? হয়তো। সুসজ্জিত ২ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র ৩ হাজার মুসলিম সৈন্যের পরাজিত না হওয়া তো এটাই ইঙ্গিত বহন করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে যুদ্ধের খবর পেলেন। তিনি বললেন, যায়দ ইবনে হারিসা পতাকা হাতে নিয়ে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গিয়েছে। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করেছে এবং সেও শহীদ হয়ে গিয়েছে। এতটুকু বলে তিনি নীরব হয়ে যান। তারপর বলেন,

তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করেছে এবং লড়তে লড়তে সেও শহীদ হয়ে গিয়েছে। অতপর একজন 'সাইফুল্লাহ', অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি (খালিদ ইবনে ওয়ালিদ) পতাকা হাতে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করেছেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমি দেখলাম, জান্নাতে এদের সকলকে আমার কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই স্বর্ণের পালঙ্কে উপবিষ্ট রয়েছে, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার পালঙ্ক একটু কাৎ হয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হল, এমনটি হল কেন? তিনি বললেন, ওরা দু'জন নির্দ্বিধায় সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল। পক্ষান্তরে, আবদুল্লাহ্ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তারপর অগ্রসর হয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ রা- এর জন্য এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! খালিদ তোমারই তরবারি! তুমি তাঁকে চির বিজয়ী রাখিও। মুতার যুদ্ধে প্রবল দুর্যোগে খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এমন যুদ্ধ করলেন যে, স্বয়ং তিনি বলেন (বুখারী : ১৫৩৫), মুতার জিহাদের দিন আমার হস্তে নয়টি তরবারি ভেঙ্গেছে, শেষ পর্যন্ত একটি ইয়ামনি তরবারি বাকি ছিল।[২০১]

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

ইসলামের অগ্রযাত্রায় অমুসলিমদের অন্তরজ্বালা দিন দিন বাড়তেই থাকে। ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এবার তারা আরো বিরাট প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এ খবর শুনে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এবার রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের মুকাবিলা হয় সিরিয়ার ইয়ারমুক প্রান্তরে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রায় আড়াই লক্ষ রোমান সৈন্য মুসলমানদের সঙ্গে লড়তে এসেছিল। মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪ হাজার। সাহাবা জামাতের

---

[২০১] *সিরাতে ইবনে হিশাম*; বুখারী : মুতার জিহাদ অধ্যায়।

অবিচল লৌহ কঠিন ঈমানী বলের সম্মুখে রোমানদের এমনই পরাজয় সেদিন ঘটেছিল যা পৃথিবীতে আজও নজীরবিহীন হয়ে আছে। হযরত ইকরিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, শুরাহবীল ইবনে হাস্সান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আর মহাবীর সর্বাধিনায়ক হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের বাহিনীর রণকৌশল ও বীরত্বের কাছে লক্ষ লক্ষ রোমান সৈন্য-ব্যূহ সেদিন তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ইকরিমা বিন আবু জাহেল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়ারমুকের যুদ্ধে তাঁর কালজয়ী মন্তব্য করে বলেছিলেন, যখন সত্য বুঝিনি তখন আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি আর আজ যখন সত্য চিনতে পেরেছি তখন কী পালিয়ে যাব? রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের সম্মুখে দাঁড়াতেই পারে নি, নিরঙ্কুশ পরাজয় ও পলায়ন বরণ করে। শুধু পানিতে পড়েই প্রায় ১ লক্ষ রোমান সৈন্য মারা গিয়েছিল।

যুদ্ধরত অবস্থায় সর্বাধিনায়ক খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এর হাতে সরকারি ফরমান আসে, তাতে ছিল খলীফা আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের ও তাঁর জায়গায় আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সর্বাধিনায়ক নিয়োগের খবর। এ ফরমান ছিল নতুন খলীফা হযরত ফারুকে আযমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পক্ষ থেকে। বীরবর খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু চিঠির সংবাদ গোপন রাখলেন যাতে সৈন্যদের মধ্যে দুর্বলতা ও হতাশা না আসে। হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন থেকে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে একইভাবে লড়ে গেলেন এবং বিজয় ছিনিয়ে এনে ক্ষান্ত হলেন। কারণ, এরা তো ছিলেন নবীর সাহাবী, সত্যিকারের মুসলমান, সর্বশ্রেষ্ঠ মুমীন, তাঁরা লড়েন একমাত্র আল্লাহর জন্য কোনো পদ-পদবীর জন্য নয়।[২০২] যুদ্ধে যিনি প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে হযরত আবু উবায়দাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আপনি আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২০২] ইবনে কাসীর। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ইয়ারমুকের যুদ্ধ।

ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাবেন আর বলবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তার সবগুলোই সত্য ও সঠিক পেয়েছি।[২০৩]

আল্লাহর সত্য দীন প্রচারে মুসলমানদের নির্মল প্রচেষ্টা, এজন্য মিথ্যার বিলোপ সাধনে প্রাণান্তকর জিহাদী প্রেরণা ও ইজতিহাদী কর্মতৎপরতা ধীর ধীরে গোটা বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত করে। দেখা যায়, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেই গোটা হিজাজ ভূমি, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চল ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে এবং এশিয়া, ইউরোপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামের শান্তির বার্তা পৌছে যায়। আমীরুল মুমিনীন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ফিলিস্তিন ও বাইতুল মাকদিস বিজয় অর্জিত হয়।

মহানবীর ﷺ সাহাবীগণ رضي الله عنهم : মানবসভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট জামাত

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, পবিত্র কুরআনের শুভ সূচনা হয়েছে পড়াশোনা, জ্ঞান, কলম সম্পর্কে। কারণ এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হবে মানবতার উৎকর্ষের যুগ। তাঁর রিসালতই সর্বশেষ রিসালত আর এটি বহাল থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত যখন মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার সাধিত হবে। সুতরাং, উম্মতে মুহম্মদীর উন্নতি, অবনতি, সফলতা, ব্যর্থতা জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, এই উম্মত পড়ালেখা, গবেষণা ও তাসনিফাতের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে থাকতে পারবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য তাকদীরী ফয়সালা হচ্ছে, উম্মতে মুহাম্মদীর পথচলা, জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সফলতা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত।[২০৪] এতে এটিও প্রমাণিত হয় যে, কিতাবের পাশাপাশি সুযোগ্য গবেষক ও শিক্ষকের প্রয়োজন অনিবার্য যা ছাড়া কোনো সত্য বেশিদিন ঠিকে থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

---

[২০৩] *প্রাগুক্ত।*

[২০৪] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ভাবনা*। আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া অনু. ২০১৫। ঢাকা:মাকতাবাতুল আযহার। পৃ. ২৪-২৫।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۞ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ط وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۞

অর্থাৎ "যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?" (যুমার : ৯) তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান কার হয়।" (বাকারা : ২৬৯)

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আপনি বলুন, হে প্রভু, আমাকে জ্ঞান দান করুন।" (ত্বাহা : ১১৪)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন। বস্তুত আমি বন্টনকারী এবং আল্লাহ হলেন দাতা।"[২০৫] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জ্ঞান পিপাসী স্বয়ং জ্ঞানের অন্বেষণে থাকে আর বেহেশত স্বয়ং জ্ঞান অন্বেষণকারীর অনুসন্ধানে থাকে।

সুতরাং ইসলামের শিক্ষামালাকে ধারণ ও প্রচার করার জন্য ঐ সময় এমন একটি মানব কাফেলার প্রয়োজন অনিবার্য ছিল যারা এজন্য অতুলণীয় যোগ্যতার অধিকারী হবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা জামাত-ই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হলেন সেই সৌভাগ্যবান আলোর কাফেলাসমগ্র যারা এই স্থান শতভাগ পূরণ করেছিলেন। সোনালী যুগের প্রথম কাফেলা ইসলামের নির্দেশনাকে এমনভাবে অবলম্বন করলেন, এমন সোনার মানুষে পরিণত হলেন যার কোনো তুলনা নেই। এর পরিচয় আমরা পূর্বের অধ্যায়ে পেয়েছি। আবার তাঁদেরই অনেকে কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসকে এমনভাবে পাঠ করলেন যে, একেক জন

---

[২০৫] মুত্তাফাকুন আলাইহি; মিশকাত।

হয়ে ওঠলেন কুরআন-হাদীসের স্বার্থক বিশেষজ্ঞ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কুরআনের পাশাপাশি এর অর্থ ও ব্যাখ্যা অর্থাৎ, হাদিসের এমনই কদর করতেন যে, একটি হাদিস শোনার জন্য খেয়ে না খেয়ে নবীর দরবারে দিনের পর দিন পড়ে থাকতেন। আসহাবে সুফফার সাহাবা জামাতের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জ্ঞান ও আমল অর্জনে ছিলেন সর্বেসর্বা, অথচ মুহাজির সাহাবিগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম তো ছিলেন বাস্তুহারা। সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কুরআন-হাদীসের কদর করেছিলেন সবচেয়ে বেশি, অনুসরণে-অনুকরণে।

সোনালী যুগের এই সোনার মানুষজন এমন যুগে জ্ঞান সাধনা করেছেন যখন আজকের ইউরোপ সে সময়ের শত বছর পরেও গোসলে ময়সা সাফ করার জন্য গাত্র প্রক্ষালনকে অসভ্যতা মনে করত। অর্থাৎ, প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর যে চিত্র আমরা অবলোকন করে এসেছি, সেই সপ্তম শতকে মদীনার এক খেজুর পাতা ও ডালপালা নির্মিত মসজিদকে কিছু মুসলমান নিজেদের আবাস বানিয়ে নিয়েছিলেন এজন্য যে, তারা যেন ইলম ও আমল, সত্য ও সুন্দরের চর্চা, উন্নত মূল্যবোধ শিখতে পারেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক পাশে তাঁদের জন্য কিছু জায়গা আলাদা করে একটি শিক্ষায়াতন গড়ে দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে এমন অনেক দেদীপ্যমান তারকা ছিলেন যাদের ঐ সাধনা আজও পৃথিবীকে বস্তুপূজার কালো অন্ধকারের মধ্যেও নির্মল জ্ঞানের আলো দিয়ে যাচ্ছে, যাবে কিয়ামত অবদি।

প্রথম চার খলীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এরকম অসংখ্য সাহাবী ছিলেন ইলমে নববী হাসিলের দিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাফসীরে আব্বাসী আজও সকল তাফসীরের উস্তাদ।

আল্লাহর বাণীর বিশুদ্ধ কিরাআত, অর্থ ও মর্ম তথা তাফসির, বিশুদ্ধ আমল, মুআমালাত, মুআশারাত প্রভৃতি জ্ঞান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতে থেকে সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এমন উচ্চরূপে হাসিল করেন, গভীরভাবে চিন্তা করলে স্বীকার করতে হবে যে, ষষ্ঠ শতকের অন্ধকারকে দূরীভূত করে বিশ্বসমাজকে আলো বা রেনেসাঁর পথ দেখানোর এরাই ছিলেন প্রকৃত অগ্রপথিক। সুতরাং, প্রথম চার খলীফা, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম- এর মতো সাহাবীগণ যখন আল-কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ও তাফসীরের জ্ঞান হাসিল করলেন তখন আরেক দল দাঁড়িয়ে গেলেন এই তাফসীরের ভাষ্য হাদীসের, যা ছাড়া কুরআনের তাফসির অসম্ভব, সংগ্রাহক ও সংরক্ষকরূপে।

হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এমনই এক জ্ঞান-নক্ষত্র। জ্ঞানের প্রতি এমন উৎসর্গীপ্রাণ মানুষ বিরল। জ্ঞান অর্জনের জন্য নববী দরবারে নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতির কারণে তাঁকে যেরকম অনাহার ও অনটনের কষ্ট সইতে হয়েছে তা তুলনাহীন। তিনি নিজে বলেন, কখনও কখনও এত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তাম যে, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কোনো একজনকে কুরআনের কোনো একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম অথচ সেটি তার চেয়ে আমারই বেশি জানা। উদ্দেশ্য, তিনি যেন আমাকে সঙ্গে করে তাঁর ঘরে নিয়ে যান এবং কিছু খেতে দেন! এরকম একদিন আমি খুব ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে সাহাবীদের যাতায়াত পথে বসে রইলাম। প্রথমে আবু বকর পাশ দিয়ে গেলেন। তাঁকে এই আশায় কুরআনের একটি আয়াত জিজ্ঞেস করলাম যে, হয়তো তিনি আমাকে ডেকে নেবেন, কিন্তু তিনি ডাকলেন না। এরপর আসলেন উমর, তাঁকেও একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনিও ডাকলেন না। শেষ ব্যক্তি যিনি এই পথ দিয়ে গেলেন তিনি ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা। দরদভরা কণ্ঠে ডাকলেন, 'আবু হোরায়রা'? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, লাব্বাইক ইয়া

রাসূলুল্লাহ। এরপর তাঁর পিছে পিছে চললাম, তাঁর ঘরে ঢুকলাম। একটি পেয়ালায় সামান্য দুধ ছিল, একজন তাঁকে হাদিয়া পাঠিয়েছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, যাও আসহাবুস্ সুফ্ফাকে ডেকে নিয়ে আস। এতে আমি খুব হতাশ হলাম যে, এই সামান্য দুধে গোটা আসহাবুস্ সুফ্ফার কী হবে? আমার মন চাচ্ছিল, পেয়ালা থেকে অন্তত এক চুমুক খেয়ে নিয়ে তারপর তাদের কাছে যাই, যাতে কিছুটা হলেও দুর্বলতা কাটে। আমি আসহাবুস্ সুফ্ফার সদস্যদেরকে ডেকে নিয়ে এলাম। সবাই এলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, এই নাও আবু হোরায়রা, সবাইকে দাও। আমি একেক জনকে দেই, যাকে দেই সে তৃপ্ত হয়ে পাশের জনকে দেয়, এভাবে সকলের পান করা শেষ হলে পেয়ালাটি নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে দিলাম। তিনি মুচকি হেসে আমার দিকে মাথা তুলে তাকালেন আর বললেন 'শুধু আমি আর তুমি বাকি'। আমি বললাম, আপনি সত্য বলেছেন হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাহলে খাও। আমি খেলাম। তিনি আবারো বললেন, খাও, আমি খেলাম। এভাবে তিনি বলতেই থাকলেন আর আমি খেতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আমি আরয করলাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ করে বলছি, আমি আর খেতে পারছি না। তখন তিনি আমার হাত থেকে পাত্রটি নিলেন এবং অবশিষ্ট দুধ পান করলেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতাম। প্রথম ভাগে নিদ্রা যাপন করতাম, দ্বিতীয় ভাগে ইবাদত করতাম আর তৃতীয় ভাগে নবীজীর হাদিস মুখস্ত করতাম। (মুসনদে দারেমী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তাঁকে বলা হয় রাইসুল ক্কুর্রা, তিনি বলতেন, আমি ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহর কুরআনের কোন্ আয়াত কখন কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে তা আমি জানি! আমি যদি জানতে পারি যে কুরআন সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ কেউ আছে তবে নিশ্চয় তার নিকট যেতাম। এই

নক্ষত্রও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসহাবুস্ সুফ্‌ফার সদস্য ছিলেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক খাদেম ছিলেন। তাঁর পানাহারের ব্যবস্থা বলতে এমন ছিল যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু এলে খেতেন নয়তো ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাতেন। এভাবেই তাঁরা খেয়ে না খেয়ে ইলমের ঝরনাধারা পৌঁছে দিয়ে গেছেন অনাগত মানুষের জন্যে।

হযরত সালমান আল-ফারসি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সত্যের সন্ধানে প্রথমে পারস্যে পৈত্রিক সুখের আলয় থেকে পালিয়ে, অতঃপর বারে বারে বিক্রি হতে হতে শেষ পর্যন্ত মদীনায় নীত হন ক্রীতদাস হিসেবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভের জন্যই তাঁর মদীনায় আগমন। কিন্তু এখানে তিনি এক ইহুদির ক্রীতদাস। অতঃপর সত্য গ্রহণ এবং সত্যের আলোকে মানব দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু সহায় নেই, সম্বল নেই, কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, যাকে বলে নিরঙ্কুশ বাস্তুহারা ও সর্বহারা। কিন্তু যার আছেন মহান ও পবিত্র রাব্বুল আলামীন আর তাঁর দরদী রাসূল রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর চেয়ে ধনী আর কে আছে? যে সত্যের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ, এখন সত্য পেয়ে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য, তাঁর থেকে নির্ভেজাল ইলম ও আমল অর্জনের সাধনাকেই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন আসহাবুস্ সুফ্‌ফার সদস্য। কত যে দিন-রাত এই সোনার মানুষগুলোর অনাহারে অর্ধাহারে পার হয়েছে তা আজ কে বুঝবে? এই মহান সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সাহাবা জামাতের যুগ থেকেই কুরআন লিখে সংরক্ষণ করার মতো হাদিসও লিখে সংরক্ষণের ইতিহাস রয়েছে। আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্‌ইয়া তাঁর এক

গ্রন্থে এর উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।[২০৬] সহিফা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, সহিফা আমর ইবনে হাযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (ইয়ামনের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে সেখানে যোগ দেওয়ার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লিখিত এই হিদায়াতনামা দিয়েছিলেন), সহিফা সামূরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, সহিফা সাঈদ ইবনে উবাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, সহিফা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, সহিফা মুগীরা ইবনে শোবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মুসনাদে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবু হুরায়রার শিষ্য বশীর ইবনে নাহীকের হাদিস সংকলন (দারেমী), কিতাবুল সাদাকাহ্ (এটি নবীজী সংকলন করিয়েছিলেন), সহিফা আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫), সহিফা ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। হযরত আবু কুরায়ব রহ. হযরত ইবনে আব্বাসের খাদিম ছিলেন, তিনি বলেন, তিনি ইবনে আব্বাসের কিতাবাদির এক বিরাট স্তুপ পেয়েছিলেন যা এক উটের বোঝা হবে। ওপরের পরিসংখ্যান হাদিস বর্ণনার একটি নমুনা মাত্র, প্রকৃত পরিসংখ্যান নয়। প্রায় ১,২৫,০০০ বা ১,১৪,০০০ সাহাবীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মধ্যে হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা যদি হাফেজ যাহাবীর মতে ১৫০০ জনও হন তাহলে তাঁরা প্রায় ২,৫২,৮০০ হাদিস বর্ণনা ও সংকলন করে গেছেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।[২০৭]

ষষ্ঠ শতকে যে মুমূর্ষু বিশ্ব-মানবতা আমরা দেখে এসেছিলাম তাকে প্রাণ দিয়ে, সভ্যতা দিয়ে ফুলে-ফলে ভরিয়ে তুলেছিল যে কুরআনী শিক্ষামালা, তার প্রথম স্বার্থক ধারক-বাহক, সংরক্ষক ও বন্টনকারী ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালী সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। যে প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি, কাফির-মুশরিকদের নিপীড়ন-নির্যাতন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য অকাতরে সহ্য করে দুর্ভেদ্য মরুভূমি, গিরি-গুহা পাড়ি দিয়ে চিরন্তন ঐ

---

[২০৬] আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া। ২০১২। *হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি*। ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার। পৃ. ২৪-২৫।
[২০৭] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৪-২২।

শিক্ষামালা বা ইলম ও আমলের মশাল তাঁরা সংরক্ষণ করেছেন, অতঃপর বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি নেই, ভবিষ্যতেও হবে না; কুরআন ও হাদিস মুখস্ত করে, লিখে এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে তাঁরা এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যে কুরআন ও এর ব্যবহারমালা লাভ করে মানব-বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি-নৈতিকতা, উন্নতি ও প্রগতি লাভে ধন্য হয়েছে, তা এই সাহাবা জামাতের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মাধ্যমেই বিশ্ববাসী প্রাপ্ত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান-অবদান যেমন অপরিশোধ্য তেমনি তাঁর সাহাবা জামাতের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম দান-অবদানও অপরিশোধ্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহাবা জামাতকে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম অবজ্ঞা করে, পাশ কাটিয়ে বিশ্ব-মানবতার ত্রাণকর্তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল্যায়ন করা এবং করুণা ও দান-অবদান লাভ করা সম্ভবই নয়।

সারণি : ৩.২ সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হাদিস বর্ণনার দৃষ্টান্ত- ১

সাহাবীর নাম	বর্ণনাকৃত হাদিসের সংখ্যা
হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৫,৩৭৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	২৬৩০
হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	২২৮৬
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	২২১০
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৬৬০
হযরত যাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৫৪০
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১১৭০
মোট সাত জন	১৬,৮৭০

সূত্র : ইবনে হজম, *আসমাউস সাহাবাহ আর রুআত*।

সারণি : ৩.৩ সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাদিস বর্ণনার দৃষ্টান্ত- ২

হাদীসের সংখ্যা	সাহাবীর رضي الله عنهم সংখ্যা	বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা
৫০০-১০০০	৪ জন	২৬২১
১০০-৫০০	২৮ জন	৫৪৫৯
৪০-১০০	৪৫ জন	২৬৪৪
১০-৪০	১১২ জন	২১২২
১-৯	৯১৬ জন	১৯৮০
মোট	১১০৫ জন	১৪,৮২৬

সূত্র : ইবনে হজম, *আসমাউস সাহাবাহ আর রুআত*।

তাবেঈগণ : মানবসভ্যতার দ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট জামাত

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম শত্রুর তরবারির মুখে মহান রবের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে সত্যকে রক্ষা করেছিলেন, যারা বেঁচেছিলেন তাঁরা মানবতা ও সভ্যতা রক্ষার এই মূলধনকে আপন জীবনের চেয়ে মূল্যবান বিবেচনা করে আগলে রেখে তাঁদেরই শিষ্য তাবেঈগণের কাছে শতভাগ পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম গোটা হিজাজ ভূমি, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাবেঈগণের মাধ্যমে দ্বিতীয় যে প্রতিভা দলের উদ্ভব হল তার নমুনাও সাহাবা জামাতের পরে এই বিশ্ব কখনও দেখেনি। এঁরা এই মূলধনকে সংরক্ষণ এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মহৎ কর্মটিও শতভাগ শততার সঙ্গে পালন করেছিলেন। যুগের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের বিপদের কথা ভেবে তাঁরা এইক্ষেত্রে এমন আরেক প্রয়োজন, ইজতিহাদের মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়ার সূত্রপাত করলেন যা অভূতপূর্ব তো বটেই বরং বিস্ময়করও; সময় বিচারে নিঃসন্দেহে এটি ছিল ফিকহি ইজতেহাদের সুবর্ণ কাল যা এর উৎসমূল অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাহাবা জামাতের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মাধ্যমে স্পর্শ করে জন্ম লাভ করেছিল। হযরত আবু সাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عن أبي سعيد رضى الله، عنه ، عن النبيّ صلى الله، عليه وسلم ، قال:يأتي على الناس زمان يغزون ، فيقال لهم:فيكم من صحب الرسول صلى الله، عليه وسلم ، فيقولون نعم ، فيفتح عليهم ، ثم يغزون ، فيقال لهم هل فيكم من صحب من صحب الرسول صلى الله، عليه وسلم ، فيقولون نعم ، فيفتح لهم ،

অর্থাৎ, লোকদের নিকট এমন যুগ আসবে যে, তারা যুদ্ধ করবে, তখন তাদের বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও কি আছেন, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ পেয়েছেন? তখন তারা বলবেন হ্যাঁ। তখন (সাহাবাদের বরকতের দরুন) তাদেরকে বিজয় দেওয়া হবে। তারপর তারা জিহাদ করবে, তখন তাদের বলা হবে তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কি আছেন, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সাহচর্য পেয়েছেন? তখন তারা বলবেন হ্যাঁ। তখন তাদেরকে বিজয় দিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী: ৩৩৯৯)

ইমাম যাহাবী রহ. (৭৪৮ হি.) তাঁর বিখ্যাত *সিয়ারু আলামিন নুবালা* গ্রন্থে তাবেঈগণকে ছয় শ্রেণিতে ভাগ করেছেন এবং এক একটি শ্রেণিতে শত শত তাবেঈর জীবনীও উল্লেখ করে দিয়েছেন। যদি প্রতি শ্রেণিতে একশ করে ধরা হয় তাহলেও তাবেঈগণের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় শত। তাহলে দেখা যায় শত শত, সম্ভবত শহস্র তাবেঈ অনুপম প্রেম-ভালবাসা, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় ব্যয় করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া শিক্ষামালা সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কাছ থেকে পরম ভক্তিভরে সকল তনুমন উজাড় করে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, অতঃপর কঠোর সংগ্রাম ও সাধনায় সেই ধনকে অন্তরে ধারণ, জীবনে লালন ও প্রচার এবং অধিকন্তু সেসবের ওপর গোটা জীবন গবেষণা করে নতুন নতুন ফুলে-ফলে ভরিয়ে দিয়ে এক অপূর্ব জ্ঞান ও সভ্যতার কানন সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিলেন।
তাবেঈগণ ছিলেন সাহাবা জামাতের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। মানব সভ্যতার অবিসংবাদিত রাষ্ট্রনায়ক হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহুর শাসন বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তারই বংশধর তাবেঈ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের রহ. শাসন আমলে। জ্ঞানের মহাসমুদ্র হযরত আলী কারামাল্লাহু রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান ও ইবাদতের চিত্র দেখা যায় হযরত হাসান বসরীর রহ. মধ্যে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের রহ. যুহদের চিত্র দেখুন, তিনি যুবরাজের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন হতদরিদ্র যুবক আবূ ওদাআর সঙ্গে। যুহদের এই চিত্র কী সাহাবায়ে আজমাইনের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম প্রতিচ্ছবি নয়? এবার লক্ষ করুন, তাবেঈগণ সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মানব সমাজের উন্নতি ও মুক্তির যে বিকল্পহীন চিরন্তন নববী শিক্ষামালা লাভ করেছিলেন, সেই শিক্ষায় নিজেরা শতভাগ রঙিন হওয়ার পর, বিশ্ববাসীর জন্য কীভাবে একে নতুন-নতুন ফুলে-ফলে, কুসুম কাননে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

সারণি : ৩.৪ সভ্যতা বিকাশের অগ্রদূতগণের শতাব্দী ভিত্তিক দৃষ্টান্ত (বন্ধনীতে হি. মৃত্যু সন)

সময় (হিজরী)	স্তর	আলোর কাফেলার সদস্যদের নাম
১ম শতক	১ম স্তর	সকল সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।
	২য় স্তর,	বর্ষীয়ান তাবেঈগণ রাহিমাহুল্লাহ। যেমনঃ আবু মুসলিম খাওলানী (৬২ হি.), আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস (৮৬ হি.), সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (৯৪ হি.), অরওয়া (৯৪ হি.), সালিম (১০৬ হি.), ইকরিমা (১০৮ হি.) প্রমুখ।
২য় শতক	৩য় স্তর	তাবেঈদের মধ্যম স্তর যারা সাহাবীদের কাছ থেকে প্রচুর রিওয়ায়াত আহরণ করেছেন। যেমনঃ শাবী (১০৪/১১০ হি.), হাসান বসরী (১১০ হি.), মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (১১০ হি.), মকহুল (১১২-১১৩ হি.) প্রমুখ।
	৪র্থ স্তর	স্বল্প বয়সী তাবেঈ যারা বর্ষীয়ান তাবেঈদের থেকে অধিকাংশ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, তবে সাহাবীদের থেকেও কিছু কিছু রিওয়ায়াত আহরণ করেছেন। যেমনঃ কাতাদাহ (১১৭/১১৮ হি.), যুহরী (১২৪ হি.) প্রমুখ।
	৫ম স্তর	স্বল্প বয়সী তাবেঈন যারা এক/দুই জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন, তবে তাঁদের থেকে কোনো হাদিস আহরণ করতে পারেন নি। যেমনঃ সুলায়মান আল-আমাশ (১৪৮ হি.), আবু হানিফা (১৫০ হি.) প্রমুখ।
		এমন তাবেঈন যারা ৫ম স্তরের তাবেঈদের সমবয়সী হলেও কোনো

	৬ষ্ঠ স্তর	সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হতে পারেন নি। যেমন: ইবনে জুরায়জ (১৫০ হি.), আওযায়ী (১৫৭ হি.), রবী ইবনুস সাবী (১৬০ হি.) প্রমুখ।
	৭ম স্তর	বর্ষীয়ান তাবে-তাবেঈনদের স্তর যারা তাবেঈদের কাছ থেকে রিওয়ায়াত আহরণ করেছেন। যেমন: সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি.), ইমাম মালিক (১৯৭ হি.) প্রমুখ।
	৮ম স্তর	মধ্যবয়সী তাবে-তাবেঈনদের স্তর। যেমন: ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা (১৯৩ হি.), সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (১৯৮ হি.), ইয়াহইয়াহ ইবনে সাঈদ (১৯৮ হি.) প্রমুখ।
৩য় শতক	৯ম স্তর	স্বল্প বয়সী তাবে-তাবেঈনদের স্তর। যেমন: ইমাম শাফিয়ী (২০৪ হি.), আব্দুর রায্যাক (২১১ হি.) প্রমুখ।
	১০ম স্তর	বর্ষীয়ান মুসলিম মনীষী যারা তাবে-তাবেঈনদের থেকে হাদিস আহরণ করেছেন। যেমন: উসমান ইবনে আবি শায়বা (২৩৯ হি.), আহমদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি.) প্রমুখ।
	১১তম স্তর	তাবে-তাবেঈনদের থেকে হাদিস আহরণ করেছেন এমন মধ্য বয়সী মনীষী। যেমন: ইমাম যুহিলী (২৫৩ হি.), ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.) প্রমুখ।
	১২তম স্তর	তাবে-তাবেঈনদের থেকে হাদিস আহরণ করেছেন এমন স্বল্প বয়সী মনীষী। যেমন: ইমাম তিরমিযী (২৭৯ হি.), আবু যুরআহ দিমাশকী (২৮১ হি.), আবু বকর মারওয়াযী (২৯২ হি.) ও সমকালীন অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ।

সূত্র : হাফিয ইবনে হাজর, উদ্ধৃতি: আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া, ২০১২।

তাবেঈ আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মসজিদুল হারামের প্রধান মুফতি। তাঁকে বলা হত ফকীহ সম্রাট। একবার হজ্জের মৌসুমে মক্কায় এভাবে ঘোষণা করা হয়, ভাইগণ, 'এই অঞ্চলের একমাত্র মুফতী আতা ইবনে আবী রাবাহ, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর নায়েব আবদুল্লাহ ইবনে আবী নাজাহ রহ.। এ দুজন ছাড়া অন্য কেউ এখানে ফাতওয়া দিতে পারবে না।' তাঁর সম্পর্কে যুগের আমীরুল মুমিনীন খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক বলেছিলেন, তিনিই এই মহান মসনদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সুযোগ্য উত্তরসূরী। তিনি শৈশবে এক মহিলার কাজকর্ম করতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, শৈশব থেকেই তাঁর সময় তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, এক- মনিবের জন্য, দুই- আল্লাহর জন্য এবং তিন- জ্ঞানের জন্য। মালিক তাঁর ইলম ও আমলের স্পৃহা দেখে তাঁকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

প্রায় বিশ বছর মসজিদুল হারামের মাটিই ছিল তাঁর বিছানা। একবার বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় এলে লোকেরা তাঁর কাছে ফাতওয়া জানতে ভিড় করল। ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে মক্কার লোকেরা, আমি অবাক হচ্ছি যে, আতা ইবনে আবী রাবাহ থাকতে তোমরা ফাতওয়ার জন্য আমার কাছে এসেছ!

সারণি : ৩.৫ তাবেঈগণের কিছু অবদান

তাবেঈ	অবদানের ক্ষেত্র
আলক্বামা ইবনে ক্বায়িস (১০-৬০ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ
আমির শা'বি (১৯-১০৪ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ; তাফসির; হাদিস
হাসান বসরী (২১-১১০ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ; হাদিস
আবু আবদুল্লাহ ইকরিমা (২৫-১০৪ হি.)	হাদিসের রাবী; তাফসির
আতা বিন আবি রাবাহ (২৭-১১৪ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ; তাফসির
মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (২৮-১১০ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ; হাদিস
আবু-আবদুল্লাহ নাফি' (৩০-১৭/১৯ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ; তাফসির; সীরাত
তাওস বিন কাইসান (৩০-১০৬ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ
আলী বিন হুসাইন বিন আলী (৩৮-৯৩ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ
সাঈদ বিন জুবায়ের (৪৬-৯৫ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ; তাফসির
ইবনে শিহাব আল-জুহরী (৫১-১২৪হি.)	সীরাত; হাদিস; ইতিহাস
আবুল খাত্তাব ক্বাতাদা (৬০-১১৭ হি.)	হাদিসের রাবী; তাফসির; হাদিস
সুলাইমান আ'মাশ (৬১-১৪৭ হি.)	হাদিসের রাবী; ক্বারী; হাদিস
হিশাম বিন উ'রওয়া (৬১-১৪৬ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ
আইয়ুব সাখতিয়ানী (৬৬/৬৮-১৩১ হি.)	হাদিসের রাবী; ফিক্‌হ; তাফসির; সীরাত
ইমাম আবু হানিফা (৮০-১৫০ হি.)	আল-ফিকহুল আকবার; কিতাবুল আছার; ফিক্‌হ
ইবনে জুরাইয (৮০-১৫০ হি.)	হাদিসের রাবী

সূত্রঃ মুসলিম স্কলার্স ডাটাবেইজ [http://muslimscholars.info/

হিজরী দ্বিতীয় শতকে এসে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় সব সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম দুনিয়া থেকে একে একে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন তাঁদের শিষ্যদের [তাবিঈদের] সম্মুখে প্রথম দায়িত্ব পড়ল দ্রুত

সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কাছ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সংগ্রহ করে তা সংকলন করা। সৌভাগ্যশীল অনেক তাবেঈ এই পবিত্র দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করেছিলেন। তাবেঈগণের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ যে কীর্তি সাধন করেছেন তা অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই, অথচ তিনি হয়তো দুই/চারজনের বেশি সাহাবী সহবত পান নি। তিনি কুরআন-হাদিস গবেষণা করে তাঁর ইফতা বোর্ডের মাধ্যমে ১২ লক্ষ মাসালা আবিষ্কার করে গিয়েছেন। তাঁর *কিতাবুল আছার* এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তীতে তাঁর পথ ধরে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইসলামি আইন বিজ্ঞানের এমন সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন যা অপূর্ব ও বিস্ময়কর। ভবিষ্যতে কি কি সমস্যা আবির্ভূত হলে কি ব্যবস্থা নিতে হবে তাঁরা সে সম্পর্কেও গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করে গিয়েছেন।

তাবে-তাবেঈগণ : মানবসভ্যতার তৃতীয় সর্বোৎকৃষ্ট জামাত

তাবেঈগণের পর ইসলামের প্রচার-প্রসারের মহতী কাজে এবার তৃতীয় আরেক দল প্রতিভা এগিয়ে আসলেন যারা তাবেঈগণের সুযোগ্য শিষ্য। ইতিহাসে এঁরা তাবে-তাবেঈ হিসেবে খ্যাত হলেন। তাবে-তাবেঈগণের যুগ শুরু হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় শতকে। এঁরা এমন এমন কাজ সম্পাদন করেছেন যার তুলনাও অন্য কোথাও নেই। মূলত, মহান তাবেঈগণ সাহাবীগণের কাছ থেকে যে হাদিস ভাণ্ডার সংকলন করেছিলেন, তাবে-তাবেঈগণ তাকে কেন্দ্র করে শত শত গবেষণা গ্রন্থ বা রেফারেন্স গ্রন্থ রচনা করে কিয়ামত অবধি সময়ের জন্য ইসলামের আলোর নির্ভেজাল মিনার নির্মাণ করে দিয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এসব গবেষণা করতে গিয়ে তাঁরা পূর্ববর্তী শত শত ভাষ্যকারদের (রাবী) পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত রচনার এক বিস্ময়কর তথ্য ভাণ্ডার বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন, এটি পরবর্তীতে *আসমাউর রিজাল শাস্ত্র* হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। *রিজাল শাস্ত্র* মুসলমানদের একক আবিষ্কার যার নমুনা অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই। ইসলামের ঘোর সমালোচক প্রাচ্যবিদগণ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এসবের প্রশংসা করেন। মহান ও পবিত্র আল্লাহ মুমূর্ষু বিশ্বমানবতাকে, যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ করেছি, প্রাণে প্রাণ দিয়ে পশু-

সমাজ থেকে মনুষ্য-সমাজে, সভ্যতা ও মুক্তির পথে পরিচালিত করার জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বারা বহুমাত্রিক মিশনের সূচনা করেছিলেন। ৩.১ - ৩.৭ পর্যন্ত সারণিসমূহের প্রতি লক্ষ করলে বুঝা যায় যে এটি নিঃসন্দেহে ইসলামের সুসংরক্ষণের এক আসমানী ব্যবস্থাপনা।

সারণি : ৩.৬ তাবে-তাবেঈগণের কিছু অবদান

তাবে-তাবেঈ	অবদানের ক্ষেত্র
হাম্মাদ বিন সালামা (৮২-১৬৭ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ; হাদিস
শু'বাহ বিন হাজ্জাজ (৮২-১৬০ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ; হাদিস
ইমাম মালিক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হি.)	ফিক্হ; হাদিসের রাবী; হাদিস; তাফসির; মুয়াত্তা ইমাম মালিক; তাফসিরে গারিবিল কুরআন; কিতাবুস সির
লেইস বিন সা'দ (৯৪-১৭৫ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ; হদিস
মা'মার বিন রাশিদ (৯৫/৯৬-১৫৪ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; হাদিস; সীরাত; ইতিহাস; আল-মাগাজি
সুফিয়ান সাওরী (৯৭-১৬১ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ; তাফসির; জামিয়ুল কাবীর; জামিয়ুস্ সাগীর; কিতাবুল ফারাইজ
হাম্মাদ বিন যায়িদ (৯৮-১৭৯ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ; হদিস
সুফিয়ান বিন উয়াআইনাহ (১০৭-১৯৬ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ; তাফসির
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (১১৮-১৮১ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ;
ইয়াহইয়া ইবনে ফারুক ক্বাতান (১২০-১৯৮ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ; হাদিস
ওয়াকি বিন জার্‌রাহ (১২৯-১৯৭)	হাদিস বর্ণনাকারী; তাফসির
আবদুর রাহমান বিন মাহদী (১৩৫-১৯৮ হি.)	হাদিস বর্ণনাকারী; ফিক্হ; হাদিস
ইমাম মুহাম্মদ ঈদ্রিস শাফিঈ (১৫০-২০৪ হি.)	ফিক্হ; হাদিস; তাফসির; হাদিস বর্ণনাকারী;

সূত্রঃ মুসলিম স্কলার্স ডাটাবেইজ [http://muslimscholars.info

সারণি : ৩.৭ তাফসির, হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রে ধারাবাহিক বিস্ময়কর চিত্র

	তাফসিরে আব্বাসী [হি. ১ম শতক]	ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
	তাফসিরে তাবারী [হি. ৩য় শতক]	আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী
	তাফসিরে রুহুল মাআনী [হি. ৫ম শতক]	আল্লামা মাহমুদ আলূসী
	তাফসিরে কাবির [হি. ৬ষ্ঠ শতক]	ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী
তা	তাফসিরে কাশশাফ [হি. ৬ষ্ঠ শতক]	আল্লামা জামাখশারী
	তাফসিরে কুরতুবী [হি.৭ম শতক]	ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী
ফ	তাফসিরে ইবনে কাসীর [হি. ৮ম শতক]	আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর
	তাফসিরে আল-বাহরুল মুহীত [হি. ৮ম শতক]	আবূ হাইয়ান গারনাতী আন্দালুসী
	তাফসিরে জালালাইন [হি. ৯ম শতক]	জালালুদ্দীন সুয়ূতী
সি	তাফসিরে মাযহারি [হি. ১২ শতক]	কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী
	তাফসিরে বয়ানুল কুরআন [হি ১৪ শতক]	আশরাফ আলী থানভী
র	তাফসিরে মারেফুল কুরআন [দু'টি; খ্রি. বিংশ শতক]	মুহাম্মদ শফি; ইদ্রিস কান্দলভী
	বুখারি শরীফ [হি. ২য় শতক]	ইসমাঈল আল-বুখারী
	মুসলিম শরীফ [হি. ২য় শতক]	মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশায়রী
	তিরমিযী শরীফ [হি. ২য় শতক]	আবূ ঈসা আত-তিরমিযী
হা	সুনানে আবূ দাউদ [হি. ৩য় শতক]	সুলায়মান ইবনে আশআস আস-সিজিস্থানী
	সুনানে নাসায়ী [হি. ৩য় শতক]	আবু আবদুর রহমান
দি	ইবনে মাজাহ [হি. ৩য় শতক]	মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ
	মুয়াত্তা ইমাম মালেক [হি. ৩য় শতক]	ইমাম মালেক
	মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ [হি. ৩য় শতক]	ইমাম মুহাম্মদ বিন হাম্বল
স	বিভিন্ন সময়ে সংকলিত অনেক মুসনাদ	সুবিখ্যাত অনেক হাদিস শাস্ত্রবিদ
	বায়হাকী [হি. ৫ম শতক]	আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন বায়হাকী
	মেশকাত শরীফ [হি. ৮ম শতক]	মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরিযী
	ফিকহে ইমাম আবু হানিফা [৮০-১৫০ হি.]	অন্যান্য ফিকহি সংকলন তেমন সংরক্ষিত হয় নি। ফিকহ শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য ভিত্তি হিসেবে এই চারটি সংকলনই যথেষ্ট মনে করা হয়।
ফে	ফিকহে ইমাম মালেক [৯৩-১৭৯ হি.]	
	ফিকহে ইমাম শাফিঈ [১৫০-২০৪ হি.]	
কা হ	ফিকহে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল [১৬৪-২৪১ হি.]	

ইসলামের মূল বুনিয়াদ দু'টি (কুরআন ও হাদিস) হলেও এগুলোর ওপর আমল করার জন্য তৃতীয় আরেকটি শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে যা ফিকহ শাস্ত্র বা ইসলামি আইন বিজ্ঞান নামে পরিচিত। ফিকহ্ বলতে শরীয়তের কার্যগত বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসাইলকে বুঝায় যা কুরআন-হাদিস গবেষণা করে বের করা অপরিহার্য। নমুনা হিসেবে ইসলামের এই তিন শাস্ত্র- তাফসির, হাদিস ও ফিকহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ওপরে সারণি ৩.৭ তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে অন্তত এটি বুঝা যায় যে ইসলামের এই ব্যবস্থাপনা বিস্ময়কর যা অন্য কোনো ধর্ম বা মাযহাবে লক্ষ করা যায় না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুসলিম অবদান

এ কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে জ্ঞান সাধনা এই উম্মতের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য, তার নিয়তি জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং, জ্ঞানের কোনো বিভাজন তার কাছে কাম্য নয়। এই উম্মত যেমন তাফসির, হাদিস, ফিকাহ প্রভৃতি ধর্মের সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাধনায় প্রতিকৃত ও সর্বেসর্বা তেমনি অন্যান্য মানববিদ্যার জ্ঞান সাধনায়ও প্রতিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

এই পরিচ্ছেদের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর অতীত বিস্ময়কর ইতিহাস আর আজকের মুসলিম উম্মাহকে দেখে এটি মেলানো কঠিন যে তাদের পূর্বসূরীগণই মানববিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় এ বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতার আসনে সমাসীন ছিলেন। সপ্তম শতকে মুসলমানদের এসব ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চা শুরু করার পূর্বে মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় মিশরীয়, ব্যবীলনীয়, গ্রিক, রোমান, পারস্য, ভারতীয় ও চৈনিক জাতিগোষ্ঠীর বেশ কিছু অগ্রগতি ছিল, তবে এদের অবদান ষষ্ঠ শতকে এসে পুরোপুরি নিভে যায়। ইসলামের শিক্ষামালা আসার পর মুসলমানগণ এসব জাতিগোষ্ঠীর এসব জ্ঞান আহরণে এক ঐতিহাসিক অভিযান শুরু করেন। তারা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জ্ঞানকে ইতিহাসের ধূলিদুস্তর থেকে খোঁজে বের করে সংগ্রহ করেন এবং আরবিতে অনুবাদের ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। প্রাচ্যবিদ হিট্টি লেখেন, এই তরজমার কাজ চলে ৭৫০-৮৫০ খ্রি. পর্যন্ত একশ বছর। তারা শুধু এসব জ্ঞানকে, বিশেষত গ্রিক, আত্মস্থ নয় এসব আহরিত জ্ঞানকে প্রয়োজনে

পরিশিলিত করে উন্নতির নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেন।[২০৮] মূলত এসব মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিপুল অবদানই হল ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের, ইউরোপীয় রেনেসার ও আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের মূল কারণ। কারণ মুসলিম বিজ্ঞানীদের বৈপ্লবিক আবিষ্কারসমূহ তাদেরই হাত দিয়ে সিরিয়া, স্পেন, সিসিলি মারফত ইউরোপে পৌঁছেছিল।

রসায়ন বিজ্ঞান

রসায়ন চর্চার ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রথমে মিশরে এর যাত্রা শুরু হয়; ৩৫০০ বছর পূর্বে মিশরীয়রা যেভাবে কাঁচ তৈরি করত আজও সে পদ্ধতিই ব্যবহৃত হচ্ছে, কেবল নতুন যন্ত্রপাতি ছাড়া। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতবরণ করেন। তিনি বলেছিলেন, পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি বিদ্যুৎ ও বজ্রসদৃশ কোনো বস্তুর সঙ্গে সংমিশ্রণ করতে পার তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হতে পারবে। এটি ছিল স্বর্ণ প্রস্তুতের সূত্র। সপ্তম শতকে খলীফা খালেদ বিন ইয়াযিদ (মৃ. ৭০৪ খ্রি.) সর্বপ্রথম গ্রিক থেকে আরবিতে গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইবনে নাদিম ফিরহিস্তে খালেদ বিন ইয়াযিদ- এর কয়েকটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হল: কিতাবুল হারারত, সাহিফাতিল কবীর, সাহিফাতিল সগীর, এবং ওয়াসিয়াতিহি ইলা ইবনিহি ফিস্ সান আ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধস্তন পুরুষ ইমাম জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রের জনক জাবির ইবনে হাইয়ানের শিক্ষক। ইবনে খাল্লিকানের মতে, ইবনে হাইয়ান ২ হাজার পৃষ্ঠার যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাতে তাঁর শিক্ষক জাফর সাদিকের আবিষ্কৃত সমস্যাগুলিও অন্তর্ভূক্ত করেন এবং এতে ৫০০ পৃষ্ঠা ব্যয় হয়। জাফর সাদিকের যে গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় সেটি হল- *রিসালা জাফর আস্ সাদিক ফি ইলমিস্ সালা ওয়াল হাজারিল মোকাররম (Book of the Epistole of Jafar Sadik on the Science of the Art and the Noble*

---

[২০৮] ফিলিপ কে. হিট্টি। ২০০২। *আরব জাতির ইতিকথা*। ইব্রাহিম খাঁ অনু. ঢাকা : অবসর। পৃ. ৮৯ ৯৭; নূরুল হোসেন খন্দখার। ২০০৯। *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*। ঢাকা:ইফা। পৃ. ১৯-২৭।

Stone)। জার্মান প্রাচ্যবিদ Ruska এটি সম্পাদনা করে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন।[২০৯]

রসায়ন শাস্ত্রের জনক বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২১-৮১৫ খ্রি.)

বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ানের পূর্বে রসায়ন চর্চা হলেও মূলত তাঁর হাতেই এটি বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র হিসেবে গোড়াপত্তন লাভ করে। এজন্য তাঁকে এই শাস্ত্রের জনক বলা হয়। ইবনে হাইয়ান সহস্রাধিক গ্রন্থের রচয়িতা যার মধ্যে অন্তত ২২টিতে তিনি বিভিন্ন রাসায়নিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।[২১০]

সারণি : ৩.৮ জাবির ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থের ধরন ও সংখ্যা

বিষয়	সংখ্যা
রসায়ন বিষয়ক	২৬৭
কিতাবুত্ তাকদীর সম্বন্ধীয়	৩০০
দর্শন বিষয়ক	৩০০
যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধীয়	৩০০
চিকিৎসা সম্বন্ধীয়	৫০০
দার্শনিক যুক্তিখণ্ডন বিষয়ক	৫০০
জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও অন্যান্য	৫
সর্বমোট	২১৭২

তথ্যসূত্র: *http:/en.wikipedia.org/wiki/jabir_ibn_Hayyan;* মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ২০০৬ : ২৯।

ইবনে নাদিমের মতে জাবির দুই হাজারের বেশি গ্রন্থ রচনা করেন, অবশ্য এসব গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক ছিল যা ৮/১০ পৃষ্ঠার এমনকি মাত্র ২

---

[২০৯] মুহাম্মদ নূরুল আমীন। ২০০৬। *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*। ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন। পৃ. ২৭।

[২১০] এহসানুল করিম। ২০১৫। *মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জি*। মো: আফতাব হোসেন ও শহীদ উদ্দীন হোসাইন অনু. ঢাকা : ইফা। পৃ. ১৩৯-১৪০।

পৃষ্ঠার। হিট্টি বলেন, এ কথা সত্য যে আরবি ও ল্যাটিনে যে একশ বই হাইয়ানের নামে চলে তার বেশিরভাগই মেকি (নকল, জাল)।[২১১] অবশ্য তাতেও রসায়ন শাস্ত্রে হাইয়ানের কীর্তি কখনও ম্লান হবার নয়।

সারণি : ৩.৯ জাবির ইবনে হাইয়ানের কিছু গ্রন্থের তালিকা

নং	আরবি নাম	ইংরেজি নাম	ছাপা সংক্রান্ত তথ্য অথবা পাণ্ডুলিপি কোথায় আছে
১.	উস তুকিলিস উসিল আউয়াল ইলাল বারামেক	The First Book of Foundation to Barmaecides	১৮৯৯ সালে ভারতে ছাপা হয়।
২.	তাফসিরুল উসতুকিস	An Explanation of Istuqus	
৩.	সুন্দুকুল হিকমা	The Casket of Wisdom	কায়রো রাজকীয় লাইব্রেরী, মিশর।
৪.	কিতাব ইখরাজ মা ফিল কাওয়াতে ইলা আল ফিল	The Book of Extraction from Potentiality to Actuality	কায়রো রাজকীয় লাইব্রেরী, মিশর।
৫.	কিতাবুল হুদুদ	The Book of Definitions	কায়রো রাজকীয় লাইব্রেরী, মিশর।
৬.	কাশফুল আসরার ওয়া হাক্কুল আসতার	The Unwiling of Secrits and the Reasling of Veils	ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন।
৭.	রিসালা ফিল কিমিয়া	Letter on Chemistry	কায়রো রাজকীয় লাইব্রেরী, মিশর।
৮.	খাওয়াসুল ইকসিরুজ জাহাব	The Progerties of Elinir of Gold	প্যারিস
৯.	কিতাবুল মুকাবিলা ওয়াল মুমাসিলা	The Book of Comparison and Similituoles	বার্লিন মিউজিয়াম, জার্মানি।
১০.	কিতাবুর রহমত	The Book of Mercy	লিডেনে রক্ষিত আছে
১১.	কিতাবুর্ রহমাস্ সগীর	The Little of Mercy	প্যারিস।
১২.	কিতাবুত্ তাজমী	The Book of Concentration	লিডেন।
১৩.	কিতাবুত্ তাজরীদ	The Book of Abstraction	ভারত।
১৪.	কিতাবুস্ সহল	The Book of Ease	ব্রিটিশ মিউজিয়াম,

[২১১] ফিলিপ কে. হিট্টি। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৭৭।

			লন্ডন।
১৫.	কিতাবুস্ সাফী	The Book of Purity	ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন।
১৬.	কিতাবুল ইহরাক	The Book of Combustion	
১৭.	কিতাবুত্ তাকলীস	The Book of Calcination	
১৮.	কিতাবুল আবদাল	The Book of Exchanges	
১৯.	কিতাবুল উসুল	The Book of Roots i.e. fundamental principles	
২০.	কিতাবুর রাহা	The Book of Repose	
২১.	কিতাবু সিরর আল মাকতুম	The Book of the Hidden Secret	
২২.	কিতাবুজ জাহাব	The Book of Gold	
২৩.	কিতাবুল ফুদ্দা	The Book of Silver	
২৪.	কিতাবুল নুহাস	The Book of Copper	
২৫.	কিতাবুল হাদীদ	The Book of Iron	
২৬.	কিতাবুল উসবুর	The Book of Lead	
২৭.	কিতাবুল কালী	The Book of Tin	
২৮.	কিতাবুল খারসিনি	The Book of Tutenag	
২৯.	কিতাবুল ইজাজ	The Book of Abbrevietion	
৩০.	কিতাবুল নার ওয়াল হাজার	The Book of Fire and Stone	
৩১.	কিতাবুত্ তানকীয়া	The Book of Cleanning	এই লেখকের কাছে এগুলোর তথ্য নেই।
৩২.	কিতাবুত্ তানজীল	The Book of Reduction per descensum	
৩৩.	কিতাবুস সুমুম	The Book of Poisons	
৩৪.	তাদবীবুল হুকামাল কুদামা	The Book of Operation of the Ancient Sages	
৩৫.	কিতাবুর রিয়াদ	The Book of Garden	
৩৬.	কিতাব আল-যাহরা	The Book of Venus	

Source: http:/en.wikipedia.org/wiki/jabir_ibn_Hayyan

জাবির বলেন, 'যে কোনো একটি রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন উপাদান বা পদার্থ একটি করে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয়।' তাঁর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে রসায়ন শাস্ত্রে 'স্থির অনিপাত সূত্র' জন্ম লাভ করে। তাঁর কৃতিত্ব যে, রসায়ন চর্চায় তিনি বহুপ্রকারের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ কৌশলকে

নিখুঁত করে তোলেন। জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নের ক্যালসিনেশন (ভস্মীকরণ) এবং উপাদান বিশ্লেষণ (রিডাকশন) বর্ণনা করেন। বাষ্পীভূতকরণ (ইভাপোরেশন), পাতন (ডিসটিলেশন), উর্ধ্বপাতন (সাবলিমেশন), চূর্ণীভবন, পরিস্রাবন (ফিলট্রেশন), দ্রবীভূতকরণ (মেলটিং) এবং জমাটভূক্তকরণ (ক্রিস্টালিজেশন) প্রক্রিয়ার তিনি উৎকর্ষ সাধন করেন। জাবির ইস্পাত প্রস্তুত পদ্ধতি, চামড়া ও কাপড় রংকরণ প্রণালী, লোহা ও ওয়াটার প্রুফ কাপড়ে বার্ণিশ করার উপায়, কাচ তৈরিতে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার, পুস্তকে নাম লেখার জন্য সোনার জলে লৌহের প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। তাঁর কিছু আবিস্কারের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

সারণি : ৩.১০ জাবির ইবনে হাইয়ানের কিছু আবিষ্কার

রসায়ন বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ানের কিছু আবিষ্কার	আর্সেনিক ও এন্টিমনি স্বর্ণ বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি গন্ধক বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি নাইট্রিক এসিড (জাবিরের *কিতাবুল ইসতিতমাস*-এ এর প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত আছে।) সিলভার নাইট্রিক মারকিউরিক ক্লোরাইড সালফিউরিক এসিড স্বর্ণ গলানোর ফর্মুলা বা একোয়া রিজিয়া

Source: http:/en.wikipedia.org/wiki/jabir_ibn_Hayyan

শাস্ত্র হিসেবে রসায়নকে প্রতিষ্ঠা করা এবং এর উন্নয়নে জাবির ইবনে হাইয়ান সেকালে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা অপূর্ব ও অতুলনীয়। তাঁর এসব অবদান ও ঋণ আমরা শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করি। জাবিরের পরে রসায়ন চর্চায় যাদের নাম পাওয়া যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত সারণিচিত্র নিচে দেখানো হল।

সারণি : ৩.১১ আরো কিছু মুসলিম রসায়নবিদ ও তাদের অবদান

নাম	গ্রন্থ/অবদান
জুননুন মিশরী (মৃত্যু ৮৬০ খ্রি.)	জানা জায় না
আল জাহিয (মৃত্যু ৮৬৭/৬৮ খ্রি.)	গ্রন্থ: *কিতাবুল হায়ওয়ান*। গ্রন্থটি Evolution, Adoptation, Animal psychology বিষয়ে জীববিদ্যায় বিশেষ অবদান রাখে। জাহিয জীবজন্তুর অপ্রয়োজনীয় অংশ শুষ্ক পাতন করে এমোনিয়া তৈরি করতে পারতেন।
আবুল মনসুর মোয়াফ্ফাক (১০ম শতক)	গ্রন্থ: *কিতাবুল আবনিয়া হাকায়েক আল আদবিয়া*। গ্রন্থে নাতরুন (sodium carbonate) ও কালির পার্থক্য ভালভাবে ব্যাখ্যা করেন। Arsxnious acid, Cupric oxide, Silicic acid Antimon প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।
জাকারিয়া আল-রাজি (জন্ম ৮৬৩ খ্রি.)	জাবিরের পর শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ। গ্রন্থ: 1. *Book on instructive or practical introduction,* 2. *Book on the demonstrative, theoritical introduction,* 3. *Book on confirmation of the art refutation of those who deny it,* 4. *Book on stone,* 5. *Book on elixir,* 6. *Book on nobility of art,* 7. *Book on the method,* 8. *Book on the testing,* 9. *Book on evidences,* 10. *Book on secret of the stages and their devices.*
আল হাকিম আত-তামিমি (মৃত্যু ৯১২ খ্রি.)	গ্রন্থ: 1. *Book on silver water and sturry earth,* 2. *Combination of the spirit,* 3. *Book on the lamp* ইত্যাদি।
আবু আবদুল্লাহ	গ্রন্থ: *মাফাতিহুল উলুম*। ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত এটি সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম বিশ্বকোষ। এ গ্রন্থে রসায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
ইবনে আব্দুল মালেক আল কাছি (জীবনকাল: ১১ শতক)	গ্রন্থ: *আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ (Essence of the Art and Aid of Worker)*। গ্রন্থে বস্তুর পরিচয়, গুনাগুণ ও বৈশিষ্ট্য, মিশ্রণ অনুপাত ও

	প্রণালী, লাল-কালো বস্তুর পার্থক্য, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বর্ণনা, অপ্রাপ্তব্য বস্তুর বিকল্প, রসায়ন চর্চার কার্যপন্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
আবুল কাশেম আল ইরাকি (১৩ শতক)	ধাতুর পরিবর্তন প্রমাণ করেন। তাঁর গ্রন্থের ইংরেজি ভাষ্য: 1. *Knowledge acquired concerning culvination of gold,* 2. *Cream of the search upon the sowing of gold,* 3. *Perfume of saffron upon the knowledge of the elixir,* 4. *Pearls sealed with figures,* 5. *The seven climes on the science called art of alchemy,* 6. *Sources of the truths and explanation on the ways,* 7. *The most glorious treasure and greatest secret concerning the transmutation of the noble stones,* 8. *Salvation and conjunction with the sources of life.*
আল জিলকাদী (মৃত্যু ১৩৪২/৪৩ বা ১৩৬০/৬১)	জর্জ সার্টন তাঁর ১৫টি রসায়ন গ্রন্থের উল্লেখ করেন। কয়েকটি গ্রন্থের ইংরেজি ভাষ্য: 1. *The brilliant moon on the secrets of elixir,* 2. *The wish of the expert,* 3. *Hidden pearls,* 4. *The lamp of the secrets of alchemy.*

পদার্থবিজ্ঞান

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ তৎকালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আওতায় পদার্থবিজ্ঞান চর্চা করতেন, কেননা সেকালে বিজ্ঞানের আজকের মতো বিভাজন ছিল না। পদার্থবিদ্যায় যেসব মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আল-বিরুনী, ইবনে সীনা এবং বিশেষত ইবনুল হাইছাম উল্লেখযোগ্য। আল-বিরুনী আলো ও গতি সম্পর্কীয় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলো হল: ১. তাজরীদ আল্ শাআ'য়াত ওয়াল আনওয়ার আনিল ফাসায়েসে মুদাওয়ানাতে ফিল আসফার (আলো ও আলোকরশ্মি বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে), ২. তাহশীলু আশ্ শাআ'য়াত বেআব'আদেত তর্কে আনিয়াস্ সা'আত (সময় ও আলো সম্পর্কীত জটিল পারস্পরিক আলোচনা), ৩.

তামহিদুল মুসতাকার্‌রে লিমানিল মামার্‌রে (আলোর গতিপথ সম্পর্কে আলোচনা) ইত্যাদি।

চক্ষু বিজ্ঞানের জনক পদার্থবিজ্ঞানী ইবনে হাইছাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.)

ইবনে হাইছাম ছিলেন একাধারে গণিতশাস্ত্রবিদ ও পদার্থবিদ। তাঁকে দ্বিতীয় টলেমি বলা হত। আধুনিক সভ্যতা তাঁকে অপটিকস বা চক্ষুবিজ্ঞানের জনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে মাত্র। অধ্যাপক ইসমাইল পাশা (ইস্তাম্বুল) হাইছামের ১১৫ টি গ্রন্থের তালিকা উল্লেখ করেছেন। হাইছামের গ্রন্থ সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। নিচের সারণিতে ইবনে হাইছামের কিছু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে এই বিজ্ঞানীর কীর্তি এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় কত উর্ধ্বে ছিলেন সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি : ৩.১২ প্রকৃতি অনুসারে বিজ্ঞানী ইবনে হাইছামের গ্রন্থ

গ্রন্থের প্রকৃতি	গ্রন্থের সংখ্যা	গ্রন্থের প্রকৃতি	গ্রন্থের সংখ্যা
গণিতশাস্ত্র	২৫	সাহিত্য	২
জ্যোতির্বিজ্ঞান	২৩	ক্ষেত্রতত্ত্ব	২
ন্যায়শাস্ত্র	১৫	এপিসটেমোলজি	২
পদার্থবিজ্ঞান	১১	যুদ্ধবিজ্ঞান	১
দর্শন	১১	হস্তলিপিবিদ্যা	১
মনোবিজ্ঞান	৬	ধর্মশাস্ত্র	১
ভূগোল	৬	রসায়ন	১
প্রাণী বিজ্ঞান	৩	সাহিত্য	২
চিকিৎসা বিজ্ঞান	২	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৩
সর্বমোট ১১৭ টি			

সূত্রঃ নূরুল হোসেন খন্দকার, ২০০৯ : ১৩০; https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Haytham

হাইছামের আলোকবিজ্ঞান ও চক্ষুবিজ্ঞান

ইবনে হাইছামের পূর্বে আলো সম্বন্ধে বিশদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য পাওয়া যায় না। আলো সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের যা কিছু অগ্রগতি ও আবিষ্কার তার পুরোটাই

ইবনে হাইছাম- এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সূত্র ধরে হয়েছে। টলেমির আলোর প্রতিসরণ সমীকরণ কেবল ক্ষুদ্র প্রতিসরণ কোণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বৃহৎ কোণের বেলায় নয়; হাইছাম টলেমির মতবাদের এই ত্রুটি প্রমাণ করেন।

সারণি : ৩.১৩ বিজ্ঞানী ইবনে হাইছামের কিছু গবেষণা কর্ম[২১২]

গ্রন্থের নাম	গবেষণার/আলোচ্য বিষয়
রিসালাতু ফিশ্‌শফক (Courses of Twilight)	এই গ্রন্থে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব সীমা নির্ণয় করা হয়েছে
মাকালাতে ফি কাওস ফাজহিন ওয়াল হালাত (Memoir on the Rainbow and the Halo)	রংধনু, বস্তুর ছায়াপথ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে
মাকালাতু ফিল মারাইয়াল মুহরিকা বিলকুতু	Danoptra প্রস্তুত প্রণালী বর্ননায় আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, প্রতিবিম্বের স্বরূপ ও তার নানা ত্রুটি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে
মাকালাতু ফিল মারাইয়ান যুহরিকা বেদদাওয়ায়ের	অকাট্য তথ্যপ্রমাণসহ আলোর উপর ব্যাপক বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হয়েছে
মাকালাতু ফিল জুয়েল কামার	
কিতাবুল মানাজির	চোখের দৃষ্টি, চোখে কিভাবে দেখা যায়, দৃষ্টি বিভ্রমের কারণ, পালিশ করা বস্তু থেকে কিভাবে আলোর প্রতিফলন ঘটে ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে চক্ষুবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে

হাইছাম আলোর যে প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের নিয়ম আবিষ্কার করেন তাই বর্তমানে Snell's Law নামে পরিচিত হয়েছে। হাইছামের মতে, আলোর বেগের তারতম্যের কারণেই হালকা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপেক্ষাকৃত ভারী স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় আলোর প্রতিসরণ বা দিক পরিবর্তন হয়। হাইছাম নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে ভারী মাধ্যমের চেয়ে হালকা মাধ্যমে আলোর বেগ দ্রুততর হয়। মাধ্যম পরিবর্তনের ফলে আলোর গতিপথের

[২১২]1.https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Haytham;2. http://1001inventions.com/ibnalhaytham; 3. http://www.ibnalhaytham.com/

পরিবর্তনও তিনি সঠিকভাবে নির্ণয় করেছিলেন। তার বহু পরে নিউটনও এ বিষয়ে সঠিক বর্ণনা দিতে পারেন নি। আলোর গতিপথ যে কখনও কখনও বেঁকে যায় এটি আইনস্টাইনও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন এবং এটি আজ একটি প্রমাণিত বিষয়। ফরাসী বিজ্ঞানী Pierre De Femet হাইছামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাঁর Principle of Least Time মতবাদ প্রদান করেন। সতেরো শতক পর্যন্ত কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০), রোমার (১৬৪৪-১৭১০) এ মতকে সত্য জেনে আসছিলেন যে আলোর *গমনে কোনো সময়ের দরকার হয় না*, অথচ ইবনে হাইছাম, আল-বিরুনী, ইবনে সীনা এগারো শতকেই প্রমাণ করেছিলেন যে, আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুততর এবং আলোর যাতায়াতে সময় লাগে প্রভৃতি মতবাদ।

ইবনে হাইছামের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর কিতাবুল মানাজির গ্রন্থ যার মধ্য দিয়ে আধুনিক চক্ষুবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। ইহুদি বিজ্ঞানী যোসেফ বিন জুদাহ বিন আর্কানন হাইছামের এই গ্রন্থকে ইউক্লিড টলেমির গ্রন্থের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এই গবেষণায় হাইছাম প্রমাণ করেন যে চোখ থেকে আলোক রশ্মি কোনো বস্তুর উপর পড়লেই সে বস্তু দেখা যায় না বরং বস্তু থেকে আলোক রশ্মি চোখে এসে পড়লেই তবে সে বস্তু আমরা দেখতে পাই। অথচ এর পূর্বে ইউক্লিড, এ্যরিস্টটল, টলেমি প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ মনে করতেন যে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত অলোর প্রতিফলনে বস্তু দেখা যায়, তারা বস্তু থেকে আলোর প্রতিসরণ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন।

গণিতশাস্ত্র

গণিতে মুসলমানদের অবদান উপরের মতো অনবদ্য। মুসলিম গণিতজ্ঞদের মধ্যে আবু ইসহাক আল ফারাজী (মৃত্যু ৭৭৭ খ্রি.) সর্বপ্রথম সমুদ্রে সূর্য ও নক্ষত্রের উচ্চতা নির্ণায়ক যন্ত্র এ্যাস্ট্রোল্যাব আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথম আরব গণনা পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করে আরবি বর্ষপঞ্জী প্রণয়ন করেন। তাঁর পুত্র আবু আবদুল্লাহ খলিফা মনসুরের নির্দেশে ভারতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থ *সিরহিন্দ* নামে আরবিতে অনুবাদ করেন যার ভিত্তিতে আল খারেজমি তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান

তালিকা (astronomical table) প্রণয়ন করেন। আবু ইয়াহইয়া আল বাতরিক টলেমির *Tetrabiblos* গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ বিশুদ্ধ গণিত চর্চা করেছেন কেননা গণিত ছাড়া বিজ্ঞান চর্চা অসম্ভব। আল কারখী গণিতের অনেক সূত্র যেমন, $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = ab$, ভগ্নাংশের গুণ, বর্গমূল নির্ণয় পদ্ধতি প্রভৃতি আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁর *কিতাবুল ফারখী* গ্রন্থ বীজগণিতে এক অমূল্য সংযোজন। আল বিরুনী তাঁর *কানুনে মাসউদী* গ্রন্থে ত্রিকোণমিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি প্রথম ০ ডিগ্রি থেকে ৯০ ডিগ্রি সাইনের মান নির্ধারণ করে একটি সাইন টেবিল তৈরি করেন। ইবনে হায়ছাম প্রায় ৬০টি গ্রন্থ বীজগণিত ও জ্যামিতি- এর উপর রচনা করেন। ত্রিকোণমিতির কোটেনজেন্ট সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন থিওরাম উদ্ভাবন করেন।

ওমর খৈয়াম সুবিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন। তিনি ২১টি সরল সমীকরণ, ১৪টি ত্রিরাশিক ত্রিমাত্রিক সমীকরণ, ২৪টি ত্রিরাশিক চতুর্মাত্রিক সমীকরণ, ২৮টি চতুর্রাশিক চতুর্মাত্রিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। গণিতবিদ আল মাহানি তাঁর আল মাহানি সমীকরণের জন্য অমর হয়ে আছেন। তাঁর সমীকরণটি হল: $x^3 + a^2b = cx^2$ | তিনি আর্কিমিডিসের গোলক সম্পর্কেও গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আল-বাত্তানী গণিতশাস্ত্রে ত্রিকোণমিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এই শাখায় sine, cosine, tangent, cotangent অধিক তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেন। তিনিই এসব সংকেতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। তাঁর একটি সূত্র হল, কোনো কোণের সাইন জানা থাকলে তার ট্যানজেন্ট বের করা বা ট্যানজেন্ট জানা থাকলে সাইন বের করা সহজেই নিস্পন্ন হতে পারে। প্রতীকের সাহায্যে বর্তমান এই সূত্রটি হল:

$$\sin\alpha = \frac{\tan\alpha}{\sqrt{(1+\tan^2\alpha)}} \text{ এবং } \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{(1+\tan^2\alpha)}}$$

ত্রিভুজের বাহুর সাথে কোণের ত্রিকোণমিতিক সম্বন্ধও আল বাত্তানী উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই নিয়মটি হল: cosa+cosb cosc+sinc cosa. এরকম

আরো অসংখ্য মুসলিম বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা গণিতশাস্ত্রে বিভিন্নমুখী অবদান রেখে গেছেন। ইবনুল সানী, আল খুজান্দী (তাঁর cubic equation তাঁকে অমর করে রেখেছে), আবুল হাসান আল খোরাসানী, মুসলিম স্পেনের ইউনুস সাফ্ফার, যারকালী, ইবনুস সামাহ, ইবনে আবির রিজাল সহ বহু মুসলিম গণিতবিদ এই শাস্ত্রে অবদান রেখে গেছেন।

বীজগণিতের জনক আল খোয়ারিজমি (মৃ. ৮৪৭ খ্রি.)

খোয়ারিজমি ছিলেন গণিত শাস্ত্রের বিরল প্রতিভা। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান যে তিনিই বীজগণিতকে গণিতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জগৎদ্বিখ্যাত *ইলমুল জাবির ওয়াল মুকাবেলা* গ্রন্থের ইউরোপীয় অনুবাদ *আল-জাবির* হতেই Algebra বা বীজগণিতের উৎপত্তি হয়। খোয়ারিজমি কেবল এই অবদানের জন্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর কীর্তি উপলব্ধি করার জন্য শুধুমাত্র এই অবদানের উল্লেখই যথেষ্ট। খোয়ারিজমি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং গণিতের উন্নতি সাধনে নানামুখী ভূমিকা পালন করেন, তিনি তাঁর পূর্বের গ্রিক গণিতেরও অনেক উন্নতি সাধন করেন। বীজগণিতের অন্যতম অংশ লগারিদম (Logarithm) আল-খোয়ারিজমির নাম থেকে উদ্ভূদ।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

এই শাস্ত্রেও মুসলিম মনিষীদের অবদান বিস্ময়কর এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আধুনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানের তারাই প্রতিষ্ঠাতা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে কেবলমাত্র যদি ইবনে সীনা ও আল-রাজির অবদান আলোচনা করতে হয় তাহলেও কয়েক হাজার পৃষ্ঠা লেগে যাবে।

মুসলমানদের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যার যাত্রা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শুরু হয়েছিল যা পরবর্তীতে সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাত, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ জামাত চর্চা করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে এখানে শুধু হাতে গোনা কয়েকজন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীর বিববরণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যেসব মুসলিম মনীষী বিশেষ অবদান রাখেন তাঁরা হলেন, জাবির ইবনে হাইয়ান, আল কিন্দি, আলী ইবনে

রাব্বান, আবুল হাসান আত তাবারী, আল রাজী, ইবনে সীনা, আত তামিনী, আজ্ জাহরাবী, ইবনে হাইছাম, আলী ইবনে ঈসা প্রমুখ। এসব মনীষীগণ চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ, চিকিৎসা পদ্ধতি, রোগের প্রকৃতি ও উপসর্গ, ঔষধ প্রস্তুত উপকরণ ও প্রণালী, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি নানা বিষয়ে প্রামাণ্য অবদান রাখেন। এসকল চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জীবনকাল মোটামুটি সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দি পর্যন্ত। নিচের সারণী থেকে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। তবে এটি খুবই সংক্ষিপ্ত তালিকা। এখানে সামান্য কিছু নমুনা তুলে ধরা হল, নতুবা চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান বাস্তবে অনেক দীর্ঘ যা স্থানাভাবে এখানে উল্লেখ করা হল না।

সারণি : ৩.১৪ মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও তাদের অবদানের একটি দৃষ্টান্ত

নাম	অবদান
জাবির ইবনে হাইয়ান	চিকিৎসা বিজ্ঞানে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চক্ষুবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণার উপর ভিত্তি করে চক্ষু চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্ম হয়।
আল কিন্দি (মৃ. ৮৫০ খ্রি.)	দার্শনিক হিসেবে বেশি খ্যাত হলেও চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর ২৭ টি গ্রন্থ রয়েছে, এর মধ্যে দুটির সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হলঃ কিতাবু ফি কিমিয়া এবং আকরাবাদিন। লেভী কর্তৃক ১৯৬৬ সালে অনুদিত কিন্দির একটি গ্রন্থে ২২৬ টি ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ রয়েছে। কিন্দি তাঁর গ্রন্থে নানা রোগ ও এসবের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
আলী ইবনে রাব্বান (মৃ. ৮৫৫/৮৫০ খ্রি.)	আরবি ভাষায় প্রথম বিশদ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর *ফিরদাউস হিকমত* চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশ্বকোষ তুল্য।
জাকারিয়া আল রাজী (৮৪১-৯২৬ খ্রি.)	চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে ১১৭টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম শিশু চিকিৎসা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। সে হিসেবে

	তাঁকে Pediatrics- এর জনক বলা সঙ্গত। শিশু রোগকে তিনি ২৩ ভাগে বিন্যস্থ করেন। রাজীর গ্রন্থ কিতাবুল মনসুরী ১০ ভাগে বিভক্ত যাতে রয়েছে এনাটমী, ফিজিওলজী, ঔষধ, স্বাস্থ্য রক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, বিষ, জ্বর প্রভৃতি। আল রাজীর কিতাবুল হাবী ৩০ খণ্ডে রচিত যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।
হুনায়েন ইবনে ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.)	চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা ও বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। গ্যালেন সহ অনেক প্রাক-রোমান বিজ্ঞানী তাঁর মাধ্যমে পরিচিত লাভ করেন।
সাবেত বিন কুররা (৮২৬-৯০১ খ্রি.)	চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু গ্রন্থ (১২৮ টি) রচনা করেন যা ল্যাটিনে অনুদিত হয়। তাঁর পরিবারের অনেক সদস্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী সিনান ইবনে সাবেত তাঁরই পুত্র ছিলেন যিনি প্রায় ১৯ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।
আহমদ আত্ তাবারী, আলী ইবনে আব্বাস (১০ম শতক)	এরা তাবারীস্থানের অধিবাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। দুজনেই কিছু গ্রন্থ রচনা কেরছেন। আলী ইবনে আব্বাস তাঁর *কিতাবুল মালিকি* গ্রন্থের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ইবনে আব্বাস তাঁর গ্রন্থে রোগের উপশম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্বের-পরের গবেষকদের মতবাদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি আজমা, পাঁচড়া, মেছতা, কুষ্ঠ, বসন্ত, হাম, ইরিসিপিলাস প্রভৃতি রোগ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার এমনকি ক্যানসারের অপারেশন করেছেন। সার্টনের মতে, তাঁর গ্রন্থেই capillary system- এর প্রথম আভাস পাওয়া যায়।
হাসান ইবনে নূহ (১০ম শতক)	বিখ্যাত চিকিৎসক। চিকিৎসা বিষয়ে কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কিতাবু গানা ওয়া মানা (৩ খণ্ড) সবচেয়ে বিখ্যাত। এছাড়া আছে মাকালাতু ফিত্তীর, মুসতালাহাতেত্ তীব, বিতাবু এলানিন প্রভৃতি।
আবু মনসুর মুয়াফাক	আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানে দ্বিবিধ কারণে বিখ্যাত।

(১০ম শতক)	প্রথমত, তিনি প্রাদেশিক ভাষা ফার্সিতে সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন এবং দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে রসায়নের সংযোগ ঘটিয়েছেন।
আত্ তামিমী (মৃ. ৯৯০ খ্রি.)	চিকিৎসা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি বিশেষত ঔষধ নিয়ে বেশি গবেষণা করেন।
আবুল কাসেম খালাফ আল জাহরাবী (৯৩৬-১০৩০)	মুসলিম স্পেনের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি স্পেন তথা ইউরোপে রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বদ্ধমুল কুসংস্কার দূরীকরণে মূখ্য ভূমিকা রাখেন। স্পেন তথা ইউরোপে সার্জিকেল বিদ্যা সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। হিট্টির মতে তিনি স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ *আত্ তাসরীফ*- এ (২ খণ্ড, ৩০ অধ্যায়) এনাটমী, ফিজিওলজী, ডায়াবেটিকস, সার্জারী সম্পর্কে আলোচনা করেন। সার্টন এই গ্রন্থকে Medical Encyclopedia হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটি প্রথম সচিত্র শল্যবিদ্যা গ্রন্থ। তিনি কুষ্ঠ, শিশু রোগ, রিকেট, কানের অসুখ, গ্লুকুমা প্রভৃতি নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেন।
ইবনে হাইছাম (৯৬৫-১০৪০)	পদার্থবিদ ও গণিতবিদ হাইছাম চক্ষুবিজ্ঞানে অনবদ্য অবদান রাখেন। তাঁর গবেষণার উপর ভিতিাত করেই চোখের চশমা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁকে চক্ষু বিজ্ঞান ও চশমার আবিষ্কারক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। চোখের এনাটমী পরীক্ষা করে তিনি seleroid, cornea, choroid, iris প্রভৃতির পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেন। তিনি চোখের রেটিনা, অপটিক, নার্ভ-প্রভৃতির কাজ, চোখের জলের জলীয় ও স্বচ্ছ কাজ প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করেন। আধুনিককালের 'লেন্স' শব্দ এই বিজ্ঞানীরই ব্যবহৃত আদাসা শব্দ থেকে উদ্ভূত।
	বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও পথিকৃৎদের অন্যমত তথা প্রধান। চিকিৎসা বিষয়ে প্রায় ১৫/১৬ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-কানুন*

ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.)	*ফিত্ তীব* চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ ও বাইবেল হিসেবে খ্যাত যা একাদশ-সপ্তদশ শতাব্দি পর্যন্ত ল্যাটিন অনুবাদে উইরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত ছিল। এটি ৫ খণ্ডে বিভক্ত। এর ২য় খণ্ডে প্রায় ৭৫০ টি গুল্ম, প্রাণীজ ও খনিজ ওষুধের বিবরণ রয়েছে। অনেকগুলো ঔষধ এখনো ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থে প্রতিটি ওষুধের পরিচিতি ও ব্যবহার, কার্যকারিতা, কোন রোগে কোন ওষুধ ব্যবহার্য্য, বিকল্প ঔষুধ ইত্যাদির উপর বিশদ আলোচনা রয়েছে। ২য় খণ্ডে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ, সেসবের উপসর্গ, ডায়াগনসিস, প্রগনোসিস ও এটিলজি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি Psycho-theraphy- এর সূত্রপাত করেন বলেও মনে করা হয়।

উপরের মতো অন্যান্য শাস্ত্র যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোলশাস্ত্র, আইনতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, গ্রন্থাগার সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমানদের রয়েছে পথিকৃতের ভূমিকা যা স্থানাভাবে এখানে আলোচনা করা গেল না।। প্রকৃতপক্ষে আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার প্রায় সবকিছুরই মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা। মুসলিম স্পেন এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদানে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে। মুসলিম স্পেনের মাধ্যমেই আজকের ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পেয়েছিল। সুতরাং মধ্যযুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপের জন্য অন্ধকার ছিল, মুসলমানদের জন্য ছিল সোনালী যুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো অঙ্গন নেই যা মুসলিম বিজ্ঞানীদের দানে সমৃদ্ধ হয় নি।

রব-বিচ্ছিন্ন জ্ঞানই জগতের সকল জালা-যন্ত্রণার কারণ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতা সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তাহীন এক দেউলিয়া সমাজ, এর মূল কারণই এটি। উম্মতে মুহাম্মদীরই এই দায়িত্ব যে সে সকল

মানববিদ্যার, বিজ্ঞান শিক্ষার যথার্থ ব্যাখা ও উপস্থাপনার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার এই ভ্রান্তি বিশ্বসমাজের কাছে তুলে ধরে মানব সমাজকে যুগের সকল জালা-যন্ত্রণা ও বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করবে। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসের পানে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁরা এই মহৎ দায়িত্বও যুগে যুগে অতি উচ্চাঙ্গের সাথে পালন করেছেন। এটি এককভাবে মুসলমানদের অনন্য কীর্তি।

মানবজীবনে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্বমানবতার যে মুমূর্ষু চিত্র আমরা দেখে এসেছিলাম সে কথাকে মনে রেখে আমরা এখন এটি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব, যে ইসলামি সভ্যতা পৃথিবীকে সকল অর্থে পশুসমাজ থেকে মনুষ্য সমাজ এবং উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করেছে সেসব ক্ষেত্রে ইসলামের কী প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। এই প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। ষষ্ঠ শতকের মানব সমাজের সঙ্গে যদি খুলাফায়ে রাশেদার ত্রিশ বছরের মানব সমাজকে তুলনা করা হয় তাহলে দেখতে পাই, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ অসভ্যতা, বর্বরতা ও মূর্খতার যে অতল গহ্বরে জীবন যাপন করছিল তা ছিল মূলত রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের ভোগবিলাসী জীবনের জন্য তাদেরই তৈরি করা নানা তন্ত্র-মন্ত্রের জালে আবদ্ধ। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতি-নৈতিকতা- সবই ছিল এক ভনিতার নীতি, এই ফাঁদে আপামর মানুষ পা দিতে ছিল বাধ্য, এছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না।

মানব প্রাণি সত্তাগতভাবে তাওহিদী, কিন্তু মানুষ সরল সত্য ভুলে যায়, সহসাই মিথ্যার ফাঁদে ফেঁসে যায়। লক্ষণীয় বিষয়, সেমেটিক এমনকি অসেমেটিক অনেক ধর্ম যেমন হিন্দু, পার্শী, একত্ববাদী, এদের মূল গ্রন্থে তাই আছে। তাহলে? তা সত্ত্বেও এসবের অনুসারীদের একত্ববাদের অবস্থা আমরা প্রথম অধ্যায়ে অবলোকন করেছি। সে সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সাধারণ মানুষের, সে সংখ্যা যত কমই হোক, এসবের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হতে থাকে। কারণ যুগের পর যুগ ধরে যে অন্ধকারের মধ্যে তারা বসবাস করছিল

যার অন্যতম হোতা ছিল অশুভ রাজতন্ত্র ও দোসর পুরোহিততন্ত্র, নিশ্চয়ই এ থেকে তারা মুক্তি খোঁজছিল। তবে মুক্তির কোনো নকশা তাদের জানা ছিল না। তারা যখন ইসলামকে কাছে থেকে দেখতে শুরু করল তখন তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য জ্ঞান, সত্য-মিথ্যার ফাঁরাক উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বতর হতে শুরু করে। ইসলাম তাদেরকে এই মুক্তির পথ দেখিয়েছিল– কথায় ও কাজে। তাই যদি না হত তাহলে এত তাড়াতাড়ি রোমান ও পারস্য সম্রাটদের শত শত বছরের তখ্ত খসে পড়ার কথা ছিল না; ইতিহাস বলে, মানুষ তখন এদের বদলে ইসলামি শাসনকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এ কথার ঐতিহাসিক দলিল আমরা পরে লক্ষ করব। জাহেলিয়াতের নানা ধর্মের জীবন ও জগতের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা, ধর্মের জটিল ও দুর্বোধ্য তত্ত্ব এবং সর্বোপরি ধর্ম ও বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্যহীন অবাস্তব সম্পর্ক ও ঘাত-প্রতিঘাতের বিপরীতে ইসলামের একত্ববাদ-রেসালাত-পরকাল দর্শন- এর সহজ-সরল বাস্তবসম্মত ও অর্থপূর্ণ সম্পূর্ণ ব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃত শান্তি ও নিয়তি খোঁজে পেয়েছে। এটিই ছিল গোটা দুনিয়ায় ইসলামের বিজয়ের প্রকৃত কারণ। লিওপোল্ড লুইস ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে একটি ইহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। নানা ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে বিস্তর পড়ালেখা করে ১৯২৬ সালে সস্ত্রীক ইসলাম গ্রহণ করেন, নাম রাখেন মুহাম্মদ আসাদ। ইসলামের এই বিশেষত্বই এসব অসংখ্য মানুষকে সত্যের পানে নিয়ে আসে। তাঁর মতে, ইসলামই একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা যা মানুষের ইহজীবন ও আধ্যাত্মজীবনের মধ্যে সুষম সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জীবন ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুকে অর্থপূর্ণ করে তোলে।[২১৩]

খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এমন কিছু ঝোঁক ও প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল যা ছিল ইসলামের প্রভাবে। কতিপয় দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যাবে যে ইসলামের সভ্যতা কীভাবে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল। আহমদ আমীন লেখেন, অষ্টম শতাব্দীতে (হিজরী দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক) ফ্রান্সের সিপ্টিমানিয়ায় একটি আন্দোলন হয়েছিল যার মূল কথা ছিল,

---

[২১৩] Mohammad Asad. *Islam at the Cross-Road.* Dar Al-Andalus, Gibraltar. pp. 26-28. [to veiw the source visit on the book name.]

পাদ্রীদের অধিকার নেই পাপের স্বীকৃতি গ্রহণের। মানুষ মানুষের সামনে পাপ স্বীকার করবে, এর কোনো ধর্মীয় ভিত্তি নেই, মানুষ শুধু স্রষ্টার সামনে পাপ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[২১৪] বলাই বাহুল্য যে, ইসলামে যেহেতু 'পোপ' নেই সুতরাং 'পাপ স্বীকারের'ও অবকাশ নেই। ইসলামে মানুষের 'আদী পাপ' বলতে কিছু নেই। একইভাবে অষ্টম ও নবম শতকে (হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতক) ধর্মীয় চিত্র ও মূর্তি অপসারণের একটি আন্দোলন প্রবলভাবে দানাবেঁধে ওঠে। এ আন্দোলন এক সময় এতই শক্তিশালী হয় যে, তৃতীয় লুই, পঞ্চম কনস্টানটাইন ও চতুর্থ লুই- এর মতো প্রবল প্রতাপান্বিত রোমান সম্রাটগণও এর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন। ৭২৬ ও ৩০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট তৃতীয় লুই সরকারিভাবে চিত্র ও মূর্তির পবিত্রায়ণ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন এবং এটিকে মূর্তিপূজা বলে অভিহিত করেন। পোপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেগরী, কনস্টান্টিনোপলের পাদ্রী গ্রেম্যান্স ও সম্রাজ্ঞী ইরীনী ছিলেন চিত্র-উপাসক ঘোর সমর্থক ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব হয়েছিল।

রোমান ও গ্রিক সভ্যতায় প্রতিমা-প্রেম ও ভাস্কর্যপ্রীতির খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া, বলা হয় সেখান থেকেই খ্রিস্টধর্মে মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ, এবং এক সময় শক্ত শিকড় গেড়ে বসেছিল। এরকম অবস্থায়, এমন স্থানে প্রতিমা বিরোধী আন্দোলন একথা প্রমাণ করে যে, এটি ছিল ইসলামের মূর্তিবিনাশী ভূমিকা ও তাওহিদী চেতনারই প্রতিধ্বনি যা ইসলামের তাবলীগের মাধ্যমে মুসলিম স্পেন থেকে পাশ্চাত্যে পৌঁছেছিল।

বিশপ নামীয় জনৈক ক্লেডিয়াসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ছিল স্পেনে, তিনি ২১৩ হিজরীতে, ৮২৮ খ্রিস্টাব্দে টুরীনের বিশপ হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি তার বিশপ অঞ্চলে ক্রুশ উপাসনা শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণাই করেন নি অধিকন্তু সব ক্রুশ জ্বালিয়ে দেওয়ারও আদেশ দিয়েছিলেন। এসব ছিল পৃথিবীতে ইসলামি

---

[২১৪] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৩১।

রেনেসাঁর উষাকালের ঘটনা। গিবন লেখেন ছবিপূজা সম্পর্কে ইহুদী ও মুসলিম উভয়েই অপ্রসন্ন ছিল কিন্তু বিজেতা মুসলমানদের এ বিষয়ে নিন্দা-অসন্তোষের বিষয়টি গীর্জার পুরোহিতগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। গীবন আরো লেখেন, ছবিপূজার বিরুদ্ধে যিনি প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তিনি হলেন সম্রাট লিও (প্রতিমা ধ্বংসকারী উপাধিপ্রাপ্ত) ও তার পুত্র পঞ্চম কনস্টান্টাইন। ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত সিনোড সভায় ছয় মাস আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, যীশুখৃস্টের ছবি ও প্রতিমা পূজা করা হচ্ছে ধর্মীয় নব উদ্ভাবন। পূর্বাঞ্চল এ দাবী প্রথমে অস্বীকার করে কিন্তু পরে মেনে নিয়েছিল। ৭২৮ ক্রিস্টাব্দে ইটালীয়রা এই সীদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।[২১৫] ইউরোপে সংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষদের উপর ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব লক্ষণীয়। মার্টিন লুথারের কথা এক্ষেত্রে বলা যায়, যদিও তাতে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল।

জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে ইসলামের প্রভাব লক্ষ করার মতো। Robert Briffault লেখেন, ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতির এমন কোনো অঙ্গন নেই যেখানে ইসলামি সভ্যতার বিরাট অবদান নেই।[২১৬] এই প্রাচ্যবিদ প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে বিজ্ঞানে মূল অবদান হল মুসলমানদের, বিশেষত স্পেনের অবদান বিস্ময়কর। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইউরোপের রেনেসাঁর শুভ সূচনা মূলত মুসলমানদের অবদানের ফল। Robert Briffault লেখেন:

> বিজ্ঞান আরবদের যুগান্তকারী অবদান যা আজকের পৃথিবীকে আধুনিক বিশ্বে রূপান্তরিত করেছে। ইউরোপে জ্ঞানের মশাল ইসলামই সর্বপ্রথম জ্বালিয়েছিল।[২১৭]

---

[২১৫] Edward Gibbon. *Ibid*, pp. 255-256.
[২১৬] Robert Briffault. *Ibid*, p. 190.
[২১৭] *Ibid*, p. 202.

হাজার হাজার বছর ধরে যে ভারতবর্ষ রহস্য-যবনিকার অন্তরালে আবৃত ছিল, ইসলামের অনুসারীরা তা উন্মোচিত করার পূর্বে তার কোনো ইতিহাস ছিল না। ভারতীয় উপমহাদেশে একত্ববাদ এবং এক স্রষ্টার উপাসনার সুস্পষ্ট ধারণা, ভারতীয় জাতিবর্গের নীতি ও চরিত্র, সমাজ-সংস্কৃতি এবং আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি ও সুগভীর। ইসলামের সংস্পর্শে আসার পরই কেবল এসব ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।[২১৮] কে. এম. পিনাকর লেখেন:

এটি সুস্পষ্ট ও সুস্বীকৃত যে হিন্দু ধর্মে ইসলামের প্রভাব ছিল সুগভীর এবং হিন্দু মানসে ঈশ্বর উপাসনার চিন্তা ইসলামেরই অবদান। তখনকার চিন্তানায়ক ও ধর্মবিদগণ উপাস্যদের বিভিন্ন নাম দিলেও তারা (মুসলমানরা) ঈশ্বরের উপাসনার আহ্বান জানিয়েছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে উপাস্য মাত্র একজন এবং তিনিই উপাসনার একক অধিকারী। তাঁরই কাছে মুক্তি ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করতে হবে। ইসলামি যুগে ভারতবর্ষে যেসব ধর্ম ও সংস্কার প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছে সেগুলোতে উপরোক্ত প্রভাব ছিল সুপ্রকাশিত। যেমন ভক্তিধর্ম ও গুরু কবিরের ধর্মমত।[২১৯]

জওহরলাল নেহেরু তাঁর *Discovery of India* গ্রন্থে লেখেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিক থেকে বিজেতাদের আগমন এবং ইসলামের প্রবেশ ভারতের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় সমাজে যে ব্যাধি ও পচন ছড়িয়ে পড়েছিল, ইসলামই তা প্রকাশ করেছিল। বর্ণভেদ ও অচ্ছুৎ প্রথা এবং বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা যাতে ভারতবর্ষ তখন আচ্ছন্ন ছিল, ইসলামই তা প্রকাশ করেছিল। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব যা মুসলিম জাতির

---

[২১৮] তারা চাঁদ। ২০১৪। *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*। এস. মজিব উল্লাহ অনু. ঢাকা:ইফা; মানবেন্দ্রনাথ রায়। ২০০৪। *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান*। মোহাম্মদ আবদুল হাই অনু. কলকাতা:রেনেসাঁস।

[২১৯] A Survey of Indian History, p. 132, উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ., *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৩৫।

জীবন ও বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল তা ভারতীয়দের মনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এ প্রভাব ঐসব হতভাগ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেই ছিল সর্বাধিক, ভারতীয় সমাজ যাদেরকে সাম্য ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। ভারতীয় আধুনিক লেখক N.C. Mehta লেখেন: ইসলাম ভারতবর্ষে এমন এক আলোর মশাল নিয়ে এসেছিল যা মানুষের জীবন থেকে অন্ধকার দূর করেছে, এই অন্ধকার প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পতনকালে জেঁকে বসেছিল। কিছু উত্তম আদর্শ তখন বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে বিশ্বাসের রূপ লাভ করেছিল। বস্তুত ইসলামের বিজয়াভিযানের প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেই ছিল বেশি শক্তিশালী, এমনটি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও লক্ষ করা যায়। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতে ইসলামের আগমন রাজ্য শাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিচিতি লাভ করেছে ফলে ইসলামের মূল সত্য, মহান দান-অবদান লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে।[২২০]

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য যা শুধু ভারতবর্ষ নয় বরং গোটা বিশ্ব এমনকি মুসলমানদের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, রঙিন চশমা না চড়িয়ে একবারে এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস পড়লে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের উদ্ধত আচরণ উপহাস্য বলে মনে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইতিহাসকে অপমানিত করেছে আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকেও ব্যাহত করেছে। মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার অধিনায়ক হয়ে রইল। এমনকি আজও তার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অতীত ঋণের বোঝা স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হন না। দুর্ভাগ্য আমাদের, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইসলামের সংস্কৃতি-সম্পদ থেকে ভারতবর্ষ তেমন উপকৃত হতে পারে নি, কেননা অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবার যোগ্যতা তার ছিল না। এখনও এই বিলম্বিত রেনেসাঁসের সৃষ্টি বেদনায় মানবেতিহাসের এই অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসীরা প্রভূত লাভবান হতে পারে।

---

[২২০] *Indian Civilization and Islam*. উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৩৫-২৩৬।

মানব সংস্কৃতিতে ইসলামের দান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ আর উক্ত দানের ঐহিতাসিক মূল্যের যথার্থ অনুধাবন তাদের উদ্ধত আত্মপ্রসাদের প্রাসাদ থেকে বাইরে টেনে নিয়ে এসে হিন্দুদের চকিত বিস্ময়ে অভিভূত করে দেবে, আর আমাদের এ যুগের মুসলমানদের সঙ্কীর্ণতা মুক্ত করে তারা যে ধর্মে বিশ্বাসী, তার মর্মবাণীর সঙ্গে তাদের মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দেবে।[২২১]

ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর সহোদরের ন্যায়, হাতে হাত ধরে চলে, দু'য়ের মিলনে সভ্যতা স্বার্থক হয়ে উঠে। মুসলমানদের একক এই কীর্তি যে– তাঁরা যুগপৎ ধর্মচর্চা ও বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালের মুসলমান, অমুসলমান সবাই এই আদর্শ পরিত্যাগ করে মানবসভ্যতাকে অনিবার্য বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। একদিকে মুসলমানরা বিজ্ঞান চর্চা পরিত্যাগ করেছেন (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), অন্যদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধর্মচর্চা পরিত্যাগ করেছেন (৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরিশেষে বলা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বের সমাজচিত্র ও এর তৎপরবর্তী যুগসমূহের ইতিহাস যদি নিতান্ত আলোকিত মন নিয়ে অধ্যয়ন করা যায় তাহলেই কেবল বিশ্বময় ইসলামের প্রভাব, দান-অবদান হৃদয়পটে সঠিকভাবে ধরা দিতে পারে; তখন দেখা যাবে, সভ্য পৃথিবীর এমন কোনো অঙ্গন নেই যা ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ হয়নি।

[২২১] মানবেন্দ্রনাথ রায়। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৬৪।

৪

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম শাসন এবং পরোক্ষভাবে বিশ্ব শাসনের দায়িত্বভার এমন একদল মানুষের হাতে ছিল, পরবর্তী আমলসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্তগণের সঙ্গে যাদের তফাৎ ছিল সুস্পষ্ট। প্রথমত, প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য এমন একদল মানুষ পরিচালনা করেছিলেন যারা ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা ভারসাম্যে পরিপূর্ণ আলোকিত মানুষ। ইলম, আমল ও তাকওয়ার মানদণ্ডে প্রত্যেকে ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন্ত মু'জিযা। এঁরা এমনভাবে গড়ে ওঠেছিলেন যে একমাত্র দেহসত্তা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে অতীতের সঙ্গে তাদের কোনো সাদৃশ্য তো ছিলই না, তাঁদের পরের যুগের শাসকদের সঙ্গেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য।

একদিকে তাঁরা ছিলেন মসজিদের সুযোগ্য ইমাম, অন্যদিকে আদালতের সুযোগ্য বিচারক। মসজিদে তাঁরা ইমামতের পরিপূর্ণ হক আদায় করতেন, ইলম ও আমল শিক্ষা দিতেন, অন্যদিকে আদালতে বিচারের আসনে শতভাগ ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম করতেন। তাঁরা ছিলেন বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথার্থ আমানতদার, রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনে অতুলনীয়, বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সুদক্ষ সেনাপতি, সুকৌশলী যুদ্ধ-পরিচালক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা, ইকামতে দীন ও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় তুলনাহীন। তাঁরা সকলে ছিলেন একইসঙ্গে সত্যিকার মুত্তাকী, পরহেজগার ও আল্লাহ ভীরু ধার্মিক ও সাহসী মুজাহিদ; তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফকিহ মুজতাহিদ, বিজ্ঞ বিচারক, সুদক্ষ শাসক ও কুশলী রাজনীতিবিদ। এককথায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের সর্বোত্তম জিম্মাদার জ্ঞানী

মানুষ। তাঁদের একই ব্যক্তি ছিলেন দীন ও দুনিয়া এবং ধর্ম ও রাজনীতির ধারক, তিনি হলেন খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীন।[২২২]

এই জামাত কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ও এর অনুসরণ অনুকরণে ছিলেন তুলনাহীন যা তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষালয় থেকে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থেকে অবর্ণনীয় ত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছিলেন। এককথায় ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবন সবকিছু ছিল মিনহাজুন্ নবুয়তের প্রতিচ্ছবি। এসবই ছিল তাঁদের সাফল্যের মূল কারণ।

নোবেল বিজয়ী মুসলিম মনীষী আবদুস সালাম মুসলমানদের স্বর্ণালি যুগের সাফল্যের পেছনে তিনটি কারণ দেখতে পেয়েছেন। প্রথম এবং প্রধানত, মুসলমানরা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুনঃ পুনঃ দেওয়া নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন। দ্বিতীয় কারণ যা প্রথমটির সঙ্গে জড়িত তা হল জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে ব্যক্তিত্বদের– আলীমদের– প্রতি ইসলাম যে মর্যাদা দেয় তা। সমসাময়িক রাজা-বাদশাহগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তৃতীয় কারণ হল ইসলামের আন্তর্জাতিক চরিত্র। ইসলামি জগত জাতি এবং বর্ণের উর্ধ্বে; তাছাড়া প্রাথমিক মুসলমান সমাজ তার বাইরের মানুষ এবং তাদের চিন্তাধারার ব্যাপারে অত্যন্ত সহনশীল ছিল।[২২৩] কিন্তু এর পর সময় যত পার হয়েছে সফলতার এই কারণসমূহের মধ্যে অবনতি দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েছে যার রেশ আর টেনে ধরা যায় নি।

ঈমান-আমলের ক্রমাবনতি

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের বহু কারণের মধ্যে এটিই মূল যা তাকে দিনে দিনে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও

---

[২২২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৩৮।

[২২৩] এ. এম. হারুনুর রশীদ। ২০০১। *নোবেল বিজয়ী আবদুস সালাম:আদর্শ ও বাস্তবতা*। ঢাকা:ইউনিভার্সিটি বুক পাবলিশার্স। পৃ. ২৩৯।

তাঁর নূরানী সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাতের যুগের সঙ্গে পরবর্তী জামানার দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈমান-আমলেরও অধঃপতন বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম উম্মাহ দিনে দিনে পাশ্চাত্যবাদী ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রভাবে বস্তুবাদ ও ভোগবাদের ফাঁদে ফেসে যেতে থাকে যার অনিবার্য পরিনতি হল ঈমান-আমলের অধঃপতন। আর ঈমান-আমলের অধঃপতন হলে জীবনের যে কোনো অঙ্গনে এর অশুভ প্রভাব অনিবার্য। মুসলিম উম্মাহর জীবনে সেটাই হয়েছে। ইসলামি বিশ্বের ইতিহাসের পানে তাকালে দেখা যায়, অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর সভ্যতা-সংস্কৃতির মোহমায়ায় উম্মত যখন দিশেহারা হয়েছে এবং আত্মিক শক্তিকে অবহেলা করে সেসবের বিপরীত স্রোতে আত্মনিবেদিত হয়েছে তখন এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে তার ঈমান ও আদর্শ তিলে তিলে এমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ফলে সে তার মর্যাদার আসন থেকে ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়েছে। তাতারী ফিতনা, ক্রুসেড প্রভৃতি ঘটনায় যদিও ইসলাম তার চিরন্তনতার কারণে আপন রূপে ঠিকে গেছে এবং থাকবে, কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তার আত্মবিলয় থেকে আজও জেগে উঠতে পারেনি। এর মূল কারণ সেটি যার বদৌলতে সে মুমূর্ষু বিশ্বমানবতাকে একটি সোনালী যামানা ও অদ্বিতীয় অবদান উপহার দিয়েছিল, বিশ্বমানবতাকে বাঁচিয়েছিল নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে। এটিই সেই ঈমানী রুহানিয়াত যা তার নবীর শিক্ষামালারূপে সে পেয়েছিল, এবং তার অধঃপতনের কারণও এটিই যা সে হারিয়েছে।

অশুভ রাজতন্ত্র

হিজরী ৪০ সালের ১৭ রমযান হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর লোকজন হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়াত গ্রহণ করে। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেদিন থেকেই খলীফা হিসেবে কাজ শুরু করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছিলেন, আমার খিলাফত নীতি ৩০ বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে। তারপর

শুরু হবে রাজতন্ত্র।[২২৪] হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ৪১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর সময়কাল যোগ করলে এ সময় পর্যন্ত ৩০ বছর পূর্ণ হয়। ইবনে কাসীর লেখেন, এ হাদিস এবং এর বাস্তবতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য নবী হওয়ার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। মহামতি হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফিতনা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেভাবে খিলাফতের দায়িত্ব মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্বপক্ষে পরিত্যাগ করেছিলেন তা বিশ্ববাসীর জন্য একটি চিরকালীন শিক্ষা হয়ে আছে। অথচ, খিলাফতের আসনে তিনি পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বসেছিলেন আর তিনি এরই উপযুক্ত ছিলেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছিলেন, হে লোক সকল! আমার এই বংশধর (হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নেতা ও পথ প্রদর্শক। অতিসত্বর তার মাধ্যমে আল্লাহ্ দু'টো বৃহৎ মুসলিম দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করবেন। (বুখারী) হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই ঘটনা ছিল সেই বাণীরই প্রতিফলন। ইবনে কাসীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে লেখেন, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন প্রথম রাজা, তাঁর যুগ প্রথম রাজত্ব যুগ। তিনি ছিলেন রাজাদের মধ্যে উত্তম রাজা। আমাদের অতি-অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মধ্যে নূরের স্তরভিত্তিক ঔজ্জ্বল্যের মতো ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বের স্তর ছিল, কিন্তু তাঁরা কেউই ভাল ছাড়া মন্দ ছিলেন না, সকলেই ছিলেন হিদায়াতের উৎস।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, আমার সাহাবাগণ আকাশের নক্ষত্রের মতো। তাদের যে কারো অনুসরণ

---

[২২৪] ইবনে কাসীর। *বিদায়া-নিহায়া*। অষ্টম খণ্ড । পৃ. ৪২।

করলে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। এই হাদিস এবং ইতোপূর্বে সাহাবা জামাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিকে সামনে রেখে বলতে হয়, যারা হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মন্দ সমালোচনা করে তারা কুরআন-হাদিস বিরোধী অবাস্তব কথা বলে। সুতরাং, ইতিহাসে উম্মতের মধ্যে অধঃপতনের সূচনা তাঁর আমলের পর থেকে শুরু হয়েছে, এটিই সঠিক কথা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতও এটিই।[২২৫] সুতরাং, খিলাফতে রাশেদার পরের মুসলিম শাসক, রাজা-বাদশা ও তাদের শাসনামলের অশুভ প্রভাবের কথা যখন বলা হবে সেখানে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তো বটেই, উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.- এর মতো ব্যক্তিত্বকেও এই বর্ণনার বাইরে ধরতে হবে।

হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পর– উমর ইবনে আবদুল আযীয, নূরউদ্দিন জঙ্গী, সালাউদ্দিন আইয়ুবী- এর মতো ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেখা যাবে, খোলাফায়ে রাশেদার পর শাসন কার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে এমন এমন লোকদের দখলে চলে গিয়েছে যারা কোনভাবেই এর যোগ্য ছিলেন না এবং এর জন্য তাদের কোনো প্রস্তুতিও ছিল না। মূলত, ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও ভাবধারায় এরা যথেষ্ট আত্মস্থ ছিল না, উম্মাহর নেতৃত্ব দানের জন্য যা পূর্বশর্ত। জিহাদী চেতনা ও ইজতিহাদী যোগ্যতা, পরিণামদর্শীতা কিছুই তাদের ছিল না, ইসলামি খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহন এবং বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য যা অপরিহার্য। তারা ভোগবাদী বিলাসীতায় দিন দিন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হচ্ছিলেন। কিছু ব্যতিক্রম, যেমন এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এরকম ছাড়া, উমাইয়া, আব্বাসী শাসনামল থেকে নিয়ে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এটি সত্য ছিল। এসব কারণে, বিশ্বজনীন দ্বীনে-ইসলামের মজবুদ দেয়ালে এমন এমন ফাটল সৃষ্টি হল যা আর রোধ করা সম্ভব হয় নি এবং এর ফলে উম্মাহর জীবনে এমন বিচ্যুতি ও বিকৃতি সৃষ্টি হল, একের পর

---

[২২৫] মুহাম্মদ তাকী উসমানী। ২০০৩। *ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু*। ঢাকা:দারুল কলম। পৃ. ১৪৩-১৫১।

এক এমন সব ফিতনা ও দুর্যোগ ধেয়ে আসতে লাগল যা রোধ কারো পক্ষেই আর সম্ভব হয় নি।

খোলাফায়ে রাশেদারে শাসনামলের সঙ্গে যদি এসব অপরিণামদর্শী অযোগ্য শাসকদের তুলনা করা হয়, যদিও তা যুক্তিযুক্ত নয়, তখন বড়ো আফসুস হয়। মূলত, দ্বীনের সঠিক শিক্ষা ও দর্শন থেকে যে প্রজন্ম নিজেকে বিমুক্ত করে ফেলে, তাদের দ্বারা তখন দুর্ভোগই কেবল সৃষ্টি হতে ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। খিলাফতে রাশেদার পর দ্বীনের সঠিক শিক্ষা ও দর্শন থেকে এই যে ক্রম-বর্ধমান বিমুক্তি ও তার ফলে দুর্ভোগের পর দুর্ভোগ, স্পেনে মুসলিম শাসনের বিলুপ্তির মাধ্যমে তার সর্বশেষ যবনিকাপাত ঘটল। এককথায় বলা যায়, মুসলিম উম্মাহ প্রায় হাজার বছর ধরে বিশ্বে যে নূর ও মুক্তির পথ ও পাথেয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনালী সোপান গড়ে তুলেছিল, যার আলোয় পথ চলেছিল গোটা পৃথিবী তার সবকিছুই ঐসব অযোগ্য, অশুভ নেতৃত্বের কারণে একে একে হারিয়ে যেতে থাকে। এসব অশুভ শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায় মানব জাতির গর্ব, মানবকূল শ্রেষ্ঠ সাহাবা জামাতের কোনো কোনো সাহাবী পর্যন্ত, অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ তাবেঈ, তৃতীয় শ্রেষ্ঠ তবে-তাবেঈ, আউলিয়া, দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং অগণিত সোনার মানুষজনের নাজেহালের কলঙ্কিত কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল- এর মতো ব্যক্তিত্ব যাদের হাতে ও যাদের শাসনামলে নির্যাতিত ও নিগৃহিত হতে পারেন তাদের কাছে জাতি কী আর আশা করতে পারে!

জিহাদ ও ইজতিহাদ[২২৬] থেকে বিচ্যুতি

ইসলাম চিরন্তন ও সর্বজনীন ধর্ম, এটি সর্বকালে আলোকিত মানুষের ধর্ম। ইসলাম জীবনের কোনো খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে না। অপরাপর যে কোনো মত ও পথের বিপরীতে ইসলামি নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য

---

[২২৬] এই ইজতিহাদ অর্থ গবেষণার মাধ্যমে কোনো নতুন মাযহাব আবিষ্কার করা নয়, বরং চিন্তা, অনুসন্ধান বা গবেষণাকে বুঝায়।

অনেক সংবেদনশীল ও সুবিস্তৃত গুণ ও যোগ্যতার প্রয়োজন অনিবার্য। নদবী রহ.- এর মতে, এসব গুণসমূহকে এক কথায় জিহাদ ও ইজতেহাদ (গবেষণা) শব্দে প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। যে কোনো ব্যক্তি বা দলকে ইসলামের নেতৃত্বের মহা-মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে অবশ্যই তাকওয়া ও সততার পাশাপাশি জিহাদ ও ইজতেহাদেরও পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।[২২৭] ইসলামের অর্থ হল এবং মুসলিম জীবনের লক্ষ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সকল বিষয়ে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর যে কোনো আদেশ-নিষেধ বা বিধি-বিধানের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। জিহাদের অর্থ হল, এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বড়-ছোট যে কোনো বিষয়ে নিরলস সাধনা, চেষ্টা ও সংগ্রাম করে যাওয়া। এটি সুদীর্ঘ ও সুকঠিন সংগ্রাম যা জীবনব্যাপী এবং চিরকাল অব্যাহত থাকে। এই জিহাদ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে, ভিতরে-বাইরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত যা নিয়োজিত হবে ঐ সব ভ্রান্ত-চিন্তা-বিশ্বাস, আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা, চাহিদা, প্রবৃত্তি, মত-পথ, উপাস্য- এক কথায় সকল বাতিলের বিরুদ্ধে যা আল্লাহর পথে আনুগত্যের পথে অন্তরায়।

নদবী রহ. লেখেন, "পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের এ মহৎ গুণাবলি অর্জনের পর একজন মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য হবে আপন সমাজে, চারপাশের জনপদে এবং পর্যায়ক্রমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ, বিধান ও শাসন প্রতিষ্ঠার জিহাদে আত্মনিয়োগ করা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। এটি হল আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর অর্পিত অপরিহার্য দায়িত্ব, তদুপরি মানবজাতির প্রতি দয়া ও সহৃদয়তারও এটাই দাবী। কেননা মানবতা ও সভ্যতাকে রক্ষা করার এটিই একমাত্র পথ, এমনকি তার আত্মকল্যাণের জন্যও এটি অপরিহার্য। এই জিহাদ ও মুজাহাদা ছাড়া ব্যক্তিজীবনে ইবাদত ও আনুগত্যও দুঃসাধ্য, বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। আল-কুরআনের পরিভাষায় এটাকে 'ফিতনা' বলা হয়েছে ।"[২২৮] যিনি যামানার যে কোনো বাতিলের বিপক্ষে ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম

---

[২২৭] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ২৩৯।
[২২৮] *প্রাগুক্ত।*

হন তিনি মুজাদ্দিদী মুসলিম। কবি ইকবাল হয়তো এজন্যই বলেছিলেন, "এ যামানার সবচেয়ে বড় মুজাদ্দিদ হচ্ছেন তিনি, যিনি অন্যান্য শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামি নীতিমালা এবং শাসন ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হন।" মহান ও পবিত্র আল্লাহ বলেন:

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞

অর্থাৎ, "আলিফ-লাম-রা, এ তো সেই কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি সমস্ত মানুষকে তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মহা-পরাক্রমশালী, মহা-প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে।" (ইবরাহিম : ১)

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কেউ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনাও এটিই, এটিই মহা-সুশৃঙ্খলা, এতেই কল্যাণ ও শান্তি নিহিত। প্রাণ-প্রাণহীন অন্যান্য সব মহলেও এই চিরন্তন রীতিই বহমান আছে, এর বাইরে যাওয়ার সাধ্য নেই। যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেন:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ (আল-ইমরান) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ
وَمَنْ فِى الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۞ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
مُكْرِمٍ ط إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ (হজ্জ : ১৮)

অর্থাৎ, তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চায়? অথচ, তাঁরই আনুগত্য গ্রহণ করেছে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আর তারা তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে। (আলে-ইমরান : ৮৩) তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহর সম্মুখে সিজদাবনত রয়েছে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, ও ভূমণ্ডলে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ; আর অনেকের উপর

অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। (হজ্জ : ১৮)

সৃষ্টিজগতে জীবন-মৃত্যু, উন্মেষ-বিকাশ, উত্থান-পতন এবং জাগতিক যে স্বভাব-চাহিদার চিরন্তন ব্যবস্থা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন সেই বিধান ও ব্যবস্থার বৃত্তেই সবাই বিচরণ করছে এবং করতেই থাকবে, এ থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়ার ক্ষমতা বৃহৎ-ক্ষুদ্র কারো নেই। চিরন্তন ধর্মের ক্ষেত্রেও এই বিধান কার্যকর। এখানে মুসলিম উম্মাহ যে জিহাদ ও মুজাহাদার আদেশ পেয়েছে তা হল আল্লাহর নিত্যসত্যের বা আল্লাহর বিধান বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জিহাদ এবং ইকামাতে দীন ও ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহর মুজাহাদা যা নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যেহেতু সত্যের বিপক্ষে মিথ্যার উপস্থিতি, আসমানী বিধান ও শরীয়তের বিপক্ষে বাতিল শক্তি ও আন্দোলন পৃথিবীতে সর্বদা আছে এবং থাকবে সেহেতু জিহাদ ও মুজাহাদাও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। জিহাদের অসংখ্য প্রকারভেদ রয়েছে, যুদ্ধ-লড়াই জিহাদের একটি মাত্রা। পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মিথ্যাকে পরাভূত করে সত্যের চলার পথকে নিষ্কন্টক করার জন্য কখনও কখনও যুদ্ধ বা কিতাল অপরিহার্য হয়। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ط فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۞

অর্থাৎ, "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালিম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)।" (বাকারা : ১৯৩)

এখন এই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অন্যতম দাবী হল, সর্বসাধারণের পক্ষে এটি সম্ভব নয়, যারা এতে নেতৃত্ব দেবে তাদের হক ও বাতিল, ইসলাম এবং কুফর ও জাহেলিয়াত সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি থাকবে, সত্য-মিথ্যা, ইসলাম-অনৈসলাম যখন যেভাবেই আসুক তা যেন সুস্পষ্টরূপে ফারাক করা যায়।

হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'আমার আশঙ্কা হয়, যার জন্ম হয়েছে ইসলামের পরিমণ্ডলে, জাহেলিয়াতের পূর্ণ অবগতি লাভ করেনি, সে একটি একটি করে ইসলামের অঙ্গচ্ছেদন করে ফেলবে।' এই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য সাধ্যের ভিতরে সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ ও প্রস্তুতি থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

অর্থাৎ, "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত অশ্বদল, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন; বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর পথে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।" (আনফাল : ৬০)

ইজতিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব এমন সুযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে থাকবে যারা ধর্মীয় বিধি-বিধান, নীতিমালা, তথ্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী, একক বা সমষ্টিগতভাবে উদ্ভাবনী ও ইজতিহাদী যোগ্যতাসম্পন্ন, ফলে বিশ্বে ও মুসলিম শাসিত অঞ্চলে উদ্ভূত সকল সমস্যার সঠিক সমাধান তারা দিতে পারেন, যেসবের সমাধান বিধিবদ্ধ মাযহাব বা ফিকাহ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাদের পক্ষে যে কোনো সমস্যার ইসলামি সমাধান দেওয়া এবং যে কোনো সঙ্কটকালে উম্মাহকে নির্ভুলভাবে পথ প্রদর্শন করা সম্ভব।

জিহাদ ও ইজতিহাদী গুণসম্পন্ন যে নেতৃত্বের কথা এখানে বলা হল, ইতিহাস স্বাক্ষী, খোলাফায়ে রাশেদার পর ইমামতের ইতিহাসে হাতে গুনা দু'একজন ছাড়া মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যে এসব অপরিহার্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব দিন দিন বিরল হয়ে ওঠেছেন। নেতৃত্ব এমন এমন হাতে চলে গিয়েছে বা দখলকৃত হয়েছে যাদের ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞানই ছিল না, অনেকের মধ্যে

বরং ইসলাম সম্পর্কে ছিল নেতিবাচক ধারণা। তারা ইসলামের নামে এবং ইসলামের বিপক্ষে এমন অনেক কাজ সম্পাদন করেছেন যা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর মেরুদণ্ডে সজোর আঘাত করে করে একে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিয়েছে।

জঙ্গীবাদ নির্মূল করে জিহাদ

আত্ম-সংশোধন থেকে সমাজ-সংশোধন- যে কোন ক্ষেত্রে জিহাদ এক চিরন্তন ব্যবস্থা। জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনই এক নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে শরিয়তসম্মত পন্থায় প্রচেষ্টা চালানোও ইসলামে জিহাদ। কুরআনে বলা হয়েছে:

لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ ۞ (বাকারা) وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞ (বাকারা) وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۞ (কাসাস) إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ (ইউনুস) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۞ (বাকারা)

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। (বাকারা:২৫৬) আল্লাহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (বাকারা:২০৫) তোমরা পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি কর না, আল্লাহ দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের ভালবাসেন না। (কাসাস:৭৭) আল্লাহ দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের কর্মকে সফল করেন না। (ইউনুস:৮১) হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কাজের শাস্তি ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন গোটা মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করল। (মায়েদা:৩২)

কুরআনের এসব উদ্ধৃতি থেকে এটি স্পষ্ট যে ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের কোনো স্থান নেই। জঙ্গীবাদ কখনই জিহাদ নয়। যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস, জঙ্গী কর্মকাণ্ড করে, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সম্পদ বিনষ্ট করে তারা এই ঘৃণ্য কাজ নিজ দায়িত্বেই করে। ইসলামের সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। এরা ইসলামের দৃষ্টিতে মহাঅপরাধী।

রাজনীতি থেকে ধর্মের নির্বাসন

ইসলাম গোটা মানবজাতির ইহকালীন-পরকালীন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যেমন আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারেরা, তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর। ইসলাম কেবলমাত্র নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানবীয় জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যা কিছু জড়িত এবং মানব জীবন যত খাতে প্রবাহিত– ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিকতা, সব কিছুরই ওহিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কিংবা মূলনীতি ইসলামে রয়েছে, ওহিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বা মূলনীতি থাকার কারণে এর বাইরে অন্য কোনো ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট হতেই পারে না। আল্লাহর নির্দেশ হল, এটি বিবেকেরও দাবী, মানব জীবনের সকল কিছু আল্লাহর এই ওহিভিত্তিক মূলনীতি অনুসারে পরিচালিত হবে, অন্য কিছু দ্বারা নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর একমাত্র খোলাফায়ে রাশেদীন হলেন প্রথম সৌভাগ্যবান সেই সোনালী জামাত যারা ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্র শাসন পর্যন্ত সর্বত্র এই ওহিভিত্তিক মূলনীতি সর্বোচ্চ পরিমাণে কার্যকর করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের শাসকগণ সেরকম সফলতা দেখানো তো দূরের কথা, অনেকে ধর্মকে রাজনীতির ময়দান থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে ক্ষান্ত হয়েছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে খোলাফায়ে রাশেদার পর মুসলিম নেতৃত্ব এমন এমন হাতে চলে গিয়েছে বা দখলকৃত হয়েছে যাদের ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ তেমন কোনো জ্ঞানই ছিল না, অনেকের মধ্যে বরং ইসলাম সম্পর্কে ছিল নেতিবাচক ধারণা। নামে মুসলমান হলেও এসব শাসকদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষের পুরাতন জেহালত ধীরে ধীরে ফিরে এসেছিল। এমন বহু মুসলিম শাসক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে বিগত হয়েছেন যাদের অবস্থা অবলীলায় সেই রোমান-পারসিক সম্রাটদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এসব শাসকরা রোম-পারস্যের স্বেচ্ছাচারী ও জুলুমবাজ রাজা-সম্রাটদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। তারা পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি ও আদর্শ, যার অপার বরকতে ইসলাম সর্বত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল, থেকে ছিল বহু দূরের পথভ্রান্ত পথভ্রষ্ট পথিক। আসলে ধর্ম সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব থাকলে এমনটিই

হয়। দুনিয়া তখন সেসব মানুষের ওপর বিজয় লাভ করে তাকে ধীরে ধীরে ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

শাসকদের যখন এমন অবস্থা হয়েছে তখন বাতিল এই সুযোগে তার সমস্ত উপায়-উপকরণ নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, মূর্খ শাসকদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আশকারা ইঙ্গিতে বাতিলের মূর্খ তরবারির মুখে ইসলামের ডাল-পালা, পাতা, শাখা-প্রশাখা ধূলায় লুঠিয়েছে। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ যদি এই সত্য দ্বীনের স্রষ্টা ও ধারক-বাহক না হতেন তাহলে তার আর উঠে দাঁড়ানোর কথা ছিল না, নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের চিরন্তনতা এবং মুজিযা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু, খেসারত? এর পাল্লা আজ আর পরিমাপের নয়, মুসলিম উম্মাহর শুধু নয়, গোটা দুনিয়ার অতীত-ভবিষ্যতের কত যে নিদারুণ ক্ষতি এর ফলে হয়েছে তা আজ কে বুঝবে!

অন্যদিকে যুগের ওলামায়ে কেরামের নির্দেশনা শোনার, মানার কোনো তোয়াক্কা এসব শাসককূল করত না, পরামর্শ গ্রহণ করলেও নিজেদের সুবিধার অনুকূলে তা ব্যবহার করত। দ্বীনের মশালরূপ আলিম সমাজও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সবাই পালন করতে পারেন নি। কেউ কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছেন, অনেকে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। অনেক সময় তাদের উপর চলত নির্লজ্জ নির্যাতন। আবার অনেকে শুধু হালুয়া-রুটির লোভে শাহী দরবারের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। অনেকে দ্বীনের কল্যাণ ভেবে শাসক ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি পালন করে গেছেন। অনেকে হতাশ হয়ে সবকিছু থেকে হাত গুটিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসনের পথ ধরেছেন এবং আত্মসংশোধন ও ব্যক্তি সংশোধনের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছেন। এভাবে জাহেলিয়াত নতুন নতুন রূপে ফিরে আসছিল আর ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয় সময়ের জাহেলিপনায় ধর্ম ও রাজনীতি হয়ে উঠল পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি বিষয় যা প্রায় সময় চরম বিদ্বেষের রূপ ধারণ করত।

এসব জাহিলী শাসকদের মাধ্যমে এভাবে জাহেলিয়াতের রাস্তা আবার প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়েছে যার মূল্য এই উম্মাহ আজও দিয়ে যাচ্ছে। এক কথায় এই সংকটকে বলা যেতে পারে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখীতা বা বৈপরিত্যের সম্পর্ক। এটি হল বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সংকট। নদবী রহ. লেখেন, আমি নিশ্চিত মনে করি, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকট হচ্ছে নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যকার বিরাজিত সংকট। এই সংকট হল তাদের উভয় শ্রেণির মধ্যে সৃষ্ট ভয়াবহ দূরত্বগত সংকট। জনগণ ইসলাম পছন্দ করে, তারা ইসলামের জন্য বাঁচতে চায়, ইসলাম নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, জনগণের নেতৃত্বের বাগডোর যাদের হাতে তারা এসব চিন্তা-চেতনা থেকে বহু দূরে অবস্থান করে।[২২৯]

জাহেলিয়াতের পুনরোৎপাদন ও বিস্তার

শাসন ব্যবস্থা যে মান ও প্রকৃতির হয়, তার সমাজও সেই মান ও প্রকৃতির হয়। সমাজ ও এর অধিবাসীদের মান শাসন ব্যবস্থার মানের ওপরে যেতে পারে না। রাষ্ট্রের শাসনভার যাদের হাতে থাকে তারা যদি ধর্মজ্ঞান শূন্য হওয়ার ফলে ধর্মবিমুখ হয়, শাসন চলে নিজেদের ইচ্ছা ও স্বার্থ-সুবিধা অনুসারে, তাহলে তাদের মধ্যে এবং তাদের মাধ্যমে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীতে জাহেলিয়াতের রোগজীবাণু ও সত্যভ্রষ্টতার উন্মেষ ও বিকাশ কেউ রোধ করতে পারে না। খোলাফায়ে রাশেদার পরে মুসলিম শাসক ও সমাজে এমন অবস্থাই ঘটতে থাকল। এতে স্বভাবতই জীবন ও সমাজের সর্বত্র এসব জাহিলী যুগের রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়ে পড়েছিল আর মানুষ তাদের স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতাকেই অনুসরণ করতে শুরু করল। আসলে এটাই মানুষের স্বভাব ও ফিৎরাত। তাই বলা হয়, রাজার চালে রাজ্য চলে। রাষ্ট্র ও সরকার শক্তি এভাবে যখন নিজেই ভ্রষ্টাচারে নিমজ্জিত, তখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়

---

[২২৯] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *তাবুণ্যের প্রদি হৃদয়ের তপ্ত আহবান*। মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন অনু. ও সঙ্কলিত। ঢাকা:মুহাম্মদ ব্রাদার্স। পৃ.৫০।

ও নিষ্ফল। কেননা, এই কাজের পেছনে থাকে না কোনো সাহায্য ও সমর্থন। ফলে দীনদান শ্রেণির স্ব-উদ্যোগের আদেশ-নিষেধের বাণীর তখন কেউ পরোয়া করে না। কেননা এদের তিরস্কারের কিংবা পুরষ্কারের কোনো ক্ষমতাই থাকে না। এ অবস্থায় কে কার কথা শুনে। বিপরীতে খাহিশাত ও প্রবৃত্তির এবং অনাচার ও পাপাচারের উপকরণ ও হাতছানি যখন থাকে প্রবল ও বেশুমার। ফলে গোটা সমাজ তার নবীর আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের আহ্বান ও আদর্শ, পূর্বপুরুষদের দান-অবদান, ত্যাগ ও মূল্য সকল কিছু ভুলে যেতে বসে। এবং সে দীন-ধর্ম এবং পরকালের জবাবদিহিতা ভুলে দুনিয়াবী ভোগবিলাস, খাহিশাত ও খেল-তামাশায় ডুবে যেতে থাকে। মুসলিম উম্মাহর জীবনে এসবই ঘটল।

মুসলিম উম্মাহ সকল প্রশ্নে সুসভ্য ও আলোকিত এবং গোটা মানবজাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। অথচ, খোলাফায়ে রাশেদার পরে এভাবে দিনে দিনে তাদেরই উত্তরসূরী জাহেলিয়াতের কালো অন্ধকারে ডুবে আবার পূর্ববৎ মুমূর্ষু অবস্থার দিকে ফিরে যেতে থাকে। একটি উম্মাহর এই যদি অবস্থা হয় তাহলে দীন-দুনিয়া কোনো ক্ষেত্রেই সে আর নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না, যিল্লতি ও বরবাদি এবং লাঞ্ছনা ও অপদস্থতাই শুধু হতে পারে তার ভাগ্যলিপি।[২৩০] আল্লাহ বলেন: سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا "যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি, আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।" (আহযাব : ৬২)

ইসলামের মন্দ প্রতিনিধিত্ব

ঐসব অযোগ্য শাসকবর্গ তখন নিজেদের ভ্রান্ত চিন্ত-চেতনা এবং ভ্রষ্ট রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থারই কেবল প্রতিনিধিত্ব করেছিল, তাদের জীবন ও সমাজে, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ খুব কমই

---

[২৩০] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৪৫-২৪৬।

প্রতিফলিত ছিল। ফলে অমুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের বাণী ও আহ্বান দিন দিন সব আবেদন ও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল। এতে ইসলামের প্রতি মানুষের পূর্ববৎ আস্থা ও সমর্থন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কেননা ঐসব শাসককূল ও সমাজ বিশ্বে ইসলামকে ভুল ও মন্দ রূপে উপস্থিত করেছিল। জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন, ইসলামের অবনতি শুরু হয়েছিল এজন্য যে, মানবজাতি তাদের সততায় সন্দিহান হয়ে পড়েছিল যারা এই নতুন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছিল।[২৩১]

জ্ঞানচর্চার ভ্রান্তি ও অধঃপতন

উম্মতে মুহাম্মদীর উন্নতি, অবনতি, সফলতা, ব্যর্থতাকে ইলমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অন্তত প্রায় ৭৫০-৮০০ বছর পর্যন্ত মুসলিম পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যার কিছু বিবরণ আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়ের চর্চাই হ্রাস পেতে পেতে এক সময় প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে, যা শুধু এই উম্মাহর জন্যই নয় বরং গোটা মানবতার জন্যই এক অনিবার্য বিপর্যয়ের দ্বার খুলে দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় শঙ্কা এই ছিল যে, মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ত্বরিত উন্নতি লাভ করার পর পুনরায় তার অবনতি ঘটবে। অর্থাৎ, জ্ঞানার্জনের স্পৃহা এবং জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হবে। ফলে ইল্‌ম ধীরে ধীরে ক্ষয় পাবে।[২৩২] আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে।

এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে মুসলমানগণ আজ কী জ্ঞান সাধনা করবেন? এটি কী শুধুই ধর্মীয় জ্ঞান যা একদল বিশেষজ্ঞ ঠিক করে নিয়েছেন? কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য কী এটি এবং এভাবে নয় যে, চূড়ান্ত বিচারে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাফল্য

---

[২৩১] উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৪৬-২৪৭।

[২৩২] মুহাম্মদ শফি। *তফসীরে মা'আরেফুল-কুরআন*। প্রাগুক্ত। ২য় খণ্ড, পৃ. ৯।

লাভের জন্য দুনিয়াতে দীন ও ঈমান এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দ্বীনি জ্ঞানের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নানা প্রয়োজন মেটানোর জ্ঞান ও যোগ্যতাও অর্জন করবে? যেমন, দারিদ্র্য যদি মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যুগের জ্ঞান ও প্রযুক্তি আত্মস্থ করা অপরিহার্য নয় কী? 'শত্রুর মুকাবিলায় নিজেদের সাধ্যমত প্রস্তুতি' নিতে হলে কী নানা বিদ্যায় পারদর্শীতার প্রয়োজন অনিবার্য নয়? অতএব কোনো সন্দেহ নেই, মুসলিম উম্মাহকে এসব ক্ষেত্রেও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে হবে, যা থেকে তারা দিনে দিনে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "সর্দার বা নেতা নির্বাচিত অথবা কর্মকর্তা নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে তোমাদের তাফাক্কোহ অবশ্যই হাসিল করতে হবে।"[২৩৩] এখানে 'তাফাক্কোহ' বলতে কেবল ধর্মীয় ইল্ম বুঝায় না, বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র ভেতরে সমুদয় আধ্যাত্মিক বিষয়াদিসহ জাগতিক বিষয়সমূহ সম্মন্ধে যে আলো দান করা হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যার যেসব সমাধান তাতে দেওয়া হয়েছে তার সাহায্যে ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে।

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ঐ আদেশ জারির পর হতেই তাফাক্কোহ অর্জনের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছিল, নৈতিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।[২৩৪] তাফাক্কোহ হল মানব সমাজের উপকারের জন্যে প্রকৃতির আইন সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তা আবিষ্কার করা (বিজ্ঞান), আর তাস্খির হল প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব অর্জন করা, অর্থাৎ একে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো। কুরআন শরিফে তাফাক্কোহ এবং তাস্খির- এর ধারণা লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ: কেবল সূরা জ্বাছিয়ার ১২ ও ১৩ নং আয়াত দেখা যেতে পারে। যেমন: তিনি আল্লাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের (উপকারের জন্য) অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জলযান চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ

---

[২৩৩] আজিজুল ইসলাম অনু.। *বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত*। ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।
[২৩৪] *প্রাগুক্ত*। ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫।

(উপকার) অনুসন্ধান কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও [১২]। এবং (এমনিভাবে) নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যা আছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে (যাতে তোমরা উপকৃত হতে পার)। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে [১৩]। বুখারী শরীফের ১১৩৯ নং হাদিসে দেখা যায়, কৃষিকার্য যদি কারো জন্য অপরিহার্যও হয় তথাপি লাঙল ও গরুর ব্যবহারকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরুৎসাহিত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পেশা অবলম্বন করুক এবং কৃষিকার্য অপরিহার্য হয়ে পড়লে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করুক।[২৩৫]

নিখাদ দ্বীনি জ্ঞান ও আমলের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যই অথবা খোদ উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যুগের জাগতিক প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনও অপরিহার্য। অর্থাৎ, মুসলিম উম্মাহর দীন ও ঈমান, অস্তিত্ব, উন্নতি-অবনতি এসব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ (ধর্মীয় ও জাগতিক) জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলমানগণ সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, আইম্মায়ে-মুজতাহিদীনগণের হাত ধরে যেভাবে ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝেছিলেন এবং তার চর্চা শুরু করেছিলেন যা আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি, পরবর্তীতে তার অধঃপতন হতে শুরু করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতবাদ, পরস্পর বিরোধী অবস্থান, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ প্রভৃতির ফলে মুসলমানগণ বিভ্রান্ত হতে শুরু করলেন। এই অবস্থায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তবাদী চিন্তকদের প্রভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আস্তে আস্তে তিরোহিত হতে শুরু করল। ফলশ্রুতিতে নতুনরা এ বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল, অনেক রাজা-বাদশাহ ভ্রান্তবাদি উলামাদের প্ররোচনায় বিজ্ঞান চর্চাকে অনৈসলামিক বলে ঘোষণা করলেন, অনেকে এর চর্চাকে নিষিদ্ধ করলেন, অনেকে তাতেও ক্ষান্ত হলেন না বরং বিজ্ঞানের বইপত্রকে পুড়িয়ে পর্যন্ত ফেলতে শুরু করলেন। নতুন নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা বন্ধ হতে শুরু করল। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী

[২৩৫] *প্রাগুক্ত*। ১ম খণ্ড।

আবদুস সালাম এ প্রসঙ্গে বলেন, মোঙ্গলদের (তাতারী) দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ ঘটলেও প্রধানত অভ্যন্তরীণ কারণে অর্থাৎ, নতুন সৃষ্টিকে নিরুৎসাহিতকরণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার নিঃসঙ্গতার কারণে এই পতন ঘটে। এই নিরুৎসাহিতকরণ শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতও এক্ষেত্রে ভুল ধারণা পোষণ করতেন। যেমন, ইবনে খালদুনের মতো মনীষী পর্যন্ত সেকালে তাঁর মুকাদ্দিমাতে লেখেন, "... কিন্তু এটা স্পষ্ট যে আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যার কোনো গুরুত্ব নেই। সুতরাং ঐগুলি আমরা বাদ দিতে পারি।" খালদুনের ঔদাসীন্যকে বৈরিতা বলা যায় যা থেকে আসে নিঃসঙ্গতা।[২৩৬]

রাজনীতি থেকে ধর্মের নির্বাসনের পর এখন জ্ঞান চর্চা বিষয়ে এই খণ্ডিত ব্যাখ্যায় একটি ধ্বংসাত্মক ক্ষতি এই হল যে, জ্ঞান চর্চাকে (১) দ্বীনি জ্ঞান চর্চা যা-ই একমাত্র অপরিহার্য ও গ্রহণযোগ্য এবং (২) জাগতিক বা বৈষয়িক তথা বিজ্ঞান চর্চাকে 'বদ্বীনি' ফলে পরিত্যাজ্য- এই দু'ই পরস্পর বিরোধী ভাগে বিভক্ত করা হল। এই বিভক্তিই আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। এতে যারা শুধুই দীন চর্চা করেন তারা জাগতিক বিষয়ে অবদান রাখতে অক্ষম, আবার যারা শুধুই বিজ্ঞান চর্চা করেন তারা দ্বীনি বিষয়ে, দ্বীনি ইলম ও আমল বিষয়ে গোটা জীবনই অজ্ঞতার ফলে দূরে থেকে যান, এমনকি ইসলামকে তারা অচল মনে করে বসে থাকেন। এই বিভক্তি দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও ঘৃণা-প্রত্যাখ্যানের রূপ লাভ করেছে। দু-একজন ব্যক্তিক্রমী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও, গোটা মুসলিম উম্মাহর বর্তমান-ভবিষ্যত আরো পতন রোধ করার পক্ষে এটি দূষিত কোনো এক মহাসমুদ্রকে পবিত্র করতে এক কাপ অপবিত্রতা নাশকের মতো।

আরেকটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণের চারটি উদ্দেশ্য কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তা হল– ১. মানুষকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনানো, ২.

---

[২৩৬] এ. এম. হারুনুর রশীদ। *প্রাগুক্ত*।

মানুষকে যাবতীয় মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত করা, সৎ গুণাবলী দ্বারা সুসজ্জিত করা, ৩. মানুষকে কিতাব ও ৪. প্রজ্ঞা শিক্ষা দেওয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

অর্থাৎ, "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন, ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" (জুমু'আ : ২)

তামাম মানবকূলের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এই চার গুণের সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারী। তারপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণও রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এই চার গুণে গুণান্বিত ছিলেন, এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারী। তারপর তাবেঈ, তারপর তবে-তাবেঈগণের মধ্যে অনেকে এই চার গুণে গুণান্বিত ছিলেন।[২৩৭] এসব যুগের পর জ্ঞানের বিভাজন শুরু হয়। উম্মতের অসংখ্য সুযোগ্য ব্যক্তিগণ নিজেরা এসব চার গুণে গুণান্বিত হওয়ার পাশাপাশি একেকজন একেক দিকের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক এই বিভাজনের ভুল ব্যাখ্যা করে একটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যটিকে গুরুত্বহীন করে তোলেন, এমনকি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অস্বীকার পর্যন্ত করতে শুরু করেন। এভাবে তৈরি হয় নানা দল-উপদল, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও ঘৃণা-হানাহানি। এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকারীদের মূর্খ আচরণ মানুষের মধ্যে এভাবে বিরাট ফেৎনার সৃষ্টি করে যা আজও দূর করা যায় নি। অন্যদিকে ইসলামের মাত্র কয়েক শতকের মধ্যেই শিয়া, রাফেজি, খারেজি, মুতাযিলা, খালকে-কুরআন- এর মতো ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

[২৩৭] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১৮১।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত আমল মহান আল্লাহ, তিনি যেভাবে যা চান, সংরক্ষণের ফিক্‌হি মহা-ব্যবস্থা কায়েম করে দিয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই আমল কখনও একাধিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করেছেন। যেমন, একই সুন্নত কখনও দুই রাকাত ফরজের আগে বা পরে, কখনও চার রাকাত ফরজের আগে বা পরে পড়েছেন, তাহাজ্জুদ কখনও রাতের প্রথম প্রহরে কখনও শেষ প্রহরে পড়েছেন, কখনও ফরজ গোসল সেরে কখনও শুধু ওযু করে ঘুমিয়েছেন। বুঝা উচিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম ঘটেছে আল্লাহর নির্দেশে। মানবগোষ্ঠীর নানা প্রয়োজন, বাস্তবতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রশ্নে জীবন্ত দ্বীনের প্রশস্ততার জন্যে এসব আল্লাহর বিরাট কৃপা। ফলে চারটি ফিক্‌হি সংকলন জীবন্তরূপে পৃথিবীর নানা প্রান্তে জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. লেখেন, ইজতেহাদী বিষয়ে মধ্যপন্থা (কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ) অবলম্বনই সঠিক পন্থা, সবার জন্য গোড়াঁমী ও বাড়াবাড়ি পরিহার অপরিহার্য।[২৩৮]

অন্যদিকে, পরবর্তীকালে কিছু লোক যেমন গায়রে মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবিরা, এই ওহিভিত্তিক ব্যবস্থার মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য বুঝতে না পেরে, অথবা জাগতিক কোনো স্বার্থ বা লোভের বশে এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণে উঠে পড়ে লেগে যায়। এরা সাধারণ মানুষের কাছে দ্বীনের নানা নতুন নতুন আপাত:আকর্ষণীয় কিন্তু বিষমিশ্রিত যা সাধারণ মানুষের বুঝার কথা নয়, ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে মানুষকে গোমরাহ বানানো শুরু করে। এরকম দল-উপদল দ্বীনের শুধুই ক্ষতি ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

অবনতি ও অবক্ষয়ের ঐসব যুগে মুসলিম মনীষীগণ অতি-প্রাকৃতিক জ্ঞান ও গ্রিক ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে যে অধ্যবসায় ও অনুসন্ধান করেছেন সেই পরিমাণ

---

[২৩৮] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.। ২০০৮। *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*। ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। ৬২-৬৪।

প্রাকৃতিক ও প্রয়োগিক বিজ্ঞানের চর্চা-গবেষণা করেন নি; অথচ জীবন ও জগতের প্রয়োজন মেটানো ও নেতৃত্ব দানের জন্য এগুলোই ছিল অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ। নদবী রহ. লেখেন, গ্রিক ঈশ্বরতত্ত্ব ছিল তাদের জাতীয় প্রতিমাতত্ত্ব যা কোনো প্রকার ওহিসূত্র ছাড়া ছিল স্রেফ দার্শনিক কল্পবিলাস, দার্শনিক পরিভাষায় রাষ্ট্রীয় পোশাকে এগুলো উপস্থাপিত হয়েছিল। এসব দর্শন আলোচনায় সার বলতে কিছু ছিল না, ছিল কেবল ধারণা ও অনুমান, শব্দজৌলুস ও বাক্য-ঝিলিক।[২৩৯] মুসলমানদের হাতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষামালা ছিল যা তাকে মহান সত্তার জাত-সিফাত, ইলাহিয়াত, রবুবিয়াত সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিল। সুতরাং এর পরে এ সম্পর্কে রাসায়নিক বিশ্লেষণে নিয়োজিত হওয়া ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। মুসলমান মনীষীগণ কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রিক চিন্তাপ্রসূত নিষ্ফল জ্ঞান ও শাস্ত্র এবং দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রীয় অর্থহীন ও নিষ্ফল সাধনায় মেধা, শ্রম ও সময়ের অপচয় করেছেন। একই ভাবে তারা রূহ ও আত্মা, ফালসাফাতুল ইশরাক ও নিওপ্লেটো দর্শন এবং ওয়াহদাতুল ওজূদ ও এককসত্তাবাদ, কল্পবিলাসী গল্প-কাব্য, রাজা-শাহানশাহনামা- এর জটিল ও নিষ্ফল আলোচনায় আত্মনিয়োগ করে সময়, শ্রম, মেধা ও প্রতিভার বিপুল অংশ তাতেই ব্যয় করেছেন।[২৪০] নদবী রহ. লেখেন, "এককথায় তারা জিহাদের প্রকৃত ক্ষেত্র ত্যাগ করে কম গুরুত্বপূর্ণ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে 'বীরবিক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ' করেছেন এবং নিজেদের বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। এই নির্বোধ বুদ্ধিবিলাস তাদেরকে ঐসব প্রায়োগিক জ্ঞান-গবেষণা ও শাস্ত্র চর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল যা দ্বারা প্রকৃতির যাবতীয় শক্তি ও সম্ভাবনা করায়ত্ব করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সেগুলো নিয়োজিত করা যেত এবং বিশ্বের উপর ইসলামের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা যেত।"[২৪১]

---

[২৩৯] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৪৮।

[২৪০] *প্রাগুক্ত।*

[২৪১] *প্রাগুক্ত*।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রকৃতি ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানে কীর্তি ও অবদান, গবেষণা, গ্রন্থ রচনা পূর্ববর্তীদের চেয়ে অবশ্যই বেশি ছিল কিন্তু অনান্য জ্ঞান-গবেষণার তুলনায় সেসব ছিল নগন্য এবং ইতিহাসের যে সুদীর্ঘ সময়কাল তারা পেয়েছিলেন তার বিচারেও এসব অবদান সন্তোষজনক ছিল না। প্রায়োগিক বিজ্ঞানের নানা শাখায় ঐ পরিমাণ প্রতিভা ও মনীষার আবির্ভাব ঘটে নি। পরবর্তীকালের ইউরোপ যদিও এসব মুসলিম জ্ঞান-গবেষণা ও আবিষ্কার দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে যা তারা স্বীকারও করে, কিন্তু মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের মধ্যে ইউরোপ জ্ঞান-গবেষণার যে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিল তা পূর্বের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আজ মুসলমানদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও গবেষণা নিয়ে যত গর্বই করা হোক না কেন, একবিংশ শতকের ইউরোপের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না।

মুসলমানদের অধঃপতনের সঙ্গে জ্ঞানচর্চা সম্পর্কিত এমন আরো দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক লক্ষণীয় যা ওপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের চেয়েও মারাত্মক। এগুলো হল-

১. স্বর্ণযুগের মহান কাফেলা যে স্বচ্ছ ঝর্নাধারা (কুরআন-হাদিস) থেকে জ্ঞানসুধা পান করেছিলেন সেই একই উৎস আজও চির-অমলিনরূপে বিরাজমান। কিন্তু কালের প্রবাহে সেই উৎসের সঙ্গে কিছু কিছু ভেজাল মিশ্রিত হয়েছে। তাঁরা যে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন তাও খুঁজে দেখা প্রয়োজন। হয়তোবা প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও ভেজাল মিশ্রিত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে অনেকে গ্রিক সাহিত্য ও দর্শন, প্রাচীন উপকথা ও ভাবধারা, ইহুদি ও খ্রিস্টবাদ ইত্যাদি-প্রসূত এবং অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার চিন্তা ও ভাবধারা তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় জড়িয়ে ফেলেন। উদহরণস্বরূপ, ইবনে রুশদ, ইবনে সীনা, আল-ফারাবি, আল-কিন্দী প্রমুখ মুসলিম মনীষীগণ 'ইন্দ্রিয় ও যুক্তিবাদী গ্রিক দার্শনিক পদ্ধতি' দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একে জ্ঞানচর্চার ইসলামি পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে মারাত্মক ভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রাচ্যবিদদের অনুপ্রবেশও এতে যোগ হয়েছে যা এখনও বিদ্যমান। এভাবে কুরআন-

হাদিস- এর মূল সূত্রের সঙ্গে ভেজাল জড়িয়ে যায়। পরবর্তী যুগের বংশধরগণ এই ভেজালমিশ্রিত উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। ফলে অনিবার্যভাবে এরা প্রথম দফায় গঠিত দলের মতো গুণ ও চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন নি। সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, স্বর্ণযুগের মুসলমানদের সঙ্গে পরবর্তীকালের মুসলমানদের যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে এই যে- খাঁটি ইসলামি আদর্শের সঙ্গে অন্যান্য আদর্শের সংমিশ্রণের ফলে যে মতবাদ রচিত হয় তা ইসলামি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।[২৪২]

২. স্বর্ণযুগের মুসলমানগণ কুরআন-হাদিসের চুলচেরা রাসায়নিক বিশ্লেষণের বাড়াবাড়ির পেছনে পড়তেন না। অন্যদিকে, তাঁরা তথ্য আহরণ অথবা জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতেন না, বিদ্যার ভাণ্ডার ফাঁপিয়ে তোলা, কোন বৈজ্ঞানিক বা আইন বিষয়ক সমস্যার সমাধান অন্বেষণ কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক অভাব পুরণের নিয়তে তাঁরা কুরআন অধ্যয়ন করেন নি। তাঁরা অপেক্ষায় থাকতেন- কোন বিধান নাযিল হবে আর শতভাগ তার ওপর আমল করে আল্লাহর আরো প্রিয়প্রাত্র হবেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ জামাত জ্ঞানার্জন করতেন- তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হত আমলের মাধ্যমে আল্লাহর আরো অধিক সন্তুষ্টি হাসিল করা। সে যুগের মুমীনদের জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যও হত একমাত্র আমলের মাধ্যমে আল্লাহর আরো বেশি আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাঁদের আজকের যুগের মতো বিরাট অধ্যয়ন ছিল না, কিন্তু যতটুকু জানতেন তার ওপর শতভাগ আমলের চেষ্টা করতেন। পরবর্তীতে দিনে দিনে কুরআন-হাদিস চর্চায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ঢল নামে, এবং যার অনেক ক্ষেত্রে আছে কেবল শব্দ-জৌলুস ও বাক্য-ঝিলিক, পারদর্শিতা প্রদর্শনের প্রকাশ্য বা গোপন মনোবৃত্তি। কিন্তু যারা কুরআন-হাদিস জেনে সে অনুযায়ী আমলের ইচ্ছা রাখে না, কুরআন-হাদিস কখনও তার জ্ঞানভাণ্ডার খুলে দেয় না। কুরআন নিছক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা,

---

[২৪২] সাইয়েদ কুতুব শহীদ। ২০১৭। *ইসলামি সমাজ বিপ্লবের ধারা*। ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী। পৃ. ২৭-২৮।

বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাহিনী ও ইতিহাস গ্রন্থ নয়। অথচ এসব বিষয়ই এতে আলোচিত হয়েছে। কুরআন একটি জীবন বিধান নিয়ে এসেছে যার মূলকথা বা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাক্বওয়া হাসিল বা আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। স্বর্ণযুগের মুসলমানগণ কুরআন নাযিলের এই মর্ম বা লক্ষ্য বাস্তব জীবনে রূপায়ন করেছিলেন। কুরআন ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে পরিবেশ-পরিস্থিতির নিরিখে নাযিল হত। যেমন:

﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾

অর্থাৎ, "আমি কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল করেছি যেন তুমি তা ক্রমে ক্রমে মানুষের নিকট পাঠ করতে পার এবং এভাবেই আমি ধীরে ধীরে ওহি নাযিল করেছি।" (বণি-ঈসরাইল : ১০৬)

এতে প্রথম যুগের মুসলমানগণ এটি ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের জীবন আল্লাহর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে এবং তারা আল্লাহর এক বিশেষ রহমতের ছত্রছায়ায় জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করছেন। আল্লাহর সঙ্গে জীবনের এই গভীর সম্পর্ক উপলব্ধির দরুনই তারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে গড়ে উঠেছিলেন। এভাবে তাঁরা আল্লাহর যে কোনো নির্দেশাবলি যা তাদের স্বভাবজাত জীবনের সঙ্গে অনেক সময় সঙ্গতিপূর্ণ হত না, তার জন্য সহায়-সম্বল, পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে হত, বাস্তব জীবনে রূপ দিতে অভ্যস্থ হয়েছিলেন। পরবর্তী যুগের মুসলমানগণ এই সুবর্ণ সুযোগ পান নি, তবে তারা স্বর্ণযুগের চেয়ে অনেক বেশি কুরআন-হাদিস চর্চা করেছেন। কিন্তু এরা এই জীবন বিধানকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও উপভোগের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। ফলে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের মধ্যে সেই পরিবর্তন ও সংশোধন আসে নি যা স্বর্ণযুগে হয়েছিল। এভাবে উৎসের সঙ্গে ভেজালের মিশ্রন, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ভ্রান্তি ইত্যাদি কারণে স্বর্ণযুগের মুসলমানদের মতো গুণ ও চরিত্রের অধিকারী পরবর্তীগণ হতে পারেন নি বা আজ দেখা যায় না।[২৪৩]

---

[২৪৩] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩০-৩১।

শিরক্ ও বিদ'আত : জাহেলিয়াত ঘুরেফিরে আসে

জাহেলিয়াত যুগে যুগে নতুন নতুন রূপে বিরাজ করে। আদীম জাহেলিয়াত, মধ্যযুগীয় জাহেলিয়াত, আধুনিক জাহেলিয়াত– এভাবেও বলা যেতে পারে। অধঃপতনের যেসব কারণ আমরা এতক্ষণ উল্লেখ করেছি তা যদি কোনো জাতির অবস্থা হয় তাহলে জাহেলিয়াতের অন্যতম দোসর, দ্বীনের হন্তারক এই দুই দৈত্য- শিরক্ ও বিদ'আদ আরো জোরে-সুরে জেঁকে না বসে থাকতেই পারে না। কারণ শিরক্ ও বিদ'আতের বন্ধুরা ও ময়দান তখন থাকে সবচেয়ে উর্বর। মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এমনই হল। যে দীনের নামকরণকারী মহান নবী সাইয়্যেদুনা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিমুস্ সালাম, সকল সৃষ্টির মাঝে আপন রবকে চিনে নিয়েছিলেন আর উচ্চারণ করেছিলেন সর্বকালের এক মহান বাণী। পরম প্রভু তাঁর পবিত্র নবীকে এত ভালবাসলেন, সঙ্গে এত ভালবাসলেন তাঁর উচ্চারিত বাণীকে, পরম মমতায় কুরআনে তুলে দিয়ে চিরকালীন করে রাখলেন মাখলুকের শিক্ষার জন্য। إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ অর্থাৎ, "আমি আমার মুখমণ্ডল একমুখী করলাম একক সত্তার দিকে যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই।" (আনআম : ৭৯)

মুসলিম উম্মাহ এ সবকিছুই ভুলে গেল, তারা ফিরে যেতে লাগল তাদের সেই পুরনো পচা-দুর্গন্ধময় অন্ধকারে। আদীম জাহেলিয়াতের যুগের শিরক্-বিদআতের চেয়ে এই উম্মতের এসবের লালন অধিক দুর্ভাগ্যজনক ও বেদনাদায়ক। কারণ, সুদীর্ঘ কালের নিষ্ঠুর ধারাপাতে জাহেলিয়াতের আরবে অবশিষ্ট ছিল না ইব্রাহিমী মিল্লাতের কোনো আলোক রেখা, তাদের মধ্যে সত্য দীনের কোনো আলো বুঝারও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ ব্যতিক্রম, তাদের সম্মুখে রয়েছে মহাগ্রন্থ কুরআন ও তাদের মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষামালার জীবন্ত চির-যৌবন ভাণ্ডার। এই দ্বীনে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রতিটি বিধান পরিপূর্ণ ও নিখুঁত। আর এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। যেমন: আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং

আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (হিজর : ৯) এতে কোনো মিথ্যা প্রবেশ করতে পারে না, সম্মুখ থেকেও নয় পশ্চাত থেকেও নয়। এটিতো প্রজ্ঞাময়, চির-প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (ফুচ্ছিলাত : ৪২) কিন্তু মুসলিম উম্মাহ দিনে দিনে এসবই ভুলে শিরক্ ও বিদ'আতের নতুন নতুন স্রোতে যেন ভেসে যেতে লাগল, তারা মনে করেছে এটিই বুঝি দীন অথবা এটি এমন কিছু নয়। মানুষের মধ্যে যদি হক ও বাতিলের স্পষ্ট লুপ্ত হয়ে যায়, বরং হককে বাতিল আর বাতিলকে হক মনে করে বসে থাকে, তাহলে এর থেকে তাওবাও নসীব হয় না। আজ মুসলিম মিল্লাতের এই চিত্র যখন বিশ্বে প্রদর্শিত হয় তখন কোন্ অমুসলিম এদিকে আকর্ষণ বোধ করবে? কারণ অধিকাংশ মানুষ তো জনগোষ্ঠীর জীবাচারকেই ধর্ম সাব্যস্ত করে তাকে। শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত মুসলিম সমাজ এভাবেই বহু অমুসলিমকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের যাবতীয় কারণ-নেপথ্য বিশ্লেষণ করলে, হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঐ কথাটিই বারে বারে ফিরে আসে, ইসলামের শৈশবকালেই যা তিনি বলে গিয়েছিলেন: 'আমার আশঙ্কা হয়, যার জন্ম ও প্রতিপালন হয়েছে ইসলামের পরিমণ্ডলে, অথচ জাহেলিয়াতের পূর্ণ অবগতি অর্জন করেনি, সে একটি একটি করে ইসলামের অঙ্গচ্ছেদন করে ফেলবে।' বাস্তবে তা-ই হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে সাধারণের পর্যাপ্ত আর বিশেষ বিশেষ মহলের প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে শত শত বছর ধরে দীনের অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও প্রতিনিধিত্ব উপস্থাপিত হয়ে আসছে। মসজিদের মুয়াজ্জিন-ইমাম থেকে আদালতের বিচারক, শাহী-তখতে সমাসীন রাজা-বাদশা-প্রধান- সকল ক্ষেত্রেই এই অঙ্গচ্ছেদন কর্মের সয়লাব লক্ষণীয়।

ইসলাম চিরন্তন

মুসলিম উম্মাহর এই যে অধঃপতন শুরু হল, কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ইসলামের বয়ে চল- তা সত্ত্বেও ইসলামের মৌলিকতা, ওহিভিত্তিক শিক্ষামালা, নববী আদর্শের রীতি-নীতি, সব আজও অক্ষুণ্ন, অক্ষয়-অবিনশ্বররূপে বিরাজমান; মুসলিম উম্মাহ কালের স্রোতে ভেসে গিয়েছে, কিন্তু ইসলাম ধ্বংস

হয় নি, চিরন্তন এই দীন একইরকম আছে- যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচার করে গিয়েছিলেন। এরকম অবস্থায় ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, যা অনেকে হয়তো প্রত্যাশা করেছিল এবং আজও করে। বহু ধর্ম এরকম আঘাত, যুগ-যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়েও গিয়েছে, অনেক ধর্ম, মাযহাব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইসলামের কোনো ক্ষতি কেন করা সম্ভব হয় না, বরং আঘাতে সে আরো জ্বলে উঠে, ইসলামের ঔজ্জ্বল্যে আঘাত ও আঘাতকারীই বরং ধ্বংস হয়। এর কারণ ও রসহ্য কী? এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায় যে ইসলাম যেহেতু আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন ফলে এটি কখনই পৃথিবী থেকে মুছে যাবে না; ইসলাম যে দিন মুছে যাবে সেদিন দুনিয়াও মুছে যাবে। সুতরাং ইসলাম প্রতিদিন প্রশস্ত ও বিকশিত হবে, ইসলাম অনুসারীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়বে। ইসলাম গোটা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। মার্কিন গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, আগামী অর্ধ-শতাব্দির মধ্যে অনুসারীর দিক দিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রথম থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে নেমে আসবে, এবং ইসলাম হবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্ম যা বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। কারণ যে হারে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়ছে তার দ্বিগুণ হারে ইসলাম অনুসারীর সংখ্যা বাড়ছে। এই প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৫-২০৬০ সময়কালের মধ্যে ইসলাম অনুসারীদের সংখ্যা খ্রিস্টধর্মের দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাবে। রিপোর্টে বলা হয়:

> While the world's population is projected to grow 32% in the coming decades, the number of Muslims is expected to increase by 70% – from 1.8 billion in 2015 to nearly 3 billion in 2060. In 2015, Muslims made up 24.1% of the global population. Forty-five years later, they are expected to make up more than three-in-ten of the world's people (31.1%).
>
> অর্থাৎ, বর্তমান শতকে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৩২% বৃদ্ধি পাবে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ৭০% হারে যা ২০১৫ সালের ১.৮ বিলিয়ন থেকে ২০৬০ সালের মধ্যে প্রায় ৩ বিলিয়ন হবে। ২০১৫ সালে বিশ্বে মুসলিম

জনসংখ্যার পরিমাণ ২৪.১ %। ৪৫ বছর পর বিশ্বের প্রতি ১০ জনের ০৩ জন হবে মুসলিম (৩১.১%)।[২৪৪]
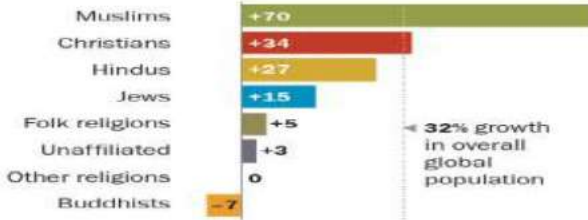
চিত্র: ১: মুসলিম জনসংখ্যার সর্বাধিক বৃদ্ধি

সুতরাং, যতো বিপদ আসুক না কেন, অবস্থা যতো নাজুকই হোক না কেন, পরিশেষে ইসলামই বিজয়ী হবে। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের রয়েছে অকাট্য দলীল। কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীসমূহ লক্ষ্য করুন:

> তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (তাওবাহ:৩২) তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে একে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (ছাফ:৯)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যতো জায়গায় দিন-রাত হয় তার সর্বত্র ইসলাম অবশ্যই পৌঁছবে। আল্লাহ এমন কোনো পাথরের ঘর বা

---

[২৪৪] https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-world's fastest-growing-religious-group/ [*This is an update of a post that originally published on April 23, 2015.*]

তাবু অবশিষ্ট রাখবেন না যেখানে এ দীন পৌঁছাবে না, সম্মান সহকারে বা লাঞ্ছনা সহকারে। হয়তোবা এমন ইজ্জত সহকারে যে আল্লাহ তার দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করবেন, অথবা এমন লাঞ্ছনা সহকারে যে আল্লাহ তার দ্বারা কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।"[২৪৫] উপরোক্ত দলিল থেকে এটি প্রমাণিত হল যে ইসলাম হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, সংখ্যায়, নেতৃত্বে ইসলাম থাকবে সবার ওপরে। দিনে দিনে শুধু বরবাদী আসবে, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত আরো খারাপ হবে তাই সবাই হাত-পা ঘুটিয়ে বসে থাকব এ কথা মোটেই ঠিক নয়। ড. ইউছুফ আল কারযাভী বলেন, এ ধরনের কথা চালু আছে যা হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার ফল এবং পূর্বের দলিল বিরোধী।[২৪৬] তাহলে এটি প্রমাণ হল যে ইসলাম বা মুসলিম উম্মাহর জগতে বর্তমান বা ভবিষ্যতে যে কোনো সংকট-দুরবস্থা দেখে হতাশ হওয়ার আদৌ কোনো কারণ নেই। সত্যের উত্তরোত্তর বিকাশের জন্যই, বিজয়ের জন্যই পদে পদে সংকট, দুরবস্থা দেখা দেয়, এর পেছনে বিরাট রহস্য ও কল্যাণ আছে। সত্য-মিথ্যার সংঘাতের মাধ্যমে এদের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হক-বাতিলের যুদ্ধ না বাঁধলে সত্যের শক্তি প্রমাণ হয় না। যেমন কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾

"আমি সত্য দিয়ে মিথ্যাকে আঘাত করি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং দেখ, মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যায়। হায় দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা (আমার সৃষ্টি জগত সম্বন্ধে) যে মিথ্যা আরোপ করছো তার জন্য।" (আম্বিয়া:১৮)

---

[২৪৫] মুসনাদে আহমদ:৪/১০৩, উদ্ধৃতি, ইউছুফ আল কারযাভী। ২০১৭। *ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।* চট্টগ্রাম:আহমদ প্রকাশন। পৃ. ৩৫।

[২৪৬] ইউছুফ আল কারযাভী। *প্রাগুক্ত*। তথ্য-প্রমাণের জন্য পুরো গ্রন্থ।

একদিকে যেমন সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাতের মতো অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহমতো সত্যিকার মুসলমান হয়ে যেতে হবে অন্যদিকে দীনের প্রচার-প্রসারে তাঁদের মতো বিশ্বময় পূর্ণ উদ্যোমে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করে যেতে হবে- এটি মুসলমানের দায়িত্ব। পক্ষান্তরে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে বিজয়ী করা এটি আল্লাহর কাজ। যেমন: আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

অর্থাৎ, "(হে মুমিনগণ!) তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (আলে ইমরান : ১৩৯)

এখন মুসলমানরা যদি নিজ নিজ দায়িত্বে উদাসীন ও অকর্মা হয়ে পড়েন যা আজ তারা হয়েছেন, তাহলে আল্লাহ বলেন:

> "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (মায়েদা:৫৪)

যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি, সময়ের পরিবর্তন, যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রভৃতি থেকে ইসলামকে মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এই উম্মাহকে এজন্য দু'টি বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন। প্রথমত, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন একটি পরিপূর্ণ ও চিরন্তন শিক্ষা দান করেছেন যা যে কোনো দ্বন্দ্ব, সঙ্কট ও পরিবর্তনকে অত্যন্ত সহজভাবে মুকাবিলা করতে পারে। তার ভেতর প্রতিটি যুগের প্রতিটি সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান করার যোগ্যতা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, তিনি এও নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন যে এই চিরন্তন দীনকে রক্ষা করার বা উজ্জীবিত রাখার জন্য প্রতি যুগে যেমন যোগ্যতা ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আবশ্যক সেরকম ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করবেন যারা দীনের

শাশ্বত শিক্ষামালাকে জীবনের মধ্যে স্থানান্তর করতে থাকবেন এবং ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে দীনের পথে যে কোনো সংকট ও জঞ্জাল সাফ করে দীনকে জীবন্ত ও উম্মাহকে কর্মতৎপর রাখবেন। যেমন: এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ এই উম্মাহর জন্য প্রতি শতাব্দীর মাথায় এমন লোক পাঠাবেন যে তাদের জন্য দীনকে নতুনত্ব দান করবে।[২৪৭] ইসলামের এই দুই বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা একটি ঐতিহাসিক সত্য বিষয়, এটি চোখের সম্মুখে দৃশ্যমান। এই গ্রন্থেও এর প্রমাণ রয়েছে। সারণি ৪.১ দেখুন। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের ইতিহাসে এই দৃষ্টান্ত নেই।

ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসা ও ঈসা নবীর আ. কাছ থেকে যে তাওরাত ও ঈঞ্জিল লাভ করেছিল, তারা এর সংরক্ষণ করতে পারে নি। বর্তমান তাওরাত-ঈঞ্জিল আমরা যেভাবে পাই তা অসংখ্য বিকৃতির অত্যাচার জর্জরিত যা পূর্বে আমরা দেখেছি। এক্ষেত্রে অন্যতম দৃষ্টান্ত হল খ্রিস্টধর্ম। খ্রিস্টধর্মে সবকিছু আছে কিন্তু ঈসা মাসিহের আ. প্রচারিত সহজ-সরল শিক্ষামালা নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হচ্ছে, কিন্তু অদ্যাবধি খ্রিস্টান জগতে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব জন্ম লাভ করেন নি যিনি নানা অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক গাল-গল্প থেকে একে ধুয়েমুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ঈসা মাসীহের আ. কথা ও শিক্ষার ওপর বিন্যস্ত করবেন। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) কিছু সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতেও জঞ্জাল পরিষ্কার হয় নি, বরং আরো নতুন নতুন জঞ্জাল উৎপাদিত হয়েছে। খ্রিস্টান মনীষীগণও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে সহস্র বছরেও খ্রিস্টান জগতে এমন কোনো ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় নি, তেমনি এমন কোনো আন্দোলনও দেখা যায় নি- যা খ্রিস্ট ধর্মের সংস্কার বা পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। Encyclopedia Britannica- এর নিবন্ধকার J.Bass Mullinger- এর মন্তব্য লক্ষ করুন, তিনি লেখেন, ষোড়শ শতাব্দির পূর্বে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে

---

[২৪৭] আবু-দাউদ, উদ্ধৃতি, ইউসুফ আল কারযাভী। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৪।

সহজেই বলা যায় যে, মধ্যযুগে মেধা অতীতের দৃষ্টান্তের গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারে নি। .... চার্চ-সংস্কারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ব্যর্থতা ইউরোপীয় ইতিহাসে একটি বাস্তব ঘটনা। তিনি আরো বলেন, ষোড়শ শতকের পূর্বে ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনরূপ বাছবিচার ছাড়া এর সবগুলো গির্জার নিন্দা ও অভিশাপের শিকারে পরিণত হয়।[২৪৮]

একই অবস্থা প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মেরও। বেদ ও উপনিষদে তাওহিদের যতটুকু শিক্ষা দেখা যায়, হিন্দু ধর্ম তা থেকে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মাধ্যমে বহু-ঈশ্বরবাদের কালো অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে। বর্ণবাদ, জন্মান্তরবাদ শিক্ষিত হিন্দুদের প্রশ্নের জবাব দিতে আজও অক্ষম। নদবী রহ. লেখেন, এসব কারণে এই ধর্ম এক সময় বুদ্ধের মধ্যে প্রতিবিধানের শান্তির পথ খোঁজেছিল; এটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ঘটনা।[২৪৯] অষ্টম শতকে শংকরাচার্য হিন্দু ধর্মের জঞ্জাল সাফ করতে গিয়ে বৌদ্ধ মতের প্রবল বিরোধিতা করেন, এমনকি বৌদ্ধ মতকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করে ছাড়েন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের কোনো জঞ্জালই তিনি সাফ করতে সক্ষম হন নি।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধ যে নবতর মতবাদ প্রচার করেন তাতে দয়া, মায়া, মহানুভবতা, আত্মসংশোধন, শ্রেণি-বৈষম্যহীনতা প্রভৃতির কথা ছিল এবং ঐ সময়ে মানুষের দিল-দেমাগের পক্ষে এসব কম কথা ছিল না। ফলে স্রষ্টার অস্তিত্ব, পরকাল- এসব মৌলিক বিষয়ে কোনো লক্ষণীয় নির্দেশনা না থাকলেও, বেশ দ্রুততার সঙ্গে এই মতবাদ এশিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটি প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সংকোচনের বা আত্মবিলয়েরও প্রমাণ। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বুদ্ধের মতবাদ তার সহজ-সারল্য, স্বকীয়তা হারিয়ে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য প্রথা-পদ্ধতির কবলে আক্রান্ত

---

[248] Encyclopedia Britenica. ix Ed. Vol. xx, p. 320.2. G, 321 ko.c.3. G, 321 ko.c.
[২৪৯] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*। আবু সাঈদ ওমর আলী অনু.। ১ম খণ্ড। ঢাকা:মুহাম্মদ ব্রাদার্স। পৃ. ৩১।

হয়ে পড়ে। বুদ্ধের মতবাদ এসবের বিরুদ্ধে তার ধ্বজা উড়িয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুদ্ধবাদ এসব কুপ্রথা- শিরক্ ও মূর্তিপূজার ধর্মে পরিণত হয়, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যার মূর্তি ও প্রতিমার সংখ্যা ব্যতীত কোনো পার্থক্য নেই। ঈশ্বর টোপা লেখেন, বৌদ্ধ ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় এমন রাজত্ব কায়েম হয় যার ভেতর অবতারের ছড়াছড়ি ও মূর্তি পূজার অবাধ কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সংঘসমূহের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতর ধর্মের নামে নিত্য নতুন প্রথা-পদ্ধতি ও নব-আবিষ্কৃত বস্তু একের পর এক দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।[২৫০]

নেহেরু লেখেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মও তাই করে। সংঘ খুবই সম্পদশালী হয়ে উঠে এবং একটি বিশেষ দলের স্বার্থ সিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়, কোনো নিয়ম-কানুনের বালাই ছিল না। উপাসনা পদ্ধতির ভেতর যাদু ও নানারূপ কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সহস্র বছর এসব নিয়ম মাফিক চালু থাকার পর বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি শুরু হয়। বৌদ্ধমত বিকৃতির মাধমে তার সকল মৌলিকত্ব হারিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাকে তার আসল রূপে ফিরিয়ে নিতে বৌদ্ধ জগতে ও তাদের শাসনামলে এমন কোনো সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেনি।[২৫১] এভাবে দেখা যায়, এসব ধর্মকে বিকৃতি, সংকোচন, আত্মবিলয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি, হিন্দু ও বৌদ্ধ বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনায় অতি ক্ষুদ্রায়তনেই অনুসৃত হচ্ছে। ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্ম একই পথে পরিণতির দিকে বয়ে চলেছে।

যে কোনো ধর্ম বা মাযহাবের চিরন্তনরূপে ঠিকে থাকার জন্য যে দুটি ব্যবস্থাপনার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এগুলো কেবল ইসলামের ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ, চিরন্তন শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মের নিখাদ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, জিহাদ ও ইজতিহাদী গুণসম্পন্ন জীবন্ত ব্যক্তিত্বের ধারাবাহিক উপস্থিতি ও যথার্থ ভূমিকা ছাড়া কোনো ধর্ম বা মাযহাবের পক্ষেই বাস্তবে ঠিকে থাকা সম্ভব নয়। ইসলামের দীর্ঘ ঘটনাবহুল ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ও

---

[২৫০] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *প্রাগুক্ত*।
[২৫১] Neheru. *Ibid.*

এমন পাওয়া যায় না যেখানে ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ইসলামের প্রকৃত সত্য বা হাকিকত ও মৌলিক শিক্ষামালা একেবারে অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছে, গোটা মুসলিম উম্মাহ অনুভূতিশূন্য হয়ে নিকষ কালো অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। নিচের সারণীতে দেখা যাবে ইসলামের ইতিহাসে এমন কোনো যুগ নেই যেখানে যুগের যোগ্যতা ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যুগের সংকট-সমস্যা দূর করে ইসলামের পথ চলা ও উত্তরোত্তর বিকাশ নিশ্চিত করেন নি।

সারণি: ৪.১ মুসলিম সংস্কারক ও ব্যক্তিত্বগণের ধারাবাহিক ভূমিকার চিত্র

সময়কাল	যুগের প্রয়োজন বা সংকট	উল্লেখযোগ্য মুসলিম সংস্কারক বা ব্যক্তিত্ব	ভূমিকা ও অবদান
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাতের সময়কাল থেকে	কুরআন-সুন্নাহর/হাদিসের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার	সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম	কুরআন-সুন্নাহর চর্চা, সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার, ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা, মিথ্যা নবুয়ত ইত্যাদি নির্মূলকরণ।
	কুরআন-সুন্নাহর/হাদিসের সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার, ফিকহ চর্চা	তাবেঈ জামাত	সাহাবা জামাতের রেখে যাওয়া কাজকে এগিয়ে নেওয়া, হাদিস সংগ্রহ, ফিকহি চর্চা ও এর সঙ্কলন ইত্যাদি।
	হাদিস ও ফিকহ সংরক্ষন ও সঙ্কলন	তাবে-তাবেঈ জামাত	তাবেঈ জামাতের কর্মকাণ্ডের প্রসার, হাদিস, ফিকহ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
	খাল্‌ক-ই কুরআন ফিতনা	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর মুজাদ্দেদী ভূমিকায় ফিতনা রোধ
	মুতাযিলা ফিতনা	ইমাম আবুল হাসান আশআরী, ইমাম আবু মনসূর মাতুরীদী	ইমাম আবুল হাসান আশআরী, ইমাম আবু মনসূর মাতুরীদী-এর ভূমিকায় রোধ
	গ্রিক দর্শনের নেতিবাচক প্রভাব, বাতেনী ফেতনা	ইমাম মুহাম্মদ আল গাযালী	ইমাম মুহাম্মদ আল গাযালী এসব সঙ্কটের জাল ছিন্নভিন্ন করে দেন।
	দ্বীনি ঈমান-আমল,	আবদুল কাদের	তাঁদের লেখনি ও ওয়াজ

বিংশ শতক পর্যন্ত	আবেগ-অনুভূতির অবনতি	জিলানী, আবদুর রহমান ইবনে জওযী	নসিহতের মাধ্যমে এক্ষেত্রে বৈপ্লিবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।
	ক্রুসেড : মুসলিম জাহানে নয়া দুর্যোগ	ইমাদুদ্দীন যঙ্গী, নূর-উদ্দীন যঙ্গী, সালাউদ্দীন আইয়ুবী	দুর্যোগ মোকাবেলা ও নির্মূল
	তাতারী ফেতনা	সুলতান আল-মালিকুল মুজাফ্‌ফর সাইফুদ্দীন, রুকনুদ্দীন বাইবার্স, শায়খ জামালুদ্দীন ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র শায়খ রশীদুদ্দীন	মিশরের শাসক সুলতান আল-মালিকুল মুজাফ্‌ফর সাইফুদ্দীন ও সেনাপতি রুকনুদ্দীন বাইবার্স- এর কাছে তাতারীদের শোচনীয় পরাজয়, শায়খ জামালুদ্দীন ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র শায়খ রশীদুদ্দীন-এর তাবলিগি ভূমিকায় তাতারীদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ফেতনা নির্মূল।
	ভারসাম্যহীন ইলমে-কালাম চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য	আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী	এক্ষেত্রে জালালুদ্দীন রুমীর মসনবীর, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বহুমুখী অবদান অবিস্মরণীয়।
	শুদ্ধ ধর্মকর্মের বিপরীতে ভ্রান্ত ধর্মকর্মের প্রাদুর্ভাব ও প্রচার	অসংখ্য মুসলিম সুফি-দরবেশ	শুদ্ধ ধর্মকর্ম চর্চার মাধ্যমে জাগতিক ও অধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সুষম সমন্বয় সাধন।
	ভারতবর্ষে দীনে-ইলাহি প্রবর্তন ও অনৈসলমিক কৃষ্টি-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব	মুজাদ্দিদে আলফে সানী	দীনি-ইলাহি ফেতনা নির্মূল ও বিশুদ্ধ ধর্ম ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নয়ন।

	ভারতবর্ষে ইংরেজের বিকৃত খ্রিস্ট-ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যাপক অপতৎপরতা	আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ইবনে খলীলুর রহমান কিরানবী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, সৈয়দ আহমদ শহীদ, সৈয়দ ইসমাইল শহীদ, আল্লামা কাসেম নানূতবী, শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান, সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী ও অসংখ্য ব্যক্তিত্ব।	অপতৎপরতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার, স্বাধীনতা আন্দোলন, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।
	লা-মাযহাবী ফেতনা [এই ফেতনার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চলমান।]	বিশ্বের অসংখ্য আলেমে-দীন	তাক্বলিদ ও মাযহাব বিষয়ে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও অপতৎপরতা প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ শিক্ষার প্রচার-প্রসার।
	সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাত সম্পর্কে অপব্যাখ্যা, ফেতনার সৃষ্টি	অসংখ্য আলেমে-দীন	ফেতনা প্রতিরোধ ও বিশুদ্ধ শিক্ষার প্রচার-প্রসার।

সূত্রঃ লেখক।

দেখা যায়, ইসলামের দীর্ঘ কঠিন ও জটিল ঘটনাবহুল ইতিহাসের ঝড়ঝঞ্ঝামুখর পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ঠিকই কোনো না কোনো ইমাম, মুজাদ্দিদ, মর্দে মুজাহিদ ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং বিপদ-দুর্যোগের শুধু মুকাবিলাই করেন নি বরং ইসলাম নামক চলন্ত ট্রেনের চাকায় যে জং-ময়লা ধরেছিল তা উপযুক্ত ময়লানাশক দিয়ে পরিষ্কার করে তার চলার পথকে

নির্বিঘ্ন করেছেন। নিচে এমন দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করছি যা থেকে ইসলামের চিরন্তনতা আরো পরিষ্কার হবে, ইনশাল্লাহ।

ক্রুসেডের মুকাবিলায় মুসলিম জাহান

পঞ্চম হিজরী বা ঈসায়ী দ্বাদশ শতকে যখন মুসলিম সাম্রাজ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রসমূহে বিশেষত বাগদাদ ও আশেপাশের অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার কাজ প্রবল গতিধারায় এগিয়ে চলছিল, তখন মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের এক ঘন কালো মেঘ পুঞ্জিভূত হতে শুরু করে। ঐতিহাসিক নদবী রহ. লিখেন, এতে মুসলমানদের অস্তিত্বই শুধু নয়, ইসলামের অস্তিত্বও ছিল মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। কারণ, ইসলাম ও মুসলমানদের সত্য বাণীর কাছে খ্রিস্ট ধর্ম ও সমাজ দিন দিন আত্মবিলয়ের মধ্য দিয়ে শান্তি লাভ করছিল। দিন দিন ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছিল, খ্রিস্টানদের গোটা প্রাচ্য সাম্রাজ্য, বায়তুল মাকদিস এমনকি স্বয়ং ঈসাহ মাসিহের আ. জন্মভূমিও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছিল। এ অবস্থায় খ্রিস্টান ইউরোপের ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকার কোনো কারণ ছিল না। কয়েক শতাব্দী ধরেই খ্রিস্টান ইউরোপ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে টগবগ করছিল। কিন্তু মুসলিম শক্তির অপ্রতিরোধ্য সত্যাভিজানের সম্মুখে সম্মিলিত খ্রিস্টান শক্তিসমূহের সাহস ছিল না যে তারা সিরিয়া, ফিলিস্তিন কিংবা কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে চোখ তুলে তাকায়। হিজরী ষষ্ঠ শতকে সেলজুকদের পতনের পর মুসলিম জাহান দুর্বলতার এক চরম সীমায় উপনীত হয়। খ্রিস্টান বিশ্বের জন্য এটি ছিল সুবর্ণ সুযোগ। খ্রিস্টান পাদ্রীগণ পবিত্র ভূমি জেরুজালেম পুণরুদ্ধারের জন্য সমগ্র খ্রিস্টান ইউরোপকে উত্তেজিত করতে শুরু করে, সমগ্র ইউরোপ এজন্য এক উদগ্র আলোড়নে ছেয়ে যায়। যদিও পবিত্র ভূমি পুণরুদ্ধারের নামে 'পবিত্র যুদ্ধ' 'ধর্ম যুদ্ধ' নাম দিয়ে এই অভিযান তারা শুরু করেছিল, কিন্তু তাদের বর্বর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য কেবল এই স্থান দখল করা কিংবা ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। এর পিছনে অনেক আর্থ-সামাজিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক কারণও ছিল যা তাদের অভিযানে তৎকালীন সমগ্র সিরিয়া (সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন) তথা মধ্য এশিয়া, মিশরকে লক্ষ্যভূক্ত করেছিল।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র ইউরোপ তার যাবতীয় শক্তিগর্ব নিয়ে সেলজুকদের উপর আক্রমণ শুরু করে। শরীরে ক্রুস ধারণ করে তারা ক্রুসেড তথা 'পবিত্র-দ্ধদ্ধে, বা 'ধর্ম-যুদ্ধে' অংশগ্রহণ করে। দুই বছরের মধ্যে তারা আর-রিহা (এডেসা), আন্তাকিয়া (এন্টিয়ক), আলেপ্পো ও বড় বড় শহর, বহু দুর্গ দখল করে নেয়। ১০৯৯ ক্রিস্টাব্দে ক্রুসেডাররা বাইতুল-মাকদাস ও জেরুজালেম শহর দখল করে নেয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের প্রায় সব শহর ও জনপদ ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়, এমনকি তারা মক্কা ও মদীনার দিকেও তাদের অসভ্য দৃষ্টি দেওয়ার স্পর্দা দেখায়। খ্রিস্টান ঐতিহাসিক Lane-poole লিখেন, ক্রুসেডাররা এসব অঞ্চলে এমনভাবে সহজে ঢুকেছিল যেমন পচা কাঠে পেরেক ঢুকে যায়, এবং কিছু সময়ের জন্য এমনই মনে হয়েছিল যেন তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের কাণ্ডটিই ধুনিত তুলার ন্যায় ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।[২৫২] বায়তুল মাকদিস প্রবেশকালে বিজয়ের উন্মত্ত নেশায় অধিবাসী অসহায় মুসলমানদের উপর ক্রুসেডাররা যে পাশবিকতা চালিয়েছিল তার কিছু বর্ণনা একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক এভাবে দিয়েছেন:

> বায়তুল মাকদিসে প্রবেশের পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এমন ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল যে মসজিদ-ই-উমরে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যাওয়ার পথে তাদের ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত রক্তে ডুবে গিয়েছিল। শিশুদেরকে ঠ্যাং ধরে দেওয়ালের গায়ে আছড়ে মারা হয় অথবা নগর-প্রাচীর থেকে চরকির মতো ঘুরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। ইহুদিদেরকে উপসনালয়ের ভেতরেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। দ্বিতীয় দিন ঠাণ্ডা মাথায় এর চেয়েও ভয়াবহ হৃদকম্প সৃষ্টিকারী তাণ্ডব চালানো হয়। ট্যাংকার্ড তিন শত বন্দীর জীবনের নিরাপত্তা দানের জামানত নিয়েছিল। ক্রুসেডাররা চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হয় এবং সবাইকে বাইরে টেনে বের করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। অতঃপর চলে ব্যাপক গণহত্যা। নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে হত্যা করার পর তাদের দেহ কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। নিহত মানুষের লাশ ও কর্তিত

---

[২৫২] The Crusaders penetrated like a wedge between the old wood and the new, and for a while seemed to cleave the trunk of Mohammedan empire into splinters. (Stanley Lane-poole. 1898. *Saladin*. London : G.P.Putnams Son. p. 25.)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরাট স্তুপ জমে ওঠে এখানে সেখানে। নির্মম গণহত্যার পরিসমাপ্তি ঘটলে শহরের রক্তাক্ত রাস্তাঘাট আরব বন্দীদের দিয়েই পরিষ্কার করা হয়।[২৫৩]

নিঃসন্দেহে এই ঘটনা ছিল মুসলিম জাহানের প্রকাশ্য দুর্বলতা ও পতন এবং খ্রিস্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির বহিঃপ্রকাশ। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে চারটি খ্রিস্টান রাজ্য (কুদস, আন্তাকিয়া, ত্রিপোলী, য়াফা) গড়ে উঠে যা ইসলামের কেন্দ্রভূমি হিজাযের সার্বভৌমত্ব, সম্মান-সম্ভ্রমের প্রতি ছিল বিরাট হুমকি। খ্রিস্টানদের দুঃসাহস এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, কির্কের শাসনকর্তা রেজিল্যান্ড মক্কা ও মদীনা শরীফের ওপর আক্রমণ করার ঘৃণ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বসে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক সম্পর্কেও সে ধৃষ্টতা ও অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে।[২৫৪]

রিদ্দার ঘটনার পরে মুসলিম জাহানে এর চেয়ে নাজুক ও বিপজ্জনক সময় আর আসে নি। এই অবস্থায় মুসলিম জাহানের একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে উপনীত হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। হিজরী ষষ্ঠ শতকে মুসলিম জাহানের বিরাট অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা, আব্বাসী শাসনের পতন, মালিক শাহ সালজুকীর পর সন্তানদের মসনদ দখল নিয়ে গৃহযুদ্ধাবস্থা ও সালজুকীদের পতন মিলে পরিস্থিতি তখন এমন ছিল যে কোনো মুসলিম মুজাহিদ শাসক ছিলেন না যিনি ইসলামের যাবতীয় যোগ্যতায় উত্তম এবং তার ফলে তিনি এই দুর্যোগময় পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে পারেন। যুগটা ছিল এতই অনিশ্চয়তা ও জটিলতাপূর্ণ যে, বিশাল-বিস্তৃত সালজূক সাম্রাজ্যকে মৃত্যু যন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়তে দেখে যে কেউ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই মধ্যবর্তী যুগে অরাজকতা ততদিন পর্যন্ত বিরাজ করছিল যতদিন না কোনো নতুন শক্তি সংঘবদ্ধরূপে, পরিপূর্ণ যোগ্যতায়, ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ

---

[২৫৩] Encyclopedia Britennica, vol. 6, Crusade, p. 627.

[২৫৪] Stanley Lane-poole. *Ibid.*

হয়ে লক্ষ্যের পানে ধাবিত হচ্ছিল। সুতরাং মুসলমানদের ওপর খ্রিস্টান বিশ্বের বিজয় সুনিশ্চিত করার এটিই ছিল মোক্ষম মুহূর্ত।[২৫৫]

আতাবেক ইমাদুদ্দীন যঙ্গী রহ. (১০৮৫-১১৪৬)

এমন ঝঞ্ঝা-দুর্যোগ ও হতাশাময় সময়ে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। মুসলিম বিশ্ব তাদের ঠিক প্রয়োজনের জরুরী মুহূর্তে একজন নতুন সুযোগ্য নেতা ও মর্দে মুজাহিদ পেয়ে যায় যখন সত্যিকার অর্থে আশার ক্ষীণ আলোও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। বিপদের ভারে ডুবে যাওয়া উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য এটি ছিল আল্লাহর নেযাম বা রীতিরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি আতাবেক ইমাদুদ্দিন যঙ্গী। লেনপুল লিখেন,"মুসলমানদের জিহাদ ঘোষণার প্রয়োজন দেখা দিল, প্রয়োজন দেখা দিল এমন একজন নেতার যাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা ও সামরিক যোগ্যতার কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। উপরন্তু তুর্কমেন সর্দার ও তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের এমন একদল যুদ্ধবাজ দীনদার নওজোয়ান সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল যারা ক্রুসেডারদের কৃত জুলুম ও বাড়াবাড়ির হিসাব নেবে এবং তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। যা হোক, ইমাদুদ্দিন যঙ্গীর ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই মুসলমানদের উল্লিখিত নেতার আবির্ভাব ঘটে।[২৫৬] ইমাদুদ্দীন যঙ্গী চরম এই জুলুমবাজদের হাত থেকে মানবতাকে রক্ষা করার জন্য পরিপূর্ণ জিহাদী চেতনা নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন। তিনি বিপুল বিক্রমে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন এবং ৫৩৯ হিজরী, ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সর্বাধিক মজবুত ও সুদৃঢ়, বিরাট আশা-ভরসার কেন্দ্রভূমি রাহা (এডেসা) রাজ্য অধিকার করেন। ঐতিহাসিকদের ভাষায় এটি ছিল 'ফতহুল-ফতুহ' বা সর্ববৃহৎ বিজয়। ইমাদুদ্দীন যঙ্গী ফোরাত উপত্যকা ক্রুসেডারমুক্ত করতে সক্ষম হন। ৫৪১ হিজরীতে (১১৪৬ খ্রি.) শাহাদাতের পূর্বে ইমাদুদ্দীন যঙ্গী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের এমন এক সূচনা করে দিয়েছিলেন যা

---

[২৫৫] *Ibid.* p. 25.
[২৫৬] *Ibid.* p. 9.

তাঁর সুযোগ্য পুত্র আল-মালিকুল-আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গী অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যান।

আল-মালিকুল-আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গী রহ. (১১১৮-১১৭৪)

ক্রুসেডাদেরকে সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ সকল মুসলিম অঞ্চল থেকে বহিঃষ্কার এবং বায়তুল-মাকদাস পুনরুদ্ধারের জন্য বীরপুরুষ নূরুদ্দীন যঙ্গী নিজেকে আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত বলে মনে করতেন এবং এজন্য তিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। তিনি বীর বিক্রমে আক্রমণ করে গোটা খ্রিস্টান রাজ্যসমূহে প্রবল ভীতির সঞ্চার করেন। নূরুদ্দীন ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে হারিম দূর্গ অধিকার করেন যা ছিল উত্তর সীমান্তবর্তী একটি মযবুত দূর্গ। আন্তাকিয়া ও ত্রিপোলীর রাজাসহ বহু বিখ্যাত নাইট এতে বন্দী হন। যুদ্ধে দশ হাজার খ্রিস্টান সৈন্য নিহত ও বহু সৈন্য বন্দী হয়। হারিম দূর্গের পর তিনি বানিয়াস জয় করেন।[২৫৭] অন্যদিকে মিশর জয় করে তিনি খ্রিস্টানদেরকে দু'দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেন। লেনপুল লেখেন, "সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর সেনাপতি (সালাউদ্দীন) কর্তৃক নীলনদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থ হল, জেরুজালেমের খ্রিস্টান রাজ্য ইঁদুর-কবলে নিপতিত হয়েছে। দু'দিক থেকেই যাদের দ্বারা সে পিষ্ট হচ্ছিল, তারা ছিল একই ব্যক্তি ও একই শক্তির দু'টি বাহিনী। সালাউদ্দীন দিময়াত ও আলেকজান্দ্রিয়া নৌ-বন্দরের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে একটি নৌবহরেরও নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এর দ্বারাই তিনি ইউরোপের ও মিশরের সঙ্গে ক্রুসেডারদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।"

এভাবে নূরুদ্দীন ফিলিস্তিনের প্রায় সমগ্র এলাকা ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলিম অধিকারে ফিরিয়ে আনেন। বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের পূর্বেই ১১৭৪ সালে মহান নূরুদ্দীন ইন্তেকাল করেন। আসলে এই মহা-সৌভাগ্য আল্লাহ তারই সেনাপতি সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবীর ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন, যা স্বয়ং নূরুদ্দীন যঙ্গীর পুণ্যকর্মের মধ্যে শামিল হবার যোগ্য।[২৫৮]

---

[২৫৭] ইবনুল আসীর। *আল-কামিল*। ১১ খণ্ড, পৃ. ১২৪।

[২৫৮] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৬৩-২৬৪।

নূরুদ্দীনের সমসাময়িক ইবনে জাওযী, খাল্লিকান নূরুদ্দীনকে সুবিচারক, যাহিদ, আবিদ, মুত্তাকী, জ্ঞানান্বেষু, আলীম ও ওলী-আল্লাহর প্রতি যত্নশীল, শরীয়তে পূর্ণ-পাবন্দ, অতি-উত্তম চরিত্রের মহান সুলতান বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫৯] অনেকের মতে, সুলতান নূরুদ্দীনের যতই প্রশংসা করা হোক, কম হবে। কথাটি মোটেও বাহুল্য নয়। ইবনুল আসীর লেখেন, "আমি বিগত সুলতানদের জীবন ও সার্বিক অবস্থা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমর ইবনে আবদুল আযীযের পরে নূরুদ্দীনের চাইতে অনুপম চরিত্রের অধিকারী এত বড় ন্যায়বিচারক সুলতান আর দেখিনি।[২৬০]

সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবী রহ. (১১৩৮-১১৯৩)

সালাউদ্দীন আইয়ুবীর ব্যক্তিসত্তা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরন্তন মুজিযা ও ইসলামি সভ্যতার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি হলেন মহা-সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তিত্ব যাকে আল্লাহ বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের জন্য মনোনীত করেছিলেন। ক্রুসেডবাহিনীর মুকাবিলায় তিনি এমনই মরণপণ জিহাদ পরিচালনা করেন ও একের পর এক জয়ী হতে থাকেন যে, গোটা খ্রিস্টান জগতের মেরুদণ্ড ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। সুলতান নূরুদ্দীনের পর সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবী ১১৭৪-১১৯৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযান পরিচালনা করেন এবং ১১৮৭ সালে হিত্তিনের ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধে (জুলাই ৩-৪) ক্রুসেড বাহিনীকে এমন পর্যুদস্ত করেন যে, তাদের কোমর ভেঙ্গে যায় এবং ভাগ্যবিপর্যয় অবধারিত হয়ে পড়ে। ভাগ্য নির্ধারণী এই যুদ্ধে মুসলমানরা নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে, গোটা সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও বাইতুল-মাকদিস নিরঙ্কুশ মুসলিম অধিকারে আসে। লেনপুল যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করেন:

> খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর নির্বাচিত ও বাছাইকৃত জওয়ানেরা বন্দী হল। জেরুজালেমের রাজা গাঈ, তার ভাই চ্যাটিলেন (হুনায়ন)- এর রেজিল্যান্ড, তেনিন- এর হামফ্রে, তাবাকাত দাবিয়া ও ইসবেতার- এর প্রধানদ্বয় ও বড়

---

[২৫৯] উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬৪-২৬৫।
[২৬০] ইবনুল-আসীর। *প্রাগুক্ত*।

> বড় খ্রিস্টান নাইট গ্রেফতার হল। জীবিত সকল খ্রিস্টান সৈন্য, অশ্বারোহী, পদাতিক, মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হল। সবাই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করছিল যে, এক একজন মুসলিম সৈনিক ত্রিশ ত্রিশজন খ্রিস্টান সৈন্যের একেক প্লাটুনকে, যাদেরকে সে স্বহস্তে বন্দী করেছিল, দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিহত ক্রুসেডারদের লাশ ও কর্তিত হাত-পা এমনভাবে স্তুপাকারে পড়েছিল, যেমনভাবে পাথরের ওপর পাথর স্তুপাকারে পড়ে থাকে। ছিন্ন মস্তক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যেমনভাবে তরমুজক্ষেতে তরমুজ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে। এই যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল।[২৬১]

৫৮৩ হিজরীর ২৭ রজব (১১৮৭ খ্রি.) বিজয়ী সুলতান বায়তুল মাকদাসে প্রবেশ করেন, দীর্ঘ ৯০ বছর ধরে মুসলানরা যার স্বপ্ন দেখছিল। সুলতান নূরউদ্দীন বহু অর্থ ব্যয়ে এই আশায় একটি জাঁকজমকপূর্ণ মিম্বর তৈরি করে রেখেছিলেন যাতে বায়তুল মাকদিস বিজয় হলে এটি সেখানে স্থাপন করবেন। সুলতান সালাউদ্দীন সেটি নিয়ে এসে সেখানে স্থাপন করে নূরউদ্দীনের স্বপ্ন পূরণ করেন। সুলতানের সহচর ঐতিহাসিক কাযী বাহাউদ্দীন সাদ্দাদ লেখেন:

> মিশর ও সিরিয়া থেকে উলামায়ে কেরাম দলে দলে বায়তুল মাকদিস অভিমুখে রওয়ানা হন, পবিত্র এই মুহূর্তে বিরাট সমাবেশ ঘটে। চারদিকে শুধু তাকবির আর তাহলিলের সজোর ধ্বনি। প্রায় নব্বই বছর পর বায়তুল মাকদিসে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হল। সাখরা গম্বুজের উপর স্থাপিত ক্রুস অপসারণ করা হল। সে এক অভাবিত দৃশ্য। আল্লাহর সাহায্য ও ইসলামের বিজয় সবাই স্বচক্ষে দেখতে পেল।

ক্রুসেডাররা বায়তুস-মাকদিস দখল করে গোটা জেরুজালেমে মুসলমানদের ওপর কীরকম বীভৎস পাশবিকতায় মেতে উঠেছিল তার বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সুলতান সালাউদ্দীন বিজয়ী হয়ে খ্রিস্টানদের সঙ্গে যে মহৎ আচরণ করেছেন তাতে দুই মেরুর চরিত্র বৈশিষ্ট্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুলতান স্থানে স্থানে সৈন্য মোতায়েন করেন যাতে কারো ওপর কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করা না হয়। একজন ক্রিস্টানকেও হত্যা করা হয় নি।

[২৬১] Stanely Lane-poole. *Ibid.* p. 214.

যেসব বন্দী মুক্তিপণ পরিশোধ করেছে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না এমন হাজারে হাজারে বন্দীকে সুলতান মুক্তি প্রদান করেন। সুলতানের ভাই আল-আদিল বহু লোকের মুক্তিপণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে মুক্ত করে দেন।[২৬২] এভাবে সুলতান পরাজিত শত্রুদের প্রতি মহানুভবতা দেখিয়েছেন। অথচ এর বিপরীতে ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানরা বায়তুল মাকদিস বিজয়ের পর মুসলমানদের প্রতি যেরকম পাশবিক আচরণ করেছিল তা কল্পনাতীত; কুদ্‌সের ছাদে উঠেও সেদিন কোনো মুসলমান রেহাই পায় নি, ক্রুসেডাররা তাদের সেখানেই তীরের সাহায্যে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ছেড়েছে, যেখানে ঈসা মাসিহ একদা দাঁড়িয়ে শান্তি, দয়া-মায়ার বাণী শোনাতেন। নদবী রহ. সুন্দর করে লেখেন, আল্লাহর যতগুলো গুণবাচক নাম আছে তাঁর ভেতর সবচেয়ে বড় নাম- রাহমান ও রাহীম, রহম থেকে উদ্ভূত। রহম (দয়া) ন্যায়বিচারের শিরোভূষণ এবং আল্লাহর জালালস্বরূপ। যেখানে 'আদল' তথা ন্যায়বিচার স্বীয় এখতিয়ার ও অধিকারের দাবীতে কাউকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারে সেখানে একমাত্র রহমই তার প্রাণ বাঁচাতে পারে।"[২৬৩] বিজীত খ্রিস্টানদের প্রতি সালাউদ্দীন যে উদারতা, মহানুভবতা ও ইসলামি চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে লেনপুলকে লিখতে হয়েছে:

> সুলতান সালাউদ্দীনের সকল গুণের ভিতর কেবল একটি গুণ সম্পর্কে যদি দুনিয়া অবহিত হত যে, তিনি কীভাবে জেরুজালেমকে অনুগ্রহ করেছিলেন (অর্থাৎ, খ্রিস্টান বন্দীদেরকে হত্যার বদলে তাদের সঙ্গে কীরকম মহৎ আচরণ করেছিলেন) তাহলে তারা একবাক্যে স্বীকার করত যে, সুলতান সালাউদ্দীন কেবল তাঁর যুগেই নন, বরং সর্বযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নত মনোবলসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ এবং বীরত্ব ও ঔদার্যের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। আভিজাত্যে ও মহত্বে সত্যি তিনি ছিলেন অনন্য ও অতুলনীয়।[২৬৪]

[262] Karen Armstrong. 2005. *Jerusalem. One City, Three Faiths.* New York : Ballantine Books. pp. 293-94.

[২৬৩] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *প্রাগুক্ত।*

[২৬৪] Stanely Lane-poole. *Ibid.*

হিত্তীনের পরাজয়ের পর বায়তুল-মাকদিসও হাতছাড়া। রোম সম্রাট কায়সার ফ্রেডরিক, ইংল্যান্ডের পাষাণ-হৃদয় রিচার্ড, ফ্রান্স, সিসিলি ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটবর্গ, ডিউক, নাইট, যুবরাজগণ– গোটা ইউরোপ ক্রোধের অনলে জ্বলে-পুড়ে তাদের সকল সেনাদল নিয়ে সকল অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সিরিয়ার উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তিনি ছিলেন সালাউদ্দীন- পাহাড়ের মতো অটল-অবিচল। তিনি যেন দ্বিতীয় আসমানী তরবারী হয়ে অবতরণ করেছিলেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা গোটা মুসলিম জাহানের পক্ষে একা লড়াই চালিয়ে গেলেন। এই পর্বে প্রায় পাঁচ বছর যুদ্ধের পর ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানরা যুদ্ধ বিরতী চুক্তির প্রস্তাব দেয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হল। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, বায়তুল-মাকদিসসহ সমগ্র ভূ-ভাগ মুসলমানদের অধিকারেই থাকল, খ্রিস্টানদেরকে কেবল উপকূলীয় ক্ষুদ্র রাজ্য একছিলতে আক্কা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। লেনপুল লেখেন:

> পোপের ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে গোটা ইউরোপ ও সমগ্র খ্রিস্ট শক্তি পবিত্র ভূমির অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল জেরুজালেম দখলে রাখা ও পতনোন্মুখ খ্রিস্টানরাজ্য রক্ষা করা। কিন্তু এ বিপুল আয়োজন, তোড়জোর ও সংগ্রামের ফল কী হল? কায়সার ফ্রেডরিক এ সময় মারা গেলেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সম্রাটদ্বয় স্ব-স্ব দেশে ফিরে গেলেন। অনুসারী অসংখ্য নাইট ও বীর যোদ্ধা ইলিয়ার মাটিতে দাফন হলেন। জেরুজালেম যেমন ছিল তেমনি সালাউদ্দীনের দখলে থাকল। খ্রিস্টানদের ভাগে থাকল শুধু উপকূলীয় এলাকার ক্ষুদ্র আক্কা রাজ্য।[২৬৫]

আল্লাহ এত অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সালাউদ্দীনের মধ্যে ঘটিয়েছিলেন যা কোনো বিশেষ বিরল ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘটে থাকে। তিনি ছিলেন ইসলামের অসংখ্য অলৌকিকতার একটি যা প্রমাণ করে যে, বিশ্বমঞ্চে ইসলামের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় নি, মুসলিম উম্মাহ তার প্রাণশক্তি ও উৎপাদনশীলতা হারিয়ে ফেলেনি। কাযী সাদ্দাদ লিখেন, সুলতান ছিলেন বিশুদ্ধ আকীদার মুসলমান এবং আহলে-সুন্নাত-ওয়াল জামাতের পরিপূর্ণ

---

[২৬৫] *প্রাগুক্ত।*

অনুসারী। একবার তিনি (সুলতান) বলেছিলেন, বছরের পর বছর গুজরে গেছে, এক ওয়াক্ত সালাতও বিনা জামাতে আদায় করিনি। সাদ্দাদ বলেন, রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি ইমামকে ডেকে পাঠাতেন এবং স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতেন। নির্ধারিত সুন্নতগুলো তিনি নিয়মিত পালন করতেন, রাতে যথাসম্ভব নফল পড়তেন, রাতের নফল কোনো কারণে কাযা হলে (শাফিঈ মাযহাব অনুসারে) ফজরের সালাতের পূর্বেই আদায় করে নিতেন। সারা জীবনে তাঁর ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার সুযোগ আসেনি। রমযানে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সিয়াম পালন করতেন। কয়েকটি রোযা তাঁর জিম্মায় বাকি ছিল যা কাযী ফাযেলের ডায়রীতে লিপিবদ্ধ ছিল। ওফাতের আগে খুবই সূচারুরূপে তিনি সেগুলো আদায় করেন।[২৬৬]

নিখাদ ইলম ও আমল, যুহদ ও তাকওয়া, জিহাদ ও তাজদিদ, প্রশাসনিক দক্ষতা ও সমর কুশলতা, নৈতিকতা, ক্ষমা ও উদারতা, ভ্রাতৃত্ব ও মহানুভবতা সবকিছু মিলে তিনি ছিলেন ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের এক স্বার্থক নমুনা। তিনি সকলের কাছে ছিলেন অতি প্রিয় ও সম্মোহনীয়। খ্রিস্টান জনসাধারণ তাঁর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর জন্যে দোয়া করত, তাঁকে একটু ছুঁয়ে দেখতে চাইত। তাহলে, নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর অবস্থান কেমন হতে পারে? এর ফলে দেখা যায়, খ্রিস্টান বাহিনীর রাজা-সম্রাট থেকে সৈন্যরা যখন যুদ্ধের ময়দানেও নানা দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, অনৈক্য, ক্রোধ-অনাস্থা, অনীহায় নাস্তানাবুদ থাকত সেখানে সালাউদ্দীনের নেতৃত্বে সৈন্য থেকে সাধারণ জনগণ সকলের মধ্যে চরম আস্থা, লক্ষ্য জয়ের প্রবল আগ্রহ ও পারস্পরিক ঐক্য-ভালবাসা বিরাজ করত। সুলতানের আহ্বানে তাঁর সৈন্যরা জান দিতে প্রস্তুত থাকত, যদিও যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রীতায় তারা খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিল। এর মূল কারণ ছিল, তারা জানত তাদের নেতার উদ্দেশ্য তো কেবল একটি, তা হল-ইসলামের হিফাযত এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া কিছু নয়। লেনপুল

---

[২৬৬] কাযী সাদ্দাদ। *আন-নাওয়াদিরুস্-সুলতানিয়া*। পৃ. ৫-১০; Stanely Lane-poole. *Ibid.* p. 372-373.

ঠিকই বলেছেন, "তৃতীয় ক্রুসেডে সম্মিলিত খ্রিস্টান শক্তি মুকাবিলায় নেমেছিল, কিন্তু তারা গাজী সালাউদ্দীনের শক্তি ও মনোবলে সামান্যতম চির ধরাতে পারে নি এবং পারে নি তার বাহিনীতে কোনো ফাটল সৃষ্টি করতে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সৈনিক তাঁর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল।"[২৬৭]

সালাউদ্দীন ক্রুসেডারদের ছুটে আসা উত্তাল তরঙ্গের সামনে প্রতিরোধের পাহাড় সৃষ্টি করে মুসলিম উম্মাহকে একদিকে পাশ্চাত্যবাদী আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেন। অন্যদিকে, তিনি মিশরের উবায়দী (ফাতেমী নামে খ্যাত) হুকুমতের অবসান ঘটানোর মাধ্যমে একটি ভয়ঙ্কর ফিতনার উৎসমুখ বন্ধ করে দেন যা মিশর থেকে বের হয়ে সমগ্র মুসলিম জাহানে শীয়া, ইসমাঈলিয়া ও ইমামিয়া, রাফেযী প্রভৃতি চিন্তাধারার কুপ্রভাব ছড়ানোর পাঁয়তারা করছিল। ইসলামের ইতিহাসে সালাউদ্দীনের এই দুই কীর্তি কখনও বিস্মৃত হবার নয়। ইসলামের এই ওয়াফাদার ও নিবেদিতপ্রাণ কুর্দী মুজাহিদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ চির শিক্ষণীয় ও স্মরণীয়। মহাবীর সালাউদ্দীন আইয়ুবী রহ. ২৭ সফর ৫৯৮ হিজরীতে (১১৯৩ খ্রি.) দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ইন্তিকালের সময় সুলতানের পরিত্যক্ত সম্পদ বলতে ছিল- একটি মাত্র স্বর্ণ মুদ্রা ও ৪৭টি রৌপ্য মুদ্রা। নিজের বলতে তাঁর অন্য কোনো স্থাবর-অস্থাবর, এমনকি একটি বসতবাটিও ছিল না! সুলতানের দাফন-কাফনের ব্যয় অন্যরা নির্বাহ করেছিলেন। কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর উযীর ও সচিব কাযী ফাযেল।[২৬৮]

তাতারী ফিতনা

হিজরী সপ্তম শতকে, ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশে এমন এক আকস্মিক মহা-দুর্যোগ দেখা দেয় যার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। এটি ছিল মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর ওপর অসভ্য ও হিংস্র মোঙ্গল

---

[২৬৭] প্রাগুক্ত।

[২৬৮] *আন-নাওয়াদিরুস্-সুলতানিয়া*। পৃ. ২৪৯-৫০।

তাতারদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ। তাতারীরা পিপীলিকা ও পঙ্গপালের ন্যায় গোটা মুসলিম জাহানের ওপর ছেয়ে যাচ্ছিল। বলা হয়, সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিযম শাহের একটি ভুল ও বোকামির কারণে মুসলমানদের ওপর এই বিপর্যয় নেমে এসেছিল। সে সময় সুলতান খাওয়ারিযম শাহ ও চেঙ্গিস খানের মধ্যে সম্পাদিত একটি বাণিজ্য চুক্তির আওতায় উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলমান ছিল।[২৬৯] কিন্তু বাণিজ্য উপলক্ষে আগত একদল তাতারী বণিককে (অজ্ঞাত কারণে) সুলতান হত্যা করেন। হ্যারল্ড ল্যাম্ব লেখেন, পথিমধ্যে উতরার শাসনকর্তা অনিলজুক বাণিজ্য কাফেলাকে বন্দী করেন এবং সুলতানকে অবহিত করেন যে এই কাফেলার মধ্যে গুপ্তচর রয়েছে। অনিলজুকের এই ধরণা ছিল একান্তই তার বুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু সুলতান খাওয়ারিযম শাহ এই অভিযোগ শুনে কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই সমস্ত বণিকদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।[২৭০] চেঙ্গিস খান এর কারণ অবগত হওয়ার জন্য সুলতানের কাছে দূত প্রেরণ করেন। সুলতান দূতকেও হত্যা করেন। ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সুলতান অবশ্যই মহা-অপরাধ করেছেন। ল্যাম্ব লেখেন, এটি ছিল এমন এক কর্ম যার বদলা নেওয়া মোঙ্গলদের অতীত ঐতিহ্য অনুসারেই অপরিহার্য ছিল। চেঙ্গিস খান তখন বলেছিলেন, আসমানে যেমন দু'টি সূর্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি পৃথিবীর বুকে দু'জন খাকান (সম্রাট) থাকতে পারে না।[২৭১] চেঙ্গিয খান ক্রোধান্বিত হয়ে প্রথমে খাওয়ারিযম শাহের সালতানাত, অতঃপর গোটা মুসলিম জাহানকেই তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন। কিন্তু একজন বাদশার বোকামি তাতারী আগ্রাসনের একমাত্র কারণ ছিল বলে মনে হয় না। তৎকালীন মুসলিম প্রাচ্যকে যদি সমসাময়িক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে অধ্যয়ন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে মুসলিম জাহানের ওপর তাতারী ফিতনার প্রাদুর্ভাব একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল না, এর কারণ অনেক

---

[২৬৯] ইবনে কাসীর। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*। ১৩ খণ্ড, পৃ. ২০০-২০৪; ইবনুল আসীর। *আল-কামিল*। ১২ খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

[২৭০] Harold Lamb. 1928. *Genghis Khan*. London. p.143.

[২৭১] *প্রাগুক্ত*।

গভীরে প্রোথিত। এজন্য আমাদেরকে আরো কয়েক বছর পেছনে ফিরে গিয়ে সে যুগের মুসলিম সালতানাত ও ইসলামি সমাজের ওপর চোখ বুলাতে হবে।

সালাউদ্দীন আইয়ুবী তাঁর ওপর অর্পিত মুসলিম সালতানাতের পবিত্র দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। খ্রিস্টান জগত তাদের তিক্ত পরাজয় থেকে অনেক শিক্ষা নিয়েছিল এবং বিস্তর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে উভয় পক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা ফিরে গিয়েছিল নতুন ক্রুসেডের প্রস্তুতি নিতে, যা উনিশ শতকে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ? তারা ফিরে গিয়েছিল তাদের আদিম জেহালতে, পুরনো চরিত্রে, সেই বিভাজন-বিভক্তি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আত্মকলহ এবং গাফিলত ও তন্দ্রালুতায়। সুলতান সালাউদ্দীনের পর তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর সন্তানদের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও আত্মকলহ, তাদের লড়াই-ঝগড়া চলেছে দীর্ঘকালব্যাপী। অপরিসীম সংগ্রাম-সাধনা ও ত্যাগের মাধ্যমে সালাউদ্দীন যে মুসলিম সালতানাত তীলে তীলে গড়ে তুলেছিলেন, সন্তানদের অত্মকলহের বলির শিকার হয়ে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তা ভাগ-বন্টন হয়ে যায়। বিশ্বের ইতিহাসে অসংখ্য অপদার্থ, অযোগ্য উত্তরাধিকারী ও শাসকদের চেয়ে সালাউদ্দীনের সন্তানদেরকে পৃথক করা যায় এমন যোগ্যতার প্রমাণ তারা রাখতে পারে নি। তাদের অবস্থা এমনই হয়েছে যে, তাদের কেউ কেউ নিজেদেরই ভাই ও বংশের লোকদের বিপক্ষে ক্রুসেড শাসক ও ফিরিঙ্গি প্রতিপক্ষের থেকেও সাহায্য নেওয়ার নোংড়া ইতিহাস সৃষ্টি করতে দেখা গেছে। বাদশাহ আল-মালিকুল আশরাফ তাতারী সংকট বাদ দিয়ে তাঁর ভাই ও আত্মীয় আল-মালিকুল কামিলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেশি আগ্রহী ও ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এই সময়েই ফিরিঙ্গীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহারতব্য অস্ত্র দামেস্ক থেকে ক্রয় করত। সে সমসয়ের শ্রেষ্ঠ ইমাম শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম ফিরিঙ্গীদের কাছে মুসলমানদের এই অস্ত্র বিক্রিকে হারাম বলে ফাতওয়া দিয়েছিলেন। শায়খ বাদশাকে সতর্ক করে যা বলেছিলেন তাতে ঐ সময়কার অবস্থা ফুটে উঠেছে। শায়খ বলেছিলেন,

সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি-কর্মকর্তারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত। মদের রাজত্ব চলছে, মানুষ পাপাচারে লিপ্ত, নিত্যনতুন করের ভারে মুসলমানরা ন্যুজ দেহ।[২৭২] এ সময় মিশরে রাজত্ব করছিলেন আল-মালিকুল আদিল। মিশরে দুর্নীতি-অনিয়মের ফলে তখন দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ, অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে মানুষ মৃতদেহ ও কুকুরের মাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করেছে।[২৭৩] স্বাভাবিকভাবে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, গৃহযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পড়েছিল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশসমূহে এবং জনসাধারণ এক ভীতিকর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন পার করছিল। ক্রুসেডার ও ফিরিঙ্গীরা বার বার ঐসব মুসলিম শহরসমূহের ওপর হামলা চালাচ্ছিল যা সুলতান সালাউদ্দীন বিরাট ত্যাগ ও সাধনায় অধিকার করেছিলেন। এ অবস্থায় বলতে হয়, তাতারী আক্রমণ ছিল মুসলিম জগতের ওপর আল্লাহর গযব যা তারা তাদের কুকর্মের ফলেই লাভ করেছিল। খাওয়ারিজম শাহের বোকামি হয়তো ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র।

তাতারী আক্রমণ : আক্রান্ত বিশ্ব-মানবতা

তাতারীদের আগ্রাসন শুরু হয়েছিল **১২১৯** খ্রিস্টাব্দে (৬১৬ হি.)। তাতারীদের আক্রমণে খাওয়ারিযম শাহ যখন পরাজিত হলেন তখন তাতারদের মুকাবিলা করার মতো প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর কেউ ছিল না। তাতারীরা পঙ্গপালের ন্যায় মুসলিম প্রাচ্যে আছড়ে পড়ে, তাদের সম্মুখে যাই কিছু পড়েছে তাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এমনই তাতারী ভীতি ঢুকেছিল যে, একজন তাতারী একটি গলিতে ঢুকলে সকলে মিলেও প্রতিরোধের সাহস করতে পারে নি, একজন তাতারীই গলির শত শত মুসলমানকে হত্যা করেছে। এমনকি পুরুষের বেশে মহিলা তাতারী ঘরে ঢুকে ঘরের সমস্ত সদস্যকে হত্যা করেছে। এমনও দেখা গেছে, একজন তাতারী কোনো মুসলমানকে বলেছে, তোর মাথাটা পাথরের উপর রাখ, তলোয়ার নিয়ে এসে তোকে হত্যা করব। তেমনি ঐ মুসলমান ভয়ে নিথর হয়ে পড়ে থেকেছে, পালিয়ে যাওয়ার কথা একবারও

---

[২৭২] প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০০-৩০১।
[২৭৩] প্রাগুক্ত। পৃ. ৩১৬-৩১৭।

তার মনে জাগে নি। তাতারী শহরে গিয়ে তলোয়ার নিয়ে এসেছে, অতঃপর মুসলমানকে জবাই করেছে।[২৭৪]

"God in heaven. The kha khan,
The power of god on earth.
The seal of the emperor of mankind"

The seal of Genghis khan[২৭৫]

৬৫৬ হিজরীতে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খানের নেতৃত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ বাগদাদকে ধ্বংস করা হয়। সেই সময়ের বাগদাদের ধ্বংসকে গোটা বিশ্বের ধ্বংস বললে অত্যুক্তি হবে না। ইবনে কাছীর লেখেন, 'বাগাদাদে চল্লিশ দিন ধরে গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা চলে, ফলে তৎকালীন বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল বাগদাদ শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। গুটি কয় লোকই কেবল অবশিষ্ট ছিল। নগর, রাস্তাঘাট সব ছিল মানুষের মৃতদেহে পরিপূর্ণ। লাশের এক একটি স্তুপ দেখতে ছিল টিলার মতো। বৃষ্টিপাতের ফলে পরিবেশ এক বীভৎস রূপ ধারণ করে। গলিত লাশের গন্ধে গোটা শহরময় আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়ে। চতুর্দিকে দেখা দেয় মহামারী যা সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল। মহামারীর কারণেও আরো বহু মানুষ মারা গিয়েছিল। বাগদাদে তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ধ্বংস- এই তিনের রাজত্ব চলছিল।'[২৭৬] বাগদাদে তাতারীরা যে গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা সাধন করেছিল তাতে কেবল ঐরকম দু'চারজনই বেঁচে গিয়েছিল যারা কোনো রকমে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিল। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ছিল ১৮ লাখ।[২৭৭] এভাবে বুখারা, সমরখন্দ, বলখসহ মধ্য এশিয়ার বহু নগর যা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার গৌরব, বহু পুণ্যবানদের বাসস্থান ও শিক্ষাকেন্দ্র তার সবই তাতারীরা ধ্বংস

---

[২৭৪] ইবনুল আসির। *আল-কামিল*। ১২ খণ্ড। *প্রাগুক্ত*।

[২৭৫] Harold Lamb. *Ibid.*

[২৭৬] ইবনে কাসীর। *প্রাগুক্ত*। ১৩ খণ্ড, পৃ. ২০২-২০৩।

[২৭৭] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ., *প্রাগক্ত*। পৃ. ৩৩০।

করেছিল। বিদ্যা-শিক্ষা ও ধর্মানুরাগের জন্য এত খ্যাত বুখারার মসজিদসমূহের পবিত্র আঙিনাকে মোঙ্গলরা তাদের ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করেছিল এবং কুরআন শরীফ চিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তা দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল।[২৭৮]

তাতারীদের পরাজিত করা যায় এ ছিল অসম্ভব কল্পনা, এমনকি প্রবাদ বাক্যের মতো একথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কেউ যদি বলে, তাতারীরা পরাজিত হয়েছে তাহলে তা বিশ্বাস করো না। তাতারীদের ভয়ে তখন গোটা বিশ্ব কম্পমান হয়ে পড়েছিল। সুইডেনের অধিবাসীরা তাতারীদের ভয়ে ইংল্যান্ডের সমুদ্রোপকূলে মৎস্য শিকার বন্ধ করে দিয়েছিল যা ছিল তাদের চিরাচরিত অভ্যাস।[২৭৯] বাগদাদের পর তাতারীরা সিরিয়ার আলেপ্পোয় প্রবেশ করে এবং এখানেও বাগদাদের ন্যায় একই কর্ম করে। এরপর তারা দামেস্কে প্রবেশ করে, শহরের খ্রিস্টান অধিবাসীরা শহরের বাইরে গিয়ে তাতারীদেরকে নানা রকম উপঢৌকন দ্বারা অভ্যর্থনা জানায়। খ্রিস্টানরা তাতারীদের সমর্থন নিয়ে শহরে বিজয়ী ভাব ধরে প্রবেশ করে, এরা ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ এবং খ্রিস্ট ধর্মের প্রশংসা করতে থাকে। তারা তাদের মাথার উপর ক্রুস কাষ্ঠ ধারণ করে মুসলমানদের শরীরে এমনকি যখন যে মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেই মসজিদের আশেপাশেও মদ ছিটাতে থাকে। মদের পাত্র নিয়ে তারা দামেস্ক মসজিদে প্রবেশ করে। তাদের অভিপ্রায় ছিল যে এই সুযোগে অনেকগুলো মসজিদ ধ্বংস করা যাবে। মুসলমানগণ তাদের কাযী, আলিম-উলামা ও প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তাতারী দুর্গে গিয়ে তাতারী শাসক ও দুর্গাধিপতি ঈল-সিয়ানের নিকট এসবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু মুসলমানদের অভিযোগের প্রতিকার তো দূরের কথা, তাদেরকে অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় আর অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ করা হয়।[২৮০]

---

[২৭৮] টি.ডব্লিউ আর্নল্ড। ২০১২। *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*। ঢাকা:ইফা। পৃ. ২৪১।
[২৭৯] Gibbon. *Ibid.*
[২৮০] ইবনে কাসীর। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২১৯-২২০।

এভাবে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিখ্যাত শহর ও জনপদ ভস্মীভূত করা হল এবং মুসলিম জ্ঞানী-গুণীজনকে হয় হত্যা করা হল নয়তো দাসে পরিণত করা হল। মোগল শাসকগণের অন্য কারো বা কোনো ধর্ম ও ইজমের প্রতি কোনো বিরাগ ছিল না বরং তারা ছিল ঐসবের প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রেমাস্পদ, কিন্তু তাদের চরম ঘৃণা ও শত্রুতা ছিল কেবল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি। চেঙ্গিস খানের নির্দেশ ছিল, যারা শরীয়ত মতো পশু জবাই করবে তাদেরকে হত্যা কর। কুবলাই খান তার শাসনামলে এই নির্দেশ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তা ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সর্বত্র গোয়েন্দা নিযুক্ত করতেন। গুয়ূক খাকান তার শাসনামলে (খ্রি. ১২৪৬-১২৪৮) সাম্রাজ্যের গোটা ব্যবস্থাপনা দু'জন খ্রিস্টান মন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর মুসলমানদেরকে শাস্তির শিকারে পরিণত করা হত। চতুর্থ শাসক আরগূন খানও (খ্রি. ১২৪৮-১২৯১) মুসলমানদের উপর একই রকমভাবে নির্যাতন নিপীড়ন চালান। তিনি তার দরবারে পর্যন্ত মুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ করে দেন।[২৮১]

তাতারীদের শোচনীয় পরাজয়

ইরাক ও সিরিয়ার পর তাতারীদের গতি ছিল মিশরের দিকে। মিশরের শাসক সুলতান আল-মালিকুল মুজাফ্‌ফর সাইফুদ্দীন বুঝতে পেরেছিলেন যে এবার তার পালা, আর তাতারীরা মিশরে প্রবেশ করলে দেশ ও দেশের জনগণকে রক্ষা করা কঠিন হবে। তাই তিনি মিশরের জমিনে অবস্থান করে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার চেয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হামলা পরিচালনা করাকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন; তাকদীরে যদি মৃত্যু লেখা থাকে তাহলে লড়াইয়ের ময়দানে শাহাদাতের শ্রেষ্ঠ মরণই হোক। সহজে বলা হলেও এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া তখন মোটেও সহজ কাজ ছিল না, বরং সমসাময়িক 'বুদ্ধিমান' শাসকদের দৃষ্টিতে ছিল আত্মঘাতী। কিন্তু আল্লাহ যখন কাউকে কবুল করেন তখন তার যোগ্যতা-অযোগ্যতার

---

[২৮১] টি.ডব্লিউ আর্নল্ড। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ২৫০।

দিকে তাকান না, তিনিই সকল ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ মু'মিন বান্দার কাছে প্রত্যাশা করেন, সে যেন আল্লাহর পথে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে আর আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করে।

সুলতান সাইফুদ্দীন তার বাহিনী নিয়ে মিশর থেকে বের হলেন। ৬৫৮ হিজরীর ২৫ রমযান তারিখে আইনে-জালুত নামক স্থানে তাতারী বাহিনীর সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর মোলাকাত হল, এবং অতীতের সব অভিজ্ঞতা ও পূর্বানুমানের বিপরীত মুসলিম বাহিনীর কাছে তাতারী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটল। নদবী রহ. লেখেন, সেদিন আসমান থেকে ফেরেশতারা নেমেছিলেন কি না তা জানা নেই, তবে কেবল অস্ত্রবলে এ যুদ্ধ জয় করা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। যুদ্ধের চিত্র ছিল এই যে, তাতারীরা উর্ধ্বশ্বাসে পালায়, আর মুসলিম সৈন্যরা পিছু ধাওয়া করে কচুকাটা করে, কিংবা বেশুমার বন্দী করে।[২৮২] সুয়ূতী লেখেন, তাতারীরা অপমানকর পরাজয় বরণ করেছিল। আল্লাহর ফযল ও করমে মুসলমানরা তাদের ওপর জয়ী হল, তাতারীরা ব্যাপক হারে নিহত হল। তাতারীদের দিশেহারারূপে পালানো দেখে মুসলমানদের মনোবল ছিল চাঙ্গা। তারা খুব সহজেই তাতারীদেরকে পাকড়াও করে নেয়।[২৮৩] মর্দে মুজাহিদ সুলতান সাইফুদ্দীন এর শুরুটা করে দিয়েছিলেন। তারপর আল-মালিকুয্ যাহির বাইবার্স তাতারীদের উপর্যুপরি কয়েকবারই পরাজিত করেন এবং গোটা সিরিয়া থেকে এদের উৎখাত ও বিতাড়িত করেন। এভাবে "তাতারীদের পরাজয় অসম্ভব"- এই প্রবাদ বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হল। বাগদাদের খলীফা ঘর থেকে বের হতে চান নি, তাই যিল্লতির মউত ছিল তার ভাগ্য, ধ্বংস হয়েছিল গৌরব-ভূমি বাগদাদের। কিন্তু মিশরের সুলতান জিহাদের ডাক দিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন, তাই তাকদীর তাঁকে ও মিশরকে দিয়েছিল ইজ্জতের জিন্দেগী।

---

[২৮২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৬২।

[২৮৩] জালালুদ্দীন সুয়ূতী। ২০১১। *তারীখুল-খুলাফা*। ফজলুল হক শাহ অনু. ঢাকা:মদীনা। পৃ. ১৯১। উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৩৪।

ইসলামের অলৌকিকতা প্রকাশ পেল

সিরিয়া ও মিশরে শোচনীয় পরাজয়ের পরও তাতারীরা ইরাক থেকে শুরু করে ইরান ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর তাদের দখলদারিত্ব কায়েম রেখেছিল। বাগদাদও ছিল তাদের দখলে। মুসলিম জাহানে এমন কোনো শক্তি ছিল না যে, তাতারীদেরকে বাগদাদ থেকে উৎখাত করতে পারে। অসভ্য, মূর্তিপূজক একটি জাতির ইসলামি জগতের সভ্যতার কেন্দ্রভূমি দখল করে রাখা ছিল যথার্থই এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। এই প্রলয়ংকরী সয়লাবে সমগ্র মুসলিম জাহান ভেসে যাবে বলে মনে করেছিলেন যুগের চিন্তাবিদগণ। ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাতারী ধ্বংসযজ্ঞের ঐ যুগে ও প্রভাব বলয়ে অবস্থান করে বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মের মুকাবেলা করে তাতারী কিংবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে মানুষকে, বিশেষত তাতারদেরকে ইসলামের অনুসারীতে পরিণত করা ছিল অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত। কিন্তু সত্যের চরিত্র এমনই হয়- এই কঠিন মুহূর্তে ইসলাম তার অলৌকিক শক্তির তেজের প্রকাশ ঘটাল। আল্লাহ বলেন:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

অর্থাৎ, "বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য।"(হা-মীম সিজদাহ্ : ৫৩)

কতিপয় অখ্যাত কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ মুবাল্লিগের দাওয়াতী প্রচেষ্টায় তাতারী সম্রাট ও জনগণ ইসলামের চিরন্তনতার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তাতারীরা মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হয়েছিল, কিন্তু চিরন্তন ইসলামের কাছে পরাজিত হল। আর্নল্ডের মতে, মোঙ্গলদের মধ্যে প্রথম মুসলমান হন চুগতাই খানের প্রপৌত্র বারাকা খান যিনি ১২৫৭-৬৭ খ্রি. সময়কালে গোল্ডেন হোর্ডের (সীরা দাদরা) প্রধান ছিলেন। ইবনে কাছীর লেখেন, ৬৯৪ হিজরীতে (১২৯৫ খ্রি.) চেঙ্গিয খানের প্রপৌত্র সম্রাট গাজান

খান, আমীর তুযানের হাতে মুসলমান হন, এতে বহু তাতারী জনগোষ্ঠী ঈমান গ্রহণ করে ইসলামের শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নেয়। গাজান খান ইসলামকে পারস্যের রাজধর্মে পরিণত করেন। এরপর কাশগড়ের রাজা তুঘলক তৈমুর খান (১৩৪৭-৬৩) মুসলমান হন। তাঁর মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা পায়। এভাবেই ধীরে ধীরে গোটা তাতারী জাতিগোষ্ঠী, যারা একদিন গোটা মুসলিম জাহানকে নিশ্চিহ্ন করার ঘৃণ্য মিশন বাস্তবায়নে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। এরপর মানুষ তাতারীদের হাতে তসবীহ শোভা পেতে দেখত। তাতারীরা কেবল নামমাত্র মুসলমান হয় নি, তাদের ভিতর অনেক বড় মুজাহিদ, আলীম, ফকিহ, ওলী-আল্লাহও জন্ম লাভ করেছেন যারা ইসলামের মুহাফিজ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, মুসলমান মুবাল্লিগদের দ্বারা অপ্রতিরোধ্য তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের ফলে অন্তত অর্ধ-পৃথিবীর মানুষের জীবন, সম্পদ ও সভ্যতা রক্ষা পেয়েছিল। এখানে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে ওঠে যে তাতারীদেরকে মুকাবেলা করার মতো কোনো শক্তি পৃথিবীতে ছিল না, কোনো ভয়ভীতির কবলে পড়ে তাদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ছিল না। ইসলামের আদর্শ তাদেরকে এই দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

ক্রুসেড ও তাতারী ফিতনা ছিল মুসলিম উম্মাহর জীবনে এমন দু'টি ঘটনা যার মুকাবেলা করা যে কোনো মানবীয় শক্তির পক্ষেই ছিল অসম্ভব। যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে ইতিহাস বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে, ইসলামের উষাকাল থেকেই তার জীবনসত্তা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর এমন সব হামলা যুগের সকল শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়েছে যার ধকল সহ্য করা অন্য কোনো মাযহাবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইসলামের মাক্কী জিন্দেগী থেকে মাদানী জিন্দেগী, খোলাফায়ে রাশেদার আমল, তৎপরবর্তী যুগ থেকে হাল আমল পর্যন্ত কোনো শতাব্দীই এসব ফিতনা ও হামলা থেকে মুক্ত নয়। বিশ্বের অপরাপর ধর্ম, যা এক সময় নিজ নিজ যুগে নেতৃত্ব দিয়েছিল, এর তুলনায় স্বল্পতর আঘাতও সহ্য করতে পারে নি, নিজের অস্তিত্বই আজ খুইয়ে বসেছে। কিন্তু ইসলাম তার সকল

প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করেছে এবং স্বরূপে ঠিকে আছে। এটি আল-কুরআনের ঐ আয়াতেরই বাস্তবায়ন যা প্রায় পনের শত বছর আগেই নাযিল হয়েছিল: "তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (তাওবাহ : ৩২)

বিশ্বে তাতারীদের ধ্বংসলীলার প্রভাব

যদিও মুসলিম সালতানাতগুলোই মূলত তাতারী আক্রমণের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছিল, কিন্তু ঐ ধ্বংসলীলার নেতিবাচক প্রভাবের শিকার শুধু মুসলিম প্রাচ্য ছিল না। গোটা বিশ্বেরই এতে বিরাট ক্ষতি হয়েছিল। ল্যাম্ব লেখেন, চেঙ্গিস খানের যাত্রাপথে যে নগরীই আসত, তা কাগজে মুদ্রিত ভুল অক্ষরের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেওয়া হত। নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যেত। তার প্রস্থানের পর এককালের জনবহুল এলাকাগুলোতে নেকড়ে আর শকুন ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকত না। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার পৌত্র হালাকু খান ও অন্যান্য উত্তরসূরীদের মুকাবেলায় গোটা খ্রিস্ট জগত ছিল দিশেহারা, আর পশ্চিম ইউরোপ তো তখন রক্তপিপাসু তাতারীদের পদতলে পিষ্ট হচ্ছিল। পোল্যান্ডের রাজা ব্লুস্লাস ও হাঙ্গেরীর অধিনায়ক বেলা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন। সাইলোবিয়ার ডিউক হেনরী যুদ্ধরত অবস্থায় লিগনিয এলাকায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[২৮৪]

জার্মান ও পোল্যান্ডের সেনাবাহিনী তাতারীদের আক্রমণ সহ্য করতে পারে নি। তাতারীরা তাদেরকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এভাবে তাতারী আগ্রাসনে রুশ সাম্রাজ্য ও পোল্যান্ড রাজত্বও তছনছ হয়ে গিয়েছিল। তাতারীদের প্রলয়কাণ্ডে অর্ধ পৃথিবীর সভ্যতারই মৃত্যু ঘটেছিল যাকে পুনর্জন্ম লাভ করতে হয়েছিল। নদবী রহ. উল্লেখ করেন, তাতারী বাহিনী ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিকবার আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তুর্কী সুলতানদের প্রবল

[২৮৪] Harold Lamb. *Ibid.* pp. 11-13, 206-210.

প্রতিরোধের মুখে তাতারীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) এবং গিয়াসুদ্দীন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রি.)- এর নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে এই প্রাচীন ভূখণ্ড ও সম্পদ, এর শিক্ষা-সংস্কৃতি তাতারী ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায়।[২৮৫]

তাতারী আক্রমণের সময়কালে বিশেষত মুসলিম প্রাচ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্রভূমি। তাতারি হামলায় বাগদাদে বাইতুল হিকমার ধ্বংস শুধুমাত্র মুসলিম প্রাচ্যেরই অপূরণীয় ক্ষতি ছিল না, ঐ বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল গোটা বিশ্বের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ। বাইতুল হিকমার সমৃদ্ধ পাঠাগার সমসাময়িক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার যে স্রোতধারার জন্ম ও প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল, নিঃসন্দেহে গোটা বিশ্বের জন্য তা ছিল এক আশীর্বাদ। তাতারী ধ্বংসলীলায় এই বিশ্বসম্পদ ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়ে সভ্যতার চাকার গতি যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

উসমানী খিলাফত

তাতারী হামলায় মুসলিম প্রাচ্যের সমরশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ উভয়টিই ধ্বংস হয়েছিল। এই অবস্থায় ধর্মীয় কিংবা জাগতিক জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার চলমান ধারা বজায় রাখা ছিল অসম্ভব, বরং বেঁচে যাওয়া সম্পদকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করাই ছিল চিন্তাবিদদের একমাত্র লক্ষ্য। এবং এ কাজটিও নিঃসন্দেহে তখন খুব সহজ ছিল না। কোনো সন্দেহ নেই, এর পর একটি জাতির পুণরায় উঠে দাঁড়ানোর জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে, তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিম উম্মাহর জীবন ও সম্পদে নিরাপত্তা ফিরে এলেও, দুর্ভাগ্যবশত নেতৃত্ব চলে এসেছিল এই মূর্খ ও অসভ্য জাতির হাতে যারা কোনো ওহিভিত্তিক ধর্ম ও কিতাব এবং এমন বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার অধিকারী ছিল না। মুসলিম জাহানে ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দান এবং

---

[২৮৫] আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০০৪। *মহানবী (সঃ) ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার*। ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ। পৃ. ৩০-৩১।

ইসলামি ইমামতের গুরুদায়িত্ব বহনের নূন্যতম যোগ্যতাও এদের ছিল না। অন্যদিকে মুসলিম শাসকদের মধ্যে যে জাহেলিপনা, ধর্মীয় অজ্ঞতা ও দ্বন্দ্ব-কলহ, যেমনভাবে ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা তো ছিলই। সবদিক দিয়ে নাজুক ঐ পরিস্থিতিতে মুসলিম মিল্লাতে এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক ছিল যা উম্মাহর দেহ-মনে প্রাণ সঞ্চারের মাধ্যমে মুসলিম জাহানকে অধঃপতন থেকে উদ্ধার করতে পারে। হিজরী অষ্টম শতকের (ঈসায়ী চতুর্দশ শতক) এই সঙ্কটকালে ইসলামের ইতিহাস মঞ্চে একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে উসমানীদের আবির্ভাব ঘটল- যারা ইতিহাসের গতিধারার একটি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

ইতিহাস মঞ্চে তুর্কী শক্তি : কনস্টান্টিনোপল বিজয়

উসমানী তুর্কীরা সর্বপ্রথম **১৩৫৩** সালে ইউরোপে প্রবেশ করে। সে সময় আদ্রিয়ানোপল ছিল তাদের ইউরোপীয় রাজধানী। বায়েজিতদের সময় (১৩৮৯-১৪০২) চালকিইক ও কনস্টান্টিনোপলের ঠিক চারপাশের জেলা ব্যতীত এজিয়ান থেকে দানিউব পর্যন্ত সকল রাজ্য যথা বুলগেরিয়া, ম্যাসিডোনিয়া এবং থ্রেস তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। দ্বিতীয় মুরাদের সময় (১৪২১-১৪৫১) এ সীমানা এ্যাড্রিয়াটিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুহাম্মদ ছানী বা দ্বিতীয় মুহাম্মদ (১৪৫১-১৪৮১) অত্যাচারী বাইজান্টাইনদের অপরাজেয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেন। ইতিহাসে তিনি মুহাম্মদ আল-ফাতিহ বা বিজয়ী মুহাম্মদ হিসেবে খ্যাত হন। ভেনিস ও মন্টিনিগ্রোর অধীনে উপকূলীয় অঞ্চল ব্যতীত, কনস্টান্টিনোপল, আলবেনিয়া, বসনিয়া ও সার্বিয়াসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব উপদ্বীপ ছিল খলীফা মুহাম্মদ ছানীর অধীনে। দ্বিতীয় সুলাইমানের সময় হাঙ্গেরী ও এজিয়ান সাগর মুসলিম শাসনাধীনের অন্তর্ভূক্ত হয়। মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সেই প্রথম সমর কুশলী যিনি আপন উদ্ভাবনী প্রতিভাবলে স্থলপথে নৌজাহাজ চালিয়ে উপসাগরে নামানোর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে বহুকাষ্ঠখণ্ড চর্বিত করে তার ওপর দিয়ে সত্তরটি জাহাজ টেনে নিয়ে কাশিমপাশার সাগর জলে নামানো হয়েছিল। এ যেন ছিল পরিখা যুদ্ধের পরিখা কৌশলের যামানা-সংস্করণ। পরিখা যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর মতো

বাইজান্টাইন বাহিনী কাশিম-পাশার সাগর জলে তুর্কী নৌবহর দেখে নিশ্চয় ভীষণ হতবাক হয়েছিল- যার কোনো জবাব ও প্রতিকারের যোগ্যতা তাদের ছিল না।
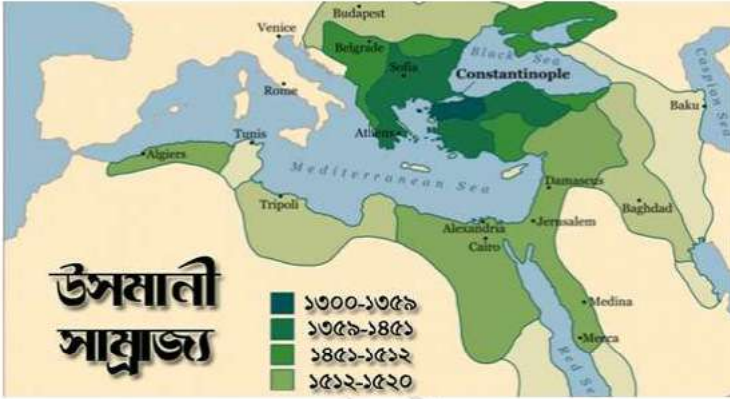
চিত্র : ২ উসমানী সালতানাতের ক্রমোপ্রসারণ [সূত্র: www.worldatlas.com]

ষষ্ঠ শতকের রাজা ও সম্রাটদের মতোই বাইজান্টাইন শাসকরাও ছিল প্রজাদের জন্য সাক্ষাৎ এক অভিশাপ। কিন্তু মুসলিম শাসন ছিল তার থেকে অনেক উত্তম। ফলে জনগণ অতি শীঘ্রই দুই শাসনের তফাত উপলব্ধি করতে পারে। যেমন, তুর্কী সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় প্রদেশসমূহে গ্রিকরা মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে যে সুযোগ-সুবিধা, ধর্মীয় সহনশীলতা ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করেছিল তা খ্রিস্টান শাসনাধীনে মোটেও ছিল না। আর্নল্ড লেখেন, গ্রিকদের উপর ফরাসী ও ভেনিশিয়ানদের শাসন ব্যবস্থা ছিল শোষণ ও উৎপীড়নমূলক। আর বাইজান্টাইন শাসনে গ্রিকরা ছিল সামন্ত দাস যাদের দুঃখ-কষ্টের অন্ত ছিল না। ভাষা, নৃতাত্ত্বিক গোত্রগত ও ধর্মীয় বিশ্বাস ভিন্ন হওয়ায় প্রজারা বাইজান্টাইনীদের ঘৃণা করত।[২৮৬] বস্তুত এসবই ঘৃণার মূল

---

[২৮৬] টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬৬.

কারণ ছিল না যা আর্নল্ড উল্লেখ করেছেন। তা হলে আর্নল্ডেরই কথামতো, বাইজান্টাইন প্রজাদের মুসলিম শাসনকে সাধুবাদ জানানোর কোনো কারণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, জনগণ বাইজান্টাইন অপশাসন থেকে মুক্তির প্রহর গুনছিল যা পাশ্চাত্যের লেখকদের গবেষণায়ই ফুটে উঠেছে। মুসলিম শাসকরা যুগের এই দাবি পূরণ করেছিলেন। যেমন, আর্নল্ড লেখেন, কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর খলিফা মুহাম্মদ আল-ফাতিহ সর্বপ্রথম রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন, নিজেকে গ্রিক চার্চের সংরক্ষক (অনুসারী নন) হিসেবে ঘোষণা করেন। বাইজান্টাইন আমলে খ্রিস্টানদের ওপর যে অমানবিক জুলুম-নির্যাতন অব্যাহত ছিল, মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। তিনি খ্রিস্টান চার্চ, আর্চ-বিশপ ও অধীনস্থদের পূর্বের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা শুধু বহালই রাখেন নি, বরং এতে আরো সমৃদ্ধি ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কী শাসনে অমুসলিম ধর্মাবলম্বীরা, খ্রিস্টান আর্চ-বিশপ ও পাদ্রীরা যার যার ধর্ম পালনে, আর্থ-সামাজিক জীবনাচারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন যা ছিল অভূতপূর্ব।[২৮৭] এসব অঞ্চল উসমানী সালতানাতের অধীনে আসার ফলে জনসাধারণ বাইজানটাইন শাসনের জুলুম-অবিচার, শোষণ থেকে যে মুক্তি পেয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তুর্কী জাতির পতন

তুর্কীদের হাতে এমন সুবর্ণ সুযোগ ছিল এবং তাদের এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল যার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা ইউরোপ ও বিশ্বকে সত্যিকার রেনেসাঁর পথ দেখাতে পারত। একদিকে তারা ছিল উদ্যম, উদ্যোগ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর, তাদের মধ্যে ছিল জিহাদী চেতনা। অন্যদিকে সমরশক্তিতে তারা ছিল তখন বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি। ফলে ইসলামের শান্তির বাণীর প্রচার ও প্রসারে যে কোনো আগ্রাসন ভেঙ্গে দিতে তারা সক্ষম ছিল। তুর্কীদের নৌবহর এত বিশাল ছিল- যা ইউরোপের সম্মিলিত শক্তির কাছেও ছিল না। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে পোপের আহ্বানে ভেনিস, স্পেন, পর্তুগাল

---

[২৮৭] *প্রাগুক্ত।*

ও মাল্টার সম্মিলিত নৌবহর তুর্কী নৌশক্তিকে ধ্বংস করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। কিন্তু তুর্কী নৌশক্তির সম্মুখে ঐ সম্মিলিত প্রয়াস সাগরজলে পর্যুদস্ত হয়েছিল। তুর্কী নৌসেনাদের নিক্ষিপ্ত ভারী গোলার আঘাতে শত্রুপক্ষের অধিকাংশ জাহাজ সাগরে ডুবে গিয়েছিল। খলীফা সুলায়মান আল-কানূনীর শাসনামলে তুর্কী নৌবহরে কেবল জঙ্গি জাহাজই ছিল তিন হাজার। ভৌগোলিক ও কৌশলগত বিচারে তাদের অবস্থান ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে যা বিশ্বকে শাসন করার জন্য ছিল অতি উপযোগী। তাতে বলকান উপসাগর থেকে যুগপৎ এশিয়া ও ইউরোপের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব ছিল। বিশেষত, তুর্কীদের রাজধানী ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) যেখান থেকে একই সঙ্গে তিন মহাদেশ- এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ওপর সহজে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায়। নেপোলিয়ান তাই বলেছিলেন, কনস্টান্টিনোপলই হচ্ছে কল্পিত 'বিশ্ব সাম্রাজ্যের' আদর্শ রাজধানী।

সুতরাং, সমস্ত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা বিশ্বকে এমন একটি সভ্যতা উপহার দিতে পারত যা আজও পথহারা নেতৃত্ব ও দুর্ভাগা মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারত। কিন্তু তুর্কীদের উত্থান ও পতন ছিল ধূমকেতুর মতো। কনস্টান্টিনোপল জয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ইতিহাসের গতিধারা ঠিক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীদের অযোগ্যতা ও উদাসীনতায় ইতিহাসের গতি চলে গিয়েছিল আবার সেই অতীতের ব্যর্থতার দিকে। একটি পতনশীল জাতির যাবতীয় দোষ-ত্রুটি তুর্কীদের মধ্যে দেখা দিল, নেতৃত্বের মাথা ও মগজ থেকে স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে তা আক্রান্ত করল সর্বসাধারণকে। ক্রমোন্নতির সকল ক্ষেত্রে দেখা দিল নির্জীবতা ও স্থবিরতা। পূর্বসূরীদের মতো তারাও ভুলে গেল কুরআনের এই বাণী- "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত অশ্বদল, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর পথে, তা তোমরা

পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।"[২৮৮] তারা ভুলে গেল নবুয়তের সেই চিরন্তন বাণী- "জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই পাবে তা সে কুড়িয়ে নেবে।"[২৮৯] আর যেহেতু তারা বিশ্বের এমন এক স্থানে অবস্থান করত যা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রীতি-নীতি, এমনকি বিপজ্জনক জাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ফলে তাদের অবশ্যই মিশর বিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই উপদেশটি স্মরণ রাখা আবশ্যক ছিল, যা তিনি মিশরে মুসলিম বিজয়ীদেরকে লক্ষ করে বলেছিলেন, "মনে রেখো, কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা বিপদ ও ঝুঁকির মুখে রয়েছ। তোমাদের অবস্থান হচ্ছে নাজুক এক মোর্চায় সতর্ক প্রহরার অবস্থায়। তোমাদের থাকতে হবে সদাসশস্ত্র। কেননা চারপাশে তোমাদের বিপুল শত্রু, আর তাদের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের ও তোমাদের ভূখণ্ডের ওপর।"[২৯০]

তুর্কীরা এসব ভুলে গিয়ে দায়িত্বহীনতার সঙ্গে সময় পার করছিল, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমাজ জ্ঞান-গবেষণার চর্চায় এমনই এগিয়ে যেতে থাকল যা তাদেরকে নতুন বিপ্লবের দিকে নিয়ে গেল। দেখা যায়, খ্রিস্টান গীর্জা পরিচালিত যে স্কুলসমূহ এক সময় ছিল মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবিম্ব, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হল। এভাবে অমুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে শুরু করল। পক্ষান্তরে তুরস্কে মুসলিম উলামা সমাজের অবস্থা হল তার বিপরীত যার প্রভাব পড়ল গোটা শিক্ষা ও জীবন ব্যবস্থায়।[২৯১]

১৭৭৪ সালে এই তুর্কীরাই ইউরোপীয় বাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। এই ঘটনায় উসমানী সালতানাতের টনক কিছুটা নড়লেও ইতোমধ্যে

---

[২৮৮] আনফাল : ৬০।

[২৮৯] তিরমিযী।

[২৯০] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.।২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৭৩।

[২৯১] Halide Edib.1935.*Conflict of East and West in Turkey*. Delhi:Jamia Millia Islamia. p. 42.

অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। তবুও খলীফার আদেশে সামরিক প্রশিক্ষণ ও বাহিনী পুনর্গঠনের কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। সুলতান তৃতীয় সেলিম উনিশ শতকের শুরুর দিকে ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তার অগ্রগতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তুর্কী জাতি ও তার সমাজ ব্যবস্থা অজ্ঞতা ও রক্ষণশীলতার এতটাই নিচে নেমে গিয়েছিল যে তারা যুগের প্রয়োজনীয় এসব উদ্যোগকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হল। বস্তুত সুলতানের দৃষ্টি আর তার জাতির দৃষ্টির মধ্যে ছিল ব্যাপক ব্যবধান ও দূরত্ব। জাতির এই সংস্কার ও আধুনিকায়ন গ্রহণ করার যোগ্যতা ছিল না। ফলে প্রাচীনপন্থি সেনারা বিদ্রোহ করে বসল এবং সুলতান মর্মান্তিকভাবে নিহত হলেন। পরবর্তী সুলতানগণ, যেমন দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৪-১৮৩৯), প্রথম আবদুল মজিদ (১৮৩৯-১৮৫১) তৃতীয় সেলিমের (১৭৬১-১৮০৮) মিশন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং এতে তুরস্ক কিছুটা উন্নতি অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু অপ্রিয় সত্য যে ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করলে ততদিনে এই অগ্রগতি ছিল গল্পের খরগোশ ও কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতার মতো- পার্থক্য এই যে, ক্ষিপ্রগতির খরগোশ এখানে পূর্ণ জাগ্রত, আর ধীরগতির কচ্ছপ এই জাগে এই ঘুমিয়ে পড়ে।[২৯২] এর পরে যদিও ইসলামি খেলাফত ব্যবস্থা আরও কিছুদিন টিকে ছিল, কিন্তু পরিশেষে বিংশ শতকের সূচনালগ্নে তার চির যবনিকাপাত ঘটে।

মুসলিম বিশ্বব্যাপী স্থবিরতা

তুর্কীদের পতনের এই সময়কাল থেকে আমরা যদি সম্মুখে বিংশ শতাব্দীর পানে অগ্রসর হতে থাকি তাহলে দেখতে পাই, এই সময়কালে মুসলিম উম্মাহ দিনে দিনে শুধু বরবাদী ও অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর হয়েছে। পক্ষান্তরে গোটা ইউরোপ অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া ও ভবিষ্যতের নেতৃত্বের উপায়-উপকরণ ও কলাকৌশল নিয়ে গবেষণায় ডুব দিয়েছে। গোটা মুসলিম জাহানে কতিপয় ব্যতিক্রম ও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলেও জাতীয় ও

---

[২৯২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৮৪।

আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করা এবং স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সেসব মোটেও যথেষ্ট ছিল না।

তুর্কী সালতানাতের সময়কালে অন্য দুটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। এগুলো ছিল ভারতবর্ষে তৈমুর বংশীয় যহিরুদ্দিন বাবর (১৪৮৩-১৫৩১) প্রতিষ্ঠিত মোঘল সাম্রাজ্য এবং ইরানের ছাফাভী সাম্রাজ্য। কিন্তু হলে কী হবে? এসব রাজা-বাদশারা তাদের মেধা ও শক্তি এমন সব বস্তু ও বিষয়ে ব্যয় করেছেন যা ছিল অপরিণামদর্শীতার নামান্তর। তাদের শাহী মেযাজ এবং ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-ফুর্তির ফোয়ারাকে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত রোমান বা পারস্য সম্রাটদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মোঘল সম্রাটদের মধ্যে সুবিচার ও দীনদারী মোটেই ছিল না তা নয়, কিন্তু দীনি-ইলাহী ফিতনা ও আনন্দ-বিলাস, তাজ-মমতাজ, এবং মসনদ লাভের অশুভ প্রতিযোগীতা, দ্বন্দ্ব-কলহ বা গৃহযুদ্ধ ছিল বেশুমার যা এসব অঞ্চলে মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ইরানে ছাফাভী সালতানাত ছিল শিয়া মতবাদ ও উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা এবং উসমানী সালতানাতের সঙ্গে সঙ্ঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত। ফলে অন্য বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার তাদের ফুরসতই কোথায় ছিল?

এ দুই সাম্রাজ্য নিজ নিজ সমস্যায় এমনই নাজেহাল ছিল যে ইউরোপের উন্নতি অগ্রগতির দিকে নজর দেওয়া তো দূরের কথা, নিকটবর্তী মুসলিম দেশসমূহের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কেও তারা ছিল বেখবর। আওরঙ্গজেব সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য ও দুর্ভাগ্য যে তিনি কিংবা তাঁর পূর্বসুরী কারোরই ইউরোপ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। ইউরোপে তখন কী বিরাট পরিবর্তন শুরু হয়েছিল এবং নবজাগরণের কার্যকারণগুলো কত দ্রুত শক্তি অর্জন করছিল সে সম্পর্কে মুসলিম শাসকরা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। এসময় ইউরোপে ছিল জাগরণের শোর আর মুসলিম জাহানে ছিল ঘুমের ঘোর, কিংবা ইউরোপ যখন ছিল পথ ও পাথেয়র সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত মুসলিম রাজা-বাদশাগণ তখন ছিলেন তাজ ও

মমতাজ নিয়ে ব্যস্ত।[২৯৩] তাজমহলের দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায় যে মুসলিম শাসকরা কোন ধরনের জাগরণের কাজে মেধা, শ্রম ও অর্থ খরচ করেছেন!

চিত্রঃ ৩ঃ তাজমহলঃ বাদশা শাহজাহানের প্রাণপ্রিয় বিবি সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের সমাধি এটি; বিশ হাজার শ্রমিক বাইশ বছর পরিশ্রম করে সমাধি ও এর আনুসঙ্গিক কাজ সমাপ্ত করে। বধূশোকে কাতর সম্রাট এতে খরচা করেন অন্তত ৩২ মিলিয়ন রূপি (তাজমহল উইকিপিডিয়া)।

কিন্তু ইউরোপ? তারা সে সময় তৈরি করেছে হাজার হাজার কল-কারখানা ও সাগরে ভাসার মতো বড় বড় জাহাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। নদবী রহ. লেখেন, ভাবতে সত্যি অবাক লাগে, এত বিশাল-বিস্তৃত ও জটিল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত সাম্রাজ্যের শাসনভার যাদের হাতে ছিল তারা সমকাল সম্পর্কে এতটা বেখবর কীভাবে থাকতে পারেন? এসব কথা স্মরণ করেই হয়তো কবি ইকবালের চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছে, কবির অশ্রুভেজা কলম বলছেঃ

> শোন, বলি তোমায় কোনো জাতির উত্থান পতনের তাকদীর
> শুরুতে তীর-তলোয়ার, শেষে পায়েল-সেতারের মধুর ঝঙ্কার ॥[২৯৪]

---

[২৯৩] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৮০।
[২৯৪] *প্রাগুক্ত*।

এ সবেরই এক শেষ ফল ছিল বিশাল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বেনিয়াদের রাজত্ব কায়েম হওয়া- যা ছিল গ্রেট ব্রিটেনের সমৃদ্ধি ও উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের বুনিয়াদ। যেমন, Brooks Adams নামে এক ঐতিহাসিক লেখেন, ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ লন্ডনে আসা শুরু হয় এবং এর সুফল খুব দ্রুত দেখা যায়। এত বড় বিপ্লব যার প্রভাব পৃথিবীময় দৃশ্যমান, তার অস্তিত্বই হয়তো সম্ভব হত না যদি না পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয় লাভ করত। বস্তুত ভারতবর্ষের অঢেল সম্পদই ছিল শিল্প বিপ্লবের সহায়ক ও চালিকাশক্তি। ভারতবর্ষ থেকে সম্পদের ঢল যখন লন্ডনে এসে আছড়ে পড়তে শুরু করল এবং বিশাল পুঁজি তৈরি হল তখন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও বিরাট প্রতিযোগিতা শুরু হল। নির্দ্বিধায় বলা যায়, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সম্পদ দ্বারা এত অধিক মুনাফা অর্জিত হয় নি যতটা হয়েছে ভারতবর্ষ থেকে লব্ধ সম্পদ দ্বারা। কেননা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।[২৯৫] Sir William Digby বলেন, মূলত বাংলা ও কর্নাটকের সম্পদভাণ্ডারের মাধ্যমেই ইংল্যান্ডের শিল্পসমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। কারণ, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে যখন ভারতবর্ষের সম্পদের ইংল্যান্ডে প্রবেশ ঘটেনি তখন এখানে শিল্প বলতে কিছুই ছিল না।[২৯৬]

ভারতবর্ষ : স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হল

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের পতন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সত্যেন সেন লেখেন:

১৮৩০ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। ভারতের রাজধানী দিল্লী শহর ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এসে গেল, আসলে এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। বহুদিন আগে থেকেই ভারতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাকে এই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। যাদের দেখার মত চোখ ছিল, তারা দেখতেও পাচ্ছিলেন যে, তার সর্বদেহে ক্ষয়রোগের লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে। এ এক

---

[২৯৫] Brooks Adams. 1889. *The Law of Civilization and Decay*. London. pp. 313-317. উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭৯।

[২৯৬] Sir William Digby. *Prosperous India : A Revolution*. p. 30. উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭৯-২৮০।

বিরাট মহীরুহ, যার ভিতরকার সমস্ত সার পদার্থ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাহলেও সাধারণের দৃষ্টির সামনে এতদিন সে তার প্রভুত্বব্যঞ্জক মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, অবশেষে সেই মহীরুহের পতন ঘটল; চমকিত হয়ে উঠল সবাই। দিল্লীশ্বরেরা জগদীশ্বরেরা শেষকালে এই হল তার পরিণতি। ... মুঘল সাম্রাজ্য, সত্য কথা বলতে গেলে একেবারে বিনা বাধায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের খাস তালুকে পরিণত হয়ে গেল। বহুকাল আগে থেকেই ভারতের অপরিমিত ধন সম্পদের সত্য ও কল্পিত কাহিনী সারা বিশ্বময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। তার মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় জলদস্যু ও বণিকের দল একের পর এক উন্মত্তের মত ছুটে আসছিল এবং তাদের পরস্পরের হানাহানির ফলে সমুদ্রের জল ও স্থলভূমি রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠেছিল– অবশেষে তার চূড়ান্ত অবসান ঘটল। ভাগ্যের নির্দেশে যারা আগে এসেছিল তারা পিছনে পড়ে গেল। আর ভাগ্যলক্ষী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠে তার জয়মালা পড়িয়ে দিল।"[২৯৭]

তারও আগে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাতে ভারতবর্ষের [বাংলার] স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হল। পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলের মতো এসব পরাজয়ের ফয়সালাও আরো অনেক আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। জগৎ শেঠ, রাজবল্লব, উমি চাঁদ, ঘাসেটি বেগম, মীর জাফরের ন্যায় দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে ব্রিটিশদের দীর্ঘ দিনের সাধ, ভূ-স্বর্গ ভারত লুণ্ঠনের অভিলাষ পূর্ণ হল।

ইংরেজরা তরবারি দিয়ে ভারত দখল করেনি। ইংরেজ কর্তৃক ভারত দখল হয়েছিল দেশীয় রাজা-বাদশাগণের অযোগ্যতা-চরিত্রহীনতা ও দেশীয় মীরজাফরীর দ্বারা। পলাশীর প্রান্তরে তিন হাজার দু'ইশত ইংরেজ সৈন্যের কাছে ভারতের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পরাজিত হয়েছিল, দেশীয় হিন্দু-মুসলিম বিশ্বাসঘাতকতায় ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটেছিল।[২৯৮]

---

[২৯৭] সত্যেন সেন। ১৯৮৬। *বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*। ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। পৃ. ৯।

[২৯৮] শ্রী নিখিনাথ রায় ও শ্রী বিনয় ঘোষ, উদ্ধৃতি, গোলাম আহমদ মোর্তাজা। ২০১৫। *ইতিহাসের ইতিহাস*। ঢাকা : মাকতাবাতুত তাকওয়া। পৃ. ২১৮-২১৯।

মীর জাফর তার প্রভু ইংরেজের হাত ধরে বাংলার মসনদে পুতুল রাজা হয়ে বসলেন, কিন্তু তাদের বেনিয়া স্বার্থ রক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়ে মসনদ থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলেন। এরপর ইংরেজরা মীর জাফরেরই জামাতা মীর কাশিমকে মসনদে বসায়। মীর কাশিম অন্তত বুঝতে পেরেছিলেন যে এসবই হচ্ছে প্রহসনের নবাবী যার মাধ্যমে ইংরেজরা গোটা ভারতবর্ষ দখল করতে চায়। ইংরেজদের কাছ থেকে বাংলার কৃষক, ব্যবসায়ী উৎপাদিত ফসল ও পণ্যদ্রব্যের ন্যয্য মূল পেত না। অন্যদিকে ইংরেজরা বহুদিন থেকে বাণিজ্য কর দিয়ে আসছিল, এটি দেওয়াও এখন বন্ধ করে দেয়। তখন মীর কাশিম হিন্দু-মুসলিম সকল দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে তাদেরকেও আজ থেকে কোনো কর দিতে হবে না। কারণ দেশবাসী কর দেবে আর শোষক ইংরেজ কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে শিকড় গাড়বে (অবশ্য শিকড় ততদিনে গাড়তে বাকি ছিল না।) তা হয় না।

আমরা যদি ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষের (প্রথম অধ্যায়) দিকে লক্ষ্য করি তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ছিল একটি বিরাট আশীর্বাদ। একত্ববাদ, রিসালাত ও আখিরাতের ওহিভিত্তিক শিক্ষা ভুলে যে ভূ-স্বর্গ ভারতবর্ষ বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় অন্ধকার গহ্বরে মৃত্যুর প্রহর গুনছিল, মুসলমানদের আগমণের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সেই দরজা খুলেছিল। এসব সঙ্গত কারণে মুসলমানরা নেতৃত্ব দিয়ে ভারবর্ষকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে অন্তত প্রথম যুগের মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষামালা পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন, ফলে নেতৃত্বের অধিক হকদার তারাই ছিলেন এবং এটি ছিল অপরাপর ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর জন্য উপকৃত হওয়ার বিরাট সুযোগ।

মুসলিম শাসকদের প্রধানত ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতনই ভারবর্ষে ইংরেজ শাসন ও শোষণকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু অধঃপতনের সেই যুগেও ক্ষণজন্মা কিছু ব্যক্তিত্ব ছিলেন যারা বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ বেনিয়া শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশরা নানা ছলাকলায় মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, ফলে মুসলমানরা এদের ওপর কখনই

সন্তুষ্ট থাকার কথা ছিল না- আর এটিই ছিল স্বাভাবিক। অবশ্য গণহারে মুসলমানদের ঐ অসন্তুষ্টি যে কেবল মসনদ পুনরুদ্ধার কেন্দ্রিক ছিল তা মোটেও নয়, মূখ্যত এই অসন্তুষ্টি ও ব্যথা ছিল ভারতবর্ষে ভ্রান্ত খ্রিস্টবাদের প্রবেশ ও বিস্তারের কারণে। ভারতবর্ষ থেকে 'ইংরেজ খেদাও' আন্দোলনের শুভ সূচনা সঙ্গত কারণে মুসলমানদের থেকেই শুরু হল। অন্যদিকে, বেনিয়া ইংরেজ জাতির সম্পদ লুণ্ঠনের মতলব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমঝদার মানুষের নিকট গোপন ছিল না।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ তুললেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.।[২৯৯] তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে একটি জাতির জীবন-মরণ কখনই ভ্রান্তবাদের নিগড়ে মুক্তি লাভ করতে পারে না আর ইসলাম ছাড়া আর কোনো তন্ত্র-মন্ত্র বা ইজমের এই যোগ্যতাই নেই। একমাত্র ইসলামই জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতার ইহ-পরকালের কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। আর, ধর্মীয় বিধান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা- এই দুই ভিত্তির ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর এই যথার্থ সূত্রে তাঁর পুত্র ও উত্তরসূরীগণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। সত্যেন সেন লেখেন, "...শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র পুত্র ও পরবর্তী ধর্মগুরু আবদুল আজিজ তাঁর পিতার এই সূত্রটিকে কার্যকরীরূপে সম্প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় মুসলমানরা এই পরাধীন অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এই পরিবেশের মধ্যে কোনো প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে যথাযথভাবে ধর্মাচরণ করে চলা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে, ভারত হচ্ছে 'দার-উল-হরব' অর্থাৎ 'যুদ্ধরত দেশ।' তিনি এদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক ফতোয়া জারি করলেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদে শরীক হওয়া তাদের সকলের ধর্মীয় কর্তব্য...। [৩০০] সত্যেন সেন লেখেন, এই ফতোয়াকে অনুসরণ করেই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রথমে শুরু হয়েছিল, যে ইতিহাসকে আমরা

---

[২৯৯] সত্যেন সেন। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১০।
[৩০০] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ১১।

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।... এই ইতিহাসকে অবহেলা করে বিস্মৃতির তলে চাপা দেওয়া এক জাতীয় অপরাধ।[৩০১]

শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী রহ., মঙ্গল পাণ্ডে, শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ., সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ., মৌলভী মুহাম্মদ কাশিম পানিপথী রহ., আল্লামা কাসিম নানুতবী রহ., শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ., সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এবং আরো অসংখ্য ভারতীয় বীর সন্তানই ছিলেন জন্মভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক, যারা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর রহ. পথ ধরে বেনিয়া ইংরেজকে ভারত থেকে বহিষ্কার করে মাতৃভূমি স্বাধীন করার জীবনপণ লড়াইয়ের শুভ সূচনা করেছিলেন।[৩০২] কিন্তু এই সত্য ইতিহাস আজও বিকৃতরূপে আমাদের মগজ দখল করে আছে।

বাংলার বুলবুল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম একদিন লিখেছিলেন:

> কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
> বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।
> ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
> উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার ॥[৩০৩]

কবির আশা পুরণ হল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অস্তমিত রবি আবার উদিত হল, দু'শ বছর পরে। অনেক দামে কেনা স্বাধীনতা। কিন্তু ভারত স্বাধীন হলেও, সত্যের মশাল নিয়ে যারা আগে এসেছিলেন, যাদের নেতৃত্ব অপরিহার্য ছিল তারা পিছনে পড়ে গেলেন।

ইসলাম বিজয়ী থাকল : দারুল উলুম দেওবন্দ

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের ঐসব স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হল। ১৮৩৩ সালের বালাকুটের সংগ্রাম, ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলন, এবং অসংখ্য

---

[৩০১] *প্রাগুক্ত*।
[৩০২] সত্যেন সেন। *প্রাগুক্ত*।
[৩০৩] কাজী নজরুল ইসলাম। *সঞ্চিতা*। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

ওলামা এতে শহীদ হলেন। কিন্তু ইসলাম তাঁর চিরন্তনতার কারণে এখানেও পরাজিত হল না। যারা ভারতভূমির স্বাধীনতার জন্য সম্মুখসমরে হেরে গিয়েছিলেন তাঁরাই দূরদর্শীরূপে এমন একটি হেকমতপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন যার বিকল্প ও উত্তম সেদিন অন্য কিছু ছিল না। এটি আজকের বিশ্বখ্যাত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম দেওবন্দ। এই মহতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এমন এমন সোনার মানু তৈরি হয়েছেন যারা আলমে ইসলামের ময়দানে বিভিন্নমুখী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর গতিপথের জঞ্জাল সাফ করে তাকে শুধু নির্বিঘ্নই করেন নি, বরং সময়ে সময়ে আলমে ইসলাম কিংবা সত্যের বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা সংকট ও ফেতনাকে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান এমন এমন মানুষের জন্ম দিয়েছে যাদেরকে দেখলে বা জানলে সোনালী যুগের সেই আলোর কাফেলাসমগ্র অর্থাৎ, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম জামাতের কথা হৃদয়ে ভেসে ওঠে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের বিপ্লবী বীর শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ. ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র সাইয়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ., ফকিউন্-নফস যুগের আবু হানিফা খ্যাত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., ইমামুল আসর খ্যাত অবিস্মরণীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতি-এ-আযম মুহাম্মদ শফি রহ., খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ., উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রহ. মাওলানা ইলিয়াস রহ., মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ.- এরকম অসংখ্য ব্যক্তিত্বের নূরানী কাফেলা এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কীর্তি। যুগ-সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে, জ্ঞান-গবেষণা ও লিখনির জগতে, শিক্ষাদানে, তাবলিগী ময়দানে- দীনের নানামুখী প্রয়োজনে বিশ্বব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।[৩০৪]

---

[৩০৪] এ বিষয়ে পড়ুন: মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া ও মুহাম্মদ তাকী উসমানী। ২০০৮। *নূরানী কাফেলা*। মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান অনু. ঢাকা:মাকতাবাতুল আশরাফ।

মুফতি মুহাম্মদ তাকী ওসমানী হাফিযাহুল্লাহ তাঁর সফরনামায় লেখেন, তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়ে সেখানেও দারুল উলূম দেওবন্দের আলীমকে দীনের কাজে নিয়োজিত পেয়েছেন। শায়খ জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ তাঁর সফরনামায় লেখেন যে, দীনি কাজে তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা. আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের যে দেশেই গিয়েছেন সেখানেই দারুল উলূম দেওবন্দের দীনি খেদমতের ব্যাপক উপস্থিতি দেখেছেন। তিনি সাইবেরিয়ায় সফরে গিয়ে সেখানে দারুল উলূম দেওবন্দের আলীমকে দীনের কাজে নিয়োজিত পেয়েছেন, যেখানে তিনি লেখা দেখতে পেয়েছেন- *End of the World* (পৃথিবীর শেষ প্রান্ত)। এসব এই প্রতিষ্ঠানের মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণ। আজ নিতান্ত নির্লিপ্ত নয়নে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুরতের সঙ্গে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নমুনা বা আদর্শ অন্বেষণ করা হলে, সেটি এই প্রতিষ্ঠান ও এর আদর্শে বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেই অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়। এর থেকে বড় সাফল্য বা কীর্তি কী হতে পারে?

চিত্র: ৪: দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

মুসলিম জাহানের শাসক ও তাদের জনসাধারণের মধ্যে যে সব রোগ-অসুখ দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠেছিল, যার একটি চিত্র আমরা এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, আর অপরপক্ষে ষোল-সতের শতক থেকেই ইউরোপ যেভাবে তাদের গতিপথ চিহ্নিত করা ও বুদ্ধিচর্চা শুরু করেছিল তাতে তখনই মূলত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভবিষ্যত পরিণতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে যা ঘটেছে ইতিহাসের গতিধারায় তা ঘটা অনিবার্য ছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের মধ্যে দিয়ে গোটা বিশ্বমানবতার কী লাভ-ক্ষতি হল? কিংবা যে বস্তুবাদী ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মেষ ঘটল তাতে বিশ্বমানবতার কী ও কতটুকু লাভ হল? কেননা মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের অর্থ- ইসলামের পতন নয় মোটেও। তাহলে?

এবার নিশ্চয় এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার সময় হয়েছে ?

৫

পাশ্চাত্য সভ্যতার চরিত্র ও পরিণতি

তুর্কী সালতানাতের পতনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বনেতৃত্ব আচমকা ইউরোপের হাতে চলে যায়নি। খোলাফায়ে রাশেদার পর যেদিন থেকে মুসলিম উম্মাহর মতিভ্রম ও ভ্রষ্টতার যাত্রা শুরু হয়েছিল, বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব ও মর্যাদার অধঃপতনের বীজ সেদিনই রূপিত হয়ে গিয়েছিল। তুর্কী সালতানাত, ভারতে মোঘল সালতানাতের পতনের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতন তার দীর্ঘ সফরের যবনিকা টেনেছিল বলা যায়। অবশ্য এরই মধ্যে মাঝে মাঝে মুসলিম জাহানে অনেক তারকার উদ্ভব হয়েছে, যাদের উল্লেখ ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। যোগ্যতা বিচারে তাঁরা সকলেই ছিলেন আপন আপন কর্ম ও কীর্তিতে সমুজ্জ্বল। কিন্তু পূর্বসূরীদের ঈমানী চেতনা, যোগ্যতা ও কর্মের সঙ্গে পরবর্তী শাসক ও জনতার তুলনা করলে দেখা যায়, অধঃপতনের ধারাবাহিক গতি দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েছে। ঐসব কতিপয় উজ্জ্বল তারকার পক্ষে এই অনিবার্য শূন্যতা শতভাগ পূরণ করা ছিল খুব কঠিন, অন্যদিকে শূন্যতার দীর্ঘসূত্রীতার বিপরীতে নিশ্চয় অন্য কোনো জাতির উদ্ভব ততদিনে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে, যারা এর প্রস্তুতিও গ্রহণ করে চলেছিল। কেননা, ময়দান তো খালি পড়ে ছিল যা পূরণ হওয়ার দাবী রাখে। অর্থাৎ, ময়দান কখনও শূন্য থাকেনা।

ইউরোপই হল সেই জাতি যারা এই শূন্য ময়দানে উঠে এসছিল, যারা আজ তাদের নেতৃত্ব ও উদ্ভাবন দিয়ে বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু এতে বিশ্বমানবতার প্রকৃত কল্যাণ কতটুকু হল? এতে এই বসুন্ধরা কী আবালবৃদ্ধবণিতার জন্য একটি আদর্শ শান্তির আলয়ে পরিণত হয়েছে, মহানবীর শিক্ষামালার মাধ্যমে ইসলামি খেলাফত মানবতাকে যা উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল? ইসলামি সোনালী সভ্যতার (খোলাফায়ে রাশেদার যুগ, তাবেঈ যুগ ও তাবে-তাবেঈ যুগ) সঙ্গে ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার

তুলনা করলে দেখা যায়, ইউরোপীয় সভ্যতা সেই মানুষই তৈরি করতে পারে নি যা ইসলামি সোনালী সভ্যতার যুগে তৈরি হয়েছিল। কাজেই বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের বিপরীতে ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব ও ভূমিকার মূল্যায়নের প্রয়োজন আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মনন ও প্রবণতা এবং বিশ্বে তার প্রভাব ও পরিণতি বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য, যাতে আধুনিক মানবসমাজ এই দুই সভ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নিজের জন্য লাভ-ক্ষতির, গ্রহণ-বর্জনের একটি চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হতে পারে।

ইউরোপীয় সভ্যতার স্বভাব-প্রকৃতি

ইউরোপীয় সভ্যতা যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাতেখড়ি মুসলিম বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে নিয়েছিল, যা সে স্বীকারও করে, তবে তার মনস্তাত্ত্বিক সত্তা গঠিত হয়েছে গ্রিক ও রোমান দর্শন দ্বারা। ইউরোপীয় সভ্যতা তার অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের পরবর্তী কথিত জাগরণযুগে সৃষ্ট অল্পবয়স্ক সভ্যতা নয়, এর শিকড় আরো অতীতে প্রোথিত। এটি গ্রিক ও রোমান উভয় সভ্যতার সন্তান। গ্রিক সভ্যতাই হল ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-প্রবণতার প্রথম সর্বোত্তম প্রকাশক্ষেত্র যা ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে।[৩০৫] ইউরোপে এটিই প্রথম সভ্যতা যা ইউরোপীয় দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে গ্রিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ওপর রোমান সভ্যতার সৌধ গড়ে ওঠেছে, কিন্তু তারও প্রাণ-প্রেরণা ছিল অভিন্ন। উনিশ শতকে জাঁকজমকপূর্ণ যে ইউরোপীয় সভ্যতা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, মূলে প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতাই এর সবকিছুর উৎস।[৩০৬] সুতরাং, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার চরিত্র সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমাদের উচিত হবে গ্রিক-রোমান সভ্যতার চরিত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা। কেননা, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজদর্শনের

---

[৩০৫] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৮৮।
[৩০৬] *প্রাগুক্ত*।

উপাদান যেমন, সুনির্দিষ্টরূপে বললে, পাশ্চাত্যবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শন, অর্থনৈতিক দর্শন প্রভৃতির ওপর ধারণা পেতে হলে আমাদেরকে কিছুটা পিছনে এবং অবশ্যই বেশ গভীরে মনোনিবেশ করতে হবে।

গ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

গ্রিক সভ্যতার মূল স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তথা প্রাণ-প্রেরণা তার সমাজদর্শনে স্পষ্ট হয়ে আছে। গ্রিক সমাজদর্শনের মানদন্ড বা আদর্শ হল:

(১) **ইন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবাদ:** গ্রিক সমাজে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মানদণ্ড ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রসূত, অর্থাৎ, যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাতে বিশ্বাস এবং যা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত তাতে অবিশ্বাস ও সংশয়। এসব তারা যুক্তির নীরিখে গ্রহণ-বর্জন করত।

(২) **ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় নিরাসক্তি** এবং পার্থিব জীবন ও ভোগবিলাসে অতিআসক্তি যা প্রথমটির অনিবার্য ফল;

(৩) **উগ্র জাতীয়তাবাদ**।

গ্রিক চিন্তাধারায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা এবং ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহই মূখ্য ছিল। ফলে শরীরচর্চা, শারীরিক খেলাধূলা, নৃত্যকলা ইত্যাদির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। দেখা যায়, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা যেমন, গান, কবিতা, সাহিত্য, এমনকি দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চাও একটি নির্ধারিত সীমা থেকে অধিক অগ্রসর হতে পারে নি। কেননা, তাদের এদিকে এই দৃষ্টি ছিল যে, বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা ও উৎকর্ষ দ্বারা শারীরিক উন্নতি যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। গ্রিকদের ধর্ম ব্যবস্থায় আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার কোনো স্থান ছিল না। তাদের ধর্মাচারে বস্তুত কোনো ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান ও ধর্মীয় শ্রেণির উপস্থিতি ছিল না যেহেতু এসব যুক্তি বা প্রমাণসিদ্ধ বিষয় নয়, আধ্যাত্মিকতার ছাপ যা-ই ছিল, তা ছিল মূলত প্রাচ্য থেকে ধার করা। একে গ্রিক সভ্যতার অঙ্গ মনে করা ঠিক নয়।[৩০৭] গ্রিক সভ্যতার এসব মৌলিক উপাদানকে এক কথায় 'বস্তুবাদ' নামে আখ্যায়িত

---

[৩০৭] *Ibid.* p. 290.

করা যায় এবং এটিই হল গ্রিক সভ্যতার মূল পরিচয় যা ইন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবাদের অনিবার্য ফল। গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সর্বত্র বস্তুবাদিতার ছাপ ও প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। দেব-দেবীর আকৃতি ছাড়া তারা কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারত না। খাদ্য, দয়া ও করুণা, ক্রোধ ও শাস্তি প্রভৃতির জন্য ছিল একেক দেবতা। গ্রিক সমাজে পশুও দেবতা জ্ঞানে পূঁজিত হত। যেমন, ছাগল ছিল দেবতার প্রতিক, কারণ অতি দারিদ্র্যের কারণে অনেকের ষাঁড় রাখার ক্ষমতা ছিল না।[৩০৮] এমনকি সৌন্দর্য ও প্রেমের মতো বস্তুনিরপেক্ষ ভাব ও মর্মকেও তারা স্থুল আকার দান করেছে। তাই গ্রিকদের ছিল সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী।

Lecky তাঁর বিখ্যাত *History of European Morals* গ্রন্থে লেখেন, গ্রিক চেতনা ছিল নিছক বুদ্ধি ও মস্তিষ্কনির্ভর, পক্ষান্তরে মিশরীয় চেতনা ছিল সম্পূর্ণ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। তাই রোমান লেখক এ্যাপিউলিয়াস বলেন, মিশরীয় দেবতারা সন্তুষ্ট হন কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটিতে, পক্ষান্তরে গ্রিক দেবতারা খুশী হন নাচ-গান ও নৃত্যগীতে। ..... গ্রিক সমাজের মতো অন্য কোনো জাতির ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে আনন্দ-উৎসব ও ক্রীড়া-কৌতুকের এতটা বাড়াবাড়ি এবং ঈশ্বরভীতির এতটা ঘাটতি চোখে পড়ে না। গ্রিক সমাজে ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভক্তি ততটুকুই ছিল যতটা থাকে সমাজে বড় ও বয়োবৃদ্ধদের প্রতি। প্রচলিত কিছু আচার-অনুষ্ঠানিকতাকেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদনের পক্ষে যথেষ্ট মনে করা হত। সুতরাং ইন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবাদের কারণে গ্রিকদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মদর্শনই এমন যে, তারপর অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভয়ভীতি, ভক্তি ও আনুগত্য জাগ্রত হওয়ার কোনো অবকাশই থাকে না।[৩০৯]

---

[৩০৮] Bertrand Russell. 1946. *History of Western Philosophy*. New York : George Allen & Unwin Ltd. p. 34.
[৩০৯] W. E. H. Lecky. 1913. *History of European Morals*. New York : Longmans, Green and Co. Vol. pp. 344-345.

এর ফলে গ্রিক সমাজে প্রতিমাবাদের অত্যাচারে 'গ্রিক ঈশ্বর' যাবতীয় গুণ ও শক্তি থেকে বিচ্যুত হলেন, বিশ্বজগত ও সমাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় সত্তায় পরিণত হলেন; কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তার নেই। এমন বিশ্বাস ও জীবন যে ঈশ্বরহীনরূপে যাপিত হবে তা বলাই বাহুল্য। এটি নাস্তিকতা থেকে মোটেও ভিন্ন নয়, শুধু এইটুকু ঐতিহাসিক তথ্যবিবরণী ছাড়া যে- ঈশ্বর 'প্রথম বুদ্ধি' সৃষ্টি করেছেন তারপর বিশ্বজগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেছেন। এভাবে গ্রিক সমাজ যেহেতু ছিল প্রতিমাপূঁজার জঞ্জালে আবদ্ধ, জীবনদর্শন ছিল বস্তুবাদ ও ভোগবাদী নিগড়ে বন্ধি, পার্থিব জীবনই ছিল সবকিছু এবং সর্বোপরি সাহিত্যিক, দার্শনিকগণ ছিলেন বাধাবন্ধনহীন ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ফলে গ্রিক সমাজজীবন ও চরিত্রে এর প্রভাব ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। গ্রিক সমাজে নীত-নৈতিকতায় সীমাহীন নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল। সেখানে সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটলের মতো বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ মোটেও ছিল না। সমাজ ও জীবন ছিল ক্ষুধার্ত হায়েনার খাদ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো এক অসহায় শিকার। এজন্যই গ্রিক নীতিবাদী দার্শনিকদেরকে নীতি-নৈতিকতা তথা ন্যায় নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে দেখা যায়। গ্রিক নীতিবাদী দর্শনের প্রধান পুরোহিত সক্রেটিসের সমস্ত দর্শনই ছিল এই ন্যায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

গ্রিক দর্শনের অন্যতম তিন পুরোহিত সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল নীতিবিদ্যা ও রাষ্ট্রদর্শনে অনেক চিত্তাকর্ষক বক্তব্য প্রদান করেছেন। তাদের নিষ্ঠা ও অবদান মোটেও অস্বীকার্য নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে তাদের দর্শনও কোনো দিন চিরন্তন সত্যের সন্ধান দিতে পারে নি। কারণ, চিরন্তন সত্যের কোনো মানদণ্ড তাদের হাতে ছিল না, আপন স্রষ্টার একটি স্পষ্ট ধারণাই তাঁরা কোনো দিন লাভ করতে পারেন নি। আদালতে জবানবন্দীতে এবং বিশেষত কারাগারে সংলাপে[৩১০] সক্রেটিস যে নীতি-

[৩১০] সরদার ফজলুল করিম অনু.। ২০০২। *প্লেটোর ডায়ালগ*। ঢাকা:প্যাপিরাস।

দর্শনের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজও প্রাণে অনাবিল দোলা দিয়ে যায়। কিন্তু নির্মম সত্য হল সেই সক্রেটিসও তাঁর জাতিকে ধর্ম বিচারে চিরন্তন মুক্তির পথ দেখাতে পারেন নি। গ্রিক পরমাণুবাদী থেকে নিয়ে নীতিবাদী কোনো দার্শনিকই এক্ষেত্রে কোনো সাফল্য দেখাতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যা যুগে যুগে নবী রাসূলগণ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়বাদী ও যুক্তিবাদী দর্শন ও ধ্যান-ধারণাই ছিল এক্ষেত্রে ব্যর্থতার মূল কারণ। অথচ ধর্মের ভিত্তিই হল ঈমান বিল গায়েব, অহী ও রিসালাত, আখিরাত ও পরকাল ইত্যাদির উপর। এসব কোনোটিই ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা অনুভবযোগ্য নয়, যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণযোগ্যও নয়। ইন্দ্রিয় ও যুক্তি ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়; তাই ইন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবাদই যদি গ্রহণ-বর্জনের একমাত্র মাপকাঠি হয় তাহলে এর দ্বারা এমন কোনো চিরন্তন জীবনদর্শন স্থির করা সম্ভব নয় যা সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত হবে।

পাশ্চাত্য মানসিকতার আরেকটি বড় উপসর্গ হল উগ্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে যার রয়েছে নিবিড় যোগসূত্র। ইউরোপের ভৌগোলিক অবস্থান এশিয়ার মতো এত বিস্তৃত নয়। এশিয়ার মতো বৈচিত্রপূর্ণ আবহাওয়া, ভূমি-উর্বরতা, জীবনোপকরণের প্রাচুর্য তার নেই। ফলে প্রকৃতিগতভাবেই, এশিয়ার দেশসমূহ ইউরোপের তুলনায় অনেক বিস্তৃত। ইউরোপের আয়তন অত্যন্ত অল্প, অন্যদিকে আবাদি ভূমি ও জনবসতি ঘন, অথচ জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ অনেক সীমিত। পর্বত শ্রেণি, সমুদ্র ও নদনদীর সীমারেখা ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীকে একটি স্থায়ী প্রাকৃতিক বেষ্টনীতে ঘিরে রেখেছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, ইউরোপের পশ্চিম-মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মোটেও উপযোগী নয়। ফলে ভৌগোলিক কারণেই ইউরোপে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছে এবং প্রাচীনকাল থেকেই সেখানকার রাজনৈতিক ধারণা নগররাষ্ট্রকে অতিক্রম করতে পারে নি। নগররাষ্ট্রীয় এই রাজনৈতিক ধারণার আদর্শ উদাহরণ হল গ্রিস, যেখানে শুরু থেকেই 'বহুদেশ' ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। শুধু জাতীয়তাবাদ নয়, যাবতীয় গ্রিক দর্শন গড়ে উঠেছিল নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে।

গ্রিসের নগররাষ্ট্রসমূহ যেমন, এথেন্স, স্পার্টা, থেবেস, স্টেগিরা, কোরিন্থ, মিলেটাস আয়তনে ছিল খুবই ক্ষুদ্র ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও অহংবোধ তৈরি করে। তারা নিজেদেরকে সুসভ্য আর অন্যদেরকে অসভ্য মনে করত। লেকী উল্লেখ করেন, গ্রিসে জাতীয়তাবাদই ছিল মূল চিন্তাধারা, সক্রেটিসসহ কিছু দার্শনিকগণ মাঝে মধ্যে যে আন্তর্জাতিকতার ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন তা কখনও গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। এমনকি এ্যারিস্টটলীয় নীতি ব্যবস্থাও গ্রিক-অগ্রিক বিভেদ রেখার ওপরই গড়ে উঠেছিল যেখানে স্বদেশপ্রেমের মর্যাদা ছিল ঐসব নৈতিক গুণাবলির উপরে, যা গ্রিক দার্শনিকগণ সম্মিলিতভাবে নির্ধারন করেছিলেন। অধিকন্তু এ্যারিস্টটল কেবল স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশানুগত্যেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর চিন্তার সঙ্কীর্ণতা এতদূর ছিল যে, তিনি বলতে পেরেছেন, 'গ্রিকদের উচিত অগ্রিকদের সঙ্গে জীবজন্তুর মতো আচরণ করা।'[৩১১] ওহির অনুসরণ না করা, প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর অপরিপক্ক বোধ প্রভৃতি কারণে এসব ইউরোপীয় অঞ্চলে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ লাভ করে, যা মানুষকে শতধাবিভক্ত জাতিতে পরিণত করে পারস্পরিক বিদ্বেষ-হিংসার বিষবাষ্পে ঠেলে দেয়।

রোমান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

সাম্রাজ্যবাদ স্বভাবী রোমানরা প্রতিপত্তি, সমরকুশলতা ও সাম্রাজ্য বিস্তারে গ্রিকদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল; সমসাময়িক জাতিবর্গ এমনকি পরবর্তী যুগেও রোমান জাতির যে পৃথক বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্ছে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বভাব।[৩১২] Drapar রোমানদের সাম্রাজ্যবাদী স্বভাবাসক্তি সম্পর্কে লেখেন, সাম্রাজ্য বিজেতাগণ একটি জিনিসই কেবল বুঝেন, তা হল বল প্রয়োগ; এর মাধ্যমে সবকিছুই নিরাপদ রাখা যায়, সবকিছু অর্জন করা যায়। [৩১৩]

---

[৩১১] Bertrand Russell. *Ibid.* p. 243.

[৩১২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত* / পৃ. ২৯৭।

[৩১৩] John William Drapar. *Ibid.* p.36.

কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন, শিল্প-সাহিত্যে রোমানরা গ্রিকদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে নি। শুধু রোমান কেন, গ্রিকরা তখন যে কোনো জাতির চেয়ে প্রাগ্রসর ছিল। রোমানরা তখন সামরিকতার স্তরেই পড়ে ছিল। ফলে রোমানরা রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয় ও আধিপত্য অর্জন করলেও, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য ও পশ্চাৎপদতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই গ্রিক সভ্যতার কাছে নতি স্বীকার করেতে হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে গ্রিক প্রতিভার যাদুপ্রভাব রোমানদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে গ্রিকদের সামনে তারা ছিল অবনত ও তাদেরই উচ্ছিষ্টভোজী। গ্রিক জ্ঞান, দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিরই তারা খোসা চর্বন করেছে দীর্ঘকাল। Judd Harmon লেখেন, If Rome dominated the Greeks military, she was herself strongly influenced by Greek philosophy।[৩১৪] অর্থাৎ, রোম যদিও সামরিক দিক দিয়ে গ্রিসকে অতিক্রম করে থাকে কিন্তু চিন্তাচেতনায় সে গ্রিক দর্শনেরই একনিষ্ঠ ছাত্র।

গ্রিক ভাষাই ছিল রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিকদের লেখার ভাষা। রোমান কবিগণ ল্যাটিন ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত গ্রিকই ছিল তাদের জ্ঞান-গবেষণা ও গ্রন্থনার ভাষা।[৩১৫] রোমান দার্শনিক সেনেকা (৩-৬৫ খ্রি.পূ.), সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রি.পূ.), এপিকটেটাস (৫০-১৩০ খ্রি.), মার্কাস অরেলিয়াস (১২১-১৮০ খ্রি.) এরা কমবেশি সকলেই ছিলেন গ্রিক মানসপুত্র। রোমকদের এই অনুকরণ ও আনুগত্য শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ভাষা-সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আবেগ-অনুভূতি, রীতি-নীতি, আদর্শ ও বিশ্বাস- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্রিক সভ্যতা রোমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। রোমানরা গ্রিকদের অনুকরণ-আনুগত্যকেই আভিজাত্য ও চৌকশতার পরিচায়ক মনে করত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, ইন্দ্রিয় নির্ভর বিশ্বাস ও বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা, অতিজীবনবাদিতা বা

---

[৩১৪] Judd Harmon.1961. *Political Thought from Plato to the Present.* Mc Graw Hill, N.Y. p. 80.
[৩১৫] W. E. H. Lecky. *Ibid.*

ভোগবাদ, ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় ও নিরাসক্তি, উগ্র জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে গ্রিক-রোমক জাতি ছিল এক কাতারের বাসিন্দা। আজকের ইউরোপ গ্রিক-রোমানদের কাছ থেকে এসবই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে।

সিসেরো লেখেন, 'নাট্যমঞ্চে অভিনেতারা যখন আবৃত্তি করত, জাগতিক বিষয়ে দেবতাদের কোনো ভূমিকা নেই, শ্রোতারা তাতে উল্লাস প্রকাশ করত।'[৩১৬] অগাস্টিন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, প্রতিমা পূজক রোমানরা মন্দিরে দেবতার উপাসনা করত, আবার নাট্য মন্দিরে দেবতাদের উপহাস করে রচিত নাটক মহাউৎসাহে উপভোগ করত।[৩১৭] সম্রাট অগাস্টাসের নৌবহর যখন ডুবে গিয়েছিল তখন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি সমুদ্রদেবতা নেপচুনের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। একই রকমভাবে, জিরমিনেক্স- এর মৃত্যুতে মানুষ দেবতাদের বলির বেদিগুলো ভাঙ্গচুর করেছিল।[৩১৮] মোটকথা, রোমান জাতির স্বভাব-চরিত্র, শাসন, জীবনাচারে ধর্মের কোনো প্রভাব ছিল না, এ নিয়ে তাদের কোনো বিশুদ্ধ ধারণাও ছিল না। সমাজে ধর্ম বলে একটি শব্দ ছিল, ব্যস এতটুকুই, সমাজ ঠিকে ছিল কেবল কতগুলো রসুম-রেওয়াজের ওপর। ফলে আত্মকেন্দ্রিকতাই ছিল রোমান ধর্মের মূল ভিত্তি যা যার যার স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হত। লেকী যথার্থই লেখেন:

> আত্মকেন্দ্রিকতাই ছিল রোমান ধর্মের ভিত্তি। রোমান সমাজ ও জীবনের লক্ষ্য ছিল যে মানুষ সর্বাবস্থায় সুখে-শান্তিতে থাকুক, ব্যস এতোটুকুই। এছাড়া তাদের ধর্মীয় অন্য কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, রোমে বহু বীরপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে কিন্তু রোম এমন কোনো ধর্মীয় সাধু পুরুষের জন্ম দিতে পারেনি যিনি ঐ বস্তুবাদী সমাজকে পথ দেখাতে পারতেন। সমগ্র রোমান জীবনে যা কিছু আত্মত্যাগের ইতিহাস পাওয়া যায় তার প্রাণপ্রেরণা জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নয়।[৩১৯]

---

[৩১৬] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৯৬।
[৩১৭] *প্রাগুক্ত*।
[৩১৮] W. E. H. Lecky. *Ibid.*
[৩১৯] *Ibid.* p. 168.

জার্মান বংশদ্ভূত মুহাম্মদ আসাদ লেখেন:

> রোমান সাম্রাজ্য ছিল কেবলই ক্ষমতা দখল যা নিজ মাতৃভূমির জন্য অন্য জাতিগোষ্ঠীকে শোষণের মাধ্যমে ঠিকিয়ে রাখা হত। রোমান সাম্রাজ্যে নৈতিকতা বলতে ছিল শুধুই রোমানদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে, নিজেদের স্বার্থে কোনো মন্দাচারই তাদের কাছে অন্যায় ছিল না। প্রচণ্ড বস্তুবাদী জীবনদর্শন কেবল মানুষকে এধরনের কার্যকলাপে চালিত করতে পারে। সত্যিকার অর্থে রোমানদের কোনো অভিনব ধর্মবোধ ছিল না, ছিল গ্রিক পৌরাণিক চিন্তাধারা যেখানে বাস্তব জীবনে এসবের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ।[৩২০]

বস্তুবাদ-ভোগবাদে নিমজ্জিত সাম্রাজ্যবাদী স্বভাবাসক্ত রোমান সমাজে নীতি-নৈতিকতার যা হওয়ার কথা ছিল, অনিবার্য পরিণতিরূপে তাই হয়েছিল। Drapar উল্লেখ করেন:

> রোমান সাম্রাজ্য যখন সামরিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষের চরমে তখন ধর্মীয় ও সামাজিক দিক দিয়ে ঐ সমাজ নৈতিক অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। ভোগ-বিলাস, আমোদ-ফুর্তি, অশ্লিলতা প্রভৃতিতে তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৩২১]

নৈতিকতার অধঃপতন এখানেই শেষ ছিল না। রোম সাম্রাজ্যের সুবিশাল ক্রীড়াঙ্গণে মানুষে-মানুষে, পশুতে-পশুতে, মানুষে-হিংস্র পশুতে রক্তাক্ত লড়াই ছিল বিনোদনের সাধারণ অঙ্গবিশেষ যা চলত মৃত্যু পর্যন্ত, আর সেই পাশবিক বীভৎস দৃশ্য উল্লাসভরে দর্শকরা উপভোগ করত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ ধরনের নৈতিকতা বিবর্জিত ক্রীড়া-কৌতুক আধুনিক সমাজেও এক শ্রেণির মানুষ একইরকমভাবে উপভোগ করে থাকেন। যেমন, ষাড়ের লড়াই, মানুষে-ষাড়ে লড়াই, রেসলিং প্রভৃতি আজকের সমাজেও বহাল আছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে এ ধরনের অসুস্থ চর্চা আরো অনেক বেশি অবারিত হয়েছে। এসব উপভোগে ধর্ম নির্বিশেষের বালাইও চোখে পড়ে না। এক্ষেত্রে অতীত আর

---

[৩২০] Mohammad Asad. *Ibid*. pp. 35-36.

[৩২১] John William Drapar. *Ibid*.

বর্তমানের পার্থক্য কী কেবল সময়ের কিছু ব্যবধান মাত্র নয়? মনে হয় এসব তো সেইকালের পাশবিক চর্চারই এপিঠ-ওপিঠ। বিশ্ববিজয়ের গর্বে গরবী রোমান শাসকদের কাছে শক্তির চেয়ে বড় কোনো উপাস্য ছিল না, আর সম্রাটই হলেন এই সর্বজয়ী শক্তির একক প্রতীক- এরই বহিঃপ্রকাশ যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে রোমান শাসনের ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি।

ধর্মহীনতার পথে পাশ্চাত্য সভ্যতা

ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যের কাছে এক সময় রেসালতের মহান শিক্ষা পৌঁছেছিল, এমনকি যে রোমান সাম্রাজ্য এক সময় প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল সেসব অঞ্চলে একের পর এক নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে বণি-ঈসরাইলগণ তো এদিক দিয়ে ছিল সবার ওপরে, কারণ তাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় নবী-রাসূল এসেছিলেন। এজন্য তাদের বিরাট গর্বও ছিল এবং তাদের এও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রতিশ্রুত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর তাদেরই বংশে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তাদের সব আশা-ভরসার বিপরীতে সেই মহান পয়গাম্বর যখন আরবে আবির্ভূত হলেন যার সম্পর্কে তাদের ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কার বর্ণনা আছে, এখন সর্বশেষ আবির্ভূত এই আরব রাসূলের মধ্যে বর্ণিত সেসব বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ শতভাগ মিলে যাবার পরও তারা কেবল এই বাহানায় তাঁকে মেনে নিতে পারে নি যে, 'সর্বশেষ পয়গাম্বর বনী-ঈসরাইল বংশের বাইরে আবির্ভূত হতে পারেন না', এ হল তাদের পেট-হিংসার বহিঃপ্রকাশ। আজ পৃথিবীর সব বনি-ঈসরাইলদেরকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি কবে দিয়েছিলেন যে, সর্বশেষ পয়গাম্বর তাদের মধ্যেই আবির্ভূত হবেন? যাই হোক, ইউরোপ তথা গোটা পাশ্চাত্য সমাজ একদিকে যেমন শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতকে স্বীকার করে নি, অন্যদিকে তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় গ্রন্থের সংরক্ষণ তো দূরের কথা, সেগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে ছেড়েছে। তাদের এই কুকর্ম সম্পর্কে কুরআন বলছে:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۞

"অতএব তাদের জন্যে আফসোস, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে; অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।" (বাকারা : ৭৯)

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বাইবেলের কথা বলে যে ধর্ম প্রচার করে তা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। কোনো বিবেকবান মানুষ, তা তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, মুক্ত মন নিয়ে যদি ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থকে পাঠ করেন, আরেকটু কষ্ট করে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন তাহলে এসব ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের জন্য তার বড্ড করুণা না হয়ে পারবে না। মুসলিম জাতি বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া আর কোনো জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মাবলম্বীর কাছে কোনো অবিকৃত ওহি নেই। এ অবস্থায় ধর্মাচারই হোক অথবা রাষ্ট্রাচারই হোক, অন্তত কোনো ওহিভিত্তিক মূলনীতি এসবে প্রয়োগ করার সুবর্ণ সুযোগ ঐসব জাতিগোষ্ঠী বহুকাল পূর্বেই হারিয়ে বসেছে।

আজকের তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যেসব মূলনীতির ওপর বিশ্বাস ও ভিত্তি করে সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি পরিচালিত করে আসছে, এবং যার গ্রিক-রোমান সূত্রের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার সবই এই ধর্মচ্যুতির অবশেষ ফল ছাড়া কিছু নয়। একটি জাতির কাছে যখন একটি অবিকৃত ওহিগ্রন্থ বা ওহি-নীতিমালা থাকে তখন সে অবস্থায়ও সে গ্রিক-রোমান কেন ভাল কোনো কিছু যে কোনো উৎস থেকেই নিক না কেন, ভাল-মন্দের গ্রহণ-বর্জনের বা কোনো মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও অনুসরণের মূলনীতির প্রশ্নে ঐ ওহিগ্রন্থ বা ওহিনীতিমালার বিকল্প কোনো উৎস হতে পারে না। এজন্যই গ্রিক পণ্ডিতগণের মতাদর্শ গ্রহণে ইউরোপের কোনই বিপত্তি ঘটেনি। লক্ষ করুণ, কিছু মুসলিম দার্শনিক যেমন: ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭), আল-ফারাবি

(৮৭০-৯৫০), আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩), ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮) গ্রিক দার্শনিক রীতি অনুসরণের ভ্রান্তিতে পড়েছিলেন। তখন ঠিকই আবু মনসুর মাতুরিদী (৮৫৩-৯৪৪), আবুল হাসান আশআরী (৮৭৩-৯৩৬), আবু হামিদ আল-গাজ্জালীর (১০৫৬-১১১১) মতো মনীষীরা গ্রিক দর্শন ও এর দার্শনিক রীতির মারাত্মক ভ্রান্তি বনাম ইসলামের সঠিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে আলো-আঁধারের তফাৎ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। আল-গাজ্জালীর *তাহাফুতুল ফলাসিফা* এক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যা আজও সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অবিকৃত ওহিগ্রন্থের অধিকারী হলেই কেবল এমন জটিল ও কঠিন কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য তার সত্যতার পরিচয় বহন করে যার ওয়াদা কুরআনে রয়েছে, আর এটি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে [এ সম্পর্কিত কুরআনের একাধিক আয়াত ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।]। পরবর্তীতে কতিপয় প্রধান পাশ্চাত্য মতবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তবে সংক্ষিপ্ত, বিশ্লেষণ থেকে আমরা পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনের ভ্রান্তি ও পরিণতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারব।

পাশ্চাত্য সমাজদর্শনের ভ্রান্তির রহস্য

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ-প্রেরণার উৎস ও ধর্মহীনতা সম্পর্কে একটি ধারণা ইতোমধ্যে আমার পেয়েছি। এখন আরেকটি মজার বিষয় লক্ষ করব যে, ইউরোপীয় সভ্যতার এই ধর্মহীনতার ফলেই হোক আর অন্য কোনো কারণেই হোক এই সভ্যতার নানা উপাদান ও এদের বিকাশের সঙ্গে নানা মতবাদের এক অদ্ভূত কিন্তু বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আজকের ইউরোপীয় এমনকি গোটা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিবর্তনের ওপর এসব বিষয়ের দারুণ প্রভাব রয়েছে। তবে একটি কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ঢালাওভাবে ত্রুটিযুক্ত নয়। বিশেষত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের অপার অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনকে আমরা নির্বিবাদে কেন গ্রহণ করতে রাজি নই তার রহস্য একটু পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। কাজেই এই অধ্যায়ে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে পাশ্চাত্য, বিশেষত ইউরোপীয় সমাজ দর্শনের ভাল-মন্দ খতিয়ে দেখা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যুগে যুগে যেসব সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রীয় মতবাদ অনুসরণ করে এসেছেন তা তাদের বস্তুবাদী মানষিকতার বাষ্পে আচ্ছন্ন যার উৎসমূলে রয়েছে গ্রিক ও রোমান দর্শন যার বৈশিষ্ট্য আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অভ্রান্ত জীবনদর্শনের প্রশ্নে গ্রিক পরমাণুবাদী দার্শনিক থেকে শুরু করে নীতি বা আদর্শবাদী কোনো দার্শনিককেই আমরা ব্যতিক্রম হিসেবে পাই না। অর্থাৎ, থেলিস থেকে নিয়ে হেরাক্লিটাস, ডেমোক্রিটাস, প্রোটাগোরাস, পারমিনাইডিস, পিথাগোরাস, এনাক্সগোরাস, এ্যানাক্সিমেন্ডার, এ্যানাক্সিমেন্ডিস, লুসিপ্পাস, এম্পিডক্লিস, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল কেউই আমাদেরকে অভ্রান্ত ওহি ভিত্তিক জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারেন নি, যা ছাড়া অভ্রান্ত জ্ঞান অর্জন সম্ভবই নয়, অধিবিদ্যা (Metaphysics) সম্পর্কে তো বটেই। এদের প্রথম জামাত অর্থাৎ, পরমাণুবাদী দল শুধু এ নিয়ে গোটা জীবন মাথা ঘামিয়ে ধূলির ধরা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন যে পৃথিবী সৃষ্টির উপাদান কী মাটি, পানি নাকি বায়ু, কোনটা? কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁরা যেসব জ্ঞান আমাদেরকে সেকালে পরিবেশন করেছেন, আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তা ঠিকে থাকতে পারছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'একটি কথা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সঙ্গে মিলে যেতে পারে, যেমনটি দৃষ্টান্তস্বরূপ থেলিসের কথা একটু পরে উল্লেখ করা হবে, কিন্তু এ ধরনের ব্যতিক্রমকে কাকতালীয় বলাই সঙ্গত। কারণ এসব দার্শনিকগণ এমন এক সময়ে এসব কথা বলেছিলেন যখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষার কোনো সুযোগ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এসব-ই ছিল তাদের কল্পনা ও অনুমান।

থেলিসকে[৩২২] দিয়ে গ্রিক দর্শনের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে দাবি করা হয়। থেলিস মনে করতেন যে, 'পানিই সর্বোত্তম।' রাসেল বলেন, থেলিসের উক্তিটি একটি ভ্রান্তি।[৩২৩] এ্যারিস্টটলের মতে, থেলিস এটি অনুমান করেছিলেন যে পানিই হল আদিমৌলিক বস্তু যা থেকে অবশিষ্ট সবকিছুর সৃষ্টি

[৩২২] থেলিসকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দার্শনিক বলে মনে করা হয়। এশিয়া মাইনরের আইয়োনীয় দ্বীপে কিংবা মিলেটাসে জন্ম। এজন্য থেলিসের দর্শনকে মিলেসীয় ধারা বলা হয়।

[৩২৩] Bertrand Russell. 1946. p. 45.

হয়েছে। তিনি মনে করতেন, পৃথিবী পানির ওপর ভাসছে। এ্যারিস্টটল আরো বলেন, থেলিস বলেছিলেন চুম্বকের মধ্যে একটি আত্মা থাকে, কারণ তা লোহাকে নড়ায়। তিনি আরো বলেছিলেন, সকল বস্তুর মধ্যে দেবতারা আছেন।[৩২৪] থেলিসের এসব বক্তব্য সম্পর্কে দার্শনিক রাসেল বলেন, সবকিছুর উৎপত্তি পানি থেকে– এই বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক অনুমান হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, আর এটি কোনোভাবেই নির্বোধ উক্তি নয়। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে [রাসেলের মৃত্যুর (১৯৭০) পরের সময় যোগ করলে বলা যায় অন্তত ৬৮-৭০ বছর আগে) গৃহীত মত ছিল যে সবকিছু হাইড্রোজেন থেকে সৃষ্টি, যে হাইড্রোজেন পানির দুই-তৃতীয়াংশ।

গ্রিকরা নিজেদের অনুমানের ব্যাপারে ছিল হঠকারী, কিন্তু মিলেসীয় ধারাটি অন্তত নিজেদের অনুমানগুলো অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল। মিলেটাসে থেলিসের উত্তরসূরীরা তাদের বিশ্ববীক্ষার কিছু কিছু থেলিস থেকেই নিয়েছিলেন। থেলিসের বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ই কাঁচা, তবে সেসব চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ উদ্দীপ্ত করার পক্ষে সহায়ক ছিল।[৩২৫] এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন হল, থেলিসের এসব বক্তব্য ছিল কেবলই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত অনুমান, যদিও 'পানিই হল আদিমৌলিক বস্তু যা থেকে অবশিষ্ট সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে'- বক্তব্য আংশিক সত্য। কারণ পানিই আদিমৌলিক বস্তু হলেও এটিই যে সর্ব-আদিমৌলিক তা কিন্তু প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ, পানি সৃষ্টির পূর্বে অন্য কোনো বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন কিনা, সে প্রশ্নের উত্তর থেলিস বা বিজ্ঞানের কাছে নেই। পৃথিবীর একমাত্র অবিকৃত ওহিগ্রন্থ কুরআন বলছে: "অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ করে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল, পরে উহাদের পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রাণবন্ত সবকিছুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি? এর পরেও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" (আম্বিয়া : ৩০) কুরআনের এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'প্রাণবন্ত সবকিছুকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে', এ হিসেবে পানি ঐ আদি বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত হয় যা থেকে সকল

---

[৩২৪] *Ibid.* [Burnet (Early Greek Philosophy, p. 51) questions this last saying.]
[৩২৫] *Ibid.*

প্রাণদার বস্তু সৃজিত হয়েছে, কিন্তু পানি সর্ব-আদিমৌলিক সৃষ্টি তা বলা হয় নি।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি পিথাগোরাস সম্পর্কে। প্রথমত, তাঁর জন্ম সম্পর্কে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। রাসেল তাঁর সম্পর্কে যেসব তথ্য আমাদেরকে জানাচ্ছেন তা হল, তাঁর (পিথাগোরাস) জন্ম আনুমানিক ৫৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সামোস দ্বীপে। সামোস দক্ষিণ গ্রিসের একটি ছোট্ট দ্বীপ, ইজিয়ান সাগরে তুরস্কের উপকূলের কাছাকাছি অবস্থিত। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন ম্নেসারকস নামীয় এক প্রখ্যাত নাগরিকের পুত্র, আবার কারো কারো মতে, তিনি ছিলেন দেবতা অ্যাপোলোর পুত্র! রাসেলের পরামর্শ হচ্ছে, 'পাঠকরা এই দুই ভাষ্যের যে কোনো একটি বেছে নিতে পারেন।'[৩২৬] রাসেলের বরাতে ডির্কেয়াকোস বলেন, 'পিথাগোরাসের প্রথম শিক্ষা ছিল, আত্মা অমর এবং তা অন্যান্য ধরনের জীবন্ত বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। কোনো কিছুই সম্পূর্ণরূপে নতুন নয়, কারণ জীবিত সমস্ত কিছুরই চক্রাকারে পুনর্জন্ম ঘটে। প্রাণ নিয়ে যা কিছুর জন্ম হয়েছে তাকেই আত্মীয় জ্ঞান করতে হবে।'[৩২৭] সন্দেহ নেই পিথাগোরাসের 'আত্মা অমর'- এই কথা ছাড়া বাদবাকি কথাবার্তা শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয়, উদ্ভটও বটে। কম-বেশি একই ধরনের কাল্পনিক, অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক কথামালার সমাহার আপনি পাবেন অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকদের কাছেও।

এবার আসা যাক গ্রিক সমাজদর্শন বিশেষত রাষ্ট্রদর্শন প্রসঙ্গে। গ্রিক সমাজদর্শন বা আদর্শবাদী দর্শনের প্রাণপুরুষ সক্রেটিস। সক্রেটিস অত্যন্ত উচু মানের নীতি-দর্শন প্রচার ও প্রদর্শন করেছিলেন[৩২৮], কিন্তু আমাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে সক্রেটিস পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না অথবা

---

[৩২৬] Bertrand Russell. *Ibid.* p. 49.

[৩২৭] *Ibid.* 52.

[৩২৮] প্লেটোর *সংলাপ* পড়লে এটি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষত, আদালতে সক্রেটিসের জবানবন্দি, ফিডো তে তো অবশ্যই।

বিরোধী ছিলেন এবং একই সঙ্গে তিনি সঠিক ধর্মদর্শনেরও প্রবক্তা ছিলেন না। ধর্ম সম্পর্কে, পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে সক্রেটিসের কাছ থেকে আমরা কোনো অভ্রান্ত দর্শন পাই না, ঠিক একই রকমভাবে তাঁর শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটলের কাছ থেকেও নয়। এর কারণটি খুবই সহজ, আর তা হল, হয় তাঁরা সমকালীন ওহির শিক্ষামালাকে যে কোনো কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, অথবা এ সম্পর্কে তাঁরা কোনো গুরুত্বই দেন নি বা বেখবর ছিলেন।

এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অদ্ভুত যে সক্রেটিসকে জ্ঞানের 'আদি গুরু' জ্ঞান করা হয় অথচ তাঁকে জানবার কোনো সুনিশ্চিত উৎস নেই। সক্রেটিস নিজে কিছু লিখে যান নি। তাঁর সম্পর্কে জানবার তিনটি মাত্র সূত্র আমাদের সামনে রয়েছে। এখন আমাদের এটিও দেখার দরকার যে এই সূত্রগুলিইবা কতটা নির্ভরযোগ্য। এরিস্টোফ্যানিসের *দি ক্লাউড্স* নাটকে সক্রেটিসের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত রয়েছে, কিন্তু ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে যে কারো সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না তা বলাই বাহুল্য। এ্যারিস্টটলের রচনায় সক্রেটিসের দর্শন সম্মন্ধে আলোচনা আছে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। এ্যারিস্টটলের জন্ম হয়েছে সক্রেটিসের মৃত্যুর পনের বছর পর। কাজেই ব্যক্তি সক্রেটিসের জীবন, প্রকৃতি, চরিত্র ও চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর কোনো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং ব্যক্তি সক্রেটিসকে জানতে আমাদেরকে তাঁর ছাত্র জেনোফেন ও প্লেটোর দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু এখানেই সমস্যা। এই দুই শিষ্য তাদের গুরু সম্পর্কে আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা উপহার দিচ্ছেন, এদের দুজনের বর্ণিত সক্রেটিস একরকম নন, আলাদা আলাদা। ফলে এই দুই বর্ণনার যে কোনো এক বর্ণনাকে বেছে নেওয়া অসম্ভব।

জেনোফেন ছিলেন একজন সৈনিক। যুবা বয়সে তিনি সক্রেটিসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সক্রেটিস তখন বৃদ্ধ, তাঁর মৃত্যুর তখন অল্পকাল মাত্র বাকি আছে। মোট চারখানা রচনা জেনোফেন আমাদের জন্য রেখে গেছেন- হাসান আজিজুল হকের ভাষায়, ভাবখানা যেন এই যে তিনি সক্রেটিসের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি *মেমোরাবিলিয়া* নামে যা

লিখেছেন তার ওপর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। কারণ বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বলে জেনোফেনের তেমন কোনো সুনাম নেই, মনগড়া গালগল্প বলতে তিনি পছন্দ করতেন। রাসেল বলেন, প্রকৃতিপ্রদত্ত মস্তিষ্কের পরিমাণ তাঁর তেমন বেশি ছিল না। নানা রকম কুসংস্কারে তাঁর মন পরিপূর্ণ ছিল। কাজেই সক্রেটিস সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনা বাহুল্য মাত্র। সক্রেটিস সম্পর্কে লেখার সময় সেইসব সংকীর্ণতা অবশ্যই কাজ করেছে। যেহেতু বুদ্ধি জিনিসটা তাঁর তেমন একটা ছিল না; সেজন্য অনেকে বলেছেন, জেনোফেনের বর্ণনাই খাঁটি, কারণ মিথ্যা বানাবার প্রতিভা তাঁর ছিল না। রাসেলের মতে, এই যুক্তি ঠিক নয়, কারণ তলিয়ে দেখার ক্ষমতা না থাকার ফলে নির্বোধেরা নিজেদের ভাবনা-চিন্তাকেই সত্য বলে কল্পনা করে থাকে।[৩২৯] যাই হোক, জেনোফেন খুব অল্প সময় তাও অল্প বযসে সক্রেটিসকে দেখেছিলেন; জেনোফেন তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে সাইরাস অভিযানে বের হয়েছিলেন যা থেকে ফিরে এসে তিনি সক্রেটিসকে আর পান নি। সক্রেটিসের শেষ বয়সের একটি নেহাৎ আংশিক ও ক্ষণিক চিত্রই তিনি পেয়েছিলেন এবং এই চিত্রটাই তিনি আমাদের দিয়েছেন। অতএব দেখাই যাচ্ছে যে, জেনোফেনের সক্রেটিস অতিমাত্রায় অসম্পূর্ণ।[৩৩০]এখন বাকি থাকল প্লেটোর বর্ণনা।

প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন। আপন গুরুর অন্যায় দণ্ডে প্লেটো অবশ্যই সীমাহীনভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। সুতরাং, প্লেটোর লেখায় অতিরঞ্জনের লেশমাত্র নেই, এটি হলফ করে বলা চলে না। আবার, প্লেটো সক্রেটিসকে নিয়ে যা লিখেছেন তা তিনি সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে নিজস্ব স্মৃতি থেকে লিখেছিলেন, যেমন প্রখ্যাত *এ্যাপোলজি* সংলাপের কথা তো এক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে প্লেটো যেসব সংলাপ রচনা করেছেন সেসব যে সেভাবেই ঘটেছিল তা তিনি নিজেও দাবি করেন নি, এটি রাসেলেরও মত। এসমস্ত কারণে, প্লেটোর মুখ দিয়ে যে সক্রেটিসকে আমরা পাই তা প্লেটোর একান্ত নিজস্ব গড়া সক্রেটিস, বাস্তব থেকে তা অন্তত কিছুটা হলেও দূরের হওয়াই

---

[৩২৯] Bertrand Russell. *Ibid.* 101-102.

[৩৩০] হাসান আজিজুল হক। ১৯৯৯। *সক্রেটিস*। ঢাকা : আলহা প্রকাশন। পৃ. ১৪।

স্বাভাবিক। সুতরাং, প্লেটোর রচনায় পরিবেশিত সক্রেটিস কী প্লেটোর কলমে প্রকাশিত সক্রেটিস না কি সক্রেটিসের জবানিতে প্রকাশিত প্লেটো? এ প্রশ্নের সমাধান অসম্ভব। তাহলে দেখা যায়, শতভাগ খাঁটি সক্রেটিসকে জানার আজ আর কোনো উপায় নেই। তবে মন্দের ভাল হিসেবে প্লেটোর অঙ্কিত সক্রেটিসই তুলনামূলকভাবে গ্রহণীয় হতে পারে। হাসান আজিজুল হক লেখেন, এটি অনেকটা দুধের স্বাধ ঘোলে মেটানোর মতো।[৩৩১]
যাদেরকে জ্ঞানের আদি গুরু বলে নমস্য করা হয়, যাদের ওপর ভিত্তি করে সমাজদর্শনের বহু সবক রচনা ও প্রচার করা হয়, তাঁদের নামে পরিবেশিত তথ্য ও তত্ত্বের সত্যাসত্য সম্পর্কে যদি সুনিশ্চিত করে কিছু বলা না যায়, তাহলে বলতেই হয় যে, না জানি কত মিথ্যার জাল তাঁদের নামে ছড়িয়ে রয়েছে?

এবার প্লেটোর কথা বলব। রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিষয়ে সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার নাম *Republic* বা প্রজাতন্ত্র। প্লেটোর প্রধান মতবাদ তাঁর কাল্পনিক রাষ্ট্র তত্ত্ব। এছাড়া আছে, প্রত্যয়বাদ, অমরত্ম তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রত্যক্ষণ নয় বরং স্মৃতিচারণ হিসেবে জ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি। আমরা লক্ষ করব যে, প্লেটোর দর্শনের উৎস কী ছিল? উৎসসমূহ ছিল সমকালীন পরিবেশ ও শাসনব্যবস্থা এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের মতাদর্শ। রাসেল বলেন, প্লেটোর ওপর বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রভাব এমনই ছিল যা তাঁকে আগে থেকেই স্পার্টার দর্শনের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে এই প্রভাব ছিল পিথাগোরাস, পারমিনাইডিস, হিরাক্লিটাস এবং সক্রেটিসের দর্শনের। পিথাগোরাসের দর্শন থেকে (তা সক্রেটিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত হোক আর নাই হোক) প্লেটো তাঁর দর্শনে অর্ফিক[৩৩২] উপাদান গ্রহণ করেন। পারমিনাইডিসের দর্শন থেকে তিনি এই বিশ্বাস গ্রহণ করেন যে, সত্তা হচ্ছে শাশ্বত ও কালহীন, এবং যৌক্তিক দিক থেকে সকল পরিবর্তন হচ্ছে

---

[৩৩১] Bertrand Russell. *Ibid. Chapter:* Socretes; হাসান আজিজুল হক। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ১৮-২১।
[৩৩২]অরফিউস: প্রাচীন গ্রিসের কিংবদন্তীখ্যাত হোমারপূর্ব কবি ও বংশীবাদক। অর্ফিক: অরফিউসসংক্রান্ত, অরফিউসতুল্য।

অধ্যাসমূলক[৩৩৩] (illusory)। প্লেটো হিরাক্লিটাসের নঞর্থক মতবাদ গ্রহণ করেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে স্থায়ী বলে কিছু নেই। এই মতবাদের সঙ্গে পারমিনাইডিসের মতবাদের সমন্বয় সাধন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইন্দ্রিয় থেকে জ্ঞান অর্জন করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারাই শুধু জ্ঞান অর্জন করা যায়। এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত পিথাগোরীয়বাদের সঙ্গে সুসঙ্গতিপূর্ণ হয়।[৩৩৪]

'ইন্দ্রিয় থেকে জ্ঞান অর্জন করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারাই শুধু জ্ঞান অর্জন করা যায়'- প্লেটোর এ কথার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান মোটেও একমত নয়, বরং বিজ্ঞান এর উল্টোটাই বলছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী সেন্সেসরি অর্গান [ইন্দ্রিয়জাত অঙ্গ] হল তার চোখ। এ থেকে প্রমাণ হল যে প্লেটোর কথাগুলো ছিল তাঁর নিজস্ব জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যা গড়ে উঠেছিল ইন্দ্রিয়লব্ধ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যমতে তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমরা যদি প্লেটোর রাষ্ট্র দর্শনের ওপর চোখ বুলাই তাহলেও একই ধরনের ভ্রান্তি লক্ষ করি। প্লেটো পরিবেশিত আদর্শ রাষ্ট্র তত্ত্ব ছিল তাঁর কল্পনাবিলাস, অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর, বাস্তবে পৃথিবীর কোথাও এর প্রয়োগ নেই। যে গ্রিসে প্লেটো এই স্বপ্ন বুনেছিলেন সেখানেও এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি, যদিও তৎকালীন স্পার্টায় বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছিল।[৩৩৫] ঐতিহাসিক কিছু মূল্য থাকলেও মানুষ ও সমাজের সহজাত প্রকৃতি বিরোধী হওয়ার কারণে এ ধরনের যে কোনো মতবাদ বাস্তবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

এবার এ্যারিস্টটল প্রসঙ্গ। এ্যারিস্টটলকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র দর্শনের পিতৃপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়। তাঁর রচনাবলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল, যুক্তিশাস্ত্র বিষয়ক, প্রাকৃতিক ইতিহাস, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও

---

[৩৩৩] কোনো বস্তুতে ভিন্ন বস্তুর গুণের কল্পনা।
[৩৩৪] Bertrand Russell. *Ibid.* p.
[৩৩৫] *Ibid.* p. 131.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অলঙ্কার শাস্ত্র। পূর্বেই বলেছি যে এ্যারিস্টটল ছিলেন প্লেটোর শিষ্য। এ্যারিস্টটল প্রায় আটারো বছর বয়সে জন্মস্থান স্ট্যাগিরা থেকে এথেন্সে আসেন এবং প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্লেটোর মৃত্যুর (ক্রিস্টপূর্ব ৩৪৭) পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় বিশ বছর প্লেটোর একাডেমিতে প্লেটোর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্র দর্শনের ইতিহাস বিষয়ে কেবল রাসেলের গবেষণার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায় যে, এ্যারিস্টটলের সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শন সৌন্দর্য ও ত্রুটি- এই দুই বৈশিষ্ট্যেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; অন্যদিকে প্লেটোর মনস্তত্ত্বের প্রভাব তিনি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি ভ্রান্তিরও উর্ধ্বে ছিলেন না। যেমন রাসেল লেখেন, প্লেটোর দর্শনের অর্ফিক উপাদান এ্যারিস্টটলের দর্শনে লঘুরূপ ধারণ করেছে, এবং কাণ্ডজ্ঞানের দৃঢ় ধারণা দ্বারা সংমিশ্রিত হয়েছে। .... এ্যারিস্টটলের ভ্রান্তিসমূহ ছিল তাঁর যুগের ভ্রান্তি যা অভ্যাসগত পূর্বসংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। মৌলিক স্পষ্টতা ও প্রচণ্ড কর্মশক্তির অভাবে বৃহৎ কাজে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।[৩৩৬]

এ্যারিস্টটল ছিলেন Man is a political animal- দর্শনের প্রবক্তা, পাশাপাশি প্লেটোর পর তিনিই ছিলেন গ্রিক নগর রাষ্ট্র কেন্দ্রিক চিন্তাচেতনার শেষ প্রতিনিধি। প্লেটো-এ্যারিস্টটলের নগররাষ্ট্র কেন্দ্রিক দর্শনের সমকালিন সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা থাকলেও এই দর্শন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল মানুষের সহজাত প্রকৃতি বিরোধী। এ্যারিস্টটল স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রের কথা বলতেন, অথচ গ্রিক নগর রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র কাঠামোর মধ্যে আর্থ-সামাজিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সার্বভৌমত্ব যে অসম্ভব তা তিনি বুঝতে পারেন নি। Sinclair (*History of Greek Political Thought*) লেখেন, "It seemed to be out of date, poncrlus and even unless in its traditional function as an arbiter of morals and habits."

---

[৩৩৬] *Ibid.* pp. 174-175.

দেখা যায়, প্লেটো, এ্যারিস্টটল এবং তাদের শিষ্য-অনুরাগী দ্বারা যে গ্রিক নগর রাষ্ট্র কেন্দ্রিক দর্শন গড়ে উঠে, পরিণতিতে সেই নগর রাষ্ট্র নানাভাবে নাগরিক জীবনকে অত্যাচার-উৎপাতে জর্জরিত করে তুলেছিল। গ্রিক নগররাষ্ট্রসমূহ সর্বাত্মকবাদী ধারণা লালন করত ফলে নাগরিকদের ব্যক্তি জীবন, স্বাধীনতা সবকিছুই রাষ্ট্রের যুপকাষ্টে বলি হত। একান্ত ব্যক্তিগত জীবন থেকে ধর্মজীবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে গ্রিক রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করত। এসবেরই ফলে জন্ম নিয়েছিল Epicureanism (ভোগবাদ), Cynicism (উদাসীনতাবাদ) ও Stoicism (বৈরাগ্যবাদ) নামীয় চরমপন্থি ও সম্ভাববিরুদ্ধ নানা মতবাদের। এ্যারিস্টটলের নীতি দর্শন গড়ে উঠেছিল গ্রিক-অগ্রিক বিভেদরেখার উপরে, এতে স্বদেশপ্রেমের মর্যাদা প্রাধান্য পেত যে কোনো নৈতিক গুনাবলির উপরে যা গ্রিক দার্শনিকগণ সম্মিলিতভাবে নির্ধারন করেছিলেন। এ্যারিস্টটলের স্বদেশপ্রেম বোধ এতটাই প্রকট ও সঙ্কীর্ণ ছিল যে তিনি বলতে পেরেছেন, 'গ্রিকদের উচিত অগ্রিকদের সঙ্গে জীবজন্তুর মতো আচরণ করা'। গ্রিক দার্শনিকগণ অগ্রিকদেরকে বর্বর মনে করতেন যে কথা আমরা পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি।

মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশ নিশ্চিত করতে নগর রাষ্ট্র দারুণভাবে ব্যর্থ হয় ফলে মানব স্বভাবের চিরন্তন দাবি, এ্যারিস্টটল উত্তর দর্শনের আঘাত, তাঁরই শিষ্য আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যবাদী দর্শন ও এর বাস্তব প্রয়োগ (যেমন শিষ্য আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য কাঠামোয় তারই গুরু এ্যারিস্টটলের মানসরাষ্ট্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র বিশেষত এথেন্স লীন হয়েছিল।) প্রভৃতির প্রভাবে নগররাষ্ট্র কেন্দ্রিক দর্শনের পতন ঘটে। একথা সত্য যে আজকের দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক শাখারই বুনিয়াদ এ্যারিস্টটলের হাতে রচিত হয়েছে, রাজনীতি বিষয়ে তিনিই সর্বপ্রথম সুবিন্যস্ত গ্রন্থ *The Politics* লিখেছেন। আজও সমস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এতে একমত যে এ্যারিস্টটলের এই গ্রন্থ পরবর্তী এ সম্পর্কিত সকল গবেষণারই আকর ও টীকা-ভাষ্য।[৩৩৭] কিন্তু

---

৩৩৭ তাকী ওসমানী। ২০১৪। *ইসলাম ও রাজনীতি।* অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম। ঢাকা : মাকতাবাতুল হেরা। পৃ. ৩১-৩২।

একই সঙ্গে এ্যারিস্টটলের চিন্তার সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি[৩৩৮] আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

রোমান দার্শনিকগণ যেমন: সেনেকা (৩ খ্রি. পূ. - ৬৫ খ্রি.), সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রি. পূ.), মার্কাস অরেলিয়াস (১২১-১৮০ খ্রি.)- প্রমুখ সকলেরই একই অবস্থা। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ধারাক্রম যদি আমরা আরো সামনে এগিয়ে নিতে থাকি তাহলে? তাহলেও ফলাফল সেই একই। যেমন: সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০), টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪), ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭), টমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫), বেকন (১৫৬১-১৬২৬), হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০), লক (১৬৩২-১৭০৪), ভলটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), রুশো (১৭১২-১৭৭৮), এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০), কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), মিল (১৮০৬-১৮৭৩), মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫), স্পেন্সার (১৮১৮-১৮৮৩), ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), নীটসে (১৮৪৪-১৯০০), রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), সাত্রে (১৯০৫-১৯৮০), ফুকু (১৯২৬-১৯৮৪), দেরিদা (১৯৩০-২০০৪) কারো কাছ থেকেই অভ্রান্ত সমাজদর্শনের জ্ঞান পাওয়া যায় না, তারা নিজেরাই ছিলেন প্রকৃত সত্য থেকে বঞ্চিত অথবা সন্দিগ্ধ। তাঁদের অনেকের আবার ধর্মকর্মে বিশ্বাসই ছিল বলে প্রতিয়মান হয় না, অনেকে ছিলেন ধর্মকে কেবল গীর্জায় সীমাবদ্ধ রাখার প্রবক্তা। যেমন: কার্ল মার্কস তাঁর কমিউনিস্ট মেনুফেস্টোতে ধর্মকে উচ্ছেদের কথা বলেছেন। হবস-লক-রুশু তাদের সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে স্রস্টার কোনো ভূমিকা খেয়াল করেন নি; কেউ কেউ মানুষকে শুধু নিকৃষ্ট ও স্বার্থপর প্রাণী বলে চিনেছেন। ভলটেয়ার, যিনি আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা, রাজনীতিতে ধর্মের প্রবেশকে অনধিকার চর্চা বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। রাসেল গোটা জীবন স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর অস্বীকার-অবিশ্বাস রোগে ভোগেছেন।

---

[৩৩৮] Bertrand Russell. *Ibid.* Cjapter: Aristotle.

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দার্শনিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন নিয়ে যে অধ্যাবসায় করেছেন তা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মতবাদ সেই চিরাচরিত গ্রিক স্বভাব বৈশিষ্ট্য- যা এই অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে, দ্বারা প্রভাবিত ফলে এসবে রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা ও ভ্রান্তি। পূর্বেই বলেছি যে, গ্রিক সমাজে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মানদণ্ড ছিল ইন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবাদ প্রসূত, অর্থাৎ, যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাতে বিশ্বাস এবং যা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত তাতে অবিশ্বাস ও সংশয়। যেহেতু দেখা যায় না এমন কিছু যুক্তিদ্বারা প্রামান্য নয়। গ্রিক দেহ-মনে ছিল ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় নিরাসক্তি এবং পার্থিক জীবন ও ভোগবিলাসে অতিআসক্তি [এটি প্রথমটির অনিবার্য ফল] এবং পরিশেষে উগ্র জাতীয়তাবাদ। গ্রিকদের পর রোমান বা অন্যান্য পাশ্চাত্য সমাজ-দার্শনিক তেমন কেউই এই মানসিকতা থেকে বের হতে পারেন নি, এবং সেটি বর্তমান পাশ্চাত্য চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আজকের ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য জগত গ্রিক-রোমানদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এসব-ই লাভ করেছে।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শন : গোড়ায় গলদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রয়েছে নানা মত। এ সম্পর্কিত মতবাদ বিষয়ে একটি মোটামুটি পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন, তাতে বুঝা যাবে যে, তারা শুরুতেই কীভাবে ধোঁকা খেয়েছেন। প্রথমত রাষ্ট্রের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে সে বিষয়ে নানা মুনির রয়েছে নানা প্রস্তাবনা। এ সম্পর্কিত প্রধান মতবাদসমূহ হচ্ছে- সামাজিক চুক্তি বা সন্ধি মতবাদ (Theory of Social Contract), বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force), পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal & Metriaerchal Theory), বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদ (Evolutionary or Historical Theory), ঐশ্বরিক মতবাদ (Theory of Devine Origin) ইত্যাদি।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সারমর্ম হল, পৃথিবীতে মানব বসতির সূচনালগ্নে কোনো রাষ্ট্র, সরকার ও আইন-কানুন ছিল না। মানুষ যার যার মতো ব্যক্তিগতভাবে জীবন অতিবাহিত করত। মানব বসতির এই প্রাথমিক

অবস্থাকে বলা হয় state of nature বা প্রাকৃতিক অবস্থা বা প্রকৃতির রাজ্য। এই মতবাদ অনুসারে মানুষ প্রথমপর্বে এই প্রকৃতির রাজ্যে এরকম প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করত। কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী এমন অবস্থা চলতে পারে না, কারণ সব মানুষের পছন্দ-অপছন্দ অভিন্ন নয়, ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। আর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অনিবার্য ফল হল ঝগড়া ও লড়াই। সুতরাং, সবাই মিলে চিন্তা করে, এমন কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যাতে স্বার্থের বিরোধ লড়াই-সংঘাতের কারণ না হতে পারে। এভাবে মানুষ পরস্পরে চুক্তি বা সন্ধি করে নেয় যে এখন থেকে আমাদেরকে একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। প্রবক্তাদের মতে এটিই সেই চুক্তি বা সন্ধি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে, যাতে কোনো একজনকে নেতা স্থির করা হয় এবং সেই নেতা মানুষের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেন আর লোকজন সেসবের আনুগত্য করে। আপসের মাধ্যমে মানুষ এমনই সন্ধি করে থাকে যার ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং প্রকৃতির রাজ্য প্রকৃতিতেই হারিয়ে যায়, অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যের বা প্রাকৃতিক অবস্থার বিলোপ ঘটে। মজার বিষয় হল, ঐ সন্ধির ফলেই নাকি দুই ধরনের শাসন ব্যবস্থা জন্ম লাভ করে, একটি 'স্বেচ্ছাচারতন্ত্র' অন্যটি 'প্রজাতন্ত্র'- উভয়টিরই বুনিয়াদ ঐ সামাজিক সন্ধি। কিন্তু উভয়টির প্রকৃতি ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী।

একদল সামাজিক সন্ধির বিষয়টিকে এভাবে বুঝেছিলেন যে, যেহেতু মানুষ নিজেদের স্বার্থ ও কল্যাণের খাতিরে সমস্ত অধিকার রাষ্ট্রের নিকট সোপর্দ করেছিল তাই ঐ রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল স্বোচ্ছাচারতন্ত্র। কেননা একমাত্র স্বেচ্ছাচারতন্ত্র হলেই রাষ্ট্রের সকলের ওপর শাসকের শাসন ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। এক্ষেত্রে যুক্তি হল, ব্যক্তিস্বার্থের বিরোধের কারণেই সামাজিক সন্ধির প্রয়োজন পড়েছিল। যেহেতু প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ স্বার্থের বৃত্তের ভেতরে থেকেই চিন্তাভাবনা করে থাকে তাই প্রত্যেক ব্যক্তির এই স্বাধীনতা থাকা উচিত নয় যে, সে নিজের স্বার্থ অনুসারে ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেবে। বরং ব্যক্তি যখন নিজের স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে সোপর্দ করবে, তখন রাষ্ট্রের যিনি শাসক তিনিই সামগ্রিক স্বার্থকে সামনে রেখে ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত প্রদান

করবেন। কোনো ব্যক্তির কাছে শাসকের সিদ্ধান্ত যদি মনোপুত নাও হয়, তবু তার কর্তব্য হবে নেতার আনুগত্য করে যাওয়া।

যদিও সামাজিক চুক্তি বা সন্ধি মতবাদের অন্যতম তিন পুরোহিত হচ্ছেন Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jeac Rousseau, তবে এই দর্শন বহু পূর্বে গ্রিসে পাওয়া যায়। যেমন, স্বোচ্ছাচারতন্ত্রের কথা জোড়ালোভাবে খোদ সক্রেটিসের কাছে পাওয়া যায় যিনি নিজের জীবনে এর প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। প্লেটোর ডায়ালগে দেখা যায় যে, যেসব অভিযোগ সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল তার সবই ছিল উদ্দেশ্যমূলক, সক্রেটিস আদালতে যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, বিশেষত যেসব প্রশ্ন ও জেরা উত্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, আদালত ও অভিযোগকারীগণ সেসবের কোনই সদুত্তর দিতে সেদিন ব্যর্থ হয়েছিলেন। সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। ঘটনা এখানেই শেষ ছিল না। সক্রেটিসের একাধিক শিষ্য সক্রেটিসের পালিয়ে অন্য নগররাষ্ট্রে চলে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, এতে সক্রেটিস অন্য নগররাষ্ট্রে চলে গিয়ে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে জীবন কাটাতে পারতেন; কেননা এথেন্সের বাইরে এই দণ্ড প্রজোয্য ছিল না। কিন্তু সক্রেটিস এতে রাজি হন নি। সক্রেটিসের মতে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের সঙ্গে আমি একটি অঙ্গীকার করে আছি। রাষ্ট্র আমাকে যা নির্দেশ করে তা আমাকে মানতে হবে ও আমল করতে হবে। যেহেতু আমি এই অঙ্গীকারের অধীন, কাজেই আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের রায় ন্যায় পরিপন্থি বা বিচারের নামে অবিচার বা জুলুম হওয়া সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই অঙ্গীকারের কারণে আমি কারাগার থেকে পালাতে পারি না। প্লেটোর জবানিতে সক্রেটিস কারাকক্ষে শিষ্য ক্রিটোর সঙ্গে আলাপচারিতায় পালিয়ে যাওয়ার বিপরীতে যে দার্শনিক সংলাপ প্রদর্শন করেছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনবদ্য ঘটনা হয়ে আছে। স্বেচ্চাচারতন্ত্রের এক অনন্য নমুনা এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। পাঠকদের জন্য প্লেটোর সংলাপের *ক্রিটো* সংলাপ থেকে সামান্য কিছু এখানে তুলে ধরছি। ক্রিটোর প্রস্তাবের জবাবে সক্রেটিস বলছেন:

সক্রেটিস: তা হলে বিষয়টিকে এভাবে দেখ: মনে কর, আমি স্কুলের বালকের ন্যায়ই অবাধ্য হয়ে উঠলাম। আমার বিদ্রোহ দেখে রাষ্ট্র এবং

আইন আমাকে এসে জেরা করতে শুরু করল: 'সক্রেটিস, তোমার এরূপ কার্যের তাৎপর্য কী? তুমি কী তোমার কার্য দ্বারা সমগ্র আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করার প্রয়াস পাচ্ছ না? বল তুমি, যে রাষ্ট্রের আইনসমূহ বাধ্যতার সঙ্গে পালিত হয় না, ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের আইনকে উপেক্ষা করে এবং পদদলিত করে, সে রাষ্ট্র কি টিকে থাকতে পারে?' বন্ধু ক্রিটো, এরূপ প্রশ্নের আমরা কী জবাব দেব? রাষ্ট্রের যে কোনো বিধান যে পালিত হওয়া উচিত, যে কোনো দণ্ড যে কার্যকর করা সংগত- এ নিয়ে যে কোনো ব্যক্তি বিশেষ করে যে কোনো বাগ্মী যথেষ্ট বক্তৃতা করতে পারেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সে একথাই বলবে যে, রাষ্ট্রের বিধানকে ভঙ্গ করা সংগত নয়। আমরা তার জবাবে কী বলব? আমরা হয়তো বলতে পারি: 'বিধান মান্য করা সংগত। কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের প্রতি ন্যায্য বিধান আরোপ করেনি; রাষ্ট্র অন্যায় দণ্ডে আমাদের দণ্ডিত করেছে।' মনে কর, রাষ্ট্রকে আমি এই জবাবটিই দিলাম।

ক্রিটো : অত্যন্ত উত্তম জবাব, সক্রেটিস।

সক্রেটিস: কিন্তু রাষ্ট্র পাল্টা প্রশ্ন করবে: 'সক্রেটিস, তোমার সঙ্গে কি আমার এরূপ চুক্তি ছিল? অথবা তুমি রাষ্ট্রের সমগ্র বিধি-ব্যবস্থাকে মান্য করতে সম্মত হয়েছিলে এবং সম্মতির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল?

ওপরের আলোচনায় দেখা যায়, সক্রেটিস পালিয়ে না যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে আমার যে প্রতিশ্রুতি আছে, সেটা আমি লঙ্ঘন করতে পারি না। এ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের দৃষ্টান্ত ও উল্লেখ রোমান আইন, সামন্ততন্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতেও পাওয়া যায় বলে কোনো কোনো লেখকের অভিমত।[৩৩৯] খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দি পর্যন্ত সামাজিক সন্ধির এই ব্যাখ্যাই কার্যকর ছিল।

ফ্রান্সে এমন তিনজন দার্শনিকের উত্থান ঘটে (Hobbes, Locke, Rousseau) যাদের উল্লেখ এইমাত্র হয়েছে, যাদের রাজনৈতিক দর্শন পরবর্তীদের জন্য বুনিয়াদ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে Hobbes ও

---

৩৩৯ Vidya Dhar Mahajan. 1988. *Political Theory*. New Delhi : S. Chand & Company Ltd. pp. 226-227.

Locke সামাজিক সন্ধির এই ব্যাখ্যারই পক্ষপাতি ছিলেন যে, সামাজিক চুক্তি বা সন্ধির ফল হিসেবে যেই রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, সেটা স্বেচ্চাচারতন্ত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়জন, অর্থাৎ Rousseau সামাজিক সন্ধির বিপরীত ব্যাখ্যা দেন। রুশো একদিকে যেমন নাগরিকের স্বেচ্ছায় সকল অধিকার রাষ্ট্রকে সমর্পণ করে রাষ্ট্রের ভাল-মন্দ সকল সিদ্ধান্তের প্রতি নতশীরে বসে থাকাকে স্বীকার করেন নি, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের শুভ-অশুভের প্রশ্নে রাষ্ট্রের আচারকে লাগামহীন ঘোড়ার মতো ছেড়ে দিতেও রাজি হন নি। রুশোর মতে, যেহেতু জনসাধারণ পরস্পর মিলিত হয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দান করেছে, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শাসকের ক্ষমতা ও অধিকারের উৎস হচ্ছে জনগণ; যেহেতু আমজনতাই তাকে ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক বানিয়েছে। এজন্য শাসক যদি অন্যায় করেন, জনতার মর্জি বা কল্যাণের বিপরীত বা আপন মর্জি অনুসারে শাসন পরিচালনা করেন, তা হলে এর অর্থ হল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আর সামাজিক সন্ধির বিরুদ্ধচরণ করার কারণে তিনি পদচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। জনগন এ অবস্থায় শাসককে পদচ্যুত করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। এরকম ব্যাখ্যা করে রুশো সামাজিক সন্ধির ফলহিসেবে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র জন্ম লাভ করার বিষয় অস্বীকার করেন। বরং, তাঁর বক্তব্য হল, রাজ্য শাসন জনগণের মর্জিমাফিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, ভলটেয়ার ও রুশোর মতবাদের উপর ভিত্তি করেই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব সাধিত হয়েছিল।

সামাজিক বল প্রয়োগ মতবাদের বক্তব্য হল, শক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেছে। যখন রাষ্ট্র বলতে কিছু ছিল না এবং মানুষে-মানুষে হানাহানি ঠিকই ছিল, তখন যে বা যারা শক্তিতে বিজয়ী হত তারা বিজিতের উপর শাসক বনে বসত। এভাবেই রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে থাকবে। এজন্য বলা হয়, War begot state বা war begot king. এই মতবাদের কোনো একক প্রবক্তা নেই, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই মতবাদ প্রচার লাভ করেছে। Hume, Karl Marx প্রমুখ দার্শনিকগণের লেখায় বল বা শক্তি প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের ওপর চার্চের প্রবল ক্ষমতার

বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য চার্চের পুরোহিতগণ এ মতবাদকে ব্যবহার করেছেন; তাদের মতে চার্চ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বকারী কিংডম, অন্যদিকে রাষ্ট্র হল আগ্রাসন ও হানাহানির বহিঃপ্রকাশ।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মূল বক্তব্য হল, রাষ্ট্র হল পরিবারের বহিঃস্থ রূপ। একজন পুরুষ, স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে প্রথমে পরিবার গঠিত হয়, পিতা হলেন পরিবারের প্রধান এবং নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রয়োগকারী। অতঃপর সন্তানদের বিয়ের মাধ্যমে নতুন পরিবার সৃষ্টি হয়, কিন্তু পূর্ববৎ পিতার কর্তৃত্ব সকল সদস্যের ওপর বহালই থাকে। এভাবেই পিতৃতান্ত্রিক পরিববারের সৃষ্টি হয়। সময়ের পরিক্রমায় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, গোষ্ঠী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কয়েক সম্প্রদায় মিলে রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে থাকবে। এ বিষয়ে Leacock লেখেন: First a household, then a patriarchal family, next a tribe of persons of kindred descent and finally a nation– so emerges the social series erected on this basis.[৩৪০] অর্থাৎ, প্রথমে পরিবার যা তারপরে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে রূপ নেয়, এরপরে গোত্র এবং এ থেকেই অবশেষে একটি জাতি রূপ লাভ করে।

এ্যারিস্টটলের বক্তব্য হল, সময়ের দিক থেকে প্রথমেই পরিবার জন্ম লাভ করে, স্ত্রী ও পুরুষ, দাস ও প্রভু- এ দুটি মৌলিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পরিবার গড়ে উঠে এবং এই উভয় সম্পর্ক প্রাকৃতিক। কয়েকটি পরিবারের সমন্বয়ে একটি গ্রাম গঠিত হয়, কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়।[৩৪১] এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রবক্তা হলেন Sir Henry Maine (1722-1888)। তিনি তাঁর *Ancient Law* (1861) ও *Early History of Institutions* (1875) গ্রন্থে এই মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। Maine লেখেন: রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান ছিল পরিবার যার কর্তা হতো পুরুষ। পরিবারগুলোই গোত্র তৈরি করতো। এসব গোত্রই সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্র সৃষ্টি

[৩৪০] Cited in Mahajan. *Ibid.* pp. 253.

[৩৪১] Bertrand Russell. *Ibid.* pp. 197.

করেছে। সুতরাং রাষ্ট্র হল পরিবারের বহিঃস্থ রূপ যেখানে পিতাই হতেন প্রধান কর্তা আর সন্তানাদি জনগণস্বরূপ।[৩৪২]

Maine তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে *Old Testament*, এথেন্সের *Brotherhoods*, রোমের *patria potestas*, ভারতীয় সমাজের পরিবার ব্যবস্থা প্রভৃতিতে পিতৃতান্ত্রিকতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে, এ মতবাদ সামাজিক সন্ধি মতবাদ থেকে খুব বেশি ব্যতিক্রম নয়।

মাতৃতান্ত্রিক তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন, Mclennan, Morgan ও Jenks। Mclennan তাঁর *Primitive Society* (1865), Morgan তাঁর *Studies in Ancient Society* (1877) Ges Jenks তাঁর *A History of Politics* (1900) গ্রন্থে এ সম্পর্কিত তাদের মতামত তুলে ধরেন। তাদের মতে আদিতে কোনো মানবগোষ্ঠী এককভাবে পিতৃপ্রধান ছিল না। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল মায়ের দিক থেকেই নির্ণিত হয়ে থাকবে, পিতার দিক থেকে নয়। সেই সমাজে অবশ্যই একগামী (monogamy) ও বহুগামী (polygamy) বিয়ের কোনটাই ছিল না। সেই আদিম সমাজে polyandry (একই সময়ে বহু পতি রাখার প্রথা) বিবাহ প্রথা চালু ছিল। এই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিকে থাকেনি। ফলে বিয়ে বহির্ভূত যৌনাচারের (promiscuity of sexual relation) প্রাদুর্ভাব অবশ্যই ঘটে থাকবে এবং পরিণতিতে সামাজিক সম্পর্ক মায়ের দিক থেকেই নির্ণিত হতে হবে, পিতার দিক থেকে হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রবক্তাদের প্রস্তাবনা অনুসারে এভাবেই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদের প্রবক্তাদের মতে রাষ্ট্র ঈশ্বরের দ্বারা বা কোনো বল প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় নি, কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক

---

[৩৪২] Cited in Mahajan. *Ibid.* pp. 253-254.

সন্ধি বা চুক্তির ফলও নয়। রাষ্ট্র পরিবারের সম্প্রসারণের ফলও নয়। রাষ্ট্র হল দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনের ফল। কাজেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার যা নানা কার্যকারণের মিথস্ক্রিয়ায় বিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছে। মানবীয় সম্পর্ক (kinship), ধর্ম, সম্পত্তি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সচেনতা, শক্তি (force)- এরকম বহু উপাদান রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশে নানামূখী ভূমিকা পালন করেছে, কোনো একক উপাদানের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নি। Garner, Burgess, Leacock রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। লক্ষণীয় যে, এই মতবাদ পূর্বের সব মতবাদকে অকার্যকর সাব্যস্ত করছে।

উপরোক্ত মতবাদগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এসব মতবাদ শুধুমাত্র কতগুলো অনুমান ও ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কেননা কারো কাছে এটি নিশ্চিত রূপে সাব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই যে মানব সমাজে বাস্তবেই এরূপ ঘটেছিল, কোনো সন্ধি বা চুক্তি হয়েছিল বা কেবলমাত্র বল প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেছিল। বস্তুত এসব মতবাদের ভিত্তি বা উৎস হচ্ছে সেই সব গ্রিক দর্শন যা উৎসারিত হয় শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে। ফলে এসব মতবাদের অর্থ হল মানুষের স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই দুনিয়ায় আসা এবং কোনো কিছুর আপনা-আপনি হয়ে যাওয়ার ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এদের দৃষ্টি এই দৃশ্যমান জগতেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং যাদের কাছে সত্য ধর্মের আলো নেই, তাদের পক্ষে এমন অনুমান করে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা বলে:

"আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে, তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।[৩৪৩]

---

[৩৪৩] সূরা জাসিয়া, ২৪।

এজন্যই আল্লাহ কুরআনে তাঁর রাসূলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন:

"আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে, তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।"[৩৪৪]

যারা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত- এর উপর ঈমান রাখে, তাদের এমন অনুমানের উপর ভর করে চিন্তা ও কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন ইসলামের ওহির শিক্ষামালা এবং নির্ভেজাল অন্যান্য ওহির কিতাবধারীগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালামকে সৃষ্টি করে নিজের প্রতিনিধি তথা জমিনে শাসক বানিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন; সুতরাং আল্লাহই তাঁকে শাসক বানিয়েছিলেন এবং অন্যান্য যারা জন্ম নিয়েছিল, তারা প্রজা ছিল। সুতরাং, মানসসমাজের উপর এমন কোনো যামানা অতিবাহিত হয়নি যখন কোনো রাষ্ট্র ও এর শাসক ছিল না ফলে লোকসকল আইনকানুন বিহীন জীবন যাপন করেছে। কাজেই রাষ্ট্রের জন্মের জন্য কোনো সামাজিক সন্ধি বা চুক্তির প্রয়োজনই ছিল না এবং রাষ্ট্রবিহীন প্রাকৃতিক অবস্থা বা প্রকৃতির রাজ্য (state of nature) বলে কিছু ছিল না- এসব অবান্তর দর্শন ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তখন প্রথম মানবকেই একইসঙ্গে শাসক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে ঐশ্বরিক মতবাদ বা Theory of Devine Origin। কেবল মুসলিম নন, বরং সেইসব অমুসলিম দার্শনিকগণও এই মতবাদের প্রবক্তা যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী। এজন্য তারা 'স্রষ্টাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন'- এই সীমা পর্যন্ত একমত। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের লোকজন এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেশ ঠোকর খেয়েছেন এবং স্বেচ্ছাচারের ফলে পথচ্যুত হয়েছেন।[৩৪৫]

---

[৩৪৪] সূরা আনআম, ১১৬।

[৩৪৫] মুহাম্মদ তাকী ওসমানী। ২০১৪। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৩-৪৪।

মহাভারতে (একটি ঐতিহাসিক মহাকাব্য) বলা হয়েছে, পৃথিবীতে শুরুতে anarchy বা নৈরাজ্য অবস্থা ছিল, তখন মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরকে এসে তাদেরকে পরিত্রাণ দিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। তারা এই বলে প্রার্থনা জানাল: হে ঈশ্বর, প্রতিভূ ছাড়া আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমাদেরকে একজন প্রতিভূ দাও যাকে আমরা পূজা দেব এবং যে আমাদেরকে রক্ষা করবে। এ অবস্থায় ঈশ্বর মানুষকে শাসন করার জন্য মানুষকে নিযুক্ত করলেন।[৩৪৬] মহাভারতের এ ধরনের বক্তব্য ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়; অবশ্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, মহাভারত কোনো ওহি নয় এটি বেদব্যাস লিখিত একটি পৌরাণিক মহাকাব্য যাতে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, ইহুদি-খ্রিস্টান রাজা-পাদ্রি এবং তাদের যার যার অনুসারী সবাই নিজ নিজ স্বার্থের অনুকুলে এই তত্ত্বকে তাদের দণ্ডমুণ্ডের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। যারা গীর্জার একনিষ্ঠ ভক্ত-অনুরক্ত হত তারা রাষ্ট্রের উপর চার্চের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে আবার যারা রাষ্ট্রের শাসকের ভক্ত-অনুরক্ত তারা চার্চের উপর রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এই তত্ত্বকে ব্যবহার করত। প্রত্যেক ধ্বজাধারীরই একই যুক্তি যে চার্চের বা রাষ্ট্রের প্রধান স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও খোদাস্বরূপ, তিনি ঈশ্বরের নিকট ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ নন। চার্চ প্রধান ও রাষ্ট্র শাসকের এই একই দাবী ও এর ফলে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিস্তারের অনিবার্য ফল হত হানাহানি ও রক্তারক্তি, সাধারণ মানুষের প্রাণহানি। শাসক যেহেতু ঈশ্বরের মনোনীত প্রতিনিধি, ঈশ্বরের পরে দুনিয়ার ঈশ্বর তাই তাকে পদচ্যুত করার, তিনি প্রজা শাসনের নামে অন্যায়-অত্যাচারে ডুবে থাকলেও, কারো কোনো অধিকার ছিল না কিছু করার। রাজা যদি মন্দও হন তাহলে বুঝতে হবে যে এটি মানুষের পাপের শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে বৈধ পন্থায়ও রাজাকে হঠানোর কোনো অধিকার কারো নেই, যেহেতু রাজা ঈশ্বরের নিযুক্ত প্রতিনিধি। ইংল্যান্ডের

---

[৩৪৬] Without a chief, O Lord, we are perishing. Give us a chief whom we shell worship and who will protect us. It was under these circumstances that God appointed Manu to rule over the people. Cited in Mahajan. Ibid. pp. 250.

রাজা প্রথম জেমসের *The Law of Monarchies* গ্রন্থের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই বুঝা যাবে, কত ভয়ানকরকমভাবে মানুষকে বোকা বানিয়ে রাজাগণ নিজেদেরকে 'ধরিত্রির ঈশ্বর' বানিয়ে রাখতেন। রাজা প্রথম জেমস এই গ্রন্থে লেখেন:

> একজন রাজা কখনই মারাত্মক রকমের খারাপ বা দুশ্চরিত্র হতে পারেন না, যদিও হন তাহলে বুঝতে হবে যে এটি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্য হিসেবে প্রেরিত। মানুষের উচিত নয় রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করা। তারা যা করতে পারে তা হল ধৈর্য, উপাসনা ও জীবনের সংশোধন। ঈশ্বর রাজার বিচার করবেন, জনগণ বা দুনিয়ার কোনো আদালত নয়। রাজা জগতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তাই তিনিও ঈশ্বর।[৩৪৭]

এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়ার অর্থ হল, জনগণের কর্তব্যই কেবল নতশীরে রাজা বা শাসকের আনুগত্য করে যাওয়া, শাসকের কোনো অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ না করা, শাসক বদলের ন্যায্য কোনো চেষ্টাও না করা, তা শাসক যত খারাপই হোক। এটাই স্রষ্টার মর্জির অনুকূল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যে বাস্তবতা ও মানবতা বিরোধী তা আজ আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। একথা কুরআন ও হাদিসের আলোকে সঠিক যে, কখনও কখনও আল্লাহ তায়ালা মানুষের পাপের কারণে তাদের উপর জালিম কোনো শাসককে চাপিয়ে দেন। যেমন সূরা বনী-ইসরাইলে বল হয়েছে, 'বনী-ইসরাঈলের দাম্ভিকতার কারণে আমি তাদের উপর দুইবার জালিম শাসক নিযুক্ত করে দিয়েছি।' কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জালিম শাসককে নিরাপদ পন্থায় সরানোর চেষ্টা করা হবে না, বরং এটি ওয়াজিব। এভাবে দেখা যাবে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য সমাজ কীভাবে ধর্মহীন আর নাস্তিক্যবাদী ভ্রান্ত সমাজদর্শনের দিকে ধাবিত হয়েছে।

উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত এটি সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছে যে সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল তথা গ্রিক দার্শনিকগণ, রোমান দার্শনিকগণ, তাদের দ্বারা

[৩৪৭] Cited in Mahajan. *Ibid.* pp. 250.

প্রভাবিত পরবর্তী বা হাল আমলের পশ্চিমা দার্শনিকগণ- যারাই রাষ্ট্র ও সরকার পদ্ধতি নিয়ে বা এককথায় সমাজদর্শন নিয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করে জগতবাসীর খেদমতে যা পরিবেশন করেছেন তার সবকিছুই তাদের কল্পনার জাল ছাড়া কিছু নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা পূববর্তীগণের সুরে সুর মিলিয়ে গিয়েছেন। প্লেটো, এ্যারিস্টটলের কথাই ধরুন, দেখবেন কত দুর্বল চিন্তা তাঁরা সেকালে করে গেছেন। কালের বিচারে তাদের চিন্তা-চেতনাকে স্বাভাবিক ধরে নিতে পারি, সর্বোপরি তারা তো আর নবী-রাসূল ছিলেন না যে স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে শুনে শুনে চিরন্তন কথাগুলো আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু আধুনিক কালের সমাজ-দার্শনিকদের তরফেও যদি একই রকম উদ্ভট ও অবৈজ্ঞানিক কথা আমাদেরকে উপহার দেওয়া হয় তাহলে আমাদেরকে মানবজাতি সম্পর্কে সেই চিরন্তন কথাটিই তখন স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, এসব কথা এমন 'বুদ্ধিজীবীগণ' বলেছেন যাদের কাছে ওহী নাযিল হয় না, তাদের বক্তব্য কেবলই স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়প্রসূত আর ইন্দ্রিয় সীমাবদ্ধতা ও ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাঁরা কোথাও কোথাও অনেক সুন্দর সুন্দর কিংবা পবিত্র পবিত্র কথা বললেও তাঁদের ইন্দ্রিয়বিলাসজাত বস্তুবাদী দ্রব্য পরিশেষে কোনো যুগেই মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে নি, পারার কথাও নয়, বরং এমন সব অপব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যার খেসারত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বমানবতা দিয়ে যাচ্ছে।

গীর্জা–রাষ্ট্র দ্বন্দ্ব

ইউরোপে মধ্যযুগে গীর্জা ও রাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তারের পারস্পরিক লড়াই-সংগ্রাম এমনই ভয়াবহ ছিল যে, তাতে জনসাধারণের কল্যাণ চিন্তাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল; বরং জনগণ ছিল দ্বৈত-দাসত্বের অসহায় শিকার। গীর্জার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারীকে পাশবিক জুলুম-নির্যাতনের এমনকি নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত করা হত, অন্যদিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারীকেও একই পরিণতি বরণ করতে হত। গীর্জার প্রভাব কখনও কখনও এতটাই তীব্র হত যে খোদ সম্রাটেরই ঠিকে থাকা বেজায় কঠিন হত।

এমনও হত যে গীর্জার পোপের তলবে উপায়ন্তরহীন সম্রাটকে তৎক্ষণাৎ গীর্জায় হাজির হতে বাধ্য থাকতে হত, কিন্তু পোপ সম্রাটকে দর্শন দিতে অস্বীকার করতেন। তখন বিশিষ্টজনদের সুপারিশে পোপ কৃপাবশত দেখা দিতেন এবং অনুতপ্ত সম্রাট পোপের হাতে তওবা করে ক্ষমা লাভ করে প্রাণে বাঁচতেন। উদাহরণস্বরূপ রোমে ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ হিল্ডার ব্রান্ড ও সম্রাট চতুর্থ হেনরীর এমন ঘটনার কথা স্মরণ করা যায়। এ অবস্থায় সম্রাটগণ পোপদের এমন স্বৈরাচারি কোপানলের অবসানই কামনা করতেন। কেননা একে নিজেদের রাজত্বের জন্য অযথা উৎপাত ও হুমকি ছাড়া কিছু ভাবার সুযোগ ছিল না। যদিও গীর্জা ও রাষ্ট্রের জয়-পরাজয়ের পাল্লা ছিল দু'দিকেই কিন্তু এক সময় ইউরোপে গীর্জার প্রভাব ও প্রতাপ কমে আসে এবং সম্রাটদের বিজয় চূড়ান্ত হয়।

ভোগবাদ ও বৈরাগ্যবাদ

খ্রিস্টধর্মের আত্মবিপর্যয়ের পরিণতিতে একদিকে বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদ অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় অনাচার- সব মিলিয়ে খ্রিস্টবাদী রোমান সাম্রাজ্য তথা ইউরোপ আবর্জনার স্তুপে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এ সময় সাধু-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। লেকী লেখেন, সেন্ট জারুমের আমলে স্টার উৎসবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাধু-সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে নেতৃস্থানীয় একজন সাধুর অধীনে পাঁচ হাজার সাধু-সন্ন্যাসী ছিল, সাধু সেরাপীনের অধীনে ছিল দশ হাজার। চতুর্থ শতকের শেষ দিকে সাধু-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা মিশরের মোট জনসংখ্যাকেও প্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ দুই শতাব্দি পর্যন্ত সন্ন্যাসব্রতের নামে স্বভাব বিরুদ্ধ আত্মপীড়ন ও দেহ-নির্যাতনই ছিল খ্রিস্ট ধর্মের নৈতিকতার সর্বোত্তম আদর্শ। ইতিহাসে এ বিষয়ে ভয়াবহ চিত্র লক্ষ করা যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার সাধু ম্যাকারিউস নাকি দীর্ঘ ছয় মাস নোংরা জলাভূমিতে বাস করতেন, যাতে বিষাক্ত মাছি ও কীটপতঙ্গ তার নগ্নদেশ দংশন করতে পারে। অধিকন্তু সর্বদা তিনি এক মন ভারী লৌহদণ্ড বহন করে বেড়াতেন। তার শিষ্য সাধু ইউসিবিসের লৌহদণ্ডের ওজন ছিল দুই মন। কথিত আছে যে, তিনি একাধারে তিন বছর ধরে একটি পরিত্যক্ত কূপে বাস করেছেন। বিখ্যাত সাধু

যোহন সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে উপাসনা করতেন এবং এই সাধনা তিনি তিন বছর করেছেন। কারো পছন্দ ছিল বিবস্ত্রতা, এতে তারা লজ্জা ঢাকতো মাথার চুল দিয়ে, নিশ্চয় না কাটার ফলে চুল পা অবধি পৌঁছে যেত, আর চলাফেরা করতো চতুস্পদ জন্তুর মতো হাতে-পায়ে ভর দিয়ে। সাধু-সন্ন্যাসীরা সাধারণত বনে-জঙ্গলে বাস করতেন, ফলে ঐ জীবন জীব-জন্তুর থেকে আলাদা হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তাদের মত ছিল, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা আত্মার পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর, তাই গোসল বা অঙ্গ ধোওয়াকে তারা বড় পাপ মনে করতেন। সাধু এ্যাথিনিউস গর্ব করে বলতেন, সাধু এ্যান্থিনিউ সারা জীবনে একবারও পা ধোয়ার পাপ করেন নি! সাধু আব্রাহাম দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কখনও পায়ে, হাতে-মুখে পানি লাগান নি। অর্থাৎ, যে যত বেশি এ ধরনের সন্ন্যাসব্রতী জীবন-যাপন করতে পারতেন তিনি ধার্মিকতায় তত বড় উর্ধ্ব স্তরে আছেন বলে মনে করা হত, কিংবা যে যত বেশি উর্ধ্ব স্তরের ধার্মিক হতেন তিনি তত বেশি সন্ন্যাসব্রতী হতেন। সাধু আলেকজান্ড্রার দুঃখ করে বলেছিলেন, একটা সময় এমন ছিল যে মুখ ধোয়াও পাপ ছিল, আর এখন আমরা হাম্মামখানায় গোসল করি, কোথায় আমাদের ধার্মিকতা ও সন্ন্যাসব্রত!

শুধু তাই নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা জনপদে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াত এবং শিশুদেরকে অপহরণ করে নিয়ে বৈরাগ্যবাদ ও সন্ন্যাসব্রতের তালিম দেওয়া হত। কখনও প্রকাশ্যে বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হত, এতে বাবা-মা, এমনকি নগর প্রশাসনেরও কিছু বলার থাকত না। সমাজপতিরা এতে সমর্থন দিত। ইতিহাসে অনেক সাধু এভাবে 'অপহরণ-খ্যাতি' অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ভোক্তভোগীরা তো এতে ঠিকই অতীষ্ট ছিল কিন্তু তারা ছিল অসহায়। সাধু এ্যামব্রোজকে দেখা মাত্র মায়েরা সন্তান নিয়ে দৌড় দিত এবং ঘরে ঢুকে খিল দিত। যেসব সন্তান স্বেচ্ছায় বাবা-মাকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করত তাদের নামে শ্লোগান দেওয়া হত। সন্তানদের উপর অধিকার

বাবা-মায়ের বদলে সাধু-সন্ন্যাসীদের হাতে চলে গিয়েছিল। কোনো সাধু-পাদ্রী সন্তান দাবী করলে তার পছন্দকে প্রত্যাখ্যান করার কারো ক্ষমতা ছিল না।[৩৪৮]

স্বভাব বিরুদ্ধ এ সবকিছু মানুষের জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল। পরকালের জন্য সন্ন্যাসব্রত চালু ছিল, কিন্তু জীবন, সমাজ ও দায়-দায়িত্বকে অস্বীকার করা হয়েছিল। পরিবার বাঁচবে কী মরবে তা নিয়ে এরা কখনই বিচলিত ছিল না। এরা কন্যা-জায়া, এমনকি জননীর সঙ্গে কথা বলাকেও আত্মিক কলুষতা মনে করত। এভাবে ঐ সমাজে মানবীয় দয়া-মায়া, সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, মহত্ব এক কথায় স্বাভাবিক মনুষ্য গুণাবলি- তার সবকিছু লোপ পেয়েছিল যা ছাড়া মানব সমাজ অর্থহীন এক নিস্প্রাণ পাথর এবং অবস্থান করে নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক স্তরে। অথচ, এই বৈরাগ্যবাদ রোমান সমাজের নির্লজ্জ ভোগবাদের ঢেউয়ে কোনই আঁচড় ধরাতে পারে নি, যা অন্যদিকে সমাজকে ধ্বংসের শেষ গহ্বরে নিয়ে ছেড়েছিল। বিকৃত খ্রিস্টধর্ম কোনো অর্থেই সমাজকে সহজাত জীবনের সুখ দিতে পারে নি। একদিকে বৈরাগ্যবাদ অন্যদিকে ভোগবাদ– দু'টোই ছিল দুই চরমপন্থার নামান্তর যা বাতিল ছাড়া কিছু ছিল না, এ দুইয়ের মাঝখানে গোটা সমাজ ধ্বংস হয়েছিল। লেকীর এ প্রসঙ্গের বিবরণ পড়ে চোখে জল না এসে পারে না। ভোগবাদ ও বৈরাগ্যবাদের মাঝখানে কেমন ছিল সেই সমাজ তা লেকী খুব সুন্দর করে আমাদের জন্য লিখে রেখে গেছেন। লেকীর ভাষায়:

> মানুষের চরিত্রে ও সমাজ জীবনে অবক্ষয় ছিল চরমে। চারদিকে ছিল কেবল ভোগ-বিলাস ও পাপাচারের জোয়ার। রাজসভা ও অভিজাত পাড়ার জলসায় ছিল চাটুকারিতা ও তোষামোদের নগ্ন প্রতিযোগিতা, সাজসজ্জা, অলংকার ও বেশভূষার সীমাহীন প্রদর্শনের বাড়াবাড়ি। অন্যদিকে কিছু লোক সমাজ জীবন পরিত্যাগ করে ডুবে ছিল বৈরাগ্যবাদের আত্মপীড়নের নিষ্ঠুর সাধনায়। এভাবে জীবন ও সমাজ একই সময়ে দুই চরমপন্থা- বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের দোলায় দুলছিল। আশ্চর্যজনক হল, যেসব জনপদে সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাগম বেশি ঘটেছে, অনাচার ও পাপাচারের

---

[৩৪৮] W. E. H. Lecky. *Ibid.* pp. 332-335.

> বাজার সেখানেই ছিল বেশি গরম। মানুষের জীবনে তখন পাপাচার ও কুসংস্কার একাকার হয়ে গিয়েছিল।..... মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা এবং জাতীয় চেতনা ও উদ্দীপনার ক্ষেত্রেও ছিল কেবলই অবক্ষয়।[৩৪৯]

এই ভোগবাদ একসময় গীর্জাসমূহেও ছেয়ে যেতে শুরু করে, অথচ যাদের সাধনাই ছিল এই ভোগবাদের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের ফিতরত বা স্বভাবজাত বিরোধী কোনো রীতি-নীতিই তাকে পরম কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। যদিও ভোগবাদ নতুন কিছু ছিল না এবং আজও বিভিন্ন সমাজে বর্তমান, কিন্তু স্বভাব বিরোধী হওয়ার ফলে ভোগবাদের চরম বিরোধী বৈরাগ্যবাদও এক সময় ভোগবাদের জোয়ারে ভেসে যেতে শুরু করল। বলা যায়, ভোগবাদের মনকাড়া প্রলোভনের কাছে সাধু-সন্ন্যাসীরা নতশীর হলেন। শুধু তাই, ভোগবাদে গীর্জা এক সময় এতটাই ডুবে গেল যে, শেষ পর্যন্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অনাচার-পাপাচার, নৈতিক অবক্ষয়ে ভোগবাদের প্রবক্তা, ধারক-বাহকদেরকেও ছাড়িয়ে গেল, যার কারণে সরকার এক সময় ধর্মীয় ভোজসভার প্রচলিত রীতি নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হল। অথচ এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি জোরদার করা। একইরকমভাবে, শহীদান ও ধর্মীয় পুরুষদের স্মৃতিসভা ও মৃত্যু বার্ষিকীর উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হয়েছিল। কেননা এসবই তখন ধর্মের নামে অনাচারের বড় আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। বড় বড় পাদ্রীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক মারাত্মক নৈতিক স্খলনের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। সাধু জ্যারুম বলেন,

> গীর্জার পাদ্রী-পুরোহিতদের ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার তুলনায় অভিজাত, বিত্তশালী ও রাজপুরুষদের স্বেচ্ছাচার ও ভোগবাদীতাও ছিল নস্যি। স্বয়ং ধর্মপ্রধান পোপ ছিলেন মারাত্মক নৈতিক স্খলনের শিকার। অর্থলোভ ও সম্পদ লিপ্সা এমনভাবে তাদেরকে পেয়ে বসেছিল যে ধর্মীয় পদ ও মর্যাকে তারা সাধারণ পণ্যের মতো নিলামে তুলেছিলেন। স্বর্গের টিকেট ও ক্ষমার সার্টিফিকেট বিক্রি করে দেদার পয়সা কামানো হত। কাগুজে মুদ্রা বা ডাক টিকিট ছাপানোর মতো আইন ভঙ্গ করার অনুপতিপত্র

---

[৩৪৯] *Ibid.*

ও হালাল-হারামের সনদ জারি করা হত। ঘুষ ও সুদের কারবার ছিল ওপেন-সিক্রেট বিষয়। অপচয় ও অপব্যয় এমন ছিল যে পোপ ইনোসেন্ট তার পোপীয় মুকুট পর্যন্ত বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। পোপ দশম লিউ সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি পূর্ববর্তী পোপের রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পদ এবং নিজের অংশের সম্পদ সাবাড় করে ফেলেছিলেন। এখানেই শেষ ছিল না, বরং ভাবি পোপের আয়ও আগাম উশুল করে তাও উড়িয়েছিলেন। এভাবে তিন পোপের সম্পদ লেগেছিল তার একার ভোগে। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সমগ্র ফ্রান্সের আমদানিও পোপ সাহেবের ভোগ-চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য যথেষ্ট হত না।[৩৫০]

গীর্জার ইতিহাস ও গীর্জাপতিদের জীবনাচার ছিল আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তব চিত্র:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! সমাজপতি ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"[৩৫১]

রোমের পোপগণ বিষয়াসক্তি ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার শিকার না হলে তাদের এতটা শক্তি-সামর্থ্য ছিল যে, তাদের এক ইশারায় ইউরোপ একযোগে এমন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারত যা দেখে পৃথিবী অবাক হয়ে যেত। তারা অবাধে যে কোনো দেশে যেতে পারতেন এবং বিপুল সাদর-সংবর্ধনা লাভ করতেন। আয়ারল্যান্ড থেকে বোহিমিয়া, ইটালি থেকে স্কটল্যান্ড যে কোনো অঞ্চলের যে কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাব

---

[৩৫০] John William Drapar. *Ibid.*
[৩৫১] সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৪।

বিনিময় করতে পারতেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। কারণ তাদের ভাব বিনিময়ের ভাষা ছিল অভিন্ন। প্রত্যেক দেশেই তারা এমন চৌকশ মিত্র ও সহযোগী পেয়েছিলেন যারা একই ভাষায় কথা বলত এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে যে কোনো সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত হত। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের দুর্ভাগ্য এবং যারা এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদেরও দুর্ভাগ্য যে, গীর্জার অধিপতি ও ধর্মনেতাগণ তাদের বিপুল ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার করেছেন। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় চেতনার অনুকূলে তা ব্যবহার না করে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে ইউরোপ যেমন ছিল তেমনি মূর্খতা ও কুসংস্কার এবং পাপাচার, অনাচার ও প্রবৃত্তিপূজার আবর্তেই ডুবে থাকল এবং উন্নতি ও অগ্রগতির পরিবর্তে নগর সভ্যতা ধীরে ধীরে অধঃপতনের শিকার হতে থাকল।[৩৫২] Drapar লিখেন, দীর্ঘ এক হাজার বছরেও ইউরোপ মহাদেশে এবং পাঁচশ বছরেও ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে নি। এর জন্য দায়ী ছিল গীর্জার অদূরদর্শি পাদ্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা যারা কৌমার্যব্রতকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে মানুষকে তাতে উৎসাহিত করত। তাদের হেন অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের প্রভাবে সমাজে ব্যাপকভাবে বিবাহ বিমুখতা সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকন্তু মানুষ যেন চিকিৎসকের চিকিৎসা নিতে অনুৎসাহ বোধ করে সে বিষয়ে গীর্জা খুব তৎপর থাকত। কারণ, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসক সমাজ গীর্জার ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসার মাধ্যমে আয়-রোজগার তথা আর্থিক স্বার্থের প্রতিপক্ষ ও বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফল হয়েছিল এই- ইউরোপ জুড়ে ব্যাপক রোগ-ব্যাধি ও ভয়াবহ মহামারি দেখা দিত এবং মানুষ বিনা চিকিৎসায় ও অপচিকিৎসায় মারা যেত। বরং কখনও কখনও মৃত্যুর ধুম লেগে যেত।[৩৫৩]

---

[৩৫২] John William Drapar. *Ibid.*
[৩৫৩] *Ibid.*

ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব, গীর্জার অপরিণামদর্শিতা

গীর্জার কর্ণধারেরা বা একদল ধর্মগুরুরা এবার চরম মূর্খতার পরিচয় দিয়ে ধর্মগ্রন্থে হস্তক্ষেপ করার মতো ভয়ঙ্কর অপরাধে জড়িয়ে পড়লেন যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। তারা ধর্মগ্রন্থে এমন নানা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক তথ্য ও তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটাল যা সমসাময়িক জ্ঞান-গবেষণায় স্বীকৃত ছিল। কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তখন ঐ সীমা পর্যন্তই পৌঁছেছিল আর তারা সেটাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা মানব জ্ঞানের শেষ সীমা ছিল না ফলে মনুষ্য রচিত এই পরিবর্তনের ভ্রান্তি ধীরে ধীরে এক সময় ফুটে উঠতে শুরু করল। এর কুপ্রভাব এই হল যে মানুষের বয়ানকৃত এই ধর্ম এক সময় প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ফলাফলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াল, যা-ই হওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়টি ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ ছিল। গীর্জার পুরোহিতরা ধর্মের নামে যেসব স্ব-রচিত ঐসব অবৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করেছিল তা একদিকে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীর অপরিহার্য ধর্ম বিশ্বাসে পরিণত হল যেসব বিষয়ের স্বপক্ষে ওহির কোনো সনদ ছিল না, এসব *Christian topography* নামে অভিহিত হল।

খ্রিস্টান পাদ্রী-পুরোহিতরা ধর্মগ্রন্থ বিকৃতির এই অপরিণামদর্শী কাণ্ড এমন এক সময় করেছিল যখন ইসলাম ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রভাবে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির এক বৈপ্লবিক জাগরণ শুরু হয়েছে। গীর্জা ও রাষ্ট্রের যুদ্ধংদেহী বাদানুবাদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কাছে গীর্জার পরাজয় শুরু হয়েছিল যা একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। অন্যদিকে গীর্জার বৈরাগ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে পরিণতিতে মানুষের কাছে বাহবা কুড়াতে ব্যর্থ হয়েছিল যেহেতু এটি কেবল প্রকৃতি বিরোধীই ছিল না, এটি একটি উৎপীড়নও ছিল যা সাধারণ মানুষকে উৎপাতে জর্জরিত করেছিল। কিন্তু সেই বৈরাগী সাধু-সন্ন্যাসীরাই যখন ভোগবাদ এবং তার ফলে নানা অনাচার-অবিচারে রাজা-বাদশা ও অভিজাতদেরকেও হার মানালেন, তখন এটি মানুষকে আরো বেশি বিস্মিত করেছিল। এই বিস্ময় গীর্জার পাদ্রী-পুরোহিতদের প্রতি অনাগ্রহ ও ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছিল, যারা ত্যাগ ও ঈশ্বর

মহিমার কথা বলে মানুষের সঙ্গে নিছক শঠতা ও প্রতারণা করে যাচ্ছিলেন। এখন ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি গীর্জার আত্মহত্যার শেষ পর্ব হিসেবে ভূমিকা পালন করল। কেননা জ্ঞান-গবেষণার সঙ্গে এসব বিকৃত তথ্য ও তত্ত্ব কেবল সাংঘর্ষিকই ছিল না বরং মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছিল।

সামগ্রিক কারণে, গীর্জার নামে প্রকারন্তরে বিজ্ঞান ও যুক্তির কাছে ধর্ম বারবার পরাস্ত হয়েছে যার পর ইউরোপের মাটিতে গীর্জা ও ধর্ম আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। দুর্ভাগ্যজনক হল যে, অপরাধ করেছে গীর্জা বা কতিপয় বিভ্রান্ত পাদ্রী-পুরোহিত দল, কিংবা খুব বেশি হলে খ্রিস্টধর্ম, এর প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপ ধর্ম নামে যা কিছু আছে তার সব কিছুর প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল এবং এভাবে একটি ধর্মহীন ও ধর্ম বিদ্বেষী ইউরোপ আত্মপ্রকাশ করল।[৩৫৪]

ইউরোপের চিন্তানায়ক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবীগণ প্রথমত, ধর্মের অন্ধ আনুগত্য ও গীর্জার বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের শিকল ছিন্ন করে ফেললেন; দ্বিতীয়ত, ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশিত অবৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বকে বিনা প্রমাণে 'ঈমান বিল গায়েব' বলে মেনে নেওয়ার দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুক্তি-প্রমাণের জোরালো পন্থায় সেসবের কঠোর সমালোচনা করলেন। এক তো ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীগণ জ্ঞান-গবেষণায় ছিলেন গ্রিক মানসপুত্র যার পরিচয় আমার এই অধ্যায়ের শুরুতে পেয়েছি, এখন এই পদ্ধতি ও আদর্শ বাস্তবিকভাবে কাজে লাগল। কিন্তু এতে মিথ্যার মুখোশ উন্মোচনের নামে ধর্ম নামক গোটা বিষয়কে অবৈজ্ঞানিকরূপে একই আদর্শের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে গোটা ইউরোপকে তারা আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিলেন, যে ধ্বংস থেকে গোটা পাশ্চাত্য আজও বের হতে পারে নি। অথচ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও যুক্তিবাদ- গ্রিক চিন্তা-চেতনার এই দর্শন সর্বত্র সঠিক মানদণ্ড নয়, অন্তত ধর্মীয় ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের ক্ষেত্রে তো বটেই। কিন্তু ইন্দ্রিয়বাদী এসব বুদ্ধিজীবীরা যখন তাদের গবেষণা ফলাফল

---

[৩৫৪] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩১২।

প্রকাশ করতে শুরু করলেন যা ছিল গীর্জার সঙ্গে সাংঘর্ষিক তখন গীর্জাসমূহ আরেক ভুল পথে পরিচালিত হল।

তা ছিল এই, ধর্মনেতারা যারা ইউরোপে তখনও ক্ষমতার অন্যতম নিয়ন্তা ছিলেন, এসব বিজ্ঞানী, দার্শনিকদেরকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে খ্রিস্টধর্মের নামে এদেরকে হত্যা করার ও তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দিয়ে বসলেন। গীর্জার পক্ষ থেকে court of inquisition (তদন্ত আদালত) গঠন করা হল যাতে পোপের ভাষায়- ঐসব অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহীদেরকে খোঁজে খোঁজে ধরে এনে শাস্তি দেওয়া যায়। আদালত ও পেয়াদারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই হুকুম তামিল করে গেল। অনুমান করা হয়, এর ফলে যাদের সাজা হয়েছিল তাদের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বত্রিশ হাজার জনকে।[৩৫৫] আগুনে পুড়িয়ে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনোও। কাম্পো দে ফিওরির প্রকাশ্য স্থানে খুঁটিতে বেঁধে এই বিজ্ঞানীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ব্রুনো জগতের একাধিকতায় বিশ্বাস করতেন এবং মনে করতেন যে, পৃথিবীর বাইরেও প্রাণীর বসবাস থাকতে পারে– গীর্জার চোখে এই ছিল তাঁর অপরাধ, কেননা সেকালের প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে এটি বিরোধী মত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও মত প্রকাশ করতেন যে, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এ কারণে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। গীর্জার চাপে বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর মত প্রত্যাহার করলে তাঁকে একাকী অন্তরীণ করে রাখা হয় এবং সেই অন্ধকার কুঠুরীতেই তিনি মারা যান, মৃত্যুর পূর্বে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ভয়ঙ্কর পরিণতি

এই অশুভ পরিস্থিতি ও নিষ্ঠুরতার শেষ পরিণতি হল যে, তা গীর্জাকে শেষ রক্ষা করতে পারে নি, বরং গীর্জার অপরিণামদর্শিতা, ধর্মের নামে অধার্মিক

---

[৩৫৫] প্রাগুক্ত।

কার্যকলাপের সমূহ ফল মানুষকে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল যা ছিল গোটা দুনিয়ার জন্যই বড়ো ভয়ঙ্কর। একদিন মানুষের ক্ষোভ ছিল গীর্জার ভোগবিলাস ও অনাচারের বিরুদ্ধে, এখন বিজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির প্রশ্নেও এই দল ভারী থেকে ভারী হতে লাগল। ফলে প্রগতিশীলদের যে যুদ্ধ ছিল খ্রিস্টান ধর্মনেতাদের, আরো সঠিকভাবে বললে সাধু পলের ধর্মমতের বিরুদ্ধে, সেটাই এখন বিজ্ঞান বা মুক্তবুদ্ধি বনাম ধর্মের যুদ্ধে পরিণত হল।

মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তারা কোনো রকম চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন যে ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী বিষয় যাদের প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব। সুতরাং, যুক্তি ও বুদ্ধিতে যে বিশ্বাসী, ধর্মে তাকে অবিশ্বাসী না হয়ে উপায় নেই। যখনই তাদের সামনে ধর্ম প্রসঙ্গ আসত তখনই তাদের চোখে ভেসে উঠত পবিত্র ও নির্দোষ রক্তের স্মৃতি যা ধর্মের নামে প্রবাহিত করা হয়েছিল, ভেসে উঠত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ সেই সকল মহাত্মাদের পবিত্র স্মৃতি যারা গীর্জার পাদ্রীদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার পাশবিক বলি হয়েছিলেন। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত জল্লাদরূপী সেই সব নরপশুদের বীভৎস চেহারা যাদের চোখ থেকে ঠিকরে বের হত শুধু প্রতিহিংসার পাশবিক আগুন, যাদের হৃদয় ছিল দয়া-মায়া, ক্ষমা ও মমতাশূন্য এবং যাদের মস্তিষ্ক ছিল যুক্তি-বুদ্ধি বঞ্চিত। তাই মানুষরূপী ঐ পশুদের প্রতি তাদের হৃদয়ে জমে উঠেছিল সারা দুনিয়ার ক্রোধ ও বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা। এই ঘৃণা কেবল তাদের বিরুদ্ধে ছিল না বরং তারা যে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করত তারও বিরুদ্ধে, এমনকি অন্যান্য ধর্মেরও বিরুদ্ধে। এই অন্ধ ধর্মবিদ্বেষই ছিল তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। এমনকি পরবর্তী বংশধরদের জন্যও তারা তা উত্তরাধিকাররূপে রেখে গিয়েছে।[৩৫৬]

[৩৫৬] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৩১৪-৩১৫।

বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য

গীর্জার পাদ্রী-পুরোহিতরা যেভাবে ভুল পথে হাঁটলেন, সঠিক ধর্মাচার ভুলে, মানবতার সকল দাবী ভুলে, তারা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় যেভাবে রক্তগঙ্গায় স্নান করলেন, ঠিক তেমনি বুদ্ধিজীবী চিন্তানায়কগণও বুদ্ধির ভুল পথ ধরলেন। এই বুদ্ধিবাদীদের সেই পরিমাণ ধৈর্য, স্থিতি ও যোগ্যতা ছিল না যাতে জ্ঞান ও অধ্যয়নমনস্কতার দ্বারা তারা ধীর-শান্ত মস্তিস্কে গভীর চিন্তা-পর্যালোচনার মাধ্যমে ধর্ম ও ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকে আলাদা করতে পারতেন যে, ধর্মের নামে যা কিছু হয়ে গেছে তাতে ধর্মের দায় কতটুকু আর ধর্মনেতাদের মূঢ়তা, মুর্খতা ও ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব কতটা দায়ী? তাহলে ধর্মকে কাঁধের জোয়াল ভেবে ছুঁড়ে ফেলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হত না এবং এর ফলে মানব সভ্যতারও অপূরণীয় সর্বনাশ হত না। কিন্তু বাস্তবে অনুচিতটাই ঘটল।

বুদ্ধিবাদীদের মানসিক অস্থিরতা ও ক্ষিপ্রতা ছিল এতটাই বাঁধভাঙ্গা ফলে ধর্ম বিষয়ে সুস্থ চিন্তা করার তাদের ক্ষমতাই লোপ পেয়েছিল। পৃথিবীতে অধিকাংশ বিপ্লবী, প্রতিবিপ্লবী ও বিদ্রোহী দলের স্বভাব প্রবণতা এমনই হয়ে এসেছে। সুতরাং ইতিহাসের সিদ্ধান্ত এই যে, এই অঘটনের জন্য যদি প্রথম দল হয় প্রধান আসামী এবং তারা অবশ্যই তাই, তবে সে জন্য ধর্মকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বদকার ধর্মনেতাদের শাস্তি ধর্মের উপর চাপানো এবং জীবন ও সভ্যতার অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসন করা ছিল দ্বিতীয় দলের অনেক বড় অবিচার যা শুধু তাদের নিজেদের প্রতি ছিল না, ছিল গোটা মানবজাতির প্রতিও।

প্রধানত ধর্ম বিষয়ে ঐতিহাসিক ভ্রান্ত উত্তরাধিকার যা ছিল ইন্দ্রিয়বাদের অন্ধ-বন্ধনা যা তারা যুগ যুগ ধরে লাভ করেছিল এবং সমসাময়িক অশুভ পরিস্থিতি যা ছিল ধর্মনেতাদের ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্বের ফল– এসবের ফলে ধর্ম নামীয় বিষয়টি এবং মানব জীবনের সঙ্গে এর অপরিহার্য সম্পর্ক ও চিরন্তন শুভফল সম্পর্কে ঐসব বুদ্ধিবাদী হিউম্যানিস্টরা কোনদিনই আর সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারেন নি। এসমস্ত কারণে তাদের মধ্যে এই চিত্তচেতনাও জাগেনি যাতে তারা ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারেন, যে

ধর্মের অনুসারী ছিল তাদেরই সমসাময়িক জাতিবর্গ, যে ধর্ম খুব সহজেই বিপর্যকর এ দ্বন্দ্ব-সজ্ঞাত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারত। কারণ ইসলামের মূল কথাই হল কুরআনের ভাষায়: "সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রাসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।"[৩৫৭] কিন্তু আমাদেরকে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে এ সময়ে ইউরোপে ইসলামের প্রচার-প্রসারে মুসলিম উম্মাহ মারাত্মক উদাসীনতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। ইসলামের মহিমা প্রচারের সময় ও সুযোগকে মুসলমানরা এ সময় কাজে লাগান নি। অথচ এ সময় এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল।

পাশ্চাত্যের ধর্ম বস্তুবাদ

ইউরোপ এবং তৎপর গোটা পাশ্চাত্যে এভাবে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র- রুচিবোধ, বিশ্বাস, বুদ্ধিবৃত্তি, শিক্ষা ও শিল্প-সাহিত্য, সামাজিক সম্পর্ক, রাজনীতি- জীবনের সকল ক্ষেত্রে জড়বাদ ও বস্তুবাদের নিরঙ্কুশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এক্ষেত্রে ইউরোপের সকল বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীমহলই প্রকাশ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও ধর্মকে অস্বিকারকারী ছিলেন না। কিন্তু জ্ঞান-গবেষণায় যে দর্শন ও পদ্ধতি তারা অনুসরণ করেছিলেন, তাতে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ইউরোপীয় দার্শনিক, বিজ্ঞানীদের গবেষণার দার্শনিক পদ্ধতি হল ইন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবাদ– যা কিছু ইন্দ্রিয়জাত

[৩৫৭] সূরা আরাফ। আয়াত: ১৫৭।

তাতে বিশ্বাস, যা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত তাতে অবিশ্বাস এবং যুক্তি ও প্রামাণিকতা দ্বারা কোনো কিছুকে গ্রহণ করা, যুক্তি ও প্রমাণের অতীত হলে বর্জন করা। অথচ ধর্মের ভিত্তিই হল ঈমান বিল গায়েব, অহী ও রিসালাত, আখিরাত ও পরকাল ইত্যাদির উপর। এসব কোনটিই ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা অনুভবযোগ্য নয়, যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণযোগ্যও নয়। বিশ্বাসের প্রশ্নটি মূলত অদৃশ্যের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, দৃশ্যমান বিষয়ে ঈমানের প্রশ্ন অবান্তর। অদৃশ্যকেই বিশ্বাস করতে হয়, দৃশ্যমানকে বিশ্বাস কে না করে। সেজন্যই আল-কুরআনের শুরুতে বলে দেওয়া হয়েছে, এটি (কুরআন) পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকিদের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে...। "[৩৫৮]

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের কোনো শেষ নেই, আজ যা সত্য কালই তা মিথ্যে হয়ে যায়। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। সুতরাং বিজ্ঞান জগতেও শেষ বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানই যদি চূড়ান্ত মানদণ্ড হত তাহলে হয়তো কুরআনে বলা হত, এটি পথ প্রদর্শনকারী বিজ্ঞানমনস্কদের জন্য। সুতরাং, অদৃশ্যকে বিশ্বাসের মানদণ্ড যদি হয় ঈন্দ্রিয়বাদ ও যুক্তিবাদ বা প্রমাণবাদ তাহলে এই ক্ষমতা কোনো বিজ্ঞানীর নেই যে তারা তাদের এসব দার্শনিক পদ্ধতির আয়নায় আল্লাহ্, বেহেশত, দোযখ, পরকাল ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়কে ইন্দ্রিয় ও যুক্তি দ্বারা দৃশ্যমান করে প্রমাণ করে দেবেন। দুনিয়ার তাবৎ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক বা বুদ্ধিবাদীগণ, যারা ইন্দ্রিয়বাদ, যুক্তি-প্রমাণ ও বিবেককে একমাত্র পদ্ধতি বা মানদণ্ড হিসেবে ধার্য করেছেন- তাদের কাছে এমন কোনো সর্বজনীন মানদণ্ড নেই যার নিরিখে জাগতিক জীবনের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক যে কোনো বিষয়েও ঐকমত্যে পৌঁছা যায়। কারণ ইন্দ্রিয়বাদ, যুক্তি-প্রমাণ ও বিবেক স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক, একজনের কাছে বা এক স্থান-কাল-পাত্রে যা সঠিক ও ন্যায্য বলে মনে করা হয়, ভিন্ন একজনের কাছে বা ভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রে সেটাই অন্যায্য বা ভুল মনে করা হয়। তাহলে? মানুষের কাছে এসব বিষয়

---

[৩৫৮] বাকারা : ১-৩।

নির্ধারণের জন্য একটি জিনিসই মাপকাঠি বা মানদণ্ড হতে পারে, তাহল ধর্ম। কিন্তু ধর্মের সম্পর্ক যেহেতু মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে আর ইন্দ্রিয়বাদী ঐসব সেক্যুলার দর্শনে যেহেতু তার স্থান নেই, তাই একে [বস্তুবাদী দার্শনিক পদ্ধতি] আমরা একটি ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না।

যাই হোক জড়বাদী বুদ্ধিজীবীগণ এই নিশ্চিত ভিত্তির উপর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন যে, জগৎ সৃষ্টি ও এর পরিচালনা বিষয়ে অলৌকিক কোনো শক্তি বা সত্তা বলে কিছু নেই। এরা তাদের চিন্তাভাবনাকে নাম দিলেন নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলে এবং একেই রংচং মাখিয়ে আকর্ষণীয় করে জনসম্মুখে প্রকাশ ও প্রচার শুরু করলেন। দুর্ভাগা জনতা এটাকেই আসল সত্য বলে গ্রহণ করতে থাকল। অন্যদিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে স্পর্শ করে এমন যে কোনো চিন্তা-গবেষণাকে এরা অবজ্ঞাভরে সেকেলে, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক বলে চিহ্নিত করলেন। অর্থাৎ, ইউরোপের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল দার্শনিক-বিজ্ঞানীগণ জ্ঞান-গবেষণায় তাদের আদর্শের পূর্বপুরুষ গ্রিক-রোমানদের বাতলানো যে পন্থা অনুসরণ করলেন, তা তাদেরকে এভাবে দৃশ্যমান জগৎ ও বস্তু ছাড়া অন্য সবকিছুকে অস্বীকারের পথেই নিয়ে গেল। এভাবে উনিশ ও বিশ শতকে ইউরোপে যে জীবন ও সমাজ তৈরি হল তা প্রাচীন গ্রিক-রোমান জড়বাদী চিন্তা-চেতনার সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়।

পাশ্চাত্যে যদিও শিথিলভাবে ধর্ম নামে একটি বিষয়কে ঠিকিয়ে রাখার চেষ্টা লক্ষ করা গেছে, কেননা ইউরোপীয় রেনেসাঁর ধারক-বাহকরা তখনও ধর্মের বন্ধন থেকে শতভাগ বিমুক্ত হতে পারে নি; কিন্তু বস্তুবাদী সভ্যতার গতি এত প্রবল ও চোখ ধাঁধানো ফলে ধর্ম ও ধর্মীয় রীতি-নীতি এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে নি। এসময় বিপুল সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে যারা সমানতালে জড়বাদের শিঙ্গায় ফুঁক দিতে শুরু করেন এবং সভ্যতার আপাদমস্তক মন-মগজ ও জীবনকে বস্তুবাদের যাদুমায়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন। হবস, লক, রুশো, মিল, ম্যাকিয়াভেলী, ভলটেয়ার, মন্টেস্কু, স্পেন্সার, ডারউইন, মার্কস, রাসেল, স্পিনোজা,

দেকার্তে, নীটসে, দেরিদা, ফুকু- এরকম অসংখ্য বস্তুবাদী গুণীজনদের নাম উল্লেখ করা যায় যারা এই পার্থিব মঞ্চের যোগ্য কুশীলবের ভূমিকা পালন করে পরবর্তীদের জন্য বস্তুবাদের সিলসিলা রেখে গেছেন। এসব কুশীলবদের কাছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে সামাজিক বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা থেকে প্রাত্যহিক নীতি-নৈতিকতা, জীবন ও জীবনাচার- সবকিছুর ছিল বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, এতে তারা কখনও পেতেছেন আত্মস্বার্থদর্শনের মাহাত্ম্য, কখনও অবাধ ভোগবাদের মহিমা। ধর্মকে তারা গণ্ডিবদ্ধ করেছেন ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে, রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতির সঙ্গে তাদের মতে, যার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মতে, পরকাল বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তার সম্পর্ক কেবল খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে। ধার্মিক লোকেরা গীর্জা ও ধর্মব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তারা উপযোগী ও কল্যাণকর নয়। জার্মান নওমুসলিম আসাদ এই সমাজের সদস্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর লেখেন:

> পাশ্চাত্যে এখনও এমন অনেক আছেন যারা একটি বিশুদ্ধ ধর্ম নিয়ে ভাবেন ও নিজস্ব সভ্যতায় নিজ বিশ্বাস ও আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেন, তবে এদের বিষয়টি ব্যতিক্রম হিসেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। সাধারণ চিত্র হল পাশ্চাত্যের মানুষ তা তিনি সমাজতন্ত্রীই হোন বা পুজিবাদীই হোন, গণতন্ত্রী বা স্বৈরাচারী হোন, শ্রমিক বা বুদ্ধিজীবী হোন তারা জীবনের একটিই লক্ষ্য বুঝে, তা হল বস্তুর পূজা, বস্তুবাদী জীবনের ক্রমোন্নতি, এ ছাড়া জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।[৩৫৯]

আসাদ আরো লেখেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা খোলাখুলি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, কিন্তু প্রকৃত এই সভ্যতার চিন্তা-ব্যবস্থায় আল্লাহর কোনো স্থান ও আল্লাহকে নিয়ে চিন্তার উপস্থিতি নেই। Joad তাঁর *Philosophy of Our Times* গ্রন্থে লেখেন, কয়েক শতাব্দী ধরে ইংল্যান্ডের চিন্তা-চেতনায় অর্থচাহিদা ও সম্পদ লিপ্সা জেঁকে বসেছে। বস্তুত বিগত দু'শ বছর সম্পদ অর্জনের চাহিদাই ছিল এ দেশের কর্মোদ্যমের মূল চালিকাশক্তি ও প্রধান অনুঘটক। এখনো মানুষ রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও বেতার প্রচার

---

[৩৫৯] Mohammad Asad. *Ibid.* pp. 44.

থেকে, এমনকি কখনও কখনও গীর্জায় ধর্মীয় মঞ্চ থেকেও অর্থোপার্জন ও সম্পদ সঞ্চয়ের প্রণোদনা ও প্ররোচণা পেয়ে আসছে। সর্বসূত্রে এখনো তাদের এ শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে যে, সুসভ্য ও সমুন্নত জাতি তারাই যাদের মধ্যে সম্পদস্পৃহা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। এই যে সম্পদপূজা ও অর্থলিপ্সা, এটা আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় চেতনার বিরোধী। কারণ ধর্ম হচ্ছে দারিদ্র্য-অনুরাগী এবং বিত্ত-প্রাচুর্যের নিন্দাকারী। ধর্ম বলে, সততা ও পুণ্যমনস্কতায় একজন গরীব একজন ধনীর চেয়ে অগ্রগামী। এভাবে যদিও ধর্মপ্রজ্ঞা ও ধর্মীয় সুনীতির দৃষ্টিতে ঈশ্বর-উপাসনা ও স্বর্গপ্রবেশের জন্য দারিদ্র্যই অধিকতর উপযোগী, কিন্তু মানুষ ধর্মকথা ও গীর্জার সুবচন অনুসরণে আগ্রহী নয়। এখনো তারা প্রতিশ্রুত স্বর্গীয় সম্পদের চেয়ে জাগতিক সম্পদেই বেশি আগ্রহী। সম্ভবত তাদের ধারণা, জীবনের শেষভাগে পাপ স্বীকারের দ্বারাই তাদের পরকাল নিরাপদ হয়ে যাবে, যেমন স্ফীত ব্যাংক ব্যালান্সের দ্বারা জাগতিক জীবন ও ভোগ-বিলাস নিশ্চিত হয়ে আছে।[৩৬০] Butler লেখেন, কতিপয় অর্বাচিন লেখক-চিন্তাবিদ ভাবেন যে, একই মস্তিষ্কে যুগপৎ আমরা ঈশ্বর চিন্তা ও বিত্ত চিন্তা করতে পারি না। আমিও স্বীকার করি যে তা সহজ নয়। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কাজটি কবে সহজে হয়েছে? Joad বলেন, আমরা বাটলার ও তাঁর সম-মতিদের জোড়ালো সমর্থক। অর্থলিপ্সা ও সম্পদাসক্তিতে আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, আমাদের কার্যত বিশ্বাস হল, সম্পদই হল ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড।[৩৬১] ইউরোপের এই ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা থেকেই দুই অর্থ ব্যবস্থা, যার উল্লেখ পরে আসবে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র জন্ম লাভ করেছে। একই গ্রন্থের অন্যত্র Joad লেখেন, যে জীবনবোধ এ যুগের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা এই যে, জীবন ও জগতের সবকিছু পকেট ও পাকস্থলীর দৃষ্টিকোন থেকে বিচার্য।

---

[৩৬০] C. E. M. Joad. 1941. *Philosophy of Our Times*. London : Readers' Union Ltd. pp. 338-40.
[৩৬১] *Ibid.*

মার্কিন সাংবাদিক জনগুন্তার তাঁর *Inside Europe* গ্রন্থে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী মানসিকতার রূপ তুলে ধরে লেখেন, ইংরেজ জাতি সপ্তাহের ছয় দিন পূজা করে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের, আর সপ্তম দিন হাজিরা দেয় গীর্জায়। সম্প্রতি পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নামে বিনোদনরূপে এক ধরনের আদি-ভৌতিক বিজ্ঞান চর্চার চমক শুরু হয়েছে, যাতে মৃত-আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ও কথোপকথনের চেষ্টা করা হয় এবং যাতে রয়েছে হিমালয়ের চেয়ে উচ্চতা জয় কিংবা মঙ্গল-চাঁদে বসতি গড়ার মতো অভিযান রোমাঞ্চ ও উল্লাস। এসবই বস্তুবাদীতার একেক ভ্রান্ত প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। সত্যিকার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

ইসলামেই রয়েছে আধ্যাত্মচিন্তার সাফল্যের চিরন্তন শিক্ষা ও আদর্শ যা তাসাউফ নামে সুবিধিত। তাসাউফ বা আধ্যাত্মচিন্তার মূল প্রাণই হচ্ছে আত্মসংযম ও আত্মসংশোধনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন। একইভাবে পাশ্চাত্যের মানুষ যেসব কাজে প্রাণ ও সম্পদ বিসর্জন করে তার পেছনে রয়েছে বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা ও জাগতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য; যেমন সুখ্যাতি অর্জন, জাতির গর্ব ও গৌরবের পাত্র হওয়া, ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভ করা, এমনকি লোক লজ্জা ও নিন্দাভয়ও। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম জীবনে এমন উদ্দেশ্যে কৃত কোনো কার্যই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং শাস্তির কারণ হবে। ইসলামি আদর্শ হল, বান্দার সকল কাজ হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্য, তা হবে রিয়া ও শিরকমুক্ত। কুরআন বলছে: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, "বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।" (আনআম : ১৬২) তা না হলে ক্ষতিই হবে একমাত্র পরিণতি। এদের সম্পর্কে কুরআন বলছে:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۞ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۞ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۞

অর্থাৎ, "বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে। তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোনো গুরুত্ব স্থির করব না।" (কাহাফ: ১০৩-১০৫)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে লড়াই করবে এ জন্যে যে, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হোক, সেটাই শুধু আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, আমার সব আমলকে তুমি নেক আমল বানিয়ে দাও এবং আমার সব আমলকে তুমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে নাও, তাতে তোমার গায়রের জন্য কিছুই রেখো না। এ-ই ইসলামি আদর্শ, যে একে অনুসরণ করবে, সাফল্য তারই প্রাপ্য।

মৃত আত্মা

তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের নির্ভেজাল জ্ঞান ও বিশ্বাস যাদের নেই, ইন্দ্রিয়জাত দৃশ্যমান জগত ও জীবনই যাদের দৃষ্টির সীমানা, তদুপরি ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক ভোগ-বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় উচ্চাভিলাষ ছাড়া মহৎ কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যাদের নেই, জীবন ও জগতের ভয় ও বিপদে-দুর্যোগেও এরা বিপদগামীতার পরিচয় দেয়, এটিই স্বাভাবিক। অথচ, আল্লাহকে বিশ্বাস করত বলে মক্কার মুশরিকরাও বালা-মুসিবতে যেভাবেই হোক আল্লাহকে ডাকত। কুরআন বলছেঃ

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ط وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۞

অর্থাৎ, "যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে, কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।" (লুকমান: ৩২)

কিন্তু বস্তুবাদী পাশ্চাত্য তাদের ভোগবিলাসের নিচে এতই চাপা পড়ে আছে যে তাদের অন্তকরণ বলতে কিছু বাকি নেই, নিজেদের জীবন দর্শনের ভ্রান্তি তাদের চোখে ধরা পড়ে না। এদের অবস্থা হল কুরআনের এই আয়াতের বাস্তব নমুনা, যেখানে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ط أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۞

অর্থাৎ, এবং আমি বহু মানুষ ও জীনকে দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই হল গাফিল, শৈথিল্যপরায়ণ। (আরাফ : ১৭৯)

অথচ কুরআন ও এর অলৌকিকতা তারা লক্ষ করে কিন্তু এতে তাদের কোনো অনুভূতি হয় না। কুরআনের আরো বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

অর্থাৎ, "আর আমি আপনার পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির প্রতিও ওহী প্রেরণ করেছি (কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি), অতঃপর আমি তাদেরকে বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ দ্বারা পাকড়াও করেছি যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে। কত না ভাল হত, যদি তারা বিগলিত হত তাদের কাছে আমার 'পরাক্রম' নেমে আসার পর। কিন্তু তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখালো, যে কাজ তারা করছিল।" (আনআম: ৪২-৪৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ۞ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞

অর্থাৎ, "আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন। কিন্তু যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আমি যদি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে।" (মুমিনুন: ৭৫-৭৬)

আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার অতীত ও বর্তমানকে এসব আয়াতের দর্পণে লক্ষ করুন। সাধারণ নাগরিক জীবন থেকে রাষ্ট্র নায়ক- সবার মধ্যেই কঠিন এই মানসিক রোগের ছড়াছড়ি দেখা যাবে। কঠিন থেকে কঠিনতর যে কোনো বিপদ-দুর্যোগেও তারা বস্তুবাদী আমোদ-ফুর্তি ও হৈ-হুল্লুরে জিন্দেগী থেকে গাফেল হয় না। পাশ্চাত্যের লেখক-সাহিত্যিক ও নেতারা বরং একে তাদের জাতির বীরবিক্রম বলে গর্ব প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শীর্ষস্থানীয় এক নেতা গর্বভরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ব্রিটিশ জাতি কোনো পরিস্থিতি ও দুর্যোগের সামনে কখনও ভাঙ্গেনি এবং মচকায়ও নি। তারা সটান দাঁড়িয়ে থেকেছে মাথা উঁচু করে। প্রমাণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, সিঙ্গাপুরের আকাশ থেকে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে জাপানী বোমা পড়েছে তখনও সেখানে বৃটিশদের

নাচগান ও আনন্দ-বিনোদনে ছেদ পড়েনি এবং কোনো অনুষ্ঠান বন্ধ হয় নি।[৩৬২]

ইউরোপ প্রবাসী এক ভারতীয় 'লন্ডনের একটি রাত' শিরোনামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন স্মৃতিকথায় লেখেন, 'দিনরাত লাগাতার বিমান হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি ও বন্ধুরা ঐ রাতে নাচগানের একটি জমকালো জলসার আয়োজন করলাম। উদ্দাম আনন্দে আমরা যখন উন্মত্ত, তখন হঠাৎ বিমান হামলার সাইরেনে জলসা বন্ধ হয়ে গেল। একজন জানতে চাইল, চলবে না বন্ধ? সবার আগে ফুর্তিবাজ এক তরুণী বলে উঠল, মরতে হয় নেচে-গেয়ে হেসে-খেলেই মরি! ব্যস, নাচেগানে, উদ্দাম আনন্দে জলসা আবার উন্মাত্তাল হয়ে উঠল। জলসা তো জলসা, পুরো এলাকা যেন উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। লেখক আরো জানান, এরপর তো রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল যে, সন্ধ্যায় সাইরেন বাজত, বিমান আসত, আলো নিভত, কামান গর্জে উঠত এবং অন্ধকার আকাশে আতশবাজির ফুলঝুরি শুরু হত। তখন প্রেক্ষাগৃহে ছবি প্রদর্শনের মাঝখানে পর্দায় লেখা ভেসে উঠত, বিমান হামলা চলছে, ছবিও চলবে, কেউ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চাইলে রাস্তা বামে নিচের দিকে। কিন্তু কেউ উঠত না, ছবির প্রদর্শন যথারীতি চলতে থাকত।[৩৬৩]

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল সরকারি ট্রেনে কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পথে। স্যার সারসিল বারটালকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ ঢুকলেন ট্রেনের রেস্টুরেন্টে। হাতে শেম্পেইন। সফরসঙ্গীরা তো অবাক, কারণ যুদ্ধ তখন ঘোরতর। চার্চিল মৃদু হেসে গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, বিদায়ী বছর ১৯৪১- এর নামে পান করছি, সেই বছর যা আমাদের নিয়ে এসেছে পরিশ্রম, ক্লান্তি ও বিজয়ের দিকে। সবাই চার্চিলকে অভিবাদন জানাল। আর তিনি দুই সফরসঙ্গীকে দু'হাতে ধরে নৃত্যের তালে গাইতে লাগলেন। আর দরজার দিকে এগিয়ে সবাইকে বলতে লাগলেন, আপনারা

---

[৩৬২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৩২৬-৩২৭।
[৩৬৩] উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৩২৭।

আনন্দিত থাকুন। ঈশ্বর আমাদের বিজয় দান করুন। সকলে তখন তুমুল করতালি ও উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে গান গাইতে লাগল, আর মিস্টার চার্চিল ভি চিহ্ন প্রদর্শন করে উৎফুল্ল চিত্তে আপন কামরায় ফিরে গেলেন।[৩৬৪]

বিপদে যদি এদের এই হয়, তাহলে বিজয়ে না জানি কত মাতলামি আর পাগলামি হয়। এসবই জেহালত। জেহালত সকল যুগেই আছে, উপকরণ ও এর সেবাদাস দাসী বদলায়, কিন্তু সবই নফসের গোলামী। আর পাশ্চাত্যের আদর্শভূমি গ্রিক-রোমকদের জীবনে তো এসবই ছিল সার। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যোৎপাতে পাম্পেই নগরী ধ্বংস হয়েছিল। সময় ছিল তখন বিকেল, বিশ হাজার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এ্যামফিথিয়েটার লোকে পরিপূর্ণ। হিংস্র পশুর নখ-দন্তের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল জীবন্ত মানুষের শরীর আর লোকজন এই বীভৎস দৃশ্য উপভোগের উন্মাদনায় ছিল বিভোর। ঠিক তখন হল প্রচণ্ড ভূমিকম্প, শুধু অল্প কজন হতভাগাই প্রাণে বেঁচেছিল। ধ্বংসলীলার বিবরণের অধিক উল্লেখ নিস্প্রোয়জন। দীর্ঘ প্রায় দুই হাজার বছর শহরটি পৃথিবীর মানচিত্রে অপসৃয়মান ছিল। উনিশ শতকে এসে জানা গেল যে শহরটি নিশ্চিহ্ন হয় নি, গলিত লাভার নিচে চাপা পড়ে আছে। দীর্ঘ খনন কার্যের পর কুদরতের কারিশমা ও আসমানী শাস্তির জীবন্ত নমুনা পৃথিবীর মানচিত্রে ভেসে উঠল। এ ধরনের আসমানী বহু আযাব এই পৃথিবীতে নেমে এসেছে, আদ-সামুদ জাতির কথা তো আছেই। আল-কুরআনে আছে এসবের নানা দৃষ্টান্ত ও সতর্কবাণী:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا

---

[৩৬৪] উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২৮-৩২৯।

ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থাৎ, "আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের ফলে। এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলায় এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলা-ধূলায় মত্ত। তারা কি আল্লাহর পাকড়াও করার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুত: আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।" (আরাফ: ৯৬-৯৯)

ধর্মহীন ও বস্তুবাদী স্বভাব ও জীবনের এই যে নগ্ন প্রকাশ, এর সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শের সম্পর্ক বিপরীত। যারা আল্লাহতে সত্যিকার বিশ্বাস করে, পরকালের আশা করে, বিপদ-দুর্যোগের সময় তাদের অবস্থা কেমন হয় তা কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে কিছুটা অনুধাবন করা যেতে পারে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।" (আনফাল: ৪৫)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ছিল, যখনই কোনো বিপদ বা পেরেশানী দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। বদর প্রান্তরে যখন মুসলিম বাহিনী কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হল তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সমীপে বিগলিত চিত্তে কান্নারত হলেন, তাঁর সেই বিখ্যাত দোয়া ছিল, 'হে আল্লাহ, এই ক্ষুদ্র দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে

জগতে তোমার ইবাদত হবে না।' একেই বলে আল্লাহর আনুগত্য- বিপদে-আনন্দে সর্বক্ষেত্রে।

বস্তুবাদী অর্থনৈতিক দর্শন

কার্ল মার্কস অর্থনীতিকে গোটা সমাজব্যবস্থার মূল কাটামো বা Basic Structure এবং অন্য সবকিছুকে Super Structure মনে করেছেন। কিন্তু তাই বলে অর্থনীতি সমাজ সংশোধনের মূল নিয়ামক নয়। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে রাজনীতি কিংবা অর্থনীতিকে পাশ কাটিয়ে যে কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের অসংখ্য প্রসংশনীয় গবেষণা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে নানা ব্যর্থতার মূল কারণটিও আমাদের উপলব্ধি করার সময় অবশ্যই এসেছে। ইউরোপীয় বস্তুবাদী দর্শনের সর্বেশ্বরবাদ হল তাদের সর্বগ্রাসী বস্তুবাদী অর্থ-দর্শন। এক্ষেত্রেও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাদের খেয়াল-খুশি মতো দর্শন বা মতবাদ রচনা করেছেন। তাদের বস্তুবাদী দর্শনে তিন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা তারা তৈরি করেছেন, পূঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এবং মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা। সংক্ষেপে, পূঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি হল, সম্পদ বা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি মালিকানা, মুনাফা অর্জনের জন্য বিনিয়োগ এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীর অবাধ স্বাধীনতা বা *Laissez faire.* সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি হল, উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানাহীনতা বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, ব্যক্তি স্বার্থের বদলে সামষ্টিক স্বার্থ, আয়ের সুষম বন্টন ইত্যাদি। এ দুই অর্থব্যবস্থাই নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং দুটিই দুই দিকে চরমপন্থী ব্যবস্থা কার্যকর করে সমাজকে ভারসাম্যহীন করে তোলে।

পূঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় পূঁজি ও মুনাফা কামাই করাই মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির হয়েছে, মুনাফাই এখানে একমাত্র লক্ষ্য; এবং ব্যক্তি মালিকানা, উদ্যেক্তা ও বিনিয়োগকারীকে অবাধ স্বাধীনতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও পৃথিবীর কোথাও বাস্তবে এই নীতি শতভাগ কার্যকর নয়। সর্বোপরি এই অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টনের কোনো নিশ্চিত নীতি নেই, সুদী ব্যবসা-বাণিজ্য

এটিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এসকল কারণে, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও আয় বৈষম্য আকাশচুম্বী যার ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলে, কমার কোনো সুযোগ নেই। এতে ব্যক্তিগত মুনাফার চালিকাশক্তিকে এতটাই লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে জনকল্যাণের বিষয়কে পেছনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপে ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদের যে ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল যার পরিচয় আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি, অন্যান্য সেক্টরের মতো পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়ও তারই প্রতিফলন ঘটেছে। যদিও বাস্তবে ব্যক্তিকে এমন স্বাধীনভাবে কোনো দেশেই ছেড়ে দেওয়া হয় নি, সরকারের কোনই হস্তক্ষেপ নেই এটি সম্ভবত কোনো দেশেই দেখা যায় না, এটি সম্ভবও নয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থদর্শন আরেকটি চরমপন্থি অর্থব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির টুটি এমনভাবে চেপে ধরা হয়েছে যে, তার প্রাকৃতিক স্বাধীনতাও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির যখন নিজস্ব মুনাফা, সম্পদ ও অর্জন বলতে কিছু নেই, কাজেই এতে মানুষের সহজাত কর্মচাঞ্চল্য, উদ্যম, উদ্যোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এতে মানুষের সহজাত মেধা-প্রতিভা, কর্ম ও সৃষ্টিনৈপুণ্য ভূলুণ্ঠিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাগরিকগণ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবে আর প্রয়োজন অনুযাযী ভোগ করবে- এটি কোনো প্রয়োগিকভাবে সফল দর্শন নয়। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় যেখানে বাজারের শক্তি তথা চাহিদা ও যোগানকে সমস্ত সমস্যার সমাধান হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সেই প্রাকৃতিক শক্তিকে পূর্ণ অস্বীকার করেছে এবং এর স্থলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গৃহীত পরিকল্পনাকে সকল রোগের একমাত্র চিকিৎসা সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ, ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়ে এমন বহু বিষয় ও স্বার্থ রয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের পরিকল্পনার এই দর্শন হাস্যকর ছাড়া কিছু নয়। এই অর্থব্যবস্থার ভ্রান্তি সম্পর্কে সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন- এর মূল্যায়নই যথেষ্ট। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন দেখে তিনি বলেছিলেন: "কতই না ভাল হত, যদি সমাজতন্ত্রের দর্শন অনুশীলনের জন্য রাশিয়ার মতো বৃহৎ রাষ্ট্রকে নির্বাচিত না করে আফ্রিকার

কোনো একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে বাছাই করা হত। কেননা তখন তার অনিষ্ঠতা জানার জন্যে চুয়াত্তর বছর লাগত না।"[৩৬৫]

বস্তুত যার দর্শনকে ভিত্তি করে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে সাজানো হয়েছিল তিনি হলেন কার্ল মার্কস, যদিও তিনিই এর জনক নন। কেননা, এরও বহু পূর্বে সমাজতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে অনেক মনীষী কথা বলেছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রূপরেখা তুলে ধরতে গিয়ে কার্ল মার্কস বস্তুত শুরুতেই ভুল অনুমান করেছিলেন। তাঁর উক্তি: The all of hitherto existing society is the history of class struggle. অর্থাৎ, আজ পর্যন্ত দৃম্যমান সকল সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। অবশ্য আজকাল সঙ্গে জুড়া হচ্ছে এ কথা- প্রথম আদিম সমাজ ছাড়া। বলাই বাহুল্য, মার্কসের কথা মতো ঐ যতসব সংগ্রাম হয়েছে সব একমাত্র অর্থ-সম্পদ নিয়ে *যার আছে-যার নেই*- এই দুই শ্রেণির মধ্যে। তাহলে বলতে হবে, পৃথিবীতে ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে যত সংগ্রাম হয়েছে তাও অর্থনৈতিক শ্রেণি-সংগ্রাম ছাড়া কিছু ছিল না? ঐতিহাসিক ক্রুসেড কিংবা বর্তমান প্যালেস্টাইন-ইসরাইল সংগ্রাম? অন্যদিকে মার্কস তাঁর কমিউনিষ্ঠ ম্যানুফেস্টোতে বলেন, সমাজতন্ত্র ধর্মকে উচ্ছেদ করে। এসবই ছিল বস্তুবাদী দার্শনিকদের বস্তুবাদীতার কুফল যা তারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

Joad লেখেন, ইউরোপের ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা থেকেই দুই অর্থ ব্যবস্থা- পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র জন্ম লাভ করেছে। এই দুই মতবাদের বিপুল জনপ্রিয়তা কিছুতেই হত না যদি না নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের [ইউরোপের] দেশবাসী অতিসম্পদমুখী ও অর্থলিপ্সু না হত। এটি এজন্যই সম্ভব হয়েছে যে নারী-পুরুষ সবাই বিত্ত-প্রাচুর্যকেই সৌন্দর্য ও জৌলুসের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে।[৩৬৬]

---

[৩৬৫] মুহাম্মদ তাকী ওসমানী। ২০১৫। *পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র ও ইসলাম।* ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার। পৃ. ৫৬।

[৩৬৬] C. E. M. Joad. *Ibid.* 338-40.

এটি নিঃসন্দেহে যে, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক- কোনো অর্থব্যবস্থাই ভ্রান্তিমুক্ত নয় যা আমরা লক্ষ করেছি। এ দুই অর্থ ব্যবস্থার পরে আরেকটি অর্থব্যবস্থা পৃথিবীতে চর্চা করা শুরু হয় যার নাম মিশ্র অর্থব্যবস্থা বা Mixed Economy। এতে কিছু ব্যক্তি মালিকানা, কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানা, কিছু ব্যক্তি স্বাধীনতা, কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা ব্যক্তির সরকারের অধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বলা যায় পূর্বের দুই ধরনের অর্থদর্শনের মধ্য থেকে ভাল-মন্দের গ্রহণ-বর্জন করে এই অর্থব্যবস্থা। এবং এটিই বর্তমানে বেশির ভাগ দেশে চালু রয়েছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থার কোনটিই ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয় যেহেতু এসব সীমাবদ্ধ মানব মস্তিষ্কপ্রসূত। প্রকৃতপক্ষে, খোদায়ী বিধি-নিষেধ আরোপ করা ছাড়া কোনো ব্যবস্থাই কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পারে না, আর এর অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন একমাত্র ইসলাম করতে পারে।

ডারউইনবাদ : এক নিকৃষ্ট ধোঁকা

এভাবে উনিশ শতকে ইউরোপে এমন সব মতবাদ আবিষ্কার হওয়া শুরু হল যা মানুষকে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার দিকে আরো ঠেলে দিতে থাকল। ডারউইনবাদ তথা বিবর্তনবাদ ছিল প্রবক্তাদের ভাষায় সর্বাপেক্ষা সফল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ- যার মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হয় যে, প্রাণীজগতের প্রতিকূল পরিবেশে ঠিকে থাকার সংগ্রামে অভিযোজনের ফলে তাদের মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্য যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে একসময় একটা প্রাণী ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়। বিবর্তনবাদীদের মতে এটি হল প্রাকৃতিক নির্বাচন যা কোনো স্রষ্টার ভূমিকা ছাড়া প্রাকৃতিকভাবে ঘটে। ঠিক মানুষও এভাবে অন্য একটি প্রাণী বা অনুজীব থেকে বিবর্তনের ধারায় বর্তমান স্তরে পৌঁছেছে।

ডারউইনের আগে ল্যামার্কও এমন বিবর্তনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা এ তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করেছে। ডিএনএ গবেষণায় প্রথমে দাবী করা হয়েছিল যে, মানুষের শরীরের ৯৬-৯৮% ডিএনএ হল non-coding, এরা প্রোটিনে কোনো প্রকার তথ্য সরবরাহ করে না; অর্থাৎ ২-৪% ডিএনএ ছাড়া বাকি সব ডিএনএ-ই non-coding, এগুলোর নাম তখন দেওয়া হল junk ডিএনএ. Junk ডিএনএ মানে হল

ঐসব ডিএনএ যেগুলো কোনো কেজে লাগে না। এতে বিবর্তনবাদীরা উল্লাসে বেজায় গলা ফাটানো শুরু করলেন যে মিউটেশন প্রক্রিয়ার সময় এসব ডিএনএ আমাদের শরীরে রয়ে গেছে যা কোনো কাজের নয়। স্রষ্টা বলে কোনো কিছু প্রাণী সৃষ্টি করলে এসব অপ্রয়োজনীয় জিনিস শরীরে থাকত না। সুতরাং বিবর্তনবাদ সত্য। বিবর্তনবাদী অন্যতম গুরু জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স একে বিবর্তনবাদের অন্যতম প্রমাণ দাবী করে *The Selfish Gene* নামে গ্রন্থও লিখে ফেললেন। কিন্তু বিবর্তনবাদীদের কপালে ছাই মেরে বিজ্ঞান এরপর জানিয়ে দিল যে ডিএনএকে junk বলে এতদিন যে ধারণা ছিল তা সত্য নয়, junk ডিএনএ বলে কিছু নেই। শরীরে সব ডিএনএ - এরই রয়েছে নানা বায়োক্যামিকেল ফাংশন।

শুধু তাই নয় এসব বিবর্তনবাদী অনেক বিজ্ঞানী মানবদেহের অ্যাপেন্ডিক্স নিয়েও ধোঁকাবজি করেছেন। তারা বলতেন যে এই অঙ্গের কোনো কাজ নেই। সুতরাং যদি কোনো বুদ্ধিমান সত্তা আমাদের স্রষ্টা হতেন তাহলে এই অকেজো অঙ্গ শরীরে রাখতেন না। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে, অ্যাপেন্ডিক্স কোনো অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়। আমাদের শরীরে যাতে রোগ-জীবাণু, ভাইরাস ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য সৈনিক প্রহরীর মতো যে টিস্যু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার নাম লিম্ফ টিস্যু। আমাদের শরীরের বৃহদান্তের মুখে প্রচুর লিম্ফ টিস্যু ধারণকারী যে অঙ্গ আছে তার নাম হল অ্যাপেন্ডিক্স। সুতরাং প্রমাণ হল যে অ্যাপেন্ডিক্স গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পালনকারী অঙ্গ। বিবর্তনবাদীরা এখানেও বিফল।

বিবর্তনবাদীদের মতে একটি প্রাণী থেকে অন্য একটি প্রাণীতে পৌঁছুতে যে বিবর্তন হয় তাতে মাঝখানে অনেক স্তর অতিবাহিত হয় যাকে বলে missing link। অথচ, বিবর্তনবাদ সত্য হলে দুনিয়াতে মিলিয়ন মিলিয়ন missing link থাকার কথা, কিন্তু আজ পর্যন্ত বিবর্তনবাদীরা একটিও missing link দেখাতে পারেন নি। ১৯৮৩ সালে তারা একটি missing link আবিষ্কার করলেন যার নাম দেওয়া হল Ida, কিন্তু Texas University, Duke University ও University of Chicago- এর গবেষণায় পরে প্রমাণ

হল যে এটি কোনো missing link নয়, এটি Lamour নামক একটি প্রাণীর ফসিল। ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডের সাসেক্সে কথিত মাটি খুঁড়ে প্রাপ্ত Piltdown man নামে একটি জীবাশ্মকে missing link চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বানর ও মানুষের এই missing link দেখতে মানুষ হুড়মুড়ি খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৯৫৩ সালে এর কার্বন টেস্টে প্রমাণিত হয় যে এটি মোটেও কোনো missing link নয়, এটিকে missing link হিসেবে কয়েকশত বছরের আগের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গবেষণায় দেখা যায়, এর খুলিটি মাত্র ৬০০ বছর আগের এবং মাড়ির দাঁতগুলো ওরাং ওটাং জাতীয় অন্য প্রাণীর। বিবর্তনবাদী মহলে এবারও শোকের ছায়া নামল। নব্য-ডারউইনবাদীরা Advantageous Mutation (লাভজনক-মিউটেশন)- এর ধারণা নিয়ে এবার আবির্ভূত হলেন। তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনকে পাশে রেখে বললেন, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় random mutation বা এলোমেলো পরিবর্তনের ফলে একটি প্রাণীর জীনে নতুন নতুন তথ্য যোগ হয়। এসব নতুন নতুন তথ্যকে তারা নাম দিলেন Advantageous Mutation। এর ফলে বিবর্তিত প্রাণীর মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় এবং সে নতুন কোনো প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়। তারা এটিকে নাম দিয়েছিলেন Modern Synthetic Evolution Theory।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মিউটেশন কখনও লাভজনক হয় না, সর্বদাই ক্ষতিকর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত পারমাণবিক অস্ত্রের বিকিরণে ঘটিত সম্ভাব্য মিউটেশন সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য Committee on Genetic Effects of Atomic Radiation গঠিত হয়েছিল। কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী Warren Weaver বলেন, মিউটেশনের শিকার সকল জীনই ক্ষতিকর। সুতরাং মিউটেশনের মাধ্যমে কীভাবে ভাল ফলাফল বা প্রাণী উন্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হবে?[৩৬৭] দীর্ঘদিন ধরে মাছির ওপর মিউটেশন চালানোর কাজ করা হয়েছে,

---

[৩৬৭] Warren Weaver. 1956. "Genetic Effects of Atomic Radiation." *Science*. Vol. 123, June 29.

কিন্তু কোনো নতুন প্রজাতি তো দূরের কথা একটি এনজাইমও এখন পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি।[৩৬৮] মাছির ওপর মিউটেশন কার্যক্রমে ব্যর্থ হয়ে গবেষক Michel Piltman বলেন, মাছির বিভিন্ন প্রজাতিকে গরম, ঠাণ্ডা, আলো-অন্ধকার, রাসায়নিক বিকিরণের মধ্যে রাখা হয়েছে। সকল প্রকার মিউটেশনই সংঘটিত হয়েছে যার সবই ক্ষতিকারক। এটাকে কী মানবসৃষ্ট বিবর্তনের প্রমাণ বলা যাবে? একদম না। বাস্তবতা হল, মিউটেশনের ফলে উৎপাদিত প্রজন্ম মারা যায়, বংশ বিস্তারে অক্ষম হয়ে পড়ে অথবা বংশানুক্রমে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।[৩৬৯] বিবর্তনবাদী Derek V. Ager, Mark Czarnecki প্রমুখ বিজ্ঞানীরা হতাশ হয়ে বলেন, বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি প্রমাণের বড় অসুবিধা হল জীবাশ্ম রেকর্ড। কারণ গবেষণায় দেখা যায়, জীবাশ্ম রেকর্ডে কখনই ডারউইনের প্রস্তাবিত বিবর্তনের অন্তবর্তীকালীন রূপের উপস্থিতি নেই। এর পরিবর্তে আমরা পাই, প্রজাতিসমূহের একদম হঠাৎ আগমন ও হঠাৎ বিলুপ্তি। এটিই সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের বলার কারণ যে, প্রত্যেক প্রজাতিই স্রষ্টার সৃষ্টি।[৩৭০]

আধুনিক কালে বিবর্তনবাদ ভুল প্রমাণিত হলেও, মানব সভ্যতাকে এর জন্য অনেক বেশি খেসারত দিতে হল। ১৮৯৬ সালে ডারউইন তার তত্ত্ব প্রকাশের পর এ নিয়ে রীতিমতো এক হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল, অনুরাগী-অনুসারীর সংখ্যার অভাব হল না- বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী। সমগ্র ইউরোপে এই নিয়ে এমন আলোড়ন সৃষ্টি হল যে যার তুলনা বাদ-মতবাদের ইতিহাসে বিরল। মানুষ ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কে অদম্য কৌতুহল ও জ্ঞান বাড়াবার দারুন স্পৃহা সৃষ্টি হল আর আবালবৃদ্ধবণিতাকে পরিণতিতে এই সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেল যে, বিশ্বজগত কোনো অতিপ্রাকৃতিক তথা স্রস্টার ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্পূর্ণ নিজস্ব শক্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে। অর্থাৎ, সৃষ্টের সৃষ্টি

---

[৩৬৮] Gordon R. Taylor. *The Great Evolution Mystery*. p.48.

[৩৬৯] Michel Piltman. *Adam and Evolution*. 1984. London : River Publishing. p.70.

[৩৭০] Derek V. Ager. "The Nature of the Foddil Records." Proceedings of the British Geological Association. Vol. 87. 1976. Mark Czarnecki. "The Revival of the Creationist Crusade. 1981. p. 133.

এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয়জাত। অতএব, সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই। বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী মানুষগুলো বিজ্ঞানের মূল শিক্ষাই ভুলে গেল এবং *প্রমাণ ছাড়াই প্রমাণি*ত বলে এই মতবাদকে মেনে নিল।

আসলে, ধর্মের অপব্যবহার ও ধর্মনেতাদের আনাচারের ফলে পাশ্চাত্যের, বিশেষত ইউরোপের মানুষের মনে যে ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল, এর পরে এ ধরনের মতবাদ গ্রহণের জন্য ক্ষেত্র পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। ফলে বিবর্তবাদের পক্ষে মানুষের গতি এমনই বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো ছিল এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রকাশনার এমন সর্বপ্লাবী ঢল নেমেছিল যে, গীর্জা, ধর্মনেতা কারোর এর মুকাবিলা করাই সম্ভব ছিল না। এক অসম যুদ্ধে ধর্ম ও গীর্জাকে এই ভ্রান্ত মতবাদের নিকট আত্মসমর্পণই করতে হল। এমনকি ১৮৮৩ সালে ডারউইনের মৃত্যুতে ব্রিটিশ গীর্জাকে শুধু শোক প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হওয়া গেল না, বরং তাকে সেই সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হল যা গীর্জা কোনো মানুষকে দিতে পারে, অর্থাৎ ধর্মনেতাদের সমাধিস্থলে তার সমাধিস্থ হওয়াকে অনুমোদন করতে হল। এ যেন ধর্মের শত্রুকেই সর্বোচ্চ ধর্মীয় মর্যাদায় বরণ করা। নদবী রহ. লেখেন, চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা, শিল্প-সাহিত্য, জীবন, সভ্যতা ও রাজনীতি সর্বত্র বিবর্তনবাদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। *প্রকৃতির কোলে নগ্ন-স্বাধীন জীবন-যাপনের স্বভাব যুগ*- এ ফিরে যাওয়ার এ একটা জোরদার প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, মূলত সেটি ছিল এই মতবাদেরই এক প্রকাশ।[৩৭১]

উগ্র স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ

গ্রিক স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ মানুষে-মানুষে, ভাষা ও বর্ণে, অঞ্চলে-অঞ্চলে কৃত্রিম ভেদাভেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছিল। এজন্যই দেখা যায়, গ্রিক সমাজে মানুষ অগ্রিকদেরকে বর্বর ও অসভ্য মনে করত। ইউরোপের প্রাণসত্তায় এসব জাতি-বৈশিষ্ট্যই মিশেছিল যা থেকে

---

[৩৭১] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৩৮।

বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা আজও সে কল্পনা করতে পারে না। খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে এসব কিছুটা অবনমিত হয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম তার আসল রূপ ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাতে নানা ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছিল। তবু এটি সত্যি যে, এতে আল্লাহর নবী ঈসার আ. ও আসমানী ধর্মের কিছু না কিছু আদর্শ ও ছাপ বিদ্যমান ছিল। আর কোনো আসমানী ধর্ম শত বিকৃতির পরেও মানুষে মানুষে রক্ত, বর্ণ, ভাষার ভিত্তিতে কৃত্রিম কোনো বিভেদ-বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করে না। এজন্যই দেখা যায়, বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত ইউরোপকে খ্রিস্টধর্ম রোমান গীর্জার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিল ও খ্রিস্ট জগতকে অভিন্ন পরিবারে পরিণত করেছিল। বিশেষত ক্রুসেডের সময় এমন অবিভেদ ও অবিচ্ছিন্নকরণের ভাল নমুনা লক্ষ করা গিয়েছে।

লেকী উল্লেখ করেন, ইউরোপের স্বদেশপ্রেম ও সম্প্রদায়প্রীতি সাধারণ মানবহিতৈষণায় পরিবর্তিত হয়েছিল। এই মানসিক পরিবর্তন কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল তা খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মন্তব্য থেকেও কিছুটা অনুমান করা যায়। যেমন: ট্রটোলীন বলেন, আমরা একটি প্রজাতন্ত্রের কথাই জানি, সেটি হল- 'বিশ্ব প্রজাতন্ত্র'। অরজিন বলেন, আমাদের একটিই স্বদেশ যার ভিত্তি হল একটি মাত্র শব্দ- ঈশ্বর। কিন্তু মার্টিন লুথার যখন বৈপ্লবিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং রোমান গীর্জার বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তখনই ধর্ম-প্রভাবে ইউরোপের অবদমিত স্বভাব আবার জেগে উঠল। লুথার স্বজাতি জার্মানদের সহযোগিতায় এতটাই সফল হলেন, শেষ পর্যন্ত রোমান গীর্জাকে পরাজয় মানতে হল, আর বিক্ষিপ্ত ইউরোপকে যে ঐক্যসূত্রে গাঁথা হয়েছিল তা ছিঁড়ে গেল, কোনো বন্ধনই আর থাকল না। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠী ক্রমে অভ্যন্তরীণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।[৩৭২]

---

[৩৭২] W. E. H. Lecky. *Ibid.*

ইউরোপে একদিকে খ্রিস্টধর্মের পতন, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের উত্থান শুরু হয়েছিল সমান্তরালভাবে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের পাল্লাই ভারী হয়েছিল, ধর্মের অস্তিত্বই যেন ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে গেল। আমেরিকায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড লুথিয়ান ১৯৩৮ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন, ইউরোপে এক সময় ঐরকম সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান ছিল, যেমন ছিল ভারতে খ্রিস্টধর্মের প্রথম সময়ে। কিন্তু পনেরো শতকে (মার্টিন লুথারের) ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যখন ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য বিলুপ্ত করে দিল তখন সমগ্র মহাদেশ বিভিন্ন জাতীয়তায় বিভক্ত হয়ে গেল, যাদের পারস্পরিক সঙ্ঘাত শুধু ইউরোপে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী হুমকি হয়ে দেখা দিল। একই ভাষণে তিনি আরো বলেন, ধর্ম হল মানুষের অপরিহার্য পথপ্রদর্শক এবং জীবনে নৈতিক ও আত্মিক মর্যাদাবোধ অর্জনের একক মাধ্যম। কিন্তু ধর্মের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হওয়ার অনিবার্য ফলরূপে পাশ্চাত্য এমন সব মতবাদ ও চিন্তাধারায় আক্রান্ত হয়ে পড়ল যার ভিত্তি ছিল নিছক জাতিগত ও শ্রেণিগত ভেদাভেদ। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার প্রভাবে পাশ্চাত্য এ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হল যে, বস্তুগত উন্নতিই হল জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এজন্যই ইউরোপে এখন জীবনের সমস্যা ও জটিলতা বেড়েই চলেছে এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সমন্বয় দুরূহ হয়ে পড়েছে, অথচ এ সমন্বয়ই হল যুগের বড় দুর্যোগ [উগ্র] জাতীয়তাবাদের কবল থেকে মুক্তির উপায়।[৩৭৩]

উগ্র-জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি এবং প্রাচ্য বিদ্বেষ

গোটা ইউরোপ উগ্র-জাতীয়তাবাদের ছোবলে পৃথিবীর অপরাপর যে কোনো জাতির চেয়ে নিজেদেরকে আত্মকেন্দ্রিকতায় ডুবিয়ে দিল। প্রাচীন রোমান-পারস্য জাতির মতো নিজেদেরকে তারা উপাস্যের স্তরে স্থাপন করে আত্ম-উপাসনায় মেতে উঠল। এ অহং তাদেরকে বহু রক্তপাতে নিয়োজিত করেছে,

---

[৩৭৩] উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৪৪-৩৪৫।

ইতিহাস যা সংরক্ষণ করে রেখেছে। কিন্তু এসবকে তারা উপাসিতের সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ বলে মনে করত। জাতীয়তাবাদের সবকই ছিল- জাতি ও জাতীয়তা হচ্ছে সবকিছুর উর্ধ্বে। আমার জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনোজাতি নেই। স্রষ্টা বলে কিছু থেকে থাকলে, অন্য জাতিকে শাসন ও পরিচালনা করার জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতা তিনি কেবল আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীতে আমরাই স্রষ্টার নির্বাচিত শাসক ও অভিভাবক। শাসন করা আমাদের অধিকার আর দাসত্ব করার দায়িত্ব অন্য সবার। সুতরাং অন্য কোনো জাতির জমিনে ঠিকে থাকারই সুযোগ নেই, যতক্ষণ না সে জাতি এদের দাসত্ব মেনে নেয়।

ইউরোপে ধর্ম ব্যবস্থার পতন ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের এমন উত্থানের প্রথম ফল এই হল যে, জাতীয়তাবাদের অনিবার্য ফল- আত্মবিভেদ সত্ত্বেও ইউরোপ সমগ্র প্রাচ্যের বিপক্ষে এক অভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বি শিবিরে তথা আরেক অশুভ বিভেদ রীতিতে পরিণত হল। এতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, কিংবা ইউরোপ ও ইউরোপ নয়, আরো পরিষ্কার করে বললে আর্য ও অনার্য জাতিবর্গের মধ্যে এমন একটি স্থায়ী পার্থক্যরেখা টেনে দেওয়া হল যাতে পাশ্চাত্যের মনোভাব এমন হল যে, এপারের সকল সংস্কৃতি ও সভ্যতা ওপারের সকল সংস্কৃতি ও সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[৩৭৪]

জীবন ও জগতকে শাসন করার, জীবনে সমৃদ্ধি অর্জন করার ইউরোপের অধিকার একচ্ছত্র, অন্যের সেই যোগ্যতা নেই। উল্লেখ্য, উত্থানকালে এটিই ছিল গ্রিক-রোমানদের স্বভাবচিন্তা, যাদের চোখে কেবল নিজেরাই ছিল সভ্য অন্যরা অসভ্য। এর ফল হল এই যে অ-পাশ্চাত্য বা বহিরাগত যে কোনো চিন্তা-চেতনা, ব্যক্তি, শিক্ষা, দর্শন, সংস্কৃতির তারা হয়ে উঠল চরম বিদ্বেষী। এমনকি ইউরোপের কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠী ঈসা আ. ও তার শিক্ষার বিরোধী ছিল, কারণ তিনি ছিলেন বহিরাগত। সুতরাং তিনি বহিষ্কারযোগ্য। ঈসাকে আ. এখানে অনেকে শুধু এ কারণেও প্রত্যাখ্যান করেছে যে তিনি ঈসরাইলি। আবার তার অনুসারীদের অনেকে তাঁকে আর্য-রক্তীয় প্রমাণ

---

[৩৭৪] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৪৫।

করারও জোর প্রয়াস চালিয়েছে। জনৈক জার্মান পণ্ডিত বলেন, আমাদের সন্তানদের কেন আমরা ভিন্ন জাতির ইতিহাস শেখাব? কেন তাদের ইবরাহিম-ইসহাকের কাহিনী শোনাব? আমাদের চাই খাটি জার্মান ঈশ্বর। এমনকি এক সময় জার্মান জাতির উপাস্য প্রাচীন দেব-দেবীর পুনঃঅধিষ্ঠানের আন্দোলন বা প্রবণতাও বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল।[৩৭৫] রাশিয়াও তাঁর চিরশত্রু জার্মানির চেয়ে কম এগিয়ে ছিল না। এরা মনে করে যে আধুনিক মৌলিক উদ্ভাবন-আবিষ্কারের সিংহভাগ রাশানদের অবদান।

এসবই উগ্র-জাতীয়তাবাদের ফল। জাতীয়তাবাদ যখন এরকম বিদ্বেষ, প্রত্যাহার, প্রত্যাখ্যানের জন্ম দেয়, তখন এটিই নিঃসন্দেহে এর সবচেয়ে বড় কুফল। এই জাতীয়তাবাদে যখন শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এমনকি বিজ্ঞানও অনুঘটকরূপে ব্যবহৃত হয় আর নেতৃত্বও সেসব জাতিগোষ্ঠীর হাতে থাকে যারা বস্তুবাদ ছাড়া কিছু বোঝে না, তখন পৃথিবীর পরিণতি যে কত ভয়াবহ হবে তা কল্পনা করাও দুরূহ। সুতরাং, পেছনে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর যেসব গুণপনা উল্লেখ করে এসেছি, তার সঙ্গে যখন এমন উগ্র-জাতীয়তাবোধ সংযুক্ত হয় তখন তার ফল অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর আগ্রাসনে পর্যবসিত হয়। অতীত ও বর্তমানে এর দৃষ্টান্ত অগণিত। এমনকি তখন আগ্রাসন নিজেদের মধ্যে পর্যন্ত ছড়াতে দেখা যায়, এটি নিশ্চয় উগ্র-জাতীয়তাবাদের অন্তবর্তী আগ্রাসন বা কুফল।

দু'টি উপাদান ছাড়া জাতীয়তাবাদ ঠিকে থাকতে পারে না। তা হল: ভীতি ও ঘৃণা। শুধু ইউরোপ নয়, গোটা পাশ্চাত্যই অতীত থেকে নিয়ে আজও এই দু'টি উপাদান ছাড়ানোর চেষ্টা করে থাকে। এর মাধ্যমে নিজ জাতীর মধ্যে আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা উসকে দেয়। ভয়-ভীতি ও ক্রোধ-ঘৃণাই জাতীয়তাবাদের প্রধান খাদ্য। জুড লেখেন, কোনো জাতীগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিষয়ের (যা ঐ জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বজনীনরূপে বিদ্যমান আছে) মাধ্যমে সহজেই উত্তেজিত ও জাগিয়ে

---

[৩৭৫] উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৪৫।

তোলা যায় সেটি প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি নয়, সেটি হল ভয়-ভীতি ও ক্রোধ-ঘৃণার অনুভূতি। ভাল-মন্দ যে কোনো উদ্দেশ্যে কোনো জাতির ওপর শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এটিই কার্যকর উপায় যা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে সাফল্য লাভ করা যায়। সেকালের সরকারগুলো প্রতিবেশী জাতির সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে এরই উপর নির্ভরশীল ছিল। শাসক শ্রেণির কাছে এটিই ছিল শাসন ও নেতৃত্বের রক্ষাকবচ, এটিই ছিল জাতীয় ঐক্য-চেতনার বুণিয়াদ।[৩৭৬] কোনো সন্দেহ নেই যে আধুনিক বহু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ও সরকারসমূহ এখনো এসবের চর্চা করে থাকে।

উগ্র-জাতীয়তাবাদ বিস্তারে এর পূজারীরা যে কৌশল অনুসরণ করে তা হল, বিভিন্ন দুর্বল ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কাছে তারা জাতীয়তাবাদকে নানা রংচং মাখিয়ে খুবই চিত্তাকর্ষক করে উপস্থাপন করে। তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্তুতিবন্দনায় তাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলে। এতে একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের চেতনায় এমনই বুঁদ হয়ে যায় এবং জাতীয় ঐতিহ্যের মিথ্যা অহমিকায় এতই আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, তারাই যেন শ্রেষ্ঠ, তারাই যেন একমাত্র। এতে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেও বহুজাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনের অবারিত বৃহৎ সুযোগ পালন এবং পারস্পরিকভাবে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যা শুধু মিথ্যে অহমিকা ও অন্যের প্রতি অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে। এর ফলেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নানা সজ্ঘাত-সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিগোষ্ঠী শক্তিশালী জাতি কর্তৃক ব্যাপক আগ্রাসনের শিকার হয়। শক্তির অহমিকায় তখন বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী দুর্বলের ওপরই শুধু নয়, বরং শক্তির অহমিকায় সবলের সঙ্গেও সজ্ঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এধরনের পরিস্থিতিতে দুর্বলের পক্ষে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রণাদাতারাও এগিয়ে আসে না,

---

[৩৭৬] উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৫৬-৫৭।

যারা এই বিষবাষ্প ছড়িয়েছিল। এ যেন কুরআনের সেই উদ্দিষ্টরাই: كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۞ "তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফির হতে বলে অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি।" (হাশর : ১৬)

দুর্বল জাতিগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের নেশায় আরো বুঁদ হয় এবং নিজেকে আরো বিচ্ছিন্ন করে, মনে করে সে আরো বেশি শক্তিশালী ও নিরাপদ হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা মারাত্মক ভুল ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃত সত্য হল, এতে সে বৃহৎ শক্তির আগ্রাসন আরো ডেকে আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর ভাগ্যে এটাই ঘটেছিল।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের কুৎসিত চেহারা

বস্তুবাদী দুনিয়া যখন উগ্র-জাতীয়তাবাদের নিশান ওড়াতে গিয়ে আরো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, তার লক্ষ্য হয় একমাত্র পুঁজিবাদী লাভালাভ, তখন সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী নেশা তার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়ে। কারণ, এ সবই বস্তুবাদের কুফল, সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার ছাড়া যার সফল পরিণতি কল্পনা করা যায় না। এভাবেই দেশে দেশে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের লড়াই শুরু হয়ে যায়। এতে কত যে দেশ ও জনগোষ্ঠী, যারা শক্তি ও অস্ত্রে খুবই দুর্বল, বিলীন হয় তার হিসেব কে রাখে, অনেকক্ষেত্রে এরা প্রতিরোধেরও ক্ষমতা রাখে না।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ আজ কোনো নতুন বিষয় নয় যা পাশ্চাত্য বিশেষ করে ইউরোপ এই পৃথিবীকে দেখিয়ে আসছে। বিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশ ইউরোপের বর্বর সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের অসহায় শিকারে পরিণত ছিল। তখন মনে হত যেন কোনো

দেশই এই হুমকি থেকে বিপদমুক্ত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়লে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন পরাধীন রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে বৃটেনের নাগপাশ শৃঙ্খল থেকে অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সদ্য স্বাধীন দেশগুলো তখন আত্মরক্ষার ভয়ে কম্পমান থাকত, এ অবস্থায় বিবদমান কোনো পক্ষের সঙ্গী না হয়ে নিরপেক্ষ থাকাকেই এরা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে শ্বাস ফেলত। দেশগুলো ১৯৬০- এর দশকে জোট-নিরপেক্ষতার ছায়ায় (NAM) নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেছিল।

উপনিবেশবাদীরা শুরুতে ব্যবসার নাম করে কোনো দেশে ঢুকত এবং নানা ছলাকলায় অবস্থান ও ব্যবসা করার অনুমতি আদায় করে নিত। কিন্তু এভাবে যে ঢুকত, আর তাদেরকে বের করে দেওয়া সম্ভব হত না, কারণ ছলছাতুরিতে তারা ছিল ভয়ঙ্কররকম পাকা। এই লেখকের পিএইচডি কোর্স-ওয়ার্ক চলাকালীন ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. প্রীতিকুমার মিত্র ক্লাসের এক আলোচনায় বলেছিলেন, 'ব্রিটিশরা একসময় চীনের রাজার কাছে সেদেশে ব্যবসা করার অনুমতি চেয়েছিল। রাজা এই বলে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, না বাপু, তোমাদের খাসলত বড়ই খারাপ, তোমরা ব্যবসার নাম করে ঢুক, কিন্তু আর বের হতে চাওনা।' অর্থাৎ, তোমাদেরকে ঢুকতে দেওয়া মারাত্মক বোকামী ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবীর সকল দেশেই যদি এধরনের খাসলত-চেনা বিচক্ষণ শাসক থাকতেন তাহলে আজ হয়তো পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম হতে পারত।

মূলত সম্পদ লুণ্ঠনের অভিলাষেই সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করা হত, অথবা বলা যায় সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ স্থাপন ও একে কেন্দ্র করে যত অনিষ্ট সাধিত হয়েছে তার মূলে থাকত সম্পদ লুণ্ঠন। ব্রিটেনে উনিশ শতকের শিল্প-বিপ্লবের জন্য যে অঢেল অর্থপাতি লেগেছিল তা যোগানো হয়েছিল ভারত থেকে লুণ্ঠিত বিপুল সম্পদ থেকে। সুতরাং যাদের ভূগর্ভে লুকিয়ে আছে অজস্র সম্পদ তাদের আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই নেই। সম্পদ লুণ্ঠন এবং ভবিষ্যতে এজন্য লুণ্ঠিত দেশকে নিজেদের তল্পিবাহকে পরিণত করার জন্য

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ-আমেরিকা দলভেদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এবং তাদের প্রধান আকর্ষণ এখন তেলসমৃদ্ধ মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য।

অতীতের League of Nations, আজকের UNO এসব আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নখদন্তহীন বাঘ, বরং আগ্রাসী উইরোপ-আমেরিকার পোষা বিড়াল। অথবা এসব প্রতিষ্ঠানও একেকটি ছলনা বৈ কিছু নয়। কখনও ইরাক বা লিবিয়ার মতো কোনো রাষ্ট্রকে মারাত্মক ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র (weapons of mass destruction) থাকার অভিযোগে আগ্রাসন চালিয়ে মুহূর্তে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়। UN Security Council- এর এসব অভিযোগের তদন্ত-সাপেক্ষ নেতিবাচক রিপোর্ট (বিশেষত ইরাকের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।) ইঙ্গ-মার্কিন জোটের অস্বীকারের মধ্য দিয়ে, তবুও এসব দুর্বল রাষ্ট্রে একযোগে নেকড়ের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কিয়ামত কায়েম করা মানবতার দুর্ভাগ্যের এক প্রহসন হয়ে আছে। ইরাকে weapons of mass destruction খোঁজতে গিয়ে UN Security Council ও IAEA ১০৫টি আল-সামূদ মিসাইল উদ্ধার করেছিল যা দিয়ে বড়জোড় দু'চারটা শেয়াল মারা যেত! বসনিয়া হার্জেগোবিনা, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, ফিলিস্তিনসহ মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যে যত রক্ত জড়ানো হয়েছে এবং আজও হচ্ছে, যেভাবে এসব দেশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছে, তার সবই হয়েছে আগ্রাসী ইউরোপ-আমেরিকার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য।

জুড লেখেন: জাতিপুঞ্জ নামের বিশ্বপুলিশি সংস্থাটির তত্ত্বাবধানে যে যুদ্ধই হয় তা ন্যায়, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে, কিংবা অত্যাচারী ও সীমা লঙ্ঘনকারীকে প্রতিহত করার নামে। এগুলো আসলে শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। একদলের লক্ষ্য, যে কোনো মূল্যে বিশ্বের সম্পদভাণ্ডারের সর্বোচ্চ পরিমাণের উপর দখল বজায় রাখা; অন্যপক্ষের উদ্দেশ্য হল যে কোনো উপায়ে তাতে ভাগ বসানো। এসব যুদ্ধ অতীতের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির মধ্যেকার যুদ্ধের চেয়ে, কিংবা জার্মান-প্রোশিয়া যুদ্ধ, সপ্তবর্ষী যুদ্ধ, নেপোলিয়নের যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়, শুধু নামের ভিন্নতা

ছাড়া। পক্ষান্তরে এসকল যুদ্ধের পক্ষে সাফাই গেয়ে যা কিছু বলা হয়, যেমন গণতন্ত্র রক্ষা, ফ্যাসিবাদ প্রতিহত করা, বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি, এগুলো প্রকৃতপক্ষে মুখোশ ও প্রহসন ছাড়া কিছু নয়।[৩৭৭] এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ অস্ত্রসমৃদ্ধ দেসগুলোর জন্য আরেকটি কারণেও প্রয়োজন, সেটি হল তাদের রমরমা অস্ত্র-বাণিজ্য। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাদের অস্ত্রের রমরমা ব্যবসা করে যাচ্ছে যার জন্য এবং নিত্যনতুন অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়া তাদের খুব প্রয়োজন।

এই অসৎ উদ্দেশ্য তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। এসব-ই হয় মানবতা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ছলাকলায়, এগুলো সব পাশ্চাত্যের প্রকাশ্য ভণ্ডামি যার উল্লেখ জুডের কথায়ও উল্লেখ করেছি। পররাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনে ইউরোপ এবং বিশেষত ব্রিটিশের খ্যাতি সবার উপরে। ব্রিটিশরা আজ নিজ দেশের উন্নতি ও সাজসজ্জায় যতই ইতিহাস ভুলে যাক না কেন, ইতিহাস তাদের লুণ্ঠনের কাহিনী সযতনে লিখে রেখেছে। বর্তমানে তারা অন্যান্য জাতিকে লুণ্ঠন বিষয়ে যতই দোষারূপ করবে ও সাধুগিরি দেখাবে ততই তাদের লুণ্ঠনের ইতিহাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ইংরেজ লেখক জুড বলেন:

ইংরেজ ভুলে যায়, বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, সমস্যা ও সঙ্কটের মূল শিকড় কোথায়? কী কী কারণে সজ্ঞাত-সংঘর্ষ এবং শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ভুলে যায়, বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, জাপান ও অন্যান্য জাতির ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের উৎস কী? তাদের বরং দাবী হল, ইংরেজ খুবই শান্তিপ্রিয় জাতি, জাপানীরা বরং পররাজ্য লোভী যুদ্ধোন্মাদ। তাদের দাবী হয়তো ঠিক, ইংরেজ নির্লোভ ও শান্তিপ্রিয় জাতি, তবে সে ঐ লুণ্ঠনকারীর মতো যে এখন লুণ্ঠন-পেশা ছেড়ে সাধু সেজেছে। কারণ লুণ্ঠিত সম্পদ ইতোমধ্যেই তাকে নিরঙ্কুশ প্রভাব ও প্রতাপ এবং গৌরব ও মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সুতরাং শান্তিরক্ষার তাগিদে নব্যলুণ্ঠকদের বিরুদ্ধে সে

---

[৩৭৭] C. E. M. Joad. *Ibid.* p. 191.

সংহারমূর্তি ধারণ করতেই পারে। অর্থাৎ সাবেক লুণ্ঠক ও বর্তমানের সাধু ব্যক্তিটি তাদেরকে যুদ্ধবাজ বলছে যারা শোষণে ও লুণ্ঠিত সম্পদে ভাগ বসাতে চায়।[৩৭৮]

বিশ্বায়ন : নয়া-সাম্রাজ্যবাদ

বস্তুবাদী এসব সকল সরকারেরই ধর্ম একটি, মানুষ শোষণ ও সম্পদ লুণ্ঠন। সম্পদ লুণ্ঠনের ঐ পদ্ধতিতে আজ নতুন পালক যোগ হয়েছে, এখন সাম্রাজ্য বা উপনিবেশবাদ চলছে আধুনিক পদ্ধতিতে, বিশ্বায়নের নামে। এটি নয়া-সাম্রাজ্যবাদ। বাজারকে উন্মোক্ত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে অনুন্নত দেশসমূহকে নানা বিধিনিষেধের জটিল ফাঁদে আটকে দেওয়া হয়েছে। দুর্বল দেশসমূহের যেহেতু ধনী দেশসমূহের পণ্য ও প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়, ফলে এসব দুর্বল দেশসমূহ বিশ্বায়নের ফলে আরো নিঃশেষ হচ্ছে। সুতরাং অবধারিতভাবে লাভমান হচ্ছে ধনী দেশগুলোই। এভাবে একদিকে মুক্তবাজারের নামে গরীব দেশসমূহ ধনী দেশসমূহের বিশ্ববাজারে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে মূলত উন্নত দেশসমূহের, আমেরিকা ও ইউরোপের প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। যদিও বিশ্বায়ন থেকে কোনো দেশেরই এখন আর বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, কিন্তু এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যই শুধু বাড়ছে না বরং বাস্তবে গরীব দেশসমূহের সম্পদ লুণ্ঠনেরই আধুনিক এক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যদিকে, বিশ্বায়নের যুগে তথ্যের অবাধ প্রবাহের নামে এক ধরনের তথ্য-সন্ত্রাস চালু হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে বা লক্ষ্যভূক্ত কোনো দেশ বা জাতিকে দাগি আসামীর মতো লেভেলিং করে ফেলা হয়। বিশেষত মুসলিম দেশ ও উম্মাহর বিরুদ্ধে এটি আজ আর কোনো গোপনীয় বিষয় নয়।

---

[৩৭৮] *Ibid.* p. 180.

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের নামে মানবকল্যাণ ?

এই শাসন ব্যবস্থাও প্রাচীন গ্রিসে জন্ম লাভ করেছিল। রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে প্লেটোর গ্রন্থের নামই ছিল গণতন্ত্র বা Republic যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। গ্রিসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র ছিল যেখানে সে সময়ের মতো করে এক ধরনের গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু ছিল। একটি নগররাষ্ট্রের আয়তন আজকের একটি আধুনিক নগরের চেয়ে বেশি ছিল না। সে সময় একেকটি নগররাষ্ট্রের জনসংখ্যা এত কম ছিল যে বিশেষ বিশেষ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজার পক্ষ থেকে সকল জনগণকে একত্র করা হত। যেমন এথেন্সের লোকসংখ্যা ছিল বড়জোর তিন লাখ, এথেন্স ছিল একটি রাষ্ট্র। তেমনি স্পার্টা, থেবেস ছিল একেক রাষ্ট্র যাদের লোকসংখ্যা আরো কম ছিল। সুতরাং এই পরিমাণ লোকসংখ্যাকে একটি ময়দানে একত্র করা ছিল খুবই সহজ এবং প্রয়োজনে তাই করা হত। এভাবে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। এমনই সরল ছিল গ্রিসের গণতন্ত্র ব্যবস্থা। এটি ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। এর জন্য কোনো সংবিধানও ছিল না। রাজা তার প্রজ্ঞা বলেই ঠিক করে নিতেন যে কোনো বিষয়ে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরামর্শের প্রয়োজন আর কোনো বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। সেভাবেই তাদেরকে একত্র করে তাদের অভিমত জেনে নেওয়া হত। পরবর্তীতে যদিও এর জন্য কিছু নীতিমালা তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল, তবে সেই নীতিমালার তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু বড় বড় রাজ্য বা রাষ্ট্রে এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না, যেমনটি রোম সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে বলা যায়। এজন্য রোমে পরামর্শের জন্য কাউন্সিল গঠন করা হত এবং কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। এভাবে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপক গণ-অংশগ্রহণের সুযোগ তিরোহিত হয় এবং ধীরে ধীরে সেখানে স্বেচ্চাচারতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থান লাভ করে। এজন্য গ্রিসের নগররাষ্ট্রসমূহের বিলুপ্তির পরে গণতন্ত্রের ধারণা লোপ পেয়ে যায়।

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম দিকে এই মতবাদের পুনর্জীবন শুরু হয় যখন থেকে গণতন্ত্র উদার গণতন্ত্র (Liberal Democracy) নামে প্রচার হতে শুরু করে। আমরা ইতোপূর্বে কিছুটা লক্ষ করেছি যে গীর্জা মানুষের মুক্তচিন্তা

ও স্বাধীন জীবনাচারের ওপর কর্তৃত্বের নামে মানুষের হাত-পা বেঁধে রেখেছিল। গীর্জার যাবতীয় জুলুম ও অনাচার, মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের সীমাহীন উৎপাত ও অনাচার, Devine right- এর নামে জনগণের উপর রাষ্ট্রের অন্যায্য কর্তৃত্ব ও স্বৈরাচারী শাসন প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপে বস্তুবাদী মুক্তচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যার কিছু বিবরণ আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি। প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন তো এর মধ্যে ছিলই। এর মধ্যে এমনই কিছু মুক্তচিন্তার ধারক-বাহক ছিলেন Voltaire, Montesqiue, Rousseau। এরা তিন জনই মুক্তচিন্তার নাম করে নিজ নিজ দর্শন ও মতবাদের উপর ভিত্তি করে এমনসব চিন্তাধারা দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন, যেসবের ফল হিসেবে আধুনিক গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছে।

ভলটেয়ারের কৃতিত্ব এই যে তিনি ধর্মের সেলাই একেবারে ছুটিয়ে দিয়েছেন এবং দাবী করেছেন যে, যতগুলো ধর্ম আছে তার সবই বিকৃত। তাঁর মতে, মানুষের আসলে একটি ধর্ম হওয়া উচিত, তা হল প্রাকৃতিক ধর্ম। এর আওতায় মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করলে করবে, না করলে না করবে। এ ছাড়া সাধারণ ধর্মগুলোতে যেসব বিধান পরিবেশিত হয়েছে সেগুলোর ও ধর্মীয় ব্যবস্থাপনাসমূহের কোনো মূল্য নেই। তিনি এক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হয়ে বলেন, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, কারো এই ক্ষমতা নেই অন্যের ধর্মকে সঠিক বা ভুল সাব্যস্ত করার প্রবক্তা হতে পারে। ধর্ম বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতাই চূড়ান্ত, যার যেরকম ইচ্ছা সে তাই পালন করবে। ইচ্ছে করলে মূর্তিপূজা করবে বা কোনো ওহিভিত্তিক ধর্ম গ্রহণ করবে বা ইহুদি বা খ্রিস্টান হবে। এখানে চার্চ, সরকার বা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অবকাশ নেই। আর রাষ্ট্র ও সরকারের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক সেক্যুলারিজমের জন্ম হয়েছে।

প্রত্যেক ঐ বস্তুকে সেক্যুলার বলা হয় যা কেবল ইহলৌকিক কল্যাণের জন্য বানানো হয়েছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে সেক্যুলারিজমের বক্তব্য হল, ধর্ম যেহেতু ব্যক্তিগত বিষয় তাই রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পৃক্ততা থাকা উচিত নয়, কেননা রাষ্ট্রের কাজ তো শুধু দুনিয়াবী স্বার্থ ও কল্যাণের জন্যই। ধর্মের নামে যেসব

অনাচার-অবিচার চলেছিল যা ইতোপূর্বে আমরা পেশ করেছি, এটি ছিল তার প্রতিউত্তর ও প্রতিকার। ধর্মের নামে যেহেতু অনেক জুলুম-অত্যাচার চলেছে, সুতরাং এসব চিন্তাবিদদের মাথায় এই চিন্তা এসেছে যে, যতক্ষণ না ধর্মের জোয়াল ছুড়ে ফেলা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ও সমাজের উন্নতি হবে না। সুতরাং সেক্যুলার রাষ্ট্র কায়েমের মাধ্যমে এবার সেই জোয়াল ছুড়ে ফেলা হল।

Montesqiue তাঁর *Spirit of Law* গ্রন্থে বলেন, যত স্বেচ্ছাচারী শাসন অতিবাহিত হয়েছে যার কারণে যত নির্যাতন মানুষকে ভোগ করতে হয়েছে তার কারণ এই ছিল যে, প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতা কোনো এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত ছিল। এর ফলেই ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের উপর অত্যাচার-অবিচার চলত। ফলে শাসন ব্যবস্থায় স্থবিরতা বিরাজ করত। এই দুরবস্থা সমাধান করতে হলে শাসন ক্ষমতাকে বিভিন্ন ভাগে আলাদা করতে হবে। তাঁর মতে এই ক্ষমতা আসলে তিন প্রকারে বিভক্ত হতে হবে। ১. আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, ২. আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ক্ষমতা এবং ৩. আইন ভঙ্গ করলে বা আইনের ব্যাখ্যা দরকার হলে এসবের প্রতিবিধানের ক্ষমতা। অর্থাৎ, মন্টেস্কুর মতে, ক্ষমতা এভাবে তিন পরিষদের হাতে আলাদা আলাদা ভাবে ন্যস্ত থাকবে। আধুনিককালে এটিই Seperation of power বা ক্ষমতার বিভাজন বা স্বতন্ত্রীকরণ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চর্চা করা হচ্ছে; আইনবিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ-ই হল সেই তিন বিভাগ যা মন্টেস্কুর মতবাদকে ধারণ করেছে। রুশুর কথা পূর্বে বলেছি, তাঁর মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং জনপ্রতিনিধির শাসন নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ, জনসাধারণ পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা লালন করবে, যখন ইচ্ছা সরকার গঠন করবে, যখন ইচ্ছা সরকারের পতন ঘটাবে।

এই হল মুক্তচিন্তা ও সেক্যুলার গণতন্ত্রের জন্ম ও বিবর্তন। অর্থাৎ, গণতন্ত্রের তিন বৈশিষ্ট্য, যথা: ১. রাষ্ট্র ও সরকার থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ, ২. ক্ষমতার বিভাজন বা স্বতন্ত্রীকরণ এবং ৩. অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জনপ্রতিনিধির শাসন। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আমেরিকায় সর্বপ্রথম লিবারেল

সেক্যুলার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে, ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে ইউরোপে সেক্যুলার গণতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। দুঃখজনক হল যে, পাশ্চাত্য মুরুব্বি রাষ্ট্রসমূহ গণতন্ত্রের কথা বলেই বিভিন্ন দুর্বল জাতি ও রাষ্ট্রের উপর সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে, যার কিছু নমুনা ইতোমধ্যে পেশ করা হয়েছে।

সেক্যুলারিজমের বাংলা পরিভাষা হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণযোগ্য কি না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা সবক্ষেত্রে ধর্মহীনতা নয়। দেখতে হবে যে এটি কোথায় কী অর্থে ব্যবহার করা হয়। এজন্য স্মরণ রাখা উচিত যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দু'টি প্রত্যয় বা অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথমত, রাষ্ট্র হবে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ অর্থের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্য দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং সমাজ ও রাষ্ট্র এমন সেক্যুলার জীবন ও রাষ্ট্রাচারেই বেশি স্বস্তি পোষণ করে। এটি ধর্মহীনতার নামান্তর। দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষতার আরেক অর্থ হল, সব ধর্ম ও বিশ্বাসের লোক আইনের দৃষ্টিতে সমান,[৩৭৯] নাগরিক অধিকার ভোগে ধর্ম পরিচয়ে কোন বিশেষত্ব বা অগ্রাধিকার প্রযোজ্য হবে না। ধর্মকে ব্যবহার করে নাগরিক অধিকার ভোগে কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না। বাংলাদেশ এই দ্বিতীয় অর্থের উদাহরণ। ভারতেও এই অর্থ বলবৎ রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যবহার ধর্মহীনতা বা নাস্তিকতাকে নির্দেশ করে না, সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণকে কিংবা বৈষম্যহীনতাকে বোঝায় যা গ্রহণযোগ্য। এখন গণতন্ত্রই হোক আর অন্যতন্ত্রই হোক তা যদি মানবতার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারে বরং গণতন্ত্রের নামে চলে মানুষ আর সম্পদ শোষণের রাজনীতি যা আজ চলছে, তাহলে চিরকালই এর সঙ্গে জুড়ে যাওয়া এই প্রশ্নবোধক চিহ্নটি রয়েই যাবে, মুছে যাবে না।

---

[৩৭৯] আকবর আলী খান। ২০১৭। *অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*। ঢাকা:প্রথমা। পৃ. ৯০।

পাশ্চাত্য কোন্ পথে চলেছে ?

যুগের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বিচারে বর্তমান যুগ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আর এক্ষেত্রে অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উদ্ভাবন-আবিষ্কারের প্রশ্নে পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অবদান আমাদেরকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন, একথা তো অবশ্যই মনে রাখতে হবে বা ভুলে গেলে চলবে না যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রাশি রাশি আবিষ্কার-উদ্ভাবন কিছুই জীবনের মূল লক্ষ্য নয়, নিছক উপায় বা মাধ্যম। নদবী রহ. লেখেন, নিজস্ব সত্তায় এসব ভাল-মন্দ কিছুই নয়। উপায় ও মাধ্যমের ভাল-মন্দ নির্ধারিত হয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মানদণ্ডে। সুতরাং বিচারে বসতে হলে আমাদের দেখতে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা সৎ, সুন্দর ও কল্যাণপ্রসূ কী না? নদবী রহ. প্রশ্ন করেন, বিজ্ঞান আমাদের জীবনে কী ভূমিকা পালন করে? এককথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা দূর করে, জগতের অজানা সব রহস্য উদ্ঘাটন করে, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও সম্পদ আয়ত্তে আনে এবং জীবনের গতিকে দ্রুততর ও সহজতর করে।[৩৮০] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এসব ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন বয়ে এনেছে যা সে কল্পনাও করে নি। এখন এ-সবই যদি মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। কুরআনে বলা হয়েছে:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ط لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ط إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

[৩৮০] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৭৯।

অর্থাৎ, "তোমাদের জন্য তিনি চতুষ্পাদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, এতে তোমাদের জন্যে শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে এবং আরো অনেক উপকার এবং কিছু পশুর গোশত তোমরা আহার করে থাক। আর তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য, যখন সন্ধায় চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌছাতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না।" (নাহল: ৫-৮)

লক্ষণীয় যে, গতি ও স্বস্তির সফরকে আল্লাহ মানুষের ওপর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, ভবিষ্যতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা মানুষ জানে না- বাক্য যোগ করে কী আশ্চর্য প্রজ্ঞার সঙ্গে অপার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমন অলৌকিকতা কী মানুষের কলমে কখনও সম্ভব? আল্লাহ আরো বলেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে রিজিক দান করেছি উত্তম বস্তু হতে এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (ইসরা: ৭০)

নবী সুলাইমান আ. এর প্রতি তাঁর অনুগ্রহের উল্লেখ করে বলেন:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ط وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ط وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ط وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۝

অর্থাৎ, "আর আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম, কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার

আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব।" (সাবা: ১২)

প্রকৃতির সকল শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যাবতীয় আবিষ্কার-উদ্ভাবন, এ-সবই মানুষের ওপর আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ যা সে মালিকের খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়াতে ব্যবহার করবে। তাঁরই আদেশে প্রকৃতি ও এর যাবতীয় উপায়-উপকরণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ط وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ط وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَابِبَيْنِ ط وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۝ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ط إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

অর্থাৎ, "তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং তোমাদের জন্য জলযানকে অনুগত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে চলাফেরা করে। আর নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।" (ইবরাহিম: ৩২-৩৪)

জগতের সকল শক্তি ও সম্পদ মানুষ কাজে ব্যবহার করবে এটাই স্বভাবিক, কেননা আল্লাহ এসব তার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু একজন মুমিন ও অবিশ্বাসীর মধ্যে চিন্তা ও আচরণে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম তার অনুসারীকে এই শিক্ষা দেয়, সে এসব ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এটি স্মরণ রাখবে যে এসবই আল্লাহর দান ও বিরাট অনুগ্রহ। এখন গাধার পিঠে বা ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করুক কিংবা জাহাজ ও বিমানে আরোহণ করুক, সে

আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করবে ও আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করবে, যিনি এসবকে তার অনুগত ও ব্যবহারযোগ্য করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ যদি মানুষকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা না দিতেন এবং এসবকে ব্যবহারযোগ্য না করে দিতেন, তাহলে কারো সাধ্য ছিল না এসবকে ব্যবহার করে। কুরআন বড়ই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মমতাপূর্ণ ভাষায় বলছে:

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۝

অর্থাৎ, "আর যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্যে যানবাহনে পরিণত করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর। অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার নিয়ামত স্মরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভুত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এদেরকে বশীভুত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।" (যুখরুফ: ১২-১৪)

আল্লাহ যদি এসবকে অনুগত ও ব্যবহারযোগ্য করে না দিতেন তাহলে মানুষের কোনো ক্ষমতাই নেই এসবকে বশে আনার, কিংবা লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি নিষ্প্রাণ পদার্থ তথা প্রকৃতির উপায়-উপকরণে গতি ও এমন 'প্রাণ' সৃষ্টি করার। সুতরাং মানুষের কী অবশ্যই কর্তব্য নয় এসবে আরোহণকালে একথা বলবে যে, "চিরপবিত্রতা ঐ সত্তার যিনি এটিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম ছিলাম না।" কুরআনের নিচের আয়াতগুলো লক্ষ করুন যেখানে দেখা যাবে কীভাবে নবীগণ আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন। যেমন, ইউসুফ আ. বলছেন:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ط فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّى فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ

অর্থাৎ, "হে পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে, আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে নেককাদের সাথে যুক্ত করুন।" (ইউসুফ: ১০১)

সুলাইমান আ. বলছেন:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۞

অর্থাৎ, "তখন পিঁপড়ের কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।" (নামল: ১৯)

দুনিয়ার জীবনে মানুষ যাই কিছু করেছে, শক্তি-সম্পদ, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, আল্লাহর কাছে সব কিছুর হিসাব দিতে হবে যে, সে এসব কী উদ্দেশ্যে, কী কাজে ব্যবহার করেছে? সুতরাং, জীবন ও জীবনের সঙ্গে যাপিত ও ব্যবহৃত শক্তি-সম্পদ, আবিষ্কার-উদ্ভাবন যেমন আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ, আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব পরীক্ষাও বটে। এসব যদি আল্লাহর মর্জি মতো ও মানবতার কল্যাণে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেজন্য অবশ্যই পুরুস্কার পাওয়া যাবে, অন্যথায় শাস্তি পেতে হবে। কুরআনে নবী সোলাইমান আ.- এর কথা উল্লেখ করে সেকথাই বলা হচ্ছে:

...هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝

অর্থাৎ, ".... এটি তো আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল।" (নামল: ৪০)

দেখুন, জগত-প্রকৃতির সকল উপায়-উপকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও মানবতার কল্যাণ সাধন সে দিকে লক্ষ করে কুরআনে বলা হচ্ছে:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ط وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ط إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

অর্থাৎ, "আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (হাদিদ: ২৫)

এই আয়াতের শুরুতে রাসূল ও কিতাবের কথা রয়েছে এবং শেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্যের কথা রয়েছে, মাঝখানে রয়েছে লোহা প্রসঙ্গ। মধ্যখানে লোহার প্রসঙ্গ কেন? নদবী রহ. লেখেন, লোহা এখানে প্রতিকী। মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে, এই জগত ও প্রকৃতিতে আল্লাহ যত শক্তি ও সম্পদ গচ্ছিত রেখেছেন, মুমীন তা অর্জন করবে এবং তা আল্লাহর রাস্তায়, জিহাদে, দীন প্রচারে, আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে এবং শরীয়তসম্মত বৈধ কাজে (যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে, সফরে ইত্যাদি।) আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যে

ব্যবহার করবে।[৩৮১] এভাবে আল্লাহর কোনো নিয়ামতকে মুমীন কখনও অন্যায় পথে বা অন্যায়কারীর সাহায্যে ব্যবহার করতে পারে না। যেমন মুসা আ.- এর কথা কুরআনে বলা হচ্ছে, "হে রব, যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন সেহেতু কিছুতেই আমি অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।"[৩৮২] একমাত্র সঠিক দীন ও শরিয়তের আলোই মানুষকে দুনিয়া ও এর উপায়-উপকরণ ব্যবহারে আল্লাহর সন্তুষ্টিভাজন হওয়ার সৌভাগ্য দান করতে পারে। তখন সে মনে করে যে মানুষ কোনো কিছুরই মালিক নয়, বড়জোর রক্ষক ও সেবাগ্রহিতা মাত্র। তাকে তো একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যত উন্নত বাহনেই সে চড়ুক না কেন, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানেই সে বিচরণ করুক, তার অবশেষ পরিণতি হল: "আর অতি অবশ্যই ফিরে যাব আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে।" আর সেদিন সব কিছুরই হিসাব দিতে হবে। এ জ্ঞানের আলো থেকে যারা বঞ্চিত, তারা হামান, কারুন, ফেরাউনের মতো শক্তি, ক্ষমতা ও সম্পদের দম্ভে অন্ধ থাকে। এদের পরিণতি হবে সেই সব লোক ও জাতির মতো যাদের ধ্বংসের ইতিহাস এখনো পৃথিবাসীর সম্মুখে অক্ষত রয়ে গেছে। কুরআনে বলা হয়েছে:

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ط أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

অর্থাৎ, "যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত।" (হামিম সিজদাহ: ১৫)

সত্যকে অনুধাবন করার কত সহজ যুক্তি এসব লোকের সামনে ছিল, কিন্তু অনুধাবনের যোগ্যতা না থাকলে তাদের শেষ পরিণতি এমনই হয়। কুরআন এদের কথা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে:

---

[৩৮১] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৮৫।

[৩৮২] সূরা কাছাছ : ১৭।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ط وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى ط وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞

অর্থাৎ, "অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। আর যারা সামুদ, আমি তাদেরকে প্রদর্শন করেছিলাম, অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল, অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ এসে ধৃত করল।" (হা-মিম সিজদাহ: ১৬-১৭)

কারুন সম্পদের আধিক্যে এতই দাম্ভিক হয়েছিল যে সে বলতে পেরেছিল, "সে বলল, এগুলো তো আমি প্রাপ্ত হয়েছি আমার বিশেষ জ্ঞান দ্বারা।" তখন তার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল শুনুন কুরআনের ভাষায়:

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۞

অর্থাৎ, "অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না।" (কাছাছ : ৮১)

শক্তি ও ভক্তির যখন শুভ মিলন হয় তখনই মানবতার কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এই মিলন ধর্মবিযুক্তির মধ্যে হতে পারে না। পাশ্চাত্যের দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য মানবজাতির যে সে বস্তুবাদের অন্ধ পূজায় নিমজ্জিত, তাদের কাছে দীন বলতে কিছু নেই। তারা মনে করে (কুরআনের ভাষায়), "আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।" এরই ফলে পাশ্চাত্য প্রকৃতির উপায়-উপকরণকে ভোগ-বিলাস, আধিপত্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে ব্যবহারে মরিয়া হয়ে ছুটে

চলেছে। তার কাছে শক্তি ও গতির প্রতিযোগিতা ও বাহাদুরি এখন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। যেমন জুড বলেন, ডিযরাইলীর মতে, তার যুগের সমাজ ভাবত, সভ্যতার মূল কথা হচ্ছে ভোগ, কিন্তু আমরা মনে করি, সভ্যতা মানে গতি। গতিই হচ্ছে আধুনিক যুবকের উপাস্য এবং গতির যুপকাষ্ঠে নির্দয়ভাবে তারা বলি দিতে পারে সর্বপ্রকার সুখ,স্বস্তি ও শান্তি, এমনকি অন্যের প্রতি দয়া-মায়াও।[৩৮৩] এসব কারণে, যা ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদীতার ফল, পাশ্চাত্য মানবতার জন্য বয়ে এনেছে অশেষ ক্ষতি ও ধ্বংস।

বিজ্ঞানের অপব্যবহার

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কীরকম অপব্যবহার করে থাকে এবং মানবসভ্যতার জন্য অভিশাপ ডেকে আনে তা বুঝানোর জন্য অতীতের দুটি বিশ্বযুদ্ধের চিত্র তুলে ধরাই যথেষ্ট হবে। বলা বাহুল্য যে, এসব যুদ্ধের একটিও কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়নি। এসব যুদ্ধ এবং এ যাবত পাশ্চাত্য যত যুদ্ধ বাধিয়েছে এবং যেসব যুদ্ধে জড়িত আছে তার একটিরও কোনো মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না, এসবই তাদের হীন স্বার্থ হাসিলের খেলা ছাড়া কিছু নয়। তাদের পারস্পরিক শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের অশুভ প্রতিযোগিতা এবং সম্পদ লুণ্ঠনের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যই এসব যুদ্ধের পেছনে কাজ করে। তারা যখন কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তখন তারা তাদের শত বছরের গবেষণার নির্যাস সকল অস্ত্রশক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এক তুচ্ছ কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধেছিল এবং তখনই একে অন্যের বিরুদ্ধে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, প্রয়োগ করেছিল সে সময়ের সর্বাধুনিক অস্ত্রপাতি। ফল হয়েছিল ৪১ মিলিয়নেরও অধিক নিরপরাধ মানুষের নির্মম মৃত্যু।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যন্ত্র ও প্রযুক্তির অপব্যবহার মানব ইতিহাসের সকল বর্বরতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শত বছরের চেষ্টা সাধনায় আমেরিকা যে

---

[৩৮৩] C. E. M. Joad. *Ibid.* 241.

পারমাণবিক বোমার অধিকারী হয়েছিল তাই তারা নির্দ্বিধায় লক্ষকোটি নিরপরাধ মানুষের ওপর পরীক্ষা করে বসল। ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট পারমাণবিক বোমার প্রথম পাশবিক পরীক্ষা হল জাপানের দুর্ভাগা শহর হিরোশিমার ওপর, তাৎক্ষণিকভাবেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বলির শিকার হল প্রায় ৭০,০০০ নিরপরাধ মানুষ। এখানেই শেষ ছিল না, ৯ আগষ্ট বেছে নেওয়া হল নাগাসাকি শহরকে। শুধুমাত্র বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজয় মানতে বাধ্য করার জন্যই এমন বর্বরতা প্রদর্শন করা হল, তাতে যত মানুষই নিহত হোক না কেন। বোমার আঘাতে শুধু মানুষ নয় বিশাল দুটি শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল, কোনো প্রাণ এই ছোবল থেকে রক্ষা পেল না। শুধুমাত্র ৬ আগষ্টের বোমায় প্রাণ হারিয়েছিল অন্তত দুই লাখ মানুষ।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরনের প্রভাব ছিল ভয়াবহ। যারা তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায় নি তারা বোমার প্রতিক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করেছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই দুই জনপদে বিকলাঙ্গ মানুষ জন্ম নিত, আজও হয়তো নেয়। এসবই ছিল যন্ত্র ও প্রযুক্তির অভিশাপ যা মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ঐসব বোমার চেয়েও শক্তিশালী মানব বিধ্বংসী হাইড্রোজেন বোমা, নাইট্রোজেন বোমা, রাসায়নিক বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে যার মাত্র কয়েকটি এই পৃথিবীর সবকিছুকে মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারে। এই যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার হয় তাহলে এসবকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া কিছু থাকে না। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপ-আমেরিকা বা এককথায় পাশ্চাত্যের মাথায় ভুলেও একথা আসেনি যে, বস্তুবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বদলে আমরা মানবতার খেদমত করব এবং এজন্য বিশ্ববাসীকে এমন কোনো নীতি ও কর্মসূচী বা জীবন বিধান উপহার দেব কিংবা ঈসা মাসিহের আদর্শ শিক্ষা দেব যা পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেবে।[৩৮৪]

---

৩৮৪ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১০। *নতুন দাওয়াত নতুন পয়গাম*। জহির উদ্দিন বাবর অনু. ঢাকা:আল ইরফান পাবলিকেশন্স। পৃ. ৩৮।

শক্তি ও নীতির নির্লজ্জ পতন

এটি তো পরিষ্কার যে পাশ্চাত্য যুগ যুগ ধরে কখনই শক্তির সাথে নীতি ও চরিত্রের কোনো ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে নি। পাশ্চাত্য প্রকৃতির উপায়-উপকরণকে কাজে লাগিয়ে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে, কিন্তু জানে না কীভাবে এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে হয়, কীভাবে এই পৃথিবীকে বাস-উপযোগী করতে হয়। মহাকাশ গবেষণায় তারা রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করে, অথচ এই পৃথিবীতে এখনো বহু মানুষ অনাহারে রাত যাপন করে। সুতরাং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের উন্নতি অন্যদিকে নীতি ও চরিত্রের অবনতি সম্পূর্ণ বিপরীত। জুড বড়ো সুন্দর করে লেখেন, প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের এমন শক্তি দান করেছে যা দেবতার উপযোগী, কিন্তু আমরা তা ব্যবহার করছি শিশু ও হিংস্র পশুর বুদ্ধি দ্বারা।[৩৮৫] ফলে একদিকে নষ্ট হচ্ছে রাশি রাশি সম্পদ অন্যদিকে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে মানুষের জিন্দা লাশ। জুডের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি লক্ষ করুন:

একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা, অন্যদিকে লজ্জাজনক সামাজিক শিশুতা, উভয়ের মধ্যে এই যে বিরাট ব্যবধান, জীবনের মোড়ে মোড়ে আমাদেরকে এর মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একদিকে আমরা ঘরে বসে মহাদেশ থেকে মহাদেশে কথা বলি, ছবি আদান-প্রদান করি, সিলনে বসে রেডিওতে লন্ডনের ঘড়ির ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাই, ভূমি ও সমুদ্রের উপরে-নীচে বিচরণ করি, নিঃশব্দ টেলিপ্রিন্টার ব্যবহার করি, বিদ্যুতের সাহায্যে ফসল ফলাই, এক্সরের সাহায্যে দেহের ভিতরে উঁকি দেই; ছবি এখন কথা বলে, গান গায়, বেতার যন্ত্রের সাহায্যে অপরাধী সনাক্ত হয়, উড়ো জাহাজ ও ডুবো জাহাজ দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরুতে যায়। এত কিছু হয়, হয় না শুধু এইটুকু যে, বড় বড় শহরে কিছু মুক্ত মাঠ তৈরি করি যেখানে গরীব শিশুরা মনের আনন্দে নিরাপদে খেলাধূলা করবে। বরং হয় এই যে, প্রতি বছর আমরা দু'হাজার শিশুকে হত্যা করি এবং নব্বই হাজার শিশুকে আহত করি।[৩৮৬]

---

[৩৮৫] *Ibid.* 261.
[৩৮৬] *Ibid.* 261.

একবার এক ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে আলাপকালে আমাদের সভ্যতার এভাবে প্রশংসা করেছিলাম- তখনকার কথা, একজন গাড়ি চালক বালুসড়কে ঘন্টায় চারশ মাইল পথ অতিক্রমের রেকর্ড গড়েছেন, একজন বিমান চালক মস্কো থেকে নিউইয়র্কে সম্ভবত বিশ ঘন্টায় উড়ে এসেছেন। সব শুনে ভারতীয় বললেন, হ্যাঁ, তোমরা বাতাসে পাখীর মতো উড়তে পার, পানিতে মাছের মতো সাঁতরাতে পার, শুধু জান না, কীভাবে মাটির উপরে হাঁটতে হয়।[৩৮৭] জুড পাশ্চাত্যের যে সময়ের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা বলেছেন, আজ সেটি আরো বহুদূর এগিয়েছে, কিন্তু মাটির উপর হাঁটার অজ্ঞতাও আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশ্চাত্য আজও জানে না যে কীভাবে মাঠির ওপর সুন্দর করে হাঁটতে হয়।

"পাশ্চাত্য ভাল হতে শিখে না"

পাশ্চাত্যের সকল শক্তি ও সম্পদ বহুলাংশে মানবতার কল্যাণের পরিবর্তে সর্বনাশ ও বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অথচ এসব যোগ্যতা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ হতে পারত, কিন্তু মন্দ হাতে যে কোনো ভালও মন্দ ডেকে আনে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজই নষ্ট ফলে তার থেকে ভাল কিছু আশা করা কঠিন। কুরআনের ভাষায়: "যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়।"[৩৮৮] ব্যবিলনের যাদু সম্পর্কে কুরআনে বলা আছে, "তারা ঐসব বিদ্যা শিক্ষা করত যা তাদের উপকার না করে ক্ষতি করে।" পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে আজ এটিই দেখা যাচ্ছে, সে যেন কোনো ভাল শিখতে জানেই না, যার উপকারের চেয়ে অপকারের অংশ বেশি।

জুড লেখেন, আমরা এখন অভাবনীয় গতিতে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারি, কিন্তু খুব কমই আমাদের গন্তব্য হয়ে থাকে আদর্শ গন্তব্য। পর্যটক ও

---

[৩৮৭] *Ibid.* 293.

[৩৮৮] আরাফ : ৫৭।

ভ্রমনকারীর জন্য পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই এবং সমস্ত জাতি ও জনগোষ্ঠী এত কাছে এসেছে যেন সবার অঙ্গ অভিন্ন। কিন্তু ফল কী হয়েছে? এটি এই হয়েছে যে, পারস্পরিক সম্পর্কের আরো বেশি অবনতি ঘটেছে। আর যেসব উপায় ও সুবিধার সাহায্যে আমরা পরস্পর পরিচিত হতে পেরেছি সেগুলোই আসলে বিশ্বকে যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করেছে। আমরা রেডিও বেতার উদ্ভাবন করেছি এবং প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু প্রতিবেশী দেশের আকাশ ও বাতাস ব্যবহার করা হচ্ছে তারই বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধে এবং নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে।[৩৮৯]

জুড আরো লেখেন, এই যে বিমান আকাশে ঘোরপাক খাচ্ছে, প্রথমে যারা তাতে উড্ডয়ন করেছিল, সন্দেহ নেই তাদের সাহস ও মেধা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু এখন তা কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার হচ্ছে ও ভবিষ্যতে হবে? বোমা ফেলে শহর জনপদ ধ্বংস করা এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সবকিছু ছাইভস্ম করার জন্য, অসংখ্য মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করার জন্য। এসবই নির্বোধ লোকের বা শয়তানের কাজ ছাড়া কিছু নয়। .... আগামী দিনের ইতিহাস আমাদের সম্পর্কে কী লিখবে? লিখবে, কীভাবে বেতারতরঙ্গের সাহায্যে সোনার খনি আবিষ্কার করতাম, সোনা আহরণ করতাম এবং কী অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সোনা ওজন করতাম, আর কীভাবে মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাস্ত করে বিভিন্ন রাজধানীতে সোনা হস্তান্তর করতাম। আরো লিখা হবে, মানুষরূপী এই হিংস্র পশুরা, যারা শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধনে যেমন ছিল কুশলী তেমরি ছিল দুঃসাহসী, কিন্তু তারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় ছিল অক্ষম, যা সঠিক স্বর্ণবন্টন ও স্বর্ণসংরক্ষণের দাবী ছিল। তারা বরং একটি জিনিসই বুঝত, যথাসম্ভব দ্রুত খনিগুলি দাফন করা, অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার খনি থেকে সোনা তুলে আনা, আর লন্ডন, নিউইয়র্ক ও প্যারিসের ব্যাংকে তা দাফন করা।[৩৯০]

---

[৩৮৯] C. E. M. Joad. *Ibid.* 247.
[৩৯০] *Ibid.* 192.

আলেক্সিস ক্যারল লেখেন, বর্তমান জীবনব্যবস্থা মানুষকে শুধু সম্ভাব্য সকল উপায়ে সম্পদ অর্জনে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু সম্পদের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছায় না, বরং তার মধ্যে একটা স্থায়ী উত্তেজনা ও জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি করে এবং সেটাকে প্রশমিত ও পরিতৃপ্ত করার একটা অপরিপক্ক তাড়না সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ধৈর্য ও স্থৈর্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং এমন যে কোনো কাজ থেকে সে দূরে সরে থাকে যা কিছুটা কষ্টকর ও ধৈর্যসাপেক্ষ। আধুনিক সভ্যতা যেন এমন মানুষ সৃষ্টিই করতে পারে না যার মধ্যে সৃজনশীলতা, সাহস ও মেধা রয়েছে। প্রত্যেক দেশে দেখা যায়, যে শ্রেণিটি দেশ পরিচালনা করে এবং যাদের হাতে দেশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, তাদের মধ্যে সৎ চিন্তা ও নৈতিকতার মারাত্মক ঘাটতি বিদ্যমান।

আধুনিক সভ্যতা ঐসব বৃহৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সক্ষম হয় নি যা তার কাছে মানবজাতির কাম্য ছিল। আধুনিক সভ্যতা এমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারে নি যারা সভ্যতাকে এসব সঙ্কট থেকে নিরাপদে সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে সভ্যতা শুধুই ঠোকর খাচ্ছে ও একের পর এক স্খলনের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, মানব সম্প্রদায় ঐরকম দ্রুত উন্নতি করতে পারে নি যেমন মানবমস্তিষ্ক থেকে জন্ম লাভ করা প্রতিষ্ঠানগুলো করেছে। এটি মূলত রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চিন্তা ও নৈতিকতার ত্রুটি-বিচ্যুতিরই ফল এবং ঐ মূর্খতার ফল যা আজকের সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়কে বিপদ-ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[৩৯১]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ যে পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব তৈরি করেছে তা মানুষের জন্য উপযোগী নয়। এসব গড়ে উঠেছে কেবল তাৎক্ষণিকতার ওপর, কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা ও চিন্তা-ভাবনার ওপর নয়। মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতির বিষয়টি সেখানে বিবেচনা করা হয় নি। ফলে আমরা সুখী হতে পারি নি। যে সব জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিল্পসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল

---

[৩৯১] আলেক্সিস ক্যারল, উদ্ধৃতি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৩৯৫-৩৯৬।

তারা দ্রুতই বন্যতার দিকে ধাবিত হয়েছে। কোনো শক্তি এখন তাদের বাঁচাতে পারবে না যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের বেষ্টন করে আছে। পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর মতো বর্তমান সভ্যতাও জীবনের জন্য এমন কিছু শর্ত আরোপ করে রেখেছে, যা জীবনকে অসম্ভব করে তোলে। এসব জাতি জড়বস্তু সম্পর্কে যতটা জ্ঞানার্জন করেছে, জীবন সম্পর্কে জ্ঞান তার তুলনায় খুবই অল্প। এরা আসলে জানেই না, মানুষের আসলে কীভাবে জীবন যাপন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানদৈন্যই এদের সর্বশান্ত করেছে, এর মাশুল আমাদেরকে দিতে হবে।[৩৯২] বিজ্ঞান যদি মানবতার কল্যাণের বদলে মানুষের জন্য অভিশাপ বয়ে আনতে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর ফল কী হল? আমাদের জন্য কি এটি খুব জরুরী যে আমরা উৎপাদন বাড়িয়েই যাব যাতে মানুষ অধিক হারে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহার করতে থাকে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কোনো কিছুই মানুষকে চরিত্র ও নৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারে না। একসময় মানুষ খালি পায়ে থাকত, পায়ে হেটেই বহুদূর পাড়ি দিত, কিন্তু মানুষগুলো আজকের মতো দুনিয়ায় অভিশাপের কারণ হত না, যা আজকের বস্তুবাদী আধুনিক মানুষ হচ্ছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অশুভ প্রভাব : মানবতার আত্মিক বিপর্যয়

রাসেল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ শিরোনামে লেখেন, রাজনৈতিক আদর্শকে অবশ্যই ব্যক্তিজীবনের আদর্শের ওপর ভিত্তিশীল হতে হবে। ব্যক্তিজীবন যতদূর সম্ভব ভালো করে তোলাই হবে রাজনীতির উদ্দেশ্য।[৩৯৩] যে গ্রিক চিন্তা-দর্শনের ওপর আজকের ইউরোপীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই চিন্তা-জগতের প্রবাদ-পুরুষ সক্রেটিসও ব্যক্তিমানুষের হৃদয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে সর্বপ্রধান প্রয়োজন বলে গোটা জীবন প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের আলোচনায় যে ইউরোপকে অবলোকন করেছি, এক কথায় যার চরিত্র বৈশিষ্ট্য বস্তুবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ- এই ব্যক্তিজীবনকে ভালো করে তোলার

---

[৩৯২] আলেক্সিস ক্যারল, উদ্ধৃতি, *প্রাগুক্ত* । পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

[৩৯৩] বার্ট্রান্ড রাসেল। ২০১৫। *রাজনৈতিক আদর্শ* । ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। পৃ. ২৩।

কী দর্শন তার কাছে রয়েছে? রাসেলের পরবর্তী প্রস্তাবনা- 'তার জন্য প্রথমে দেখতে হবে ব্যক্তিজীবনের কল্যাণ বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি।' কিন্তু ধর্মের জোয়াল যে পাশ্চাত্য সমাজ ছুঁড়ে ফেলেছে শত শত বৎসর পূর্বে, যার জীবন-দর্শন কেবল পেট ও পকেট ছাড়া কিছুই নয়, এমন জাতির ক্ষেত্রে এসব প্রশ্নের চিরন্তন সমাধান কী খুব একটা ফলপ্রসূ হয়? মোটেও না। ইউরোপ যেসব বস্তুবাদী উপাদানের বেড়াঁজালে বন্দি, যার আলোচনা ইতোপূর্বে হয়েছে, সেসবের নিগড় থেকে যদি বের হয়ে আসতে না পারে তাহলে পৃথিবীকে বস্তুবাদী উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা ছাড়া তার কিছু দেওয়ার নেই।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যেভাবে নিয়ত আত্মহত্যার পথে রয়েছে যার অশুভ প্রভাব সম্পর্কে এর পরেই আলোকপাত করা হবে, তার অন্ধ অনুসরণ যে কারো জন্য সেটাই ডেকে আনবে, এটাই স্বভাবিক। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্পকলা ইত্যাদির লক্ষ্য তাদের গ্রিক ইন্দ্রিয়বাদী দর্শনের সীমা পর্যন্ত, এর উর্ধ্বে সে কোনো দিন উঠতে পারে নি। যেদিন থেকে সে ধর্মের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিতে শুরু করে, তার এই বস্তুবাদী চিন্তা ও জগৎ সেদিন থেকে ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। বস্তুবাদ ও ধর্ম- এ দুটি বিষয় কখনই আপোষমূলক নয়, পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। একটিকে গ্রহণ করলে, অন্যটিকে নির্ঘাত বিসর্জন দিতে হয়। পাশ্চাত্য বস্তুবাদকে সকল তনুমন খাটিয়ে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে, ঠিক সেভাবে ধর্মকে বিতাড়িত করেছে। পাশ্চাত্যবাসীর জীবনে ধর্ম বলতে এখন যা কিছু আছে তা নামেমাত্র, বিকৃতির ফলে মুসা বা ঈসার আলাইহিমাস্‌সালাম আদর্শ অনুসরণের কোনো সুযোগ এখন তাদের সম্মুখে বিদ্যমান নেই।

Joad উল্লেখ করেন, বিশোর্ধ্ব বিশজন ছাত্র-ছাত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন ছিল, তাদের কতজন ন্যূনতম অর্থে খ্রিস্টান? মাত্র তিনজনের উত্তর ছিল, হ্যাঁ। সাত জনের মন্তব্য, বিষয়টি নিয়ে তারা কখনও ভাবেনি। বাকি দশ জন পরিষ্কার বলেছে, খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব রয়েছে। জুড এরপর লেখেন, আমি মনে করি, খ্রিস্টধর্ম যারা মানে আর যারা মানে না তাদের মধ্যে

এই যে অনুপাত, এ ভূখণ্ডে তা বিচ্ছিন্ন নয় এবং অস্বাভাবিকও নয়। সবশেষে তিনি মন্তব্য করেন, পরিস্থিতি ও পূর্বলক্ষণ বরং এটাই প্রমাণ করে যে, আগামী শতকে খ্রিস্টীয় গীর্জার মৃত্যু ঘটবে।[৩৯৪] উল্লেখ্য জুডের নমুনা সমগ্রক ছিল বিশজন যা নিতান্ত কম, কিন্তু আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে ইংরেজ এই বিদগ্ধ দার্শনিক তার দেশ ও কাল তথা সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন। জুডের আশঙ্কা মিথ্যে হয় নি, আজ সত্যে পরিণত হচ্ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার যেসব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, তা গোটা বিশ্বে অশুভ প্রভাব ফেলেছে। এটি বিশ্বমানবতার বিপর্যয় ছাড়া কিছু নয়। প্রথমত, পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য যাকে এক কথায় বস্তুবাদ নামে আমরা অভিহিত করেছি, তা গোটা বিশ্বে ছোঁয়াচে ভাইরাসের মতো অপরাপর জনগোষ্ঠীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এবং এই বস্তুবাদের অবশেষ অনিবার্য যেসব ফল রয়েছে সেগুলোকে আমরা নিম্নোক্তভাবে সনাক্ত করতে পারি:

১. ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির বিলুপ্তি;
২. ভোগ-বিলাসসর্বস্ব জীবন ও আরামপ্রিয়তা ;
৩. নৈতিকতার অধঃপতন
৪. পরিশেষে ধর্ম ও পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় ও নাস্তিকতা ইত্যাদি।

ধর্মীয় আবেগ ও উদ্দীপনার বিলুপ্তি

পাশ্চাত্য সমাজেও এক সময়, বিশেষত নবজাগরণের আগে, মানবমনে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি জাগরুক ছিল। কিন্তু নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে যে বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা দিনে দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে অতি-বস্তুবাদ ও ভোগবাদের ডামাডোলে তা যেন সম্পূর্ণই হারিয়ে গিয়েছে। নদবী রহ. লেখেন, বস্তুত এই আত্মজিজ্ঞাসা, যা মানুষের জাগ্রত বিবেক ও জীবন্ত

---

[৩৯৪] C. E. M. Joad. *Ibid.* pp. 114-115.

হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়, জীবনের হৈচৈ ও শোরগোলে যারা ডুবে থাকে, তারা কখনও তা শুনতে পায় না। এর জন্য প্রয়োজন অখণ্ড নীরবতা, নির্জনতা ও অপরিসীম নৈশব্দ, যা পাশ্চাত্যের জীবনে একেবারেই অনুপস্থিত। তাদের জীবন তো একটানা দৌড়ঝাঁপ, ভোগের উল্লাস, আনন্দের হৈচৈ এবং যন্ত্রের শোরগোল ছাড়া কিছু নয়।[৩৯৫] পাশ্চাত্য সমাজ তার এই গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে এসব এমনভাবে হারিয়েছে যে তার কাছে এসব এখন বরং হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা তার হৃদয়ে কখনই জেগে ওঠেনা। বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিজীবী মহলে হয়তো এখনো এসব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা হয় কিন্তু আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ও ভোগবাদী জীবনে তার কোনো প্রভাবই চোখে পড়ে না। জুড লেখেন, আগে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন-সংশয় দেখা দিত এবং হয়তো সন্তোষজনক উত্তর দিয়েও কাউকে কাউকে সন্তুষ্ট করা যেত না, কিন্তু আজকের প্রজন্মের ধাত এই যে, কোনো প্রশ্ন তাদের হৃদয়ে নাড়াই দেয় না এবং আপত্তির আকারে হলেও অন্তরে কোনো কৌতুহল জাগে না।[৩৯৬] কুরআনের ভাষায় বলা যায়, "বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের সব জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহে পড়ে আছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।"[৩৯৭] এ ধরনের মানুষই দলে দলে যুগে যুগে রেসালতের আহ্বানকে অস্বীকার ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত, নবীগণের আহ্বানের বিপরীতে তারা বলত, "আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।"[৩৯৮] এ ধরনের লোক নবীগণের কোমল ও সহজ-সরল সত্য কথার বিপরীতে যা বলত, যেভাবে কথা বলত, কুরআন আমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছে। যেমন তারা বলত:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ط وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ط وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۞ (হুদ) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ

---

[৩৯৫] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪১০।
[৩৯৬] C. E. M. Joad. *Ibid.*
[৩৯৭] নামল : ৬৬।
[৩৯৮] মুমিনুন : ৩৭।

مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ۞

অর্থাৎ, "তারা বলত, হে শোয়ায়েব (আঃ) তুমি যা বল তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি রূপে মনে করি। তোমার গোষ্ঠী না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে তুমি কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তি নও। (হুদ:৯১) তারা বলত, তুমি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেও, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বধীরতা এবং আমাদের ও তোমার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।" (হা-মীম সিজদাহ:৫)

এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে আরব জাহেলিয়াতের এক কবির ভাষায় বলা যায়, "জীবজন্তুকে আওয়াজ দিলে শুনতো, কিন্তু তুমি যাদের ডাকছ, তাদের দেহে তো প্রাণ নেই।" এ ধরনের আবেগ-অনুভূতিহীন লোকদের সম্পর্কে কুরআন বলছে:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۞ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۞

অর্থাৎ, "আপনি আহ্বান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধীরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না, আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব, তারাই আজ্ঞাবহ।" (নামল : ৮০-৮১।)

আজ মুসলিম বিশ্বের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, জীবনাচারে পাশ্চাত্য সমাজ আর মুসলিম সমাজের মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মুসলিম বিশ্ব অবশ্যই পছন্দ করে না, কিন্তু পাশ্চাত্যের রীতি-নীতি ও সংস্কৃতিকে সে বড়ই পছন্দ করে ফেলেছে যার ওপর সে বড়ই সন্তুষ্টচিত্তে আমল করে যাচ্ছে। অথচ, মুসলিম বিশ্বের এটি জানা উচিত যে,

তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ওপর মানবতা মুমূর্ষু দশা থেকে বেঁচে উঠেছিল এবং বেঁচে থাকবে যা এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দলিলসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানগণ যদি বিশ্বনবীর আদর্শ পরিত্যাগ করে, তাতে ইসলামের কিছুই যায় আসে না। কিন্তু সে যদি এভাবে আদর্শ পরিত্যাগ করে তাহলে তাকে নিশ্চিতরূপে জাহান্নামকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কুপ্রভাবে অন্য জাতিগোষ্ঠীর কিছু যায় আসে না, কারণ যারা ওহির আলোহারা তাদের জাতিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও মূল তো এক। কিন্তু মুসলিম জাতি? তারা তো চিরন্তন ওহির শিক্ষামালার ধারক-বাহক। মুসলিম জাতিগোষ্ঠী, একমাত্র যাদের হাতে রয়েছে অবিকৃত ওহির শিক্ষামালা, তাদের জন্যই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ বেশি আতঙ্ক ও বিপদের। অথচ, প্রাচ্য সব সময় পাশ্চাত্যের চেয়ে আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। মানুষের এই পৃথিবীতে আগমন ও প্রস্থান, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের স্বরূপ ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় প্রাচ্যের মানুষকে সব সময় ভাবিত করেছে, সে এসব বিষয়ে জানতে চেয়েছে। প্রাচ্যের মানুষ আলো-আঁধারের মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছে, কখনও আঁধারে হারিয়ে গিয়েছে, কখনও আলোর কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু সত্যানুসন্ধানের এই অভিযাত্রা কখনও নিরবচ্ছিন্নভাবে বন্ধ হয়ে যায় নি। প্রাচ্যের আত্মদর্শন, তত্ত্বদর্শন, দেহতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব- এই যে উর্ধ্বজাগতিক চেতনা ও অনুশীলন, সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও, এসব ছিল মানবের স্বভাবজাত ঐসব জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানেরই বিভিন্ন প্রয়াস। সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় এসব প্রশ্নের মীমাংসায় মানুষ সফল না ব্যর্থ হয়েছে তার চেয়েও বড় কথা হল যে, প্রাচ্য-হৃদয়ে এসব প্রশ্ন সর্বদা জাগরুক ছিল এবং উত্তর জানার উৎসুক হৃদয় সদা অব্যাহত ছিল। সকল বরবাদির মধ্যেও মুসলিম জাহানের নানা

প্রান্তে এমন অনেক আলোর মিনার বিদ্যমান ছিল যেখান থেকে রুহানী খোরাক গ্রহণের লক্ষ্যে ছুটে আসত শতসহস্র প্রাণ।[৩৯৯]

হাসান বসরী রহ., সুফিয়ান সওরী রহ., রাবেয়া বসরী রহ., জুনায়েদ বাগদাদী রহ., আল-গাজ্জালী রহ., আবদুল কাদির জিলানী রহ., আল্লামা রুমী রহ. থেকে নিয়ে ভারবর্ষে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি রহ., নিযামউদ্দিন রহ., শাহ-জালাল রহ., মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ., শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ., হাজ্বি ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ., রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., আল্লামা কাসেম নানুতবী রহ., শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ., সাইয়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ., আশরাফ আলী থানবী রহ., সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী রদবী রহ. - এর মতো অসংখ্য আলোর মিনার ছিলেন যারা ঈমানের আলোয় মানুষের অন্তরজগতকে আলোকিত করতেন। পৃথিবীর নানা প্রান্তের, নানা বর্ণের মানুষ অশেষ কষ্ট-ক্লেষ অম্লান বদনে সহ্য করে এই সোনার মানুষদের কাছে ছুটে আসত, তাদেরকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। শায়খ মুজাদ্দিদে আলফে সানির রহ. ভক্ত-অনুরক্তের সংখ্যা পরিমাপ করা অসম্ভব। তাঁর খলিফা সাইয়্যিদ আদম বিননূরীর (মৃত্যু ১০৫৩ হি.) খানকাহর দস্তরখানে দৈনিক মেহমান ছিল এক হাজার। মৃত্যুর আগে তিনি যখন লাহোরে সফর করেন তখন তার সফর সঙ্গী ছিল দশ হাজার। সাহেবজাদা সাইফুদ্দিন সিরহিন্দের খানকাহর দরস্তরখানে দৈনিক দু'বেলা মেহমান থাকত এক হাজার চারশ জন।

এদেশে ইংরেজ আগ্রাসন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্তও দীনের প্রতি মানুষের আবেগ-অনুভূতি ছিল উল্লেখ করার মতো। মির্জা মাযহার জানেজানা রহ.-এর খলীফা শাহ গোলাম আলী রহ. সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ লিখেন, হযরতের খানকাহে আমি নিজের চোখে দেখেছি, রোম, শাম, বাগদাদ, মিশর, চীন ও হাবশা থেকে আগত লোকেরা বাইয়াত হচ্ছেন এবং পরম সৌভাগ্য মনে করে খানকাহর খেদমত করছেন। নিকটবর্তী হিন্দুস্তান, পাঞ্জাব,

---

[৩৯৯] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত* / পৃ. ৪০৯।

আফগানিস্তানের কথা তো বলাই বাহুল্য। খানকাহের নিয়মিত বাসিন্দা, যারা দুনিয়া ত্যাগ করে আসতেন তাদের সংখ্যা পাঁচশ'র কম হত না। তাদের সবার রুটি-কাপড় ছিল হযরতের যিম্মায়। শুধু মাত্র একদিনের পরিসংখ্যান, ২৮ জুমাদিউল উলা ১২৩১ হিজরি তারিখে তাঁর থেকে কল্যাণ হাসিলের জন্যে যেসব জনপদ থেকে মানুষ এসেছিলেন তা ছিল- সমরখন্দ, বুখারা, গযনি, তাশখন্দ, হিছার, কান্দাহার, কাবুল, পেশোয়ার, কাশ্মীর, মুলতান, লাহোর, সিন্ধু, আমরোহ, সম্ভল, রামপুর, বেরেলী, লখনৌ, ঝাঁসি, বাহরাইচ, গোরখাপুর, আযীমাবাদ, ঢাকা, হায়দরাবাদ, পুনা ইত্যাদি।[৪০০] এটি সেই যুগের কথা যখন যোগাযোগ বলতে পদব্রজ ছিল একমাত্র উপায়। বস্তুবাদের আগ্রাসনের ঐ যুগেও প্রাচ্যে মানুষের দীনি অনুরাগের এই চিত্র ছিল। ঐ যুগেও পূর্ববর্তী যুগসমূহের প্রভাব ছিল যদিও তা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছিল। ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন, তাদের বস্তুবাদী সংস্কৃতি, ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ধর্মীয় ঐ আবেগ-অনুভূতি, উদ্যম-উদ্দীপনা আস্তে আস্তে উল্টে দিতে শুরু করল। পরিশেষে এসব অঞ্চলেও বস্তুবাদ ও ভোগবাদ এবং ধর্মে অনাসক্তির বাজার প্রসারিত হয়ে বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের সমরূপ আরেকটি 'পাশ্চাত্য' তৈরি হয়ে গেল।

ভোগ-বিলাসসর্বস্ব জীবন

প্রাচ্যের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা সে আজ হারিয়েছে, সেটি তার সহজ-সরল ও অল্পে-তুষ্ট জীবন। বিশেষত, ভারতবর্ষ ছিল এর অনুপম দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আজ এক কাতারের বাসিন্দা। পাশ্চাত্যের বাদ-মতবাদ, বস্তুবাদী দর্শনের সে যখন একনিষ্ঠ অনুসারী তাই তার এই মহা-নিয়ামতের বদলে তার জীবনে অনিবার্যরূপে ভর করেছে ভোগ-বিলাসের ভূত। প্রাচ্যের জীবন ও সংস্কৃতি এমনকি তার সাহিত্য ও শিল্পকলা সবকিছুই এখন বস্তুবাদ ও ভোগবাদের জালে বন্দি। তারও জীবনের লক্ষ্য একটাই যা

---

[৪০০] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৪১৯-৪২০; সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০০৪। *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান।* আ ফ ম খালিদ হোসেন অনু. ঢাকা। মুহাম্মদ ব্রাদার্স। পৃ. ৩৪-৩৮।

পাশ্চাত্য থেকে সে শিখেছে। জাহিলী যুগের যুবক কবি তুরফা ইবনুল আবদ লিখেছিল:

> আয়ু যদি মোর বাড়াতে না পার, মৃত্যুহীন জীবন যদি দিতে না পার
> তবে কেন আর কৃপনতা, কেন ত্যাগের কষ্ট, ভোগের সংযম?
> মৃত্যুর আগে দু'হাত ভরে লুটতে দাও, লুটাতে দাও
> আগামীকাল যখন মৃত্যু আসবে, বুঝবে কে তৃষ্ণার্ত?
> তুমি, না সেই উদার যুবক?
> জীবনকে যে সিক্ত রেখেছিল মদ আর মদিরায়।

আধুনিক মানুষের মতো জাহেলী যুগের এই কবি কোনো ছলাকলা না করে জীবনকে সহজ-সরলভাবে অকপটে প্রকাশ করে দিয়েছেন। সুতরাং, আজকের যুগের আর সেই জাহিলী যুগের কী কোনো তফাৎ আমাদের চোখে পড়ে? নদবী রহ. বলেন, আকারে-প্রকারে, আবরণে-অলঙ্কারে যতই ভিন্নতা থাকুক, বিষয় কিন্তু একই- সোনা-চাঁদি ও রুটি-কাপড়। পশ্চিমা বিশ্ব যদি এই জীবন দর্শনের স্রষ্টা হয় তাহলে অন্যান্য জাতি হল তার উপাসক। এটি দুর্ভাগ্য যে মুসলিম জাতিও আজ এই পদরেখার অনুসারী।[৪০১] ভোগ-বিলাসের এই জীবন আজ প্রাচ্যকে বড়ই আরামপ্রিয় বানিয়ে দিয়েছে যা উন্নতির পথে অনিবার্য অন্তরায়।

নৈতিকতার অধঃপতন

ইতিহাসের দিকে যদি নিতান্ত নির্মোহ অখণ্ড দৃষ্টি নিয়ে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রাচ্য এমন অনেক গুণের আধাররূপে বিরাজ করছিল, সত্যি যা অন্যান্য জাতির মধ্যে ছিল না। পৃথিবীতে একান্নবর্তী পরিবারের ধারণা এক প্রাচ্য ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ ছিল এদিক দিয়ে সবার ওপরে। ভারতবর্ষে এখনো এই বিরল সামাজিক যুথবন্ধন লক্ষণীয়। সামাজিক সংহতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রাচ্য ছিল আদর্শ স্থান।

---

[৪০১] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৩২।

বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ, ছোটদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা, শিক্ষকের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, আত্মীয়-অনাত্মীয় বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা- এসবই ছিল প্রাচ্যের অহংকার, যা পাশ্চাত্য কোনো দিন এভাবে উপভোগ করতে পারে নি।

পাশ্চাত্যে পরিবারের ধারণা আজ প্রায় বিলুপ্তির দারপ্রান্তে, আজ সেখানে পরিবার বলতে যা আছে তাতে প্রাচ্যের এই গুণ-বৈশিষ্ট্য নেই। বিয়ে, পরিবার ব্যবস্থা ও নারী সম্পর্কে দু'জন ইংরেজের মানসিকতা এখানে তুলে ধরছি। বিয়ে ও পরিবার গঠনের বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একজনের বক্তব্য হল, মার্কেটে যদি দুধ কিনতে পাওয়া যায়, তাহলে কষ্ট করে বাড়িতে গরু পালনের কী প্রয়োজন? আরেকজনের বক্তব্য ছিল, মহিলারা হল বাসের মতো, যদি একটা মিস কর তাহলে অন্য বাসে উঠে পড়।[৪০২] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাটে একবার এক বিধবা বৃদ্ধা আদালতে নিজ ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সেদিন বিশ্ববাসী এক অসহায় বৃদ্ধার আর্ত-চিৎকার শুনেছিল। আদালতে সেই হতভাগা বৃদ্ধা করুণ সুরে বলছিলেন যে, স্বামী মারা যাওয়ার পর আমি বড়ো একা হয়ে গেছি। বৃদ্ধার অভিযোগ ছিল, ছেলে আমার কোনো খোঁজখবর রাখে না। সে কুকুর পোষে, কুকুরের পিছনে তিন-চার ঘন্টা সময় ব্যয় করে, গোসল করায়, খাবার দেয়, কুকুরকে নিয়ে হাঁটে। অথচ, আমি তার জন্মধাত্রী মা, কত কষ্ট করে বড় করেছি। ছেলেকে দেখতে অধীর আগ্রহে বসে থাকি। কিন্তু দিনে একবারও সে আমার কাছে আসে না। তাই আদালতের কাছে বিনীত আরজি, আদালত যেন আমার ছেলেকে এই আদেশ দেন যে, সে যেন আমার সঙ্গেও কিছু সময় অবস্থান করে। ছেলেও উকিল ধরল। মামলা নিয়ম মতো চলল। পরিশেষে আদালত আদেশ দিলেন, আপনার ছেলে প্রাপ্ত-বয়স্ক, তার বয়স আটার বছরের বেশি। সে একটি কুকুর পোষে। তাই কুকুরের দেখাশোনা করা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সে প্রাপ্ত-বয়স্ক হওয়ায় মায়ের দায়িত্ব পালনে তাকে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

---

[৪০২] জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী। *খুতুবাতে যুলফিখার*, খণ্ড ১৫, পৃ. ৭৫-৭৬

সুতরাং আপনার সাহায্য-সহযোগিতার প্রশ্নে রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে পারেন যাতে সরকার আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আপনার দেখাশোনা করবে !

এটিই হল পাশ্চাত্য জীবন ও সমাজ। এর বিপরীতে লক্ষ করুন ইসলাম এসব ক্ষেত্রে কী নির্দেশ প্রদান করে? আল-কুরআনের নিচের আয়াতগুলো লক্ষ করুন:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۞ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۞ (আল-ইসরা) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۞ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۞ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (আহকাফ)

অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে উহ্ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সঙ্গে শিষ্টাচারপূর্ণ ভাষায় কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (আল-ঈসরা: ২৩-২৪) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস....। (আহকাফ: ১৫)

পাশ্চাত্য সমাজের অমানবিক অপসংস্কৃতির বিপরীতে ইসলামে রয়েছে এমন সর্বোত্তম আদব, আখলাক অর্জন ও পালনের নির্দেশ। বাবা-মা যদি মুশরিকও হয় তাতেও তাদের সঙ্গে সন্তানকে সদাচার করতে কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তুমি নিজে ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার।'[৪০৩] বাবা-মায়ের সেবা করে যে সন্তান জান্নাত হাসিল করতে পারে নি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোকের ওপর মারাত্মক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।[৪০৪] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, মানুষের সর্বোত্তম নেক আমলের একটি হল নিজের পরিবারের সঙ্গে সদাচার করা এবং মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে সদাচার করা।[৪০৫] বিশ্বনবীর তথা ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা হল, "যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভূক্ত নয়।" (আবু-দাউদ) একইরকমভাবে ইসলাম ছোটবড়, আত্মীয়-অনাত্মীয়, প্রতিবেশী, বৃদ্ধ, অসুস্থ সকলের প্রতি সর্বোত্তম আদব ও সহৃদয়তা পালনের নির্দেশ দেয়, এর বিপরীত করাকে ইসলাম কখনই সমর্থন করে না, এমনকি এতে শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চরিত হয়েছে। প্রাচ্য এধরনের শিক্ষা অনুসরণ করে পৃথিবীর আদর্শ হতে পেরেছিল।

প্রাচ্যের নৈতিকতা এমন ছিল যে মানুষ প্রাণ দিত, কিন্তু নীতি বিসর্জন দিত না। ১৭৫৭ সালের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শায়খ রাযিউল্লাহ বাদায়ূনী রহ. যখন অভিযুক্ত হয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হলেন, সেই আদালতের বিচারক ছিলেন শায়খের ছাত্র। বিচারক কোনো বন্ধুর মাধ্যমে শায়খকে জানালেন, তিনি যেন অভিযোগ অস্বীকার করেন যাতে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া যায়। শায়খ নারাজ হয়ে বিচারককে বললেন, তুমি কি চাও, একটি মিথ্যা দিয়ে সারা জীবনের অর্জন নষ্ট করে ফেলি? তাহলে তো নিজেই নিজের সর্বনাশ করলাম। শায়খ এমন লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। আল-কুরআন বলছে:

---

[৪০৩] আবু-দাউদ।

[৪০৪] তাবারানী, ইবনে হিব্বান।

[৪০৫] মুসলিম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ط إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ط فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ط وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ (নিসা) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ط ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ (আন'আম)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী, অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত। (নিসা:১৩৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা কর তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক, আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (নিসা ৫৮) ইয়াতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; তবে উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে পার যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্ব দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (আন'আম:১৫২)

ভারবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের শুরুর দিকে মুজাফ্ফরনগর জেলার কসবা কান্ধলায় একখণ্ড ভূমি নিয়ে একবার হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দেখা দিয়েছিল। মুসলমানগণ এটিকে মসজিদের জমি বলে দাবি করেন এবং হিন্দুগণের দাবি জমিটি দেবসম্পত্তি। অবশেষে বিষয়টি আদালতে গড়ায়। ইংরেজ বিচারক উভয় পক্ষের যুক্তি-তর্ক শুনে দ্বিধায় পড়ে যান। তখন তিনি মুসলিম পক্ষকে একান্তে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কোনো হিন্দু সাধু কি আছেন যার সততায় আপনাদের আস্থা আছে এবং যার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা হতে পারে? তারা বললেন, এমন কেউ নেই। একইভাবে বিচারক হিন্দুদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। হিন্দুগণ বললেন, এ বড়ো কঠিন পরীক্ষা, তাও ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত বিষয়। তবে একজন আছেন যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না, হয়তো এক্ষেত্রেও তিনি সত্যই বলবেন। তারা একজন মুসলিম বুজুর্গের নাম বললেন। তাঁকে আদালতে নিয়ে আসা হল। তিনি সব কথা শুনে বললেন, সত্য কথা বলতেই হবে। জমি মন্দিরের, মসজিদের নয়। নদবী রহ. এ ঘটনায় উল্লেখ করেন, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালতের ফয়সালায় সেদিন মুসলমানদের পরাজয় হল, কিন্তু নৈতিকতায় জয় হল ইসলামের। ইসলামি শিক্ষার একটি মাত্র প্রকাশে একখণ্ড জমি যদিও হাতছাড়া হল, কিন্তু বহু হৃদয় সেদিন জয় হয়েছিল, অনেকে এই ঘটনায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[৪০৬]

আজকের মতো তাদেরও রুটি-রুজির নেহায়েত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা যেরকম নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তা আজকের যুগে বড়ই বিরল। শায়খ আব্দুর রহীম রামপুরী রহ. নিকট অতীতে মাত্র দশ টাকা মাসিক বেতনে এক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন। এসময় রোহিলাখণ্ডের (ভারত) মিস্টার হকিন্স নামীয় এক ইংরেজ দায়িত্বশীল তাঁকে বেরিলী কলেজে মাসিক আড়াইশ টাকা বেতনে শিক্ষকতার প্রস্তাব দেন। ব্রিটিশ আমলের আড়াইশ টাকা মানে অনেক বড় বেতন কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্য যে, ঐ শায়খকে কোনো মতেই রাজি করানো গেল না।

---

[৪০৬] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত* / পৃ. ৪৪২-৪৪৩।

পিড়াপিড়ির শেষ পর্যায়ে শায়খ বললেন, পরকালে আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবেন, বেশি মূল্যে ইলম বিক্রি করেছ, তখন কী জবাব দেব? শায়খ মাসিক দশ টাকায়ই জীবন কাটিয়ে দিলেন, আর এক ইংরেজ এমন নৈতিকতার কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালো। প্রসিদ্ধ খলিফা আল-মনসুর একবার কিছু লেখার জন্য মজলিসে উপস্থিত ইবনে তাউসকে কালির দোয়াত এগিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু ইবনে তাউস বিরত থাকেন। ক্ষুব্ধ খলিফা, আমীরুল মুমিনীন- এর হুকুম না মানার কারণ জানতে চাইলেন। ইবনে তাউস বললেন, আমার আশাঙ্কা, এ কালি দিয়ে কোনো অন্যায্য ফরমান লেখা হবে, আর আমিও এর ভাগীদার হয়ে যাব! এরা যেন ছিলেন কুরআনের এই আয়াতের প্রতিচ্ছবি:

"সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[৪০৭]

নৈতিকতার প্রশ্নে এই ছিল প্রাচ্য। আর ইসলামি সোনালী যুগ, যার আলোচনা আমরা পিছনে করে এসেছি, সেটি ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। কিন্তু আজকের প্রাচ্য? সু-উচ্চ ঐ নৈতিকতার বিপরীতে আজকের প্রাচ্যের মুসলমানদের কোনভাবে কী তুলনা করা যায়? নদবী রহ. লেখেন, এখনকার প্রাচ্যের মুসলমানরা ইউরোপের বিভিন্ন সরকারের পক্ষে কাজ করে, সামান্য পয়সায় যাদের মেধা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি ও লেখনী অমুসলিমদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের অনুকূলে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মুসলিম স্বার্থের প্রতিকূলে ব্যবহৃত হয়। তুলনা করুন এবং বিচার করুন, কোথায় ছিলাম, কোথায় নেমে এলাম।[৪০৮] প্রাচ্য এখন প্রাচ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের রক্ত ঝড়ায়। প্রাচ্য এখন ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার বাজার খোলে বসেছে, এমন কোনো অনৈতিক কাজ নেই যাতে আজ মুসলমানরা জড়িত নয়। লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্যের নাগরিক জীবনে তাও নৈতিকতার উদাহরণ

---

[৪০৭] মায়িদাহ : ২

[৪০৮] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৪৫।

অনেক আছে যে জন্য সেসব দেশসমূহ ভালভাবেই ঠিকে আছে। সেটি হল, পাশ্চাত্য নিজ দেশের স্বার্থে পররাষ্ট্র ও পরজাতির সঙ্গে যে কোনো অনৈতিক কাজ করতে পারে, কিন্তু নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশ্নে তারা নৈতিকতা বিসর্জন দেয় না। বিবিসির এক বাংলা অনুষ্ঠানে এক শ্রোতা প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের দেশে যে কোনো পণ্যের গায়ে লেখা থাকে, নকল হইতে সাবধান। ইংল্যাণ্ডেও এটি লেখা থাকে কি না? উত্তরে বলা হল, না, এটি লেখা থাকে না। কারণ এখানে কেউ কল্পনাই করে না যে পণ্যে ভেজাল থাকতে পারে। এই লেখকের শোনা ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ষাটের দশকে ইংল্যাণ্ডে পড়তে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি দুধওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, দুধে পানি মেশানো হয় কি না? দুধওয়ালা যে জবাব দিয়েছিল তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। দুধওয়ালা বলল, স্যার, দুধে যদি পানি মেশাই তাহলে আমাদের দেশে নিউটন আর শেক্সপিয়ার জন্মাবে কীভাবে? কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোনো পণ্য কী খোঁজে পাওয়া যাবে, যাকে বলা যাবে শতভাগ ভেজালমুক্ত? সমাজের সর্বত্র এখানে ভ্রষ্টতা ও নীতিহীনতার শুধু সয়লাবই নয়, বরং প্রাচ্যে এমন লোকের অভাব নেই যারা প্রয়োজনে এবং সুযোগ পেলে নিজ দেশ-ই বিক্রি করে দেবে। এসবই বস্তুবাদের কুফল যা আজ পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যকে অনৈতিকতার সাগরে অধিক নিমজ্জিত করেছে এবং নিঃসন্দেহে এটি প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় ক্ষতি ডেকে এনেছে।

ধর্ম ও পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় ও নাস্তিকতা

বস্তুবাদের নামে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির যে চরিত্র ও অশুভ প্রভাবের কথা বলা হল তার অবশেষ অনিবার্য পরিণতি হল ধর্ম ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা, সন্দেহ-সংশয় ইত্যাদি। আর ধর্ম ও পরকাল সম্পর্কে এই যে উদাসীনতা, সন্দেহ-সংশয় তার অনিবার্য পরিণতি হল নাস্তিকতা যা আজ পাশ্চাত্য-প্রাচ্য- সর্বত্র দৃশ্যমান। বহু পণ্ডিত, শিক্ষিত গবেষক ব্যক্তিত্ব আছেন যারা এই সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত নন। এটি সেই পুরনো রোগ- ওহি ও রেসালতের শিক্ষার বিস্মৃতি, বিকৃতি ও বিলুপ্তির মাধ্যমে যার বীজ উপ্ত হয়; আর ইউরোপীয় সমাজদর্শনের নামে বড়ো আদর-যত্নের সঙ্গে পরিচর্যা করে তাকে ফুলে-ফলে, পত্র-পল্লবে, কুসুম-কাননে ভরিয়ে তুলেছে। বস্তুবাদের

নামে এটি মুসলিম প্রজন্মের সম্মুখে এখন সবচেয়ে বড় ফিতনা ও বিপদ। এটি হল সেই আবহমান ইউরোপীয় ইন্দ্রিয়বাদী ভূত যা গ্রিকরা রোপন করেছিল– দৃশ্যমান জগত সত্য, অদৃশ্য মিথ্যা, অথবা দৃশ্য পূজনীয় অদৃশ্য বর্জনীয়। অদৃশ্য-অলৌকিকতা যুক্তিপ্রামাণ্য নয়, আর যুক্তিপ্রামাণ্য নয় এমন কিছু গ্রহণীয় নয়- বস্তুপূজারীদের এই হল গ্রহণ-বর্জনের যুক্তি ও বিবেকের দৌড় যার ইউরোপীয় জনক-জননী ছিলেন গ্রিক পণ্ডিতগণ।

মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব হল সে কোনো কিছু সহজে অর্জন করতে চায়। কিন্তু অদৃশ্য প্রপঞ্চসমূহকে বুঝতে হলে বেশ মগজ, শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয় যা দৃশ্যমানতার বিপরীতে কঠিন। দৃশ্যমানকে বুঝতে তা লাগে না কিন্তু অদৃশ্যের বেলায় ঠিক এর উল্টো। যেমন, একটি গাড়ি, বাড়ি, টাকাপয়সা প্রভৃতি বস্তুকে বোঝানোর জন্য কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই এর স্বরূপ ও হাকিকত বোঝে। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব ও মারেফাত, আল্লাহর মহব্বত, রূহ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি না দেখা বিষয় সহজে বোঝে আসে না। এসব অদৃশ্য বিষয়কে বিবেকের কষ্টিপাথরে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়- এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট শিক্ষামালা ও পরিবেশের, এবং সর্বোপরি মহান ও পবিত্র রবের অনুগ্রহের।

বস্তুপূজারী পণ্ডিতগণ মানুষের সাধারণ দুর্বলতা ও অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দৃশ্য-অদৃশ্যের বিষয়ে তাদের বস্তুবাদী উদ্দেশ্যকে সহজেই জয় করতে পেরেছেন। কিন্তু এই পণ্ডিতগণ বস্তুবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করলেও অদৃশ্যের বেলায় বেজায় ঠোকর খেয়েছেন। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই আজ বস্তুপূজার এই প্রহেলিকার মোহগ্রাসের শিকার। বস্তুবাদ এমন এক বিষ যা মানুষের মন-মগজ, বিবেক ও আত্মাকে সত্যের পথে প্রতিবন্ধী করে তুলে, এক প্রকার হত্যা করে। এর ফলে বস্তুবাদীর চোখে দুনিয়া ও এর যে কোনো ভোগ্যবস্তুকে নতুন নতুনরূপে মনোরম লাগে, এসবই তার বিবেকে একমাত্র ও শেষ ঠিকানা বলে প্রতিয়মান হয় বিপরীতে অদৃশ্য বিষয়াবলীর বেলায় এরা বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী।

এজন্যই ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসৎ ব্যবহারকে এদের কাছে গোনাহ বলে মনে হয় না, মূলত বস্তুবাদ পাপ-পূণ্যের ধারণাকেই মুছে ফেলে।

উদাহরণস্বরূপ, চোখের কুদৃষ্টি, গীবত, অহংকার, হিংসা, অসংযত লোভ প্রভৃতি মানসিক রোগ সমাজকে নিকৃষ্ট বানিয়ে দেয়, এসব মনুষ্য সমাজকে পশু সমাজেরও নীচে নামিয়ে দেয়। সমাজ বা বিশ্বের ফেতনা-ফাসাদের মূলে এসব আত্মিক রোগের ভূমিকাই দায়ী যদিও খুব কম মানুষই এটি অনুভব করে। এখন যদি আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকৃত হয় তাহলে কোন সে সুপারম্যানের মাধ্যমে কোন ল্যাবেরেটরিতে কোন দূরবীন ও অনুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এসব আত্মার রোগ সনাক্ত করা হবে এবং এসবের চিকিৎসা করা হবে? একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর সঠিক বিশ্বাস ও ভয়ই এসবের একমাত্র মূল চিকিৎসা হতে পারে। কুরআনে আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ তোমাদের চোখের খেয়ানত (জিনা) ও অন্তরের গুপ্ত অপরাধসমূহ পুরোপুরি জানেন। অন্তরে যত হারাম মজা আস্বাদন কর, আল্লাহপাক ওসবকিছুই অবগত আছেন।" বোখারী শরীফের এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুদৃষ্টি চোখের জিনা। মেশকাতের এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুদৃষ্টিকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত ঐ নারীও যে নিজেকে দৃষ্টিপাতের জন্য পেশ করে।" কুরআন-হাদিসের এসব বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, কুদৃষ্টিকারী অভিশপ্ত আর অভিশপ্ত ব্যক্তি বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে যদি না তওবা করে সংশোধিত হয়। অভিশপ্ত ও বেঈমানের শাস্তি হল জাহান্নাম।[৪০৯] অথচ কুদৃষ্টিকে আজকাল কোনো গুনাহই মনে করা হয় না। সমাজে প্রতিমুহূর্তে যে ব্যভিচার বা ধর্ষণের ঘটনা ঘটে তার সূত্রপাত হয় চোখের কুদৃষ্টি থেকে। এজন্য কুরআনে মুমিন নর-নারীকে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন তাদের দৃষ্টির অসৎ ব্যবহার না করে।

---

[৪০৯] হযরত হাকীম মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আখতার রহ. ২০০৬। মাওলানা আবদুল মতিন বিন হুসাইন অনু. আল্লাহপ্রেমের সন্ধানে। পৃ. ৫৩-৭০।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۞ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۞ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞

অর্থাৎ, মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে, এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (নূর:৩০)

এখন ওহির এসব বক্তব্যের বিপরীতে দুনিয়াবী বড় থেকে বড় আইনকে সামনে দাঁড় করুন। মানুষ স্বভাবগতভাবে সীমাবদ্ধ ও দোষ-ত্রুটিযুক্ত প্রাণি। ফলে মনুষ্য রচিত আইন ও বিধি-ব্যবস্থা কখনই সীমাবদ্ধতা ও দোষ-ত্রুটিমুক্ত কিংবা ফাঁকফোকরমুক্ত হতে পারে না। অপরাধী জানে যে সে কোনো না কোনো ফাঁকফোকরে এক দিন না একদিন বেরিয়ে যাবেই, বাস্তবে তাই হচ্ছে; এ ধরনের বিধি-ব্যবস্থা ঠিক তখনই সফল হতে পারে যখন এটি কেবল মহামহিম আল্লাহর শিক্ষামালার চর্চা ও ব্যবহারের অনুগামী হবে। অপরাধী তখন উপলব্ধি করবে যে এটি দুনিয়াবী আপাত:শাস্তি, পরকালের শাস্তি আরো ভয়াবহ যদি তিনি মাফ না করেন। এক হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, "কুদৃষ্টি শয়তানের এক বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা বর্জন করবে বিনিময়ে আমি তাকে এমন এক (নবতর) ইমান দান করব যার মধুস্বাধ সে অন্তরে অনুভব করবে। অন্তরের মধ্যে এক অপার্থিব স্বাদ ও মিষ্টতা লাভ করবে।" এটি একটি পরীক্ষাযোগ্য কথা। এর ফলে এক ফেরেশতাতুল্য পবিত্র জীবনের চর্চা ও পথ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোল্লা আলী কারীর মতে, এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে এর ফলে আল্লাহ তাকে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু নসীব করবেন।[৪১০] বস্তুবাদের পচনের বিপরীতে ইসলাম এভাবেই মানুষকে বাস্তব শান্তির জীবন দান করে।

[৪১০] *প্রাগুক্ত।*

আল্লাহর এক নাম 'সালাম'- যার অর্থ 'শান্তি'।
আল্লাহ ছাড়া শান্তির কোনো উৎস নেই।
ইসলাম অর্থও শান্তি-
এটি আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবন-ব্যবস্থা।
যে ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হয়-
কেবল সে-ই শান্তি পেতে পারে ॥

প্রাচ্যবিদদের কর্মকাণ্ড

প্রাচ্য ও এর সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে একদল প্রাচ্যবিদ দীর্ঘকাল থেকে অবিরাম গবেষণা ও লেখালেখি করে যাচ্ছেন। এরা অমুসলিম আরব, অনারব। এদের অনেকে যেমন পাশ্চাত্যবাসী, তেমনি অনেক প্রাচ্যবাসীও রয়েছেন। যেমন: উইলিয়াম ম্যুর, পি. কে. হিট্টি, টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড, আর. এ. নিকলসন, কার্ল ব্রোক্লেম্যান, গোল্ডযিহার, ডব্লিউ. সি. স্মিথ, এ. আর. গিব, স্ট্যানলি লেনপোল, ই. উইলিয়াম লেন, জি. বি. স্ট্রেঞ্জ, মন্টগোমারী ওয়াট, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, এরকম অসংখ্য নাম উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন যা অনেক মুসলিমও করতে পারেন নি। যেমন: পি. কে. হিট্টি, টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড, স্ট্যানলি লেনপোল- এর মতো কারো কারো নাম উল্লেখ করা যায় যারা ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও অনেক ভাল গবেষণা করেছেন। কিন্তু এদের মধ্যে বেশির ভাগই হলেন তারা যারা ইসলামকে বিকৃতরূপে উপস্থাপনের জন্য গবেষণা করে থাকেন। আবার অনেক মুসলিম আছেন যেমন, ত্বহা হোসাইন, আহমদ আমীন, আলী হাসান আবদুল কাদের যারা খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তাদেরই ওপর আস্থাশীল হয়ে গবেষণা করে থাকেন। স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী- এরকম অনেক লেখকও আছেন যাদের গবেষণায় খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদদের গবেষণার প্রভাব লক্ষণীয়। সুতরাং প্রাচ্যবিদদের গবেষণা বা গ্রন্থাদি পাঠ করার পূর্বে এসব বিষয় সম্পর্কে আগে জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজন, না হলে ইসলামের সঠিক পরিচয়ের বদলে ভুল বার্তাই পাওয়া যাবে। প্রাচ্যবিদদের বেশির ভাগই তাদের পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে থাকেন যার মূলে থাকে পাশ্চাত্যের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক,

ভৌগোলিক, সামরিক প্রভৃতি স্বার্থ। এজন্য তারা ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও প্রাচ্য সম্পর্কে মানুষকে বিকৃত ও বানোয়াট তথ্য অত্যন্ত আধুনিক মোড়কে পরিবেশন করে থাকে।[৪১১] এধরনের প্রাচ্যবিদ জগতের সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষতি করেন, তারা বহু মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখেন।

সত্যধর্মকে ভুল বোঝা হলো

গ্রন্থের পূর্ববর্তী তথ্য-উপাত্তের দীর্ঘ বিশ্লেষণ থেকে ওহিভিত্তিক জীবনাদর্শ বনাম মনুষ্য রচিত জীবনাদর্শের একটি তুলনামূলক চিত্র নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে মনুষ্য রচিত বাদ-মতবাত তথা জীবনাদর্শ সর্বদা ত্রুটিমুক্ত নয়, সর্বজনীন নয়, এবং সকল প্রশ্নের জবাব ও পরকালীন মুক্তি দিতে অক্ষম। ওহিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক উৎসারিত হওয়ায় এটি সর্বকালে সর্বার্থে অভ্রান্ত, সর্বজনীন, চিরন্তন ফলে বিকল্পহীন, এই ব্যবস্থার যথার্থ অনুসরণেই ইহ-পরকালীন শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত হয়। এই ব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলছেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۞ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۞

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন (আদর্শ) একমাত্র ইসলাম। যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল-ইমরান: ১৯ ও ৮৫)

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে বহু মানুষ এই মহাসত্যের বদলে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়েছে, মানুষ কীভাবে তাদের প্রভু প্রদত্ত সত্য দীনের পরিবর্তে বিকৃত ধর্ম ও বাদ-মতবাদের

---

[৪১১]মুসতফা আস-সিবাঈ। ২০১৭। *প্রাচ্যবিদের ইসলাম চর্চার নেপথ্যে*। আবদুল্লাহ আল ফারুক অনু. ঢাকা:মাকতাবাতুল আযহার। পৃ. ৩৩-৩৯। এ বিষয়ে আরো পড়ুন: আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৫। *মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক (বিষয়ে) গবেষণামূলক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা*। মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন অনু.। ঢাকা:মুহাম্মদ ব্রাদার্স।

সিলসিলায় প্রহসনের জিন্দেগীতে ডুবে আছে। সবচেয়ে নির্মম যে তারা নানাভাবে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মানুষের কাছে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করে যদিও তারা অনেকেই আসল সত্য জানে। এভাবে সত্য থেকে তারা বঞ্চিত থেকে যায়।

মুসলিম উম্মার পতনে বিশ্বের সর্বনাশ ?

যে কোনো মানুষের সত্যধর্মের অনুসন্ধান এজন্য করা আবশ্যক যে, প্রত্যেকের দাবী মতে প্রত্যেক ধর্ম যৌক্তিকভাবে সত্য হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকের দাবিই যদি সত্য হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়- আল্লাহ্ই নানা ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হতে পারে যে জগতসমূহের একজন মালিক 'এক মানুষ জাতিকে' সৃষ্টি করে তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করে ফেললেন?

বিশ্ব মানব-সংসারে কোনো পরিবারে সন্তান সংখ্যা যতই হোক না কেন বাবা একজনই হয়, এ রীতি অপরিহার্য। সন্তানের পিতা একাধিক হলে নানা সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা যে সৃষ্টি হয় তা স্পষ্ট। আবার, কোনো সন্তানকেই একাধিক মা ধারণ করতে পারেন না, সন্তানের মা একজনই হন- সমস্ত প্রাণীকুলে এই রীতি। কোনো প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একজনই হন, একাধিক হলে মতানৈক্যের ফলে নানা সমস্যা তৈরি হয়, এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভেঙে গিয়ে প্রতিষ্ঠানই শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা একাধিক হলে অবশ্যই তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। এক স্রষ্টা বলতেন এখন দিন হবে, আরেকজন বলতেন রাত, একজন বলতেন রাত হবে ছয় মাস দীর্ঘ, আরেকজন বলতেন তিন মাস দীর্ঘ হবে। ফলে একাধিক স্রষ্টার মন কষাকষির যাতাকলে পড়ে গোটা বিশ্বব্যবস্থাটাই তছনছ হয়ে যেত। কুরআনে সে কথাই বলে দেওয়া হয়েছে, যেমন:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

যদি সৃষ্টিজগতে এক আল্লাহর বদলে একাধিক উপাস্য থাকত তবে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি হতো (এতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো)। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। (আম্বিয়া:২২)

কাজেই সকল সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা একজন হওয়াই স্বাভাবিক, একাধিক হওয়াটাই অস্বাভাবিক। তাহলে এক স্রষ্টার অসংখ্য ধর্ম সৃষ্টি করার কিইবা প্রয়োজন ছিল? নানা মত, নানা পথের ফলে মানুষে মানুষে যে বিভেদ-বৈষম্য বাড়ে বৈ কমে না তা তো আপনি আমি নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের অন্যায় উন্মাদনা পৃথিবীতে অনেক রক্তপাতের কারণ হয়েছে এবং হচ্ছে। সকল ধর্মাবলম্বীর নিজ নিজ দাবি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাই যদি সকল ধর্মের স্রষ্টা হন তাহলে এসব দ্বন্দ্ব-কলহ, রক্তপাতের দায় কে নেবে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা না মানুষ? কিন্তু সৃষ্টিকর্তার জন্য এ কী করে মানায়? এক পিতার দশ সন্তান হলে পিতা সেই দশ সন্তানকে একইরকম ভালবাসেন যদি না সন্তানরা বড় হয়ে বিরুদ্ধাচারণের দ্বারা পিতাকে এক্ষেত্রে বৈষম্য করতে বাধ্য করে। কোনো মায়ের উদর থেকে যদি চারটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তাদের পিতা কখনই এ কথা বলেন না যে, আমি এদেরকে জীবন পরিচালনার জন্য নানা ধরনের পরস্পর বিপরীতমুখী ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্য বাঁধিয়ে রাখব। একজন সাধারণ মানুষের জন্য যদি এটা বেমানান হয় তাহলে এই বিশ্বজাহানের যিনি মালিক তাঁর পক্ষে কী করে মানানসই হবে যে, তিনি এক মানুষ জাতিকে বিভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে বিভেদ-বৈষম্যের মাঝে ঠেলে দেবেন?

এক ধর্মে যা পালনীয় অন্য ধর্মে তা ঘৃণিত, ফলে বর্জনীয়। এক ধর্মে মূর্তিপূজা পালনীয় অন্য ধর্মে একই কাজ ঘৃণিত, ফলে বর্জনীয়। এক ধর্মে নামাজ রোজা হজ্জ অবশ্য পালনীয় অন্য ধর্মে একই কাজ বর্জনীয়। অর্থাৎ, নানা ধর্মে নানা বিপরীতধর্মী বিধি-বিধান। তাহলে এক সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে মানবকুল নামে একটি জাতিকে স্বয়ং তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠালেন, কিন্তু জীবন-বিধান দিলেন একাধিক অধিকন্তু বিপরীতধর্মী হওয়ার ফলে

মানবসমাজে নানা দল-উপদল এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি হল- এ কথা কি যৌক্তিক বলে মনে হয়? কেননা স্রষ্টা বলতে তো এমন এক মহান ও পবিত্র সত্তাকে বুঝায় যিনি সত্তায় একক এবং জ্ঞানে-গুণেও একক, তাই তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য কেউই নেই। ফলে তাঁর সকল কর্মকাণ্ড যেকোন ত্রুটি ও সীমাবদ্ধা থেকে মুক্ত। স্রষ্টার এসব বৈশিষ্ট্য না থাকলে তিনি স্রষ্টা হতে পারেন না। অন্যদিকে, পথ ভিন্ন হলেও গন্তব্য এক কিংবা সকল পথেই মালিককে পাওয়া যায় বা সন্তুষ্ট করা যায়- এ কথারইবা প্রমাণ কী? সৃষ্টিকর্তা যদি নানা পথ ও মতের স্রষ্টা না হন, তিনি একক- সুতরাং তাঁর মনোনীত মত-পথ যদি একটিই হয়, তাহলে তো অন্যান্য সকল মত-পথ ভ্রান্ত বলেই প্রতিপন্ন হবে। ফলে অন্যান্য ভ্রান্ত মত-পথে তো মালিকের সন্তুষ্টি লাভ করার প্রশ্নই ওঠে না। একজন স্বল্প শিক্ষিত মানুষও যদি তার যুক্তি-বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগান তাহলে তার বিবেক এ কথারই স্বীকৃতি দিবে যে, এমন সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট মানবকুল নামের এক প্রজাতির জন্য একটিমাত্র ধর্ম বা জীবনব্যবস্থাই নির্ধারণ করে থাকবেন– এটাই যৌক্তিক। বিবেকের দাবি কী এটাই নয়? কুরআনে সে কথাই বলা হয়েছে:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ...

"আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভূক্ত (একই ধর্মভূক্ত) ছিল, পরে (কুফর ও শিরকের দ্বারা) পৃথক হয়ে গেছে।" (ইউনুস: ১৯)

আমরা আধুনিক যুগের মানুষেরা প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করতে নারাজ। অতি সাধারণ কোনো বস্তু ক্রয় করার সময়ও আমরা সেটি ভালমতো পরীক্ষা করে নেই যে বস্তুটি খাটি কি না। একজন নিরক্ষর মানুষও এ কাজটি খুটিয়ে খুটিয়ে করেন। দশ টাকার মাছ ক্রয়ের সময় আমরা সেটি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেই। অথচ পৃথিবীতে অগণিত মানুষ আছেন যারা গোটা জীবনে একবারও এ বস্তু খেয়ে দেখেননি এবং এতে কেউ রসাতলেও যাননি। এ প্রাণীকে ভক্ষন করলেও করা যায় আবার না করলেও চলে। ফলে এটি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যা ছাড়া জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।

অথচ ধর্মবিশ্বাস কী এর চেয়েও তুচ্ছ বা কম গুরুত্বপূর্ণ যে একে যাচাই-বাছাই করার কোনই প্রয়োজন নেই? সক্রেটিস বলেছিলেন: "অপরীক্ষিত জীবন যাপন করারই যোগ্য নয়।" তাহলে ধর্ম বিশ্বাসের মতো একটি জটিল অথচ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিনা প্রমাণে, বিনা পরীক্ষায়, অথবা না বুঝে জীবনভর বয়ে নিয়ে বেড়াব কোন যুক্তিতে? এভাবে জীবন পার করে দেওয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কোনো বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেলে তার প্রতি বিশ্বাস মজবুদ হয় ফলে তা পালন করতেও আগ্রহ থাকে। তা না হলে, বিশ্বাস ও আমল হয় কচুপাতার ওপরে পতিত বৃষ্টির পানির ফোটার মতো অতি নড়বড়ে যা হালকা বাতাসের আঘাতেই উড়ে যায়। তাই একজন বুদ্ধিমান মানুষের উচিত হবে নিজের ধর্মবিশ্বাসকে পরখ করে নেওয়া। কেননা মৃত্যুর পর আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে যদি আমার অনুসৃত পথ বা জীবনাদর্শ ভ্রান্ত বলে চিহ্নিত হয়ে যায় তাহলে ভেবে দেখুন তো তখন আমার কী দশা হবে? তখন কী কেবল এই আফসুসই হবে না যে– হায় আমার পোড়া কপাল, জীবনভর শুধু দুনিয়া দুনিয়া করে কাটালাম, দশ পয়সার অতি তুচ্ছ বস্তুকণাও যাচাই না করে গ্রহণ করিনি, অথচ যে শুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনে মুক্তি নাই, যে শুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস না হলে মৃত্যুর পর অনন্তকাল দোযখের আগুনে পুড়তে হবে সেই আসল জিনিসেই আমি ধোঁকা খেয়ে গেলাম! যারা সঠিক পথে ছিল তাদের কথায় কান দেই নি, কিছু বললে বা লেখলে বরং সেসবের বিরুদ্ধে প্রাণপন বিরোধীতা করেছি, নিজের মতই সঠিক মনে করে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছি, কোনো দিন তা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করিনি, গোড়ামির কারণে যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারিনি। অথচ, মৃত্যুর পর আজ দেখা যাচ্ছে আমিই মহাভ্রমে জীবন সাঙ্গ করেছি! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু কী হবে? কাজেই আসুন, সকল প্রকার গোড়ামী বাদ দিয়ে আপন আপন ধর্মবিশ্বাসকে তদন্তসাপেক্ষে প্রমাণ করে নেই যে আমি সঠিক না ভুল পথে রয়েছি।

সত্যধর্ম চিনতে পারা কঠিন কিছু নয়, অসম্ভব তো নয়ই। সত্যধর্মকে চিনার অবশ্যম্ভাবী পথ হল সত্যধর্মের নিম্নের বিষয়গুলো অবশ্যই থাকতে হবে: ১. সত্যধর্মের অবশ্যই অবিকৃত ওহী থাকতে হবে। অর্থাৎ, অবিকৃত ওহী আছে

এমন ধর্মই সত্যধর্ম হবে এবং ২. সত্যধর্মের অবশ্যই একজন প্রফেট বা নবী থাকবেন যাঁর অবিকৃত বাণী বা শিক্ষামালা বর্তমান থাকবে। আমরা বিভিন্ন ধর্মের বিকৃতির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, আবার অনেক ধর্মের কোনো ওহি ও নবীই নেই এটিও দেখেছি এবং একইসঙ্গে ইসলামের ওহি ও তার নবীর আদর্শমালার অবিকৃত উপস্থিতিরও প্রমাণ পেয়েছি। এবার লক্ষ করুন, যেসব ধর্মের মূল গ্রন্থ বা ওহি-ই বিকৃত হয়ে গেছে এবং তাদের নবীদের শিক্ষামালারও কোনো হদিস নেই, অনেক ধর্মের কোনো ওহি ও নবী নেই যা-কিছুই একটি ধর্মের সত্যধর্ম হওয়ার অপরিহার্য পূর্বশর্ত, সেসব ধর্ম কী করে মানবজাতির জন্য পথ প্রদর্শক হতে পারে? এতে প্রমাণিত হয় যে এ ধরনের ধর্ম তা সে যে ধর্ম-ই হোক কখনই অনুসরণ বা পথ প্রদর্শনের যোগ্যতা রাখেনা। সুতরাং তথ্য-উপাত্তে একমাত্র ইসলামের সত্যতাই প্রমাণিত যা এই যোগ্যতা রাখে। কুরআনে সে দিকে নির্দেশ করে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۞ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۞

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল-ইমরান: ১৯ ও ৮৫)

কোনো ধর্মকে তার অনুসারীদের জীবনাচার দিয়ে বিচার করা যৌক্তিক নয়। প্রথমত সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ দিয়ে এবং দ্বিতীয়ত সেই ধর্মের নবীর আদর্শমালা দিয়ে বিচার করাই যৌক্তিক পদ্ধতি। বিশ্ববাসীর সম্মুখে একমাত্র ইসলামই এই মহারত্ন পেশ করে আসছে। অমুসলিম বিশ্বের উচিত হবে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য ইসলামের মূল গ্রন্থ আল-কুরআন ও তার নবীর শিক্ষামালার ওপর জ্ঞান লাভ করা। এখন অমুসলিম বিশ্ব যদি মুসলানদের পতনে উল্লসিত হয়ে থাকে, তাহলে এ তাদের আত্মহত্যার নামান্তর। কারণ, সকল নবী ও রাসূল এক ইসলাম ধর্ম এবং আখেরী নবীর আনুগত্যকে মুক্তির একমাত্র উপায় বলে সংবাদ পৌঁছে দিয়ে গেছেন। কাজেই, দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে পড়ে এ মহাসত্য বর্জন করা সবচেয়ে বড় ক্ষতি ছাড়া কিছু নয়। ইসলাম

কারো নেতৃত্ব কেড়ে নিতে আসে নি, এসেছে নেতৃত্ব ও জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টভাজন করতে। কাজেই সত্যকে গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের হারানোর কিছু নেই, বরং এতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে অশেষ কল্যাণ লাভ করতে পারে। বিশ্বমানবতাকে মৃত্যুর দোয়ারে ঠেলে দিয়ে পাশ্চাত্যের কী কোনো লাভ আছে? অবশ্যই নেই। না দুনিয়াতে আর না আখিরাতে। পাশ্চাত্যের উচিত হবে ইসলামের সত্যতাকে উপলব্ধি ও গ্রহণ করে চিরস্থায়ী মুক্তি ও মঙ্গলের দিকে দ্রুত ফিরে আসা। পাশ্চাত্য জগতবাসীর উচিত হবে কুরআনের নিচের বক্তব্যগুলোর দিকে মনোনিবেশ করা:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ط إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞ (বাকারা)وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞(আল-ইমরান)

অর্থাৎ, হযরত ইব্রাহিম (আ:) বলেছিলেন: "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে মুসলিম তথা তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতেও এক উম্মতে মুসলিমা অর্থাৎ তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও।" (বাকারা : ১২৮) হযরত ইব্রাহিম (আ:) তাঁর বংশধরদেরকে বলেছিলেন: "তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৩২।) হযরত ঈসা (আ:) বলেছিলেন: "স্বাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।" (আল-ইমরান : ৫২)

৬

মুসলিম উম্মাহর প্রত্যাবর্তন : একটি সোনালী বিশ্ব

পাশ্চাত্য সমাজ ইন্দ্রিয়বিলাসজাত বস্তুবাদী বাদ-মতবাদের সিলসিলায় কীভাবে দিনে দিনে ধর্মের মহাসত্য থেকে ভোগবাদের প্রহেলিকায় হারিয়ে গিয়েছে তা পূর্বের অধ্যায়ে আমরা অবলোকন করেছি। এবং এও লক্ষ করেছি যে কীভাবে এসব মনুষ্য রচিত মতবাদ তার সীমাবদ্ধতার কারণে অনিবার্যরূপে যুগে যুগে ব্যর্থ হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে জমিনে মানুষের রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করেছে, এবং কীভাবে এসব মতবাদ ও এর অনুসারীরা বিশ্বমানবতাকে এবং নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে যে ওহিবিহীন মত-পথ ও দর্শন দিয়ে মানবতার শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত হতে পারে না। পৃথিবীকে সকল মানুষের জন্য বাসযোগ্য শান্তির আবাস হিসেবে গড়ে তোলা এমন কোনো জাতির পক্ষে সম্ভবই নয় যাদের কাছে আছে কেবল মানবীয় মন-মগজ-মস্তিষ্কপ্রসূত ত্রুটিযুক্ত ও সীমাবদ্ধ কিছু জ্ঞান। যাদের কাছে কোনো ওহীর শিক্ষামালা নেই, এমনকি তারা এর পরোয়াও করে না, যারা ডুবে আছে নাস্তিকতা, বস্তুবাদ, উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী নেশার চাদরে, যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই জুডের ভাষায় 'পেট ও পকেট' ছাড়া কিছু নয়, মানুষ শোষণ ও সম্পদ লুণ্ঠনের নেশায় যারা পৃথিবীকে রক্তের গঙ্গায় ভাসায় একের পর এক, দুর্বল জাতিকে নিয়ে যারা স্বার্থের ভাগ-বন্টনের খেলা খেলে গোলটেবিলে বসে- এমন জাতিগোষ্ঠীর কাছে নিখিল বিশ্বের, অন্তত নিপিড়ীত মানুষের কোনো দাবী বা আকাঙ্ক্ষা নেই।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ? সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির যে গন্তব্যস্থলে পাশ্চাত্য সমাজ বহু পূর্বে উপনীত হয়েছে, প্রাচ্যের জাতিসমূহও তো সমানতালে সেই দিকেই পথ চলেছে। জীবনাদর্শের নানা অঙ্গনে, নৈতিকতা ও চরিত্রে, সমাজ ও জীবনে, জগত সম্পর্কে পাশ্চাত্য যে দর্শন ও চিন্তাচেতনায়

বিশ্বাসী ও লালন-পালনকারী, যা-ই পাশ্চাত্যের জীবন-বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্য তাকেই নিজেদের আদর্শ বা জীবন-বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিনা বাছ-বিচারে গ্রহণ করেছে এবং এর উপর আমল করে যাচ্ছে। সামষ্টিকভাবে প্রাচ্যের সমাজ ও জীবন তো বটেই, এমনকি ব্যক্তি জীবনও পাশ্চাত্যের থেকে খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। নদবী রহ. লেখেন, পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের যা কিছু দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত তা শুধু এ কারণে যে, রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের ব্যাপক জাগরণের কারণে বিদেশী শক্তির শাসন-শোষণ ও আধিপত্য এখন আর তারা মানতে রাজি নয়। মূল দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত এখানে। প্রাচ্যের এই ভিন্নতা তার আদর্শের ভিন্নতা নয়, এটিও বস্তুবাদী লাভালাভের কারণে। পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও বস্তুবাদকে প্রত্যাখ্যান করা, তার জীবন-দর্শনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা, কিংবা হৃদয় ও আত্মার জগতে তাদের দারিদ্র্য ও দেউলিয়াত্বের প্রতি করুণা অনুভব করা- এসব ক্ষণিকের জন্যও হয়তো কারো অন্তরে উদয় হয় না।[৪১২] সাহিত্যকে সমাজের ডিসকোর্স বলা হয়। প্রাচ্যের সমগ্র সাহিত্য-ভাণ্ডারে আদর্শের এই বিরোধের চিত্র খুব একটা আপনি খোঁজে পাবেন না। পাশ্চাত্যের জীবন-জৌলুসে প্রাচ্যের জাতিবর্গ এমনই মোহমুগ্ধ যে, পাশ্চাত্যের যা কিছু- সবই এদের কাছে মোহময় ও সুন্দর, এমনকি তাদের জীবনের যত অন্ধকার, এদের চোখে তা আলোর চেয়ে উজ্জ্বল। প্রাচ্য আজ পাশ্চাত্য পানে মুখ খোলে বসে থাকে, পাশ্চাত্য থেকে যা আসে তাই সে পরম তৃপ্তিতে পেট পুরে খায়, এবং খাওয়ার জন্য চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষায় থাকে। দ্বন্দ্ব শুধু এটুকু যে, আমাদের দেশ আমরা চালাব আমরা ভোগ করব, তোমাদেরটা তোমরা, ব্যস। দাবার ছক পাল্টানো উদ্দেশ্য নয়, শুধু খেলোয়ার বদল হবে, ব্যস এতটুকুই।

প্রাচ্যের বহু জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব জাহেলিয়াত, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফিরিঙ্গি জাহেলিয়াত। এরা যখন ফিরিঙ্গিকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে তখন তারা মানুষকে উভয় জাহেলিয়াতের মিশ্র রস আস্বাদন করাবে যা আরো তিক্ত। দেখা যায়, শোষিত মযলুম এসব পরাধীন জাতি যখন স্বাধীনতা ও

[৪১২] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৭৬।

শাসন ক্ষমতা পেয়েছে তখনই তাদের জাহেলী স্বভাব-চরিত্র স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা ফিরিঙ্গি জাহেলিয়াত থেকেও কদর্য ও বীভৎস। তাদের হাতে তাদেরই স্বজাতির রক্ত এমন পাশবিকভাবে ঝরেছে, ইজ্জত-আবরু, জান-মাল এমন নিষ্ঠুর ও হিংস্রভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে যার নযির পাশ্চাত্য ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। এরা তখন দুর্বল ও নিরস্ত্র স্বজাতিরই ওপর এমন ভয়ঙ্কর উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে যা চরম লজ্জার, চরম পরিতাপের বিষয়। এমন বর্বরতা ঘটেছে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম সবার দ্বারা, এমনকি হয়েছে মুসলিম দেশে মুসলিমদের হাতে মুসলিমদের ভাগ্যে। ভারতবর্ষে হিন্দু কর্তৃক বৌদ্ধ নিধন, ১৯৪৭- এ ও বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলিম নিধন, ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে গণহত্যা, মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম কর্তৃক মুসলিম নিধন, মিয়ানমারে বৌদ্ধদের দ্বারা রাখাইন মুসলিম নিধন- এসবই স্বজাতি কর্তৃক স্বজাতি নিধনের নির্লজ্জ ইতিহাস হয়ে আছে।

শুধুমাত্র ধর্ম পরিচয় ভিন্ন হওয়ার কারণে এরা যে নিজ দেশেরই অপর কোনো গোষ্ঠীর ওপর এত হিংসা ও বর্বরতা দেখাতে পেরেছে তা নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি থেকেও এরা এসব পাশবিকতায় কিছুমাত্র কম করেনি। ১৯৭১ সালের পূর্ব-পাকিস্তানে গণহত্যার পেছনে ধর্মীয় কারণ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তাদেরই ধর্ম-ভাই পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলমানদের ওপর যে নৃশংস গণহত্যার পরিচয় সেদিন দিয়েছিল তা প্রকাশের অতীত; তাহলে সে সময়ের অমুসলিম বাঙালিদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা অনুমান করা কঠিন। কাজেই এসব প্রাচ্য জাতিগোষ্ঠী আর পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কোনই তফাৎ নেই। এদেরকে নামে আমরা যে ধর্মের ঘরানাভুক্তই করি না কেন, এদের চরিত্র মূলে এক, এরা সকলেই জাহেলিয়াতের দোসর।

বিশ্বমানবতার এই যে করুণ ও উদ্বেগজনক চিত্র তার একমাত্র সমাধান হল ধর্মচ্যুত ও আদর্শচ্যুত এসব জাতি ও গোষ্ঠীর হাত থেকে বিশ্বের নেতৃত্বভার এমন জাতির হাতে ন্যস্ত করা, যারা চিরন্তন ও শাশ্বত ইসলামের সোনালী ইতিহাসের যোগ্য উত্তরসূরী হবে; বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম যে পন্থায় মানবজাতিকে শান্তি,

কল্যাণ ও মুক্তির পথে পরিচালিত করেছিলেন, দায়িত্ব গ্রহণকারী এই জাতির আশু কর্তব্য হবে যত দ্রুত সম্ভব সেই আদর্শ ও পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ, একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরস্থায়ী রিসালত ও শরীয়তই পারে গোটা বিশ্বমানবতাকে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাস মানুষের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। এ অবস্থায়, ইসলামি বিশ্বের এখন দায়িত্ব হল এই সুমহান কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসা, প্রতিটি নর-নারীর এই সুমহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া। এই কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ না করার কোনো সুযোগ ইসলামি বিশ্বের সামনে নেই। এটিই সেই মহান দায়িত্ব যা মুসলিম উম্মার ভাগ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণ বা পালাবার কোনো সুযোগ তার নেই। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ؟ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীরা, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।[৪১৩]

বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহকেই কেন নিতে হবে ?

ইসলামই সেই চূড়ান্ত আদর্শ, মহানবীর চিরস্থায়ী রিসালত ও শরীয়তই সেই পন্থা যা বিশ্ববাসীর সকল সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

---

[৪১৩] মায়েদা : ৫৪।

এজন্য আল্লাহ কুরআনে বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (মায়েদা : ৩) মুসলমানরাই হল সেই সৌভাগ্যশীল জাতি যারা এই নেতৃত্ব দ্বারা বিশ্বমানবতাকে ইহ ও পরকালে মুক্তি ও শান্তির পথে নিয়ে যাবে। এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হল পাপাচারী।" (আলে-ইমরান : ১১০)

সুতরাং যে সকল কারণে এই সুমহান দায়িত্ব ইসলামি বিশ্বের কাঁধে অর্পিত হয়েছে তা হল:

১. একমাত্র মুসলিম জাতির হাতে চিরন্তন দীন বিদ্যমান রয়েছে;
২. একমাত্র মুসলিম জাতির হাতে মহানবীর চিরস্থায়ী রিসালত ও শরীয়ত বিদ্যমান রয়েছে;
৩. মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ একমাত্র মুসলিম জাতিকে এই সুমহান দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন।

অন্য কোনো জাতির এই শিক্ষামালা নেই ফলে তারা এই যোগ্যতাই রাখে না। ইহুদি ও খ্রিস্ট সমাজে এমন কোনো সংস্কারকের আবির্ভাব লক্ষ করা যায়নি যারা মৃত ধর্মব্যবস্থায় রেনেঁসা ঘটিয়ে মানবতাকে আলোর পথ দেখাতে পারেন। মার্টিন লুথার রোমান ক্যাথলিক গীর্জার বিরুদ্ধে যে সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন, এর ফলে জীবন ও সমাজ থেকে ধর্মের জোয়াল ছুড়ে

ফেলে দেওয়ার পথ আরো তড়িৎ হয়েছিল এবং বস্তুবাদ তার আসন আরো পাকা করার সুবিধা পেয়েছিল। এসব ধর্ম এবং অন্যান্য যেমন, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসমূহ কীভাবে নানা কুসংস্কার ও অপব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মবিলয়ের পথে চলে গিয়েছে তা আমরা প্রথম অধ্যায়ে পরিষ্কাররূপে লক্ষ করেছি। ইসলাম এক্ষেত্রে পূর্ণ-ব্যতিক্রম, কোনো ঘাত-প্রতিঘাতই তাকে টলাতে পারে নি, ইসলামের ঐশী শিক্ষামালার সুসংরক্ষিত থাকা, যুগে যুগে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ও বলিষ্ঠ ভূমিকা এই ধর্মের চিরন্তনতার স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে, এসবের সুসংবাদ ইসলামে পূর্ব থেকে মওজুদ আছে। যেমন আল-কুরআনে এসবের ইঙ্গিত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, "আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।"

কুরআন ও এর প্রয়োগিক শিক্ষামালার তথা ইসলামের হেফাজত আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন, যা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামের এই চিরন্তনতা নিঃসন্দেহে পরিষ্কার হয়েছে। ইসলামের চিরন্তনতা যখন প্রমাণিত হয় তখন পৃথিবীর সকল বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যই প্রমাণিত হয়। সুতরাং, মুসলিম জাতিই হল সেই সৌভাগ্যবান জামাত যারা দাওয়াতে ইসলামের তরী বহন করবে যুগে যুগে, প্রতি যুগে।

একমাত্র মুসলিম উম্মাহর বিশ্বের প্রতি বার্তা রয়েছে

উপরিউল্লিখিত কারণে, অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীর বিশ্বের প্রতি কোনো বার্তা নেই, কেবল বস্তুবাদ ও ভোগবাদ ছাড়া। মুসলিম উম্মাহ গোটা বিশ্ববাসীর প্রতি বার্তাবাহক জাতি, এবং এমনই এক বার্তাবাহক যার উপর বিশ্বের স্থিতি ও অস্থিতি নির্ভর করে। আল-কুরআনুল কারিম মুসলিম উম্মাহকে এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র সওগাতই উম্মতকে বুঝিয়ে দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এটি সেই বার্তা যা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এই পয়গাম কোনো রাজ্য ও রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার

কথা বলে না, বরং যারাই এই পয়গাম অন্তরচিত্তে গ্রহণ ও লালন করে তারা বিশ্ববাসীকে আদর্শ রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা উপহার দেয়। এটিই সেই বার্তা যা বিখ্যাত সাহাবি রাবিই বিন আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি পারস্যের সেনাপ্রধান রুস্তমের চোখে চোখ রেখে নিঃশঙ্কচিত্তে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ভাষায় পেশ করেছিলেন:

> আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, যেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন বের করে আনি মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে, জাগতিক সঙ্কীর্ণতা থেকে পরকালীন প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।[৪১৪]

সেদিনের থেকে আজকের দুনিয়ার নানা পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু এই বার্তায় একটি অক্ষরেরও পরিবর্তন ঘটানোর কোনো প্রয়োজন নেই। সেদিনের থেকে আজকের দুনিয়ার যে নানা পরিবর্তন, এসব প্রাচীন জাহেলিয়াতের নানা রঙ-রূপের পরিবর্তন, কিন্তু চরিত্র ও নিশানা এক। তাওহিদ, রিসালত ও আখিরাতের প্রশ্নে আগে যে জেহালত বিদ্যমান ছিল এখনও নানা আঙ্গিকে তাই আছে। বস্তু, যন্ত্র ও গতি এবং ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য ও বিস্তৃতির ডামাডোলে মানুষ জীবনের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তাওহিদ, রিসালত ও আখিরাত তার কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, এসব নিয়ে আধুনিক মানুষের ভাবারও সময় নেই। আধুনিক বস্তুবাদী মানুষের এই চরিত্রের কথাই আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি। বিশেষত, মনুষ্যরচিত নানা তন্ত্র-মন্ত্র, ইজম, ধর্ম প্রভৃতির নামে মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের, শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, হত্যাযজ্ঞের যেসব কাহিনী আমরা এই গ্রন্থে লক্ষ করে এসেছি, এসব কি মানবতা ও ধর্ম? বিশ্বাস ও সংস্কার না পশুর হিংস্রতা? মনুষ্যরচিত ভ্রান্ত তন্ত্র-মন্ত্র ও ইজম ধর্ম নাম ধারণ না করলেও প্রভাব বিচারে ধর্মের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ফলে সমাজে শোষণ-নিপীড়ন ও অনাচার সৃষ্টির দিক দিয়ে এসব প্রাচীন ধর্মসমূহের চেয়ে

---

[৪১৪] ইবনে কাসীর। *আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪০।
[৪১৪] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৮৯-৪৯০।

কম নয়।[৪১৫] মনুষ্যরচিত এসব নানা মতবাদ যেমন, অঞ্চল ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার নামে পৃথিবীতে কম রক্ত প্রবাহিত হয় নি। কেবল ভিন্ন মতাবলম্বি, তা কোনো মতবাদ বা ধর্ম পরিচয়ে হোক না কেন, হওয়ার কারণে এক পক্ষ অন্য পক্ষের বা সবল দুর্বলের যে রক্ত ঝরিয়েছে, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করেছে তা প্রাচীন যুগের পশুত্বের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বরং আরো বীভৎস।

নদবী রহ. লেখেন, আধুনিক ইউরোপে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে দুই ধর্মের বিরোধ বা কোনো ধর্মীয় দল-উপদলের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত ছিল না, ছিল নিছক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় অহমিকার সঙ্ঘাত। স্পেন ও চীনের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ, তদ্রুপ দুই কোরিয়ার যুদ্ধ, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধ, উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের পিছনে ফ্রান্স ও আমেরিকার হানাদারি, এসবের কারণ রাজনৈতিক মতাদর্শ, অর্থনৈতিক মতবাদ ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্ঘাত ছাড়া আর কিছু ছিল না। অথচ নিষ্ঠুরতায় ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতায় ষষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিস্টজগতের ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ এবং মধ্যযুগে গীর্জা ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত এগুলোর তুলনায় অনেক মামুলি ছিল।[৪১৬] ঠিক তেমনি, ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান যে গণহত্যা ঘটিয়েছিল তাও কোনো ধর্মীয় বিবাধের ফল ছিল না, এ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকচক্রের স্বৈরাচারী নীতির ফল যার পেছনে ছিল তাদের জাতীয় ভোগ-বিলাস, সম্পদ লুণ্ঠন ও ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখার স্পৃহা, উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি বিদ্বেষী মানসিকতা। বর্তমানের মায়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ কোনো ধর্মীয় বিবাদের ফল নয়, এটিও মায়ানমার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ও সামরিক সরকারের উগ্র-জাতীয়তাবাদী মানসিকতার ফল। সুতরাং দেখা যায়, মনুষ্যরচিত মতবাদ ও ধর্ম- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তবাদী নানা ব্যবস্থার নামে মানবতা এখনো নিপীড়ন ও অত্যাচারের

---

[৪১৬] *প্রাগুক্ত* / পৃ. ৪৯০।

শৃঙ্খলে বন্দি। এসব-ই মানুষকে একত্ববাদ ও এর নির্দেশিত সহজ-সরল জীবন, জীবনের সঠিক দর্শন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পরকালীন মুক্তি ও প্রশস্ততার বদলে এইসব মনুষ্যরচিত জঞ্জাল ও মানুষের দাসত্ব তথা বস্তুবাদী সঙ্কীর্ণতা ও অনাচারের জালে বন্দি করে রেখেছে।

একমাত্র তাওহিদ, রিসালত ও আখিরাতের সঠিক বিশ্বাস, যা সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষামালা অনুসরণ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়, মানুষকে এইসব বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে। সুতরাং সেই একই অপরিবর্তনীয় বার্তাই আজকের অপরাপর জাতির জন্য প্রযোজ্য যা তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে।

বস্তুবাদের এই যুগে অপরাপর জাতিগোষ্ঠী এখন সর্বক্ষেত্রে দেউলিয়া, কারণ জাহেলিয়াত আজ ভরা বাজারে নাঙ্গা হয়ে গেছে এবং তার সকল পঙ্কিলতা ও কলঙ্ক-কালিমা ভরা বাজারে ধরা পড়ে গেছে। জড়বাদী ও ভোগবাদী জীবনের অনাচার ও স্বেচ্ছাচারে মানুষ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে এখন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে, মানবহৃদয়ে জাহেলিয়াতের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে। মানুষ যদিওবা এসব জাহেলী জঞ্জাল ও অত্যাচার থেকে বের হতে সক্ষম হচ্ছে না, কিন্তু তারা উপলব্ধি করছে যে একমাত্র ইসলামই তাদেরকে অর্থবহ জীবন উপহার দিতে সক্ষম, আর কেউ নয়। বিশ্ব এখন জাহেলিয়াতের নেতৃত্ব ত্যাগ করে ইসলামি নেতৃত্বের শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় নিতে প্রস্তুত।

মুসলিম উম্মাহর তাই এখনই উপযুক্ত সময় বিশ্বমানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্যে নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করার। বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহ যদি পূর্ণ ইখলাস, উদ্যোম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই দাওয়াতকে বুকে ধারণ করে আবার মানবজাতিকে ডাক দেয় এবং পূর্ণ মমতা ও দরদ এবং যুক্তি ও কল্যাণকামিতার সঙ্গে মানবসভ্যতাকে বুঝাতে পারে যে এটিই একমাত্র পথ যা মানবতাকে অধঃপতনের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে আবারও এই পৃথিবী আবালবৃদ্ধবণিতার জন্য শান্তির আলয়ে পরিণত হতে পারে এবং মানুষ পেতে পারে পরকালীন মুক্তি ও শান্তি। কবির ভাষায়, 'এ

ভূমি এখন বড়ো সিক্ত ও উর্বর এবং বড়োই উপযোগী। চাই শুধু উন্নত বীজ আর বিচক্ষণ, দরদী কৃষক।'[৪১৭]

ঈমান ও আমলের পুনর্জাগরণ

আল-কুরআনুল কারিম মানুষকে ঈমানের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করেছে। যাদের ঈমান আছে এবং যাদের ঈমান নেই। একজন মানুষ যখনই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- এর কালিমায় বিশ্বাস আনয়ন করে নেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর তাবত শিরক ও কুফরির সঙ্গে তার সম্পর্ক চিহ্ন হয়ে গিয়ে এক মাবুদের সঙ্গে ইজ্জতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। ঈমান আনার অর্থ হল সত্যিকার মুসলিম হয়ে যাওয়া। মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী লেখেন, এই ঈমানের মতলব কেবল বিশ্বাসগত ঈমান নয়, বরং কর্মগতও। অর্থাৎ, বিশ্বাস বা ঈমান যতক্ষণ না বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, বাস্তবায়িত হবে ততক্ষণ শুধু বিশ্বাসগত ঈমান ফলপ্রসূ নয়।[৪১৮] ঈমান বলতে আমরা আমল বা কর্মগত ঈমানকেই বুঝব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন নিজেকে ঈমানদার দাবি করে কিন্তু নামায পড়ে না, যাকাত ফরজ হলে যাকাত দেয় না, এবং নানা অপকর্মে সদা লিপ্ত। অর্থাৎ, মুসলমান ঈমানের দাবি করে কিন্তু এটি শুধুই মুখের দাবি, কাজে নয়। এধরনের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ বলেন: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ । (ইউসুফ: ১০৬) অর্থাৎ, অনেক মানুষ এমন আছে যারা ঈমান গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাস্তবে মুশরিক। অন্তরে গায়রুল্লাহর মহব্বতই বেশি, মালিকের মাহাত্ম্য নেই। বাস্তবে আজ আমাদের অবস্থা হল, মুমিন কম, ফাসিক ও পাপিষ্ঠ অধিক।[৪১৯] একজন মানুষ ইসলামের কালেমায় ঈমান আনয়ন করে মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায়। চুক্তিটি হল, মুসলমান এই কালেমার হক

---

[৪১৭] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৪৯১।

[৪১৮] মুহাম্মদ তাকী উসমানী। মুহাম্মদ তৈয়্যেব হোসাইন অনু. ২০১৪। *ইসলামি জীবন-ব্যবস্থা*। ১ম খন্ড। ঢাকা : বইঘর। পৃ. ৫৩-৬২।

[৪১৯] কারী মুহাম্মদ তৈয়ব। ২০১৫। *খুতুবাতে হাকিমুল ইসলাম*। ৭ম খণ্ড। ঢাকা:বইঘর। পৃ. ২৩১।

আদায় করবে, অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী পালন করবে। বিনিময়ে আল্লাহও বান্দার হক আদায় করবেন, অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্য সকল নিয়ামত দান করবেন। অমুসলমানের ক্ষেত্রে এই চুক্তি প্রযোজ্য নয়। যেহেতু তারা ঈমানই আনেনি ফলে পরকালে কোনো পুরষ্কারের ওয়াদা নেই, তারা দুনিয়ার কী পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করল তা ধর্তব্য নয়।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۞
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (কাহাফ : ১০৭) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। (নূর : ৫৫)

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায়, মুসলমানদের ইহ-পরকালের উন্নতির বা সাফল্যের পূর্বশর্ত হল ঈমান ও আমল। অর্থাৎ, মুসলমান 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- এর ওপর ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী আমল করবে। আজ অধিকাংশ মুসলমানেরই অবস্থা হল তারা আমলদার নয়। এখন অধিকাংশ মুসলমানগণ যখন আমল ছেড়ে দিয়েছে তাই আল্লাহও দুনিয়ার নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে অন্য জাতির হাতে তুলে দিয়েছেন। আজ এক দেশ হাতছাড়া হচ্ছে তো কাল আরেক দেশ হাতছাড়া হচ্ছে। দেশ হাতছাড়া না হলেও কর্তৃত্ব হাতছাড়া হচ্ছে। ফলে আপনি আপনার কর্তৃত্বে কিছুই করতে পারছেন না যদি না কোনো এক পরাশক্তি আপনার পাশে থাকে। যেসব রাষ্ট্রে দৃশ্যত মুসলিম নেতৃত্ব দেখা যাচ্ছে তাও কোনো না কোনো পরাশক্তির কর্তৃত্বের জালে বন্দি। সুতরাং এমন স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

এমন স্বাধীনতা তো আসলে পরাধীনতারই নামান্তর[৪২০] অর্থাৎ, আমরা যখন ঈমানের চুক্তি বা দাবি রক্ষা করিনি অর্থাৎ, ইসলাম তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন ছেড়ে দিয়েছি তখন আল্লাহর জন্যও আর ওয়াদা রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে না। মুসলমানদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার এটিই মূল কারণ ও রহস্য।

এখন এই অবস্থায় দুনিয়া ও পরকালের কিংবা বস্তুবাদ ও ধর্মের যথাযথ স্বরূপ যখন বোঝে আসবে এবং এক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া ভয়াবহ ধ্বংসের অনিবার্যতা যখন পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে, এককথায় বস্তুবাদ কিংবা অ-ইসলামের বিপরীতে ইসলামের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরিহার্যতা, ইসলাম না মানার ভয়াবহতা যখন বোঝে আসবে, তখনই ঈমান মুসলমানকে সোনার মানুষে পরিণত করবে, এর পূর্বে নয়। আজকের মুসলমানগণ জীবনচরিতে সোনার মানুষ এজন্য নন কারণ তারা মুখস্ত ঈমানদার- এরা দুনিয়া ও পরকালের হাকিকত এবং এজন্য ইসলামের গৌরব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে ততোটাই এমনকি তা চেয়েও বেখবর যতোটা তারা দুনিয়া বা বস্তুর পূজায় সচেতন। দুনিয়া ও পরকালের হাকিকত এবং ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই আজকের মুসলমানের জীবনাচারে ঈমানের কোনো প্রভাব নেই যা ছিল তার পূর্বপুরুষদের। দ্বীনি শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে দিয়েই কেবল এই মূল রোগ দূর হতে পারে।

মুসলমানের ঈমান হবে সাহাবা জামাতের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ঈমানের মতো। স্বর্ণযুগের সেই মুসলমানগণ ঈমান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জাহেলিয়াতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন। ইসলাম মানেই নতুন জীবন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা এক নতুন জীবন শুরু করতেন। অধিকন্তু ইসলামপূর্ব জীবনের জেহালতের জন্য সবসময় অনুশোচনায় ভোগতেন ও ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতেন। সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কেমন ঈমান এনেছিলেন, কেমন ছিল তাঁদের ঈমানের রঙ ও রূপ তা আমরা এই গ্রন্থে

---

[৪২০] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ২২৬।

অবলোকন করেছি। আল্লাহ সেই ঈমানকে পরবর্তী লোকদের জন্য মাপকাঠি বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ কুরআনে বলেন, "অতএব তারা (কিয়ামত পর্যন্ত আগত যে কোনো মানুষ) যদি ঈমান আনে, তাঁদের (সাহাবীদের) ঈমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে.....।" (বাকারা : ১৩৭) এখান থেকেই বুঝা যায় যে, কেমন ছিল তাহলে সাহাবা জামাতের ঈমান যে ঈমানকে খোদ আল্লাহ তায়ালা পরবর্তীদের জন্য মডেল বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা লক্ষ করেছি, সাহাবা জামাত যখন জেহালতের জিন্দেগী থেকে ইসলামি জিন্দেগীর ওপর ঈমান আনলেন, তখন সেই ঈমান তাদের জীবনকে এমনভাবে বদলে দিল যার তুলনা মানবজাতির ইতিহাসে খোঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের অবস্থা? সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি.) একজন তাবে-তাবেঈ ছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত সর্বোত্তম যুগের তৃতীয় যুগের ভাগ্যবান মানুষ ছিলেন। তিনি একদিন বলেছিলেন, 'হে লোক সকল, তোমরা যদি সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কেরামদেরকে দেখতে তাহলে পাগল বলতে, আর তাঁরা তোমাদেরকে বে-দীন বলতেন।' প্রায় পনেরোশত বছর পরের আজকের মুসলমানদের অবস্থা তাহলে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, তা বলাই বাহুল্য।

এখন মুসলিম উম্মাহ যদি দুর্দশাগ্রস্থ বিশ্বমানবতাকে মুক্তির পথ দেখাতে চায়, যা তাদেরকে করতেই হবে, তাহলে প্রথমত, তাকে তাদের মরচে-ধরা ঈমানকে ঝেঁড়ে-মুছে পাক-সাফ করে পুরোপুরি সতেজ ও ইস্পাতকঠিন করতে হবে, যেমন ঈমানের নূর তাদের পূর্ব-পুরুষ সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই ঈমানের রঙ-রূপ আমলরূপে বাস্তব জীবন ও জগতে তাদের সাধ্যমতো কড়ায়-গণ্ডায় বাস্তবায়িত হতে হবে। সাহাবা জামাতের মতো ঈমান ও আমলে কোনরূপ কমবেশি করার সুযোগ থাকবে না। মুসলমান ইসলামে প্রবেশ করবে কুরআনের এই আয়াতের বাস্তবরূপে, যেখানে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রবেশ কর এবং

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চিতরূপে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাকারা : ২০৫)

মুসলিম বিশ্ব যদি বিশ্বাস করে, পাশ্চাত্য জগতের বস্তুবাদী বাহ্যিক জৌলুস ও সংস্কৃতি রপ্ত করার দ্বারা সে জাহেলিয়াতের অস্ত্রে সজ্জিত পাশ্চাত্যের মুকাবিলা করবে, তাহলে এটি তার মারাত্মক ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। বস্তুবাদ ও জাহেলিয়াতে অতীতের রোমান ও পারস্য যেন ছিল আজকেরই পাশ্চাত্য। পক্ষান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা জামাতের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এসব কোনো জৌলুস ছিল না, ছিল না তাদের মতো লোকবল, অস্ত্রবলও। কিন্তু একটি জিনিস তাদের ছিল যার নমুনা পৃথিবী দ্বিতীয়টি দেখাতে পারে নি, সেটি ছিল সাহাবা জামাতের বিশুদ্ধ ইস্পাতকঠিন ঈমান ও আমলী শক্তি। এই ঈমানী রুহানিয়াতের ঝাপটায় সেদিন রোমান, পারস্য কোনো পরাশক্তিই ঠিকতে পারে নি, বালির বাঁধের মতো মিলিয়ে গিয়েছিল। ঈমানী রুহানিয়াতের এমন বিজয় আমরা ক্রুসেডেও দেখেছি, সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী যা করে দেখিয়েছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতি যে কোনো বাতিলের সম্মুখে কেবল তখনই বিজয়ী হতে পারে যখন তারা এমন ঈমানী রুহানিয়াত লাভ করতে পারে, বাহ্যিকতার ভূমিকা এখানে মূখ্য নয়। নদবী রহ. বলেন, মনে রাখতে হবে যে অন্য কোনকিছুই অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার মূল উপায় নয়। মুসলিম উম্মাহর অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার এবং তাদের আদর্শ হওয়ার মূল ভিত্তি হল তার রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিক শক্তি যা তার পবিত্র নবীর শিক্ষামালারূপে তার সম্মুখে অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এর বলেই কেবল সে অপরাপর দেউলিয়া জাতিগোষ্ঠীর উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে যা সে অতীতেও করেছিল। বস্তুত রবের পরিচয় ও আখিরাতের বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত কোনো জাতি ও জনগোষ্ঠীর মুকাবিলায় এটাই হল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য।[৪২১]

[৪২১] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত* / পৃ. ৪৯৩।

মুসলমান যখন তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে যায় এবং অধিকন্তু তার ব্যক্তি চরিত্র সেভাবে গঠিত হয়ে যায়, তখন দুনিয়া তার কাছে মশার ডানার সমানও মূল্যমান রাখে না। মুসলিম জাতির শক্তির উৎস এটাই যে সে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের মূল্য যথাযথ বোঝে। তখন তার কাছে কোনো কষ্টই আর কষ্ট থাকে না। মুসলমানদের এই ঈমানী রুহানিয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে:

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ج وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۝

"শত্রুপক্ষকে ধাওয়া করার ক্ষেত্রে তোমরা হিম্মতহারা হয়ো না। যদি তোমরা কষ্টপ্রাপ্ত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তোমাদের মতোই কষ্টপ্রাপ্ত হয়। অথচ [ঐ কষ্টের বিনিময়ে] তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা কর, যা তারা আশা করতে পারে না। আর আল্লাহ অবশ্যই সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (নিসা : ১০৪)

আল্লাহর কাছে একজন মুসলমান যা আশা করে তার সুসংবাদ দুনিয়াতেই তার কাছে এসে গেছে। যেমন: হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো হৃদয় কল্পনাও করতে পারে নি। (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) সুতরাং তোমরা ইচ্ছে করলে পাঠ করতে পার, 'কোনো নফস জানে না, যে চক্ষু শীতলকারী বস্তু (তাদের জন্য) লুকিয়ে রাখা হয়েছে'। (বুখারী)

ইসলাম তার ঈমানী শান ও জৌলুস নিয়ে দণ্ডায়মান, কিন্তু তাকে ধারণ করার জন্য মর্দে-মুমীন দুনিয়ায় আজ বড়ই বিরল। বলতেই হয়:

জল আছে, জলাধার নেই। নৌকা আছে, মাঝি নেই।
নদী ও তার তরঙ্গমালা আছে, সাতারু নেই।
প্রশান্ত মহাসাগর আছে, কোনো নাবিক নেই।
চিরন্তন ইসলাম আছে, হায় আফসুস! মুসলমান কোথায় ?

আজ মুসলিম বিশ্বের সরকার, রাষ্ট্রনায়ক, দার্শনিক, লেখক-সাহিত্যিক, ওলামা, দাওয়াতি কর্মী সকলের সম্মিলিত কর্তব্য হল মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে ঈমানের সেই রুহানী দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করা, যে ঈমানের পরিচয় যুগে যুগে কীর্তিমানরা, বিশেষত সাহাবা কেরামগণ দেখিয়ে গিয়েছেন। ঈমানের এই নব-প্রজ্জ্বলিত শিখার ফল হবে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ও উদ্দীপনার ঘর্ষণে যুগের যে কোনো জাহেলিয়াত ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া। ঈমান ও আমলের এই তরবিয়তের ফলে ঘরে ঘরে এমন মুমীন তৈরি হয়ে যাবে যারা হবে আসহাবে-কাহাফের প্রতিবিম্ব, যারা দ্বীনের খাতিরে সব ছাড়তে রাজী হবে কিন্তু দীন ছাড়বে না। এমন ঈমানওয়ালাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ط إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۞ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ط لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۞

অর্থাৎ, "আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল অতঃপর তারা বলল, আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা। আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে।" (কাহাফ : ১৩-১৪)

কুরআন, সুন্নাহ এবং নবীর সীরাত ও হায়াতে সাহাবা এমন বিপুল শক্তির আধার যা মুসলিম উম্মাহর শুষ্কপ্রায় শিরা-উপশিরায় সজিব ও উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত করতে পূর্ণরূপে সক্ষম। এর সাহায্যে যে কোনো জাহেলিয়াত ও বস্তুবাদী ভ্রান্ত জীবনদর্শনের বিপক্ষে ইসলামি নবজাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব। ইসলামি আলমের দুর্দিনে এমন এমন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে যারা তাদের প্রচণ্ড ঈমানী রুহানী শক্তির বলে জিহাদ ও ইজতিহাদি এমন বৈপ্লবিক প্লাবন সৃষ্টি করেছেন যার নজির অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে দৃষ্টিগোচর হয় না। এসবই মুসলিম উম্মাহর অমূল্য সম্পদ ও দৃষ্টান্ত যা থেকে সে প্রতিদিন শিক্ষা ও দীক্ষা নিতে পারে। মুসলিম উম্মাহর আজ বড় প্রয়োজন এসব শিক্ষা ও

নির্দেশনাকে সামনে রেখে পূর্ণ ঈমান ও আমলী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিশ্বমানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্যে সেই পবিত্র মহাদায়িত্ব, যা তাকে প্রদান করা হয়েছে, পালনে কাজে নেমে পড়া।

নিরুদ্বিগ্ন ও ব্যথাহীন জীবন মুসলমানের নয়

মুসলিম উম্মাহ আজ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ভুলে গেছে আপন গৌরবের ইতিহাস, ভুলে গেছে তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্যের এই কথা যা মুসলমানদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলছেন: "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনত, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হত, তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হল পাপাচারী।" (আল-ইমরান : ১১০)

আজ মুসলিম-অমুসলিমের তফাৎ নির্ণয় করা কঠিন। আজ মুসলিম উম্মাহ পাপ-পুণ্যের কোনই বাছবিচার না করে যে কোনো ভাবেই জীবন-যাপন করে, যেমনটি পাশ্চাত্য করে। এমনকি পাপ-পুণ্যের প্রশ্নে আজকের মুসলমান বড়ই নিষ্ক্রিয় মনোভাব প্রদর্শন করে। মুসলমান আজ তার আত্মপরিচয় ভুলে গিয়েছে, অবস্থা এমনও দাঁড়িয়েছে যে তাদের জীবন দেখলে মনে হয়, ধর্ম বলতে তাদের জীবনে কোনো বিষয় নেই, ছিল না। এমন মুসলমানের সংখ্যা আজ অগণিত যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ ইবাদত সম্পর্কেও তেমন কিছুই জানে না। এরা দুনিয়ার সবই বুঝে, পেট ও পকেটের পূজা সম্পর্কে যে পরিমাণ কুশলী ও আত্মনিবেদিত, ধর্ম ও পরকাল সম্পর্কে তারা ঠিক ততটাই বরং আরো বেশি অজ্ঞ ও চেতনাহীন। এমন মুসলমানের সম্মুখে গোটা পাশ্চাত্য যখন মুসলমানদের উপর হায়েনার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, মুসলিম অসহায় নারী, বৃদ্ধ ও শিশুর রক্তে ভূমি প্লাবিত হয়, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হয়, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় মুসলিম রাষ্ট্র ও জনপদ, তখন এমন মুসলমানের হৃদয়ে কোনো ব্যথা-বেদনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা জাগ্রত হতে দেখা যায় না, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হওয়া সে তো প্রশ্নই উঠে না। অথচ,

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের মতো। দেহের এক অংশে আঘাত লাগলে বাকি অংশ ব্যথিত হয়। (মুসলিম:৬৭৫১।) কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ মুসলিম উম্মাহ, তার শাসকগণ বিশ্বের নানা প্রান্তে মুসলমানদের চরম দুরবস্থায় ব্যথিত হয় না। আল্লাহ বলেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا*

অর্থাৎ, "তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (নিসা:৭৫।)

এখন এমন মুসলমানের যদি আরব লীগ, ওআইসি কিংবা একটি আস্ত জাতিপুঞ্জ-ই থাকে তাতে কী, তার চেয়ে বদরের সেই ক্ষুদ্র একটি দল মানে-ওজনে কতই ভারী ও কার্যকর প্রমাণিত হয়। সংখ্যা, রাষ্ট্র ও সম্পদে মুসলমানরা আজ কোনো অংশে পিছিয়ে নেই, হয়তো এগিয়েই আছে। কিন্তু এমন বোধ ও চেতনাহীন মুসলমান কেবলই সংখ্যা মাত্র, বিশ্বমঞ্চে এরা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। মহানবীর সেই বিখ্যাত হাদিসটির কথা মনে পড়ে, যেখানে তিনি বলেছিলেন:

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»● فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ● قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير● ولكنكم غثاء كغثاء السيل● ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم● وليقذفن فى قلوبكم الوهن»● فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن ● قال: «حب الدنيا● وكراهية الموت

অর্থাৎ, হযরত ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সময় নিকটবর্তী যখন কাফের জাতিসমূহ তোমাদের ধ্বংস করার

জন্য একে অপরকে এমনভাবে আহ্বান করবে যেমন খাওয়ার দস্তরখানে সুস্বাধু খাদ্যের দিকে একে অপরকে আহ্বান করে থাকে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটি কী আমাদের সংখ্যা স্বল্পতার কারণে হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তোমাদের সংখ্যা তখন অনেক বেশি হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে ঢলে ভেসে আসা খড়কুটুর মতো। তখন তোমরা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তোমাদের দুশমনদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি আল্লাহ দূর করে দেবেন। আর তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ঢেলে দেবেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন যে, ওয়াহন কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ ও মৃত্যুর অনীহা।[৪২২]

আজ মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এমনই হয়েছে যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। মুসলিম উম্মাহ আজ বোধ ও চেতনার স্বাভাবিকতা হারিয়ে এমন হয়েছে, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ভুল-সঠিক, সত্য-মিথ্যা, শত্রু-মিত্র চেনার এবং আপন দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝে কাজ করার যোগ্যতাই হারিয়ে বসেছে। ফলে তাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যা বলার, বাতিলের সম্মুখে দাঁড়াবার, নেতা ও ধর্মনেতাদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করার সৎসাহস নেই। মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তার নেতাগণ এমনই বোধ ও চেতনাহীন হয়ে পড়েছে যে, তারা হিতাকাঙ্ক্ষী-অহিতাকাঙ্ক্ষীও বুঝতে পারে না, তাদের আচরণ উভয়ের সঙ্গে অভিন্ন। মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ আজ অমুসলিম দেশের সঙ্গে হাত মিলায়, হীন স্বার্থে নিজ দেশের মানুষের উপর বিজাতীয় আক্রমণ ও লুন্ঠনকে আহ্বান করে নিয়ে আসে।

পাশ্চাত্য যদিও ধর্মহীনতার অতল গহ্বরে ডুবে গিয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তারা সীমাহীন অমানবীয়, তথাপি নাগরিক ও সামষ্টিক জীবনের ক্ষেত্রে বোধ ও চেতনায় তারা মুসলিম বিশ্বের চেয়ে উন্নততর। তারা যাই করে বুঝে-শোনে করে এবং বিশেষত নাগরিক ও সমাজ জীবনে দায়-দায়িত্ব ও নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দেয় না। পাশ্চাত্যে এখনও এমন মানুষ বিরল যারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের জন্য জাতীয় খেয়ানতের স্তরে নেমে আসতে পারে এবং দেশকে সস্তা দামে বেচে দিতে পারে। কিন্তু প্রাচ্যে? প্রাচ্যে এমন

[৪২২] আবু-দাউদ : পৃ. ৫৯০।

গাদ্দারির উদাহরণ প্রচুর, মুসলিম দেশে ভুরি-ভুরি, কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় বিরল। ইউরোপ-আমেরকিায় রাষ্ট্রনেতা ও পদস্থ কর্মকর্তারা বিলকুল ডাহা-ডাহা মিথ্যা বলতে পারে, চরম ধূর্তপণার আশ্রয় নিতে পারে, অন্য জাতিকে ধোঁকা দিতে পারে, ভিন্ন দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে, দুর্বল জাতির উপর নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে- এসব কিছুই বরং আরো অনেক কিছুই করতে পারে ও করে যাচ্ছে, তবে ব্যক্তিস্বার্থে নয়, স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থে। এসব অবশ্যই অপরাধ ও পাপ। কিন্তু প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের এক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য যা কিছু করে, একটা নির্দিষ্ট বোধ ও চেতনা এবং নৈতিক দর্শনের প্রেরণায় করে। অন্যদিকে, প্রাচ্য ও মুসলমানরা যা করে, বোধ ও চেতনাহীন অবস্থায় করে, বিশেষ কোনো দর্শন প্রেরণায় নয়, ব্যক্তিস্বার্থ লাভের জন্য করে, এমনকি সেজন্য সামষ্টিক ও জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও সে কুণ্ঠা বোধ করে না।[৪২৩]

মুসলিম দেশগুলোর নেতা, শাসক ও ক্ষমতাসীনেরা, কিছুমাত্র অসম্ভব নয় যে নিজেদের তুচ্ছ কোনো ফায়দা বা স্বার্থের প্রলোভনে মাতৃভূমি বন্ধক রেখে দেবে, কিংবা বিক্রির বায়না করে ফেলবে। এসব দেশের রক্ষকদের দ্বারা নিজ দেশের জাতীয় সম্পদের উলঙ্গ তছরুপ, এমনকি তেলের ভাণ্ডার বিদেশী প্রভুদের হাতে তুলে দেওয়া, আর যারা (পাশ্চাত্য) এক গ্যালন তেলও নিজে খরচ না করে জাতীয় ভাণ্ডারে জমা করেছে, কোনো নতুন বিষয় নয়; এবং নিজেদের গদি রক্ষা ও ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য বহিঃশক্তিকে ডেকে এনে আপন জাতির উপর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম মধ্যেপ্রাচ্যে এসবই হরহামেশা ঘটছে। এসব প্রমাণ করে যে, জাতির মন ও বিবেক মরে গেছে, চেতনা ও বোধশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। যাকে কুরআনের ভাষায় বলা যায়, 'ওরা চতুস্পাদ জন্তু, বরং তার চেয়ে অধম।' নদবী রহ. লেখেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুমিন একই

[৪২৩] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৫০৬।

গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।' কিন্তু মুসলিম দেশসমূহ দু'বার নয় বহুবার দংশিত হয়েও যেন দংশনের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।[৪২৪]

মুসলিম উম্মাহ আজ বিত্ত-বৈভব, স্ত্রী-সন্তান, পদ-পদবি, সম্মান-প্রতিপত্তি নিয়ে বড়ই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। অথচ, মুসলিম উম্মাহ নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকার জন্য দুনিয়ায় আসে নি। একজন প্রকৃত মুসলমানের হৃদয় ব্যথা-বেদনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাহীন হতে পারে না। মুসলিম উম্মাহর আজ বড় রোগ হচ্ছে– সে বড়ো নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, বিশ্বমানবতার এমনকি মুসলিম উম্মাহর চরম দুরবস্থায়ও তার হৃদয়ে কোনো ব্যথা নেই, ব্যকুলতা নেই, কোনো উৎকণ্ঠা নেই। এ যেন কবির ভাষায় মুসলিম উম্মাহর রোগ হল:

> হৃদয়ের স্পন্দন পরীক্ষা করে চিকিৎসক বললেন–
> তোমার ব্যাধি আর কিছু নয়, ব্যাধি শুধু ব্যাকুলতার অভাব।

এমনটি কেন হল, যা হওয়ার কথা নয় কখনই। এসবই বস্তুবাদ ও ভোগবাদী জীবন-দর্শনের ফল যা মুসলিম উম্মাহ পাশ্চাত্য থেকে বড় দাম দিয়ে খরিদ করেছে। এই বোধ ও চেতনাহীনতা, দরদ-ব্যথাহীনতা, উদ্বেগ-অস্থিরতাহীনতার বিপরীতে যদি বিশুদ্ধ ইসলামি বোধ ও চেতনার এমন মুসলিম উম্মাহ গড়ে তুলা না যায়- যাদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারা সেই সোনালী যুগের সাহাবা জামাতের কথা অবলীলায় জাগিয়ে তুলে, যারা গোটা মুসলিম উম্মাহকে এক দেহ মনে করে, অপর মুসলমানের ব্যথা-বেদনায় যারপর নেই ব্যথিত হয়, একে অন্যের প্রতি কোমল ও দয়াপরবশ কিন্তু দ্বীনের শত্রুর বিরুদ্ধে পাথরের ন্যায় কঠোর, যারা সব ছাড়তে প্রস্তুত কিন্তু আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও দীন ছাড়তে রাজি নয় এবং মানুষের ঈমান না আনার ব্যাথায় ব্যাথাতুর জীবন কাটায়, তাহলে কোনো কর্মপ্রচেষ্টাই জাতির ভাগ্য ও সময়ের গতিধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ভূমিকাই রাখতে পারবে না।[৪২৫] নদবী রহ. লেখেন, এখন প্রয়োজন বুকে আবার ব্যথার দহন

---

[৪২৪] *প্রাগুক্ত* / পৃ. ৫০০।

[৪২৫] *প্রাগুক্ত* / পৃ. ৫০৬-৫০৮।

সৃষ্টি করা, হৃদয়ে উত্তাপ ও ব্যাকুলতা ফিরিয়ে আনা, উম্মাহর এই পরিতৃপ্তির জীবনে একটা হালচাল মাচিয়ে দেওয়া, যাতে তার মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে মানবতার দরদ-ব্যথা, মানবতার হিদায়াত ও নাজাতের চিন্তা, এবং মানবতার প্রতি করুণা ও কল্যাণ-ব্যাকুলতা জাগ্রত হয়; যেন এই লজ্জা তাকে অস্থির করে তোলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে কী মুখ নিয়ে দাঁড়াব? এখন এই উম্মাহর কল্যাণ কামনা এ নয় যে, তার জন্য নিরুদ্বিগ্ন ও ব্যথা-বেদনাহীন জীবনের প্রার্থনা জানাবে, বরং প্রকৃত কল্যাণ কামনা এই যে, তার জন্য দরদ-ব্যথা, দহন-যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা-অস্থিরতার প্রার্থনা করবে। কবির ভাষায়:

> আল্লাহ্ করুন, তোমার জীবনে কোনো ঝড়-তুফানের সঙ্গে যেন পরিচয় ঘটে,
> তোমার জীবন-সাগরে তরঙ্গ হয়তো আছে, তরঙ্গাঘাত নেই।

শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

মুসলিম বিশ্ব দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল- মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঐসমস্ত জ্ঞান-গবেষণায় যদিও ধর্মগত দিক থেকে সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা ছিল, তথাপি নিজস্ব শক্তি ও সজিবতার কারণে প্রাচীন সকল শিক্ষা ব্যবস্থা তার সামনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ফলে ইসলামের ইতিহাসে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে যখন অমুসলিম জাতিগোষ্ঠী মুসলিম শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীদের জ্ঞানকে তাদের জীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত করেছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীদের জ্ঞান-গবেষণা স্পেন হয়ে অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছেছিল। পরবর্তীতে ইউরোপের শিল্পবিপ্লবে এই জ্ঞান, আবিষ্কার-উদ্ভাবনই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু আজকের মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-গবেষণায় ঠিক ততখানি বা তার চেয়েও পেছনে পড়ে গিয়েছে যতখানি তখন অমুসলিম বিশ্ব পিছিয়ে ছিল।

মুসলিম বিশ্বের আজ অতি প্রয়োজন হল এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণ করা যা একদিকে ইসলামি দর্শন ও আদর্শের উপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, অন্যদিকে যুগের চাহিদা ও সমস্যা মুকাবিলায় সক্ষম। মুসলিম

দেশগুলোর তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন যা নবুয়তে মুহম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম ও আদর্শের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অনুপম সংযোগের মাধ্যমে মানবতার সম্মুখের সকল জঞ্জাল ও ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে পৃথিবী সকলের জন্য একটি আদর্শ বাসযোগ্য স্থানে পরিণত হয় এবং একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে মানুষ ও জগৎ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যও চরিতার্থ হয়। নব-বিন্যস্ত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু এসকল প্রয়োজনই পুরণ করবে না, বরং একদিকে তা নববী শিক্ষামালার সঙ্গে প্রাণের নিবিড় পরিচয় ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজ করবে যার অভাবে বিশ্বমানবতা আজ দিকভ্রান্ত মুসাফির; অন্যদিকে যুগের চাহিদা ও সমস্যাকে শুধু পরিপূর্ণরূপে সমাধানই করবে না বরং পাশ্চাত্য এক্ষেত্রে শক্তি ও জ্ঞানের যে অপব্যবহার ও খেয়ানত করে থাকে তার ভ্রান্তির বিপরীতে সুষম ব্যবহার ও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এতে করে ইসলামের এই সংযোগ-বিচ্ছিন্নতার কারণে অন্য সকল ব্যবস্থা বা ইজমের ভ্রান্তি প্রমাণ হয়ে যাবে এবং পক্ষান্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য ও বিকল্পহীনতা সুপ্রমাণিত হয়ে যাবে। এর ফলে মুসলিম উম্মাহ বিশেষত যুব সমাজের দেহ-মনে ইসলাম সম্পর্কে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় ও নির্ভরতাহীনতা তৈরি হয়েছে এবং বস্তুবাদ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর হয়ে যেন ইসলামি জীবনাদর্শের ওপর তাদের আস্থা ও বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

নদবী রহ. লেখেন, মুসলিম বিশ্ব যদি নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় এবং অপরাপর জাতির দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চায় তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শুধু স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতাই নয়, বরং তাকে আজ শিক্ষা-নেতৃত্ব অর্জন করতে হবে। এ কাজ খুব সহজ নয়, বেশ জটিল। এজন্য প্রয়োজন সুগভীর চিন্তাভাবনা, ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা, প্রয়োজন আধুনিক যুগের যাবতীয় জ্ঞান ও শাস্ত্র সম্পর্কে এতটা ব্যাপক জানাশোনা ও গভীর অধ্যয়ন যার ফলে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের যোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায়। একইসঙ্গে প্রয়োজন ইসলামের শিক্ষা, দর্শন ও মূলনীতির ওপর ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞান, সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং এর সঙ্গে অপরাপর বিষয়ের সুষম সংযোগ ঘটানোর ক্ষমতা ও দক্ষতা। এসব কাজ কোনো ব্যক্তি বা দলের পক্ষে সম্পন্ন করা

সম্ভব নয়। বস্তুত এটি মুসলিম বিশ্বের সরকার ও নীতি নির্ধারকদের কাজ। তাদেরই আজ সুদৃঢ় ইচ্ছা ও প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সকল শক্তি ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিবেদিতপ্রাণ সুযোগ্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গবেষণা সংস্থা ও ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।[৪২৬]

নদবী রহ. আরো লেখেন, সুযোগ্য বিশেষজ্ঞগণ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা ও নেসাবে-তা'লীম তৈরি করবেন যেখানে কুরআন-সুন্নাহর মুহকামাত ও অপরিবর্তনীয় মূল সত্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সুসমন্বয় সাধিত হবে। তাঁরা ইসলামি মূলনীতি ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করবেন, যেখানে নতুন প্রজন্মের জীবন বিনির্মাণের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান বিদ্যমান থাকবে, যাতে তারা আপন অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে এবং পাশ্চাত্য নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে বস্তুগত ও বুদ্ধিগত উভয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে; যাতে নিজেদের ভূগর্ভস্থ সম্পদ নিজেরাই আহরণ করতে পারে এবং দেশের সমস্ত সম্পদ নিজেরাই কাজে লাগাতে পারে। এই নতুন প্রজন্ম যেন ইসলামি দেশগুলোর অর্থব্যবস্থাকে ইসলামের নীতি ও শিক্ষার আলোকে সুসংহতরূপে গড়ে তুলতে পারে, যাতে সরকার ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইউরোপের মুকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত হয়ে যায় এবং ঐ সকল অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় যার সমাধানে ইউরোপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং তা স্বীকার করেও নিয়েছে।[৪২৭]

জ্ঞান ও গবেষণার নেতৃত্ব

এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই যে মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় এতই পিছিয়ে পড়েছে, বরং বলা ভাল, ছেড়ে দিয়েছে, যার সঙ্গে উম্মাহর সোনালী যুগের কোনই মিল নেই। আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্ব যে মানের গবেষণা ও জ্ঞান চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে তার সঙ্গে তুল্য হতে পারে এমন কোনো

---

[৪২৬] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৫১৮।

[৪২৭] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৫১৮-৫১৯।

গবেষণা মুসলিম বিশ্বে হচ্ছে না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় দিনে দিনে একটি আন্তর্জাতিক দার্শনিক গবেষণা পদ্ধতি বা রীতি-নীতি গড়ে উঠেছে যাকে এড়িয়ে কোনো গবেষণাই আন্তর্জাতিক মানের হতে পারে, এমনটি মনে করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে যেসব গবেষণা ও প্রকাশনা আমাদের সামনে রয়েছে তার বেশির ভাগই আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি বা রীতি-নীতির ধার না ধরেই সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে এসব গবেষণা ও প্রকাশনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, এমনকি নিজ দেশের আধুনিক প্রজন্মের কাছেও সমাদৃত হতে ব্যর্থ হয়। মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এ বিষয়টি লক্ষ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান মুসলিম লেখক-চিন্তাবিদ তাঁদের মনের ভাব আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবেশন করতে পারছেন না। এই বাহানায় অমুসলিম লেখক ও গবেষকগণ, বিশেষত প্রাচ্যবিদগণ, সেসব লেখাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন।[৪২৮]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মুসলিম লেখক-চিন্তকদের বিপরীতে যখন প্রাচ্যবিদগণ কিংবা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী লেখকগণ গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক এসব পদ্ধতি ও রীতি-নীতিকে পুরোপুরি অনুসরণ করেন, তখন সঙ্গত কারণে ও অতি সহজেই পাঠকমহলে তাদের প্রকাশনা অধিক নজর কাড়ে এবং এসব প্রকাশনাই আন্তর্জাতিক মানসম্মত বলে স্বীকৃতি পায়, যদিও এসব লেখা নানা দোষে দুষ্ট থাকুক না কেন। আধুনিক মুসলিম তরুন প্রজন্ম এবং ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী কৌতুহলী অমুসলিম সমাজ এসব প্রাচ্যবিদদের লেখাকেই ইসলামের আদর্শ প্রকাশ বলে মনে করে ধোঁকা খায়। মুসলিম লেখক-চিন্তকগণ যতদিন না যুগের এই স্বাভাবিক দাবি মেটাতে পারছেন, ইসলাম সম্পর্কে এই ধোঁকা ততদিন পর্যন্ত দূর হবার কোনো উপায় নেই।

---

[৪২৮] মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৪৮।

সোনালী যুগের যেসব কৃতী গবেষকগণ পৃথিবীখ্যাত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন সেসবের অনুবাদেও মুসলিম সমাজের চেয়ে অমুসলিম প্রাচ্যবিদগণ এগিয়ে আছেন। তারা এসব কালজয়ী গ্রন্থকে তাদের নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছেন। মুসলিম সমাজ তার আত্ম-জাগরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মারাত্মক উদাসিনতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। এরই পরিণতিতে আজ আমাদেরকে আমাদেরই পূর্বসুরীগণের এসব ঐতিহাসিক কালজয়ী গবেষণা ও রচনারাজি প্রাচ্যবিদদের চোখ দিয়ে পড়তে হয়। অথচ, প্রাচ্যবিদগণ যখন এসব গ্রন্থ অনুবাদ করেন তখন তাদের সেই অনুবাদে শতভাগ আস্থা রাখা যায় এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। মুসলিম বিশ্ব এভাবেই জ্ঞান-গবেষণার ময়দান থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, উপরন্তু পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গবেষণার সুবোধ ছাত্র ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গবেষণার দস্তরখানের উচ্ছিষ্টভোজীতে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম শিক্ষার্থীরা আজ দ্বীনি শিক্ষা যেমন, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, এমনকি তাফসির, হাদিস, ফিকহের মতো নির্ভেজাল বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের জন্য পর্যন্ত পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হচ্ছে। অনেক মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে দেখা যায় যে তারা জ্ঞান-গবেষণায় পাশ্চাত্যকে সর্বোচ্চ আদর্শ মনে করেন, এর পরে যেন আর কোনো স্তর নেই। নদবী রহ. লেখেন, 'মুসলিম বিশ্ব যদি সত্যি আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় এবং নিজের বুদ্ধিতে চিন্তা করতে চায় তাহলে এই বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মসমর্পণ ও চিন্তা-দাসত্ব থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে। মুসলিম বিশ্বের আজ এমন বিশাল ব্যক্তিত্বের আলিম, চিন্তাবিদ ও লেখক-গবেষকের আশু প্রয়োজন যারা আত্মরক্ষার অবস্থান থেকে নয়, সংশোধনের অবস্থান থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা ও ময়নাতদন্ত করতে পারেন। ইসলামি জ্ঞান ও শাস্ত্রের সকল শাখায় বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা এমন বৈদগ্ধ ও পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন যাতে ইউররোপ-আমেরিকার ইসলাম বিষয়ক পণ্ডিতদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করতে পারেন এবং তাদের ভুল-বিচ্যুতি ও জ্ঞানপাপসমূহ ধরিয়ে দিতে পারেন, যাতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জাদুময়তার জাল ছিন্ন হয়ে যায় এবং গবেষক ও বিদ্যা পিপাসুগণ মুসলিম বিশ্বের আরব-

আজমের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর দিকে শিক্ষা অভিযাত্রা শুরু করে দেয়; এখন যেমন ইউরোপ-আমেররিকার শিক্ষাঙ্গনে উপচেপড়া ভিড় জমে যায় এবং যেমন এক সময় মুসলিম আন্দালুসে ভিড় জমত। অন্তত ইসলামি সংস্কৃতি, আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ধর্মীয় জ্ঞান ও শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্ররূপে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকাবিলায় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিক যোগ্য হবে এটাই তো স্বাভাবিক। দীনতা আর হীনতার বিষয় আর কী হতে পারে যে, মুসলিম বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী মহান বিদ্যাপীঠগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের আসন থেকে সরে এসে অন্যদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবে!'[৪২৯]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যোগ্যতা

৭৫০ খ্রি. থেকে প্রায় ১৪০০ খ্রি. (১৩৫০ সালের পর থেকেই মুসলিম জগত হারতে শুরু করে। কেবল কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক ঔজ্জ্বল্যের চমক দেখা যায়।) পর্যন্ত এমন এমন মুসলিম মনীষার উদ্ভব ঘটে যারা ধর্ম চর্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা দ্বারা পৃথিবীতে নতুন যুগের সূচনা ও বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। জাবির, খোয়ারিজমি, রাজি, মাসুদি, আবুল ওয়াফা, আল-ফারাবি, আল-বাত্তানি, আল-বিরুনি, ইবনে সিনা, আল-কিন্দি, উমর খৈয়াম, আল-হাইসাম, ইবনে রুশদ, তুসি, নাফিস, আল-সিরাজি, কামালউদ্দিন, ইবনে খালদুন, ইমাম গাজ্জালি, আল্লামা রুমি, শেখ সাদি প্রমুখ অসংখ্য মনীষা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পার্থিব মঞ্চের অধিকারী। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে মুসলমানগণ অবদান রাখেন নি। অষ্টাদশ শতকের যে শিল্পবিপ্লব পৃথিবীতে আধুনিক যুগের দ্বার খুলে দিয়েছিল তার সূতীকাগার ছিল পূর্ববর্তী এসব বিজ্ঞানীদের অবদান। কিন্তু এই চর্চাও মুসলমানগণ এক সময় হারিয়ে ফেললেন। এর বিবরণ আমরা পূর্বে দিয়েছি।

---

[৪২৯] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৫১৬-১৭।

আজকের বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকল্প নেই। শুধুমাত্র যদি মুসলিম উম্মাহর কথাই ধরা হয় তাহলে সারা বিশ্বের ক্রমবর্ধিষ্ণু মুসলিম উম্মাহর নিত্যনতুন সমস্যা ও চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার যে অবশ্যম্ভাবী তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণ ভোগে যদি কোনো সমস্যা না হয় তাহলে সেই জ্ঞান অর্জনে সমস্যা হবে কেন। কুরআনের শিক্ষা নিশ্চয় এভাবে সংকুচিত নয়। কুরআন সর্বকালের জন্য ফলে মানুষের সর্বকালের সমস্যা ও চাহিদা মেটানোর জন্য কুরআনের শিক্ষাকে আমাদের খোঁজে নিতে হবে। তা না হলে কুরআনকে না বুঝার ফলে আমরা পিছিয়েই থাকব, মুসলিম উম্মাহর আত্মনির্ভরশীলতার বদলে পশ্চিমা জগতের উপর আমাদের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা কখনই কমবে না। কুরআনে ইলম্ বলতে কেবল ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের জ্ঞান বুঝায় না, বরং উম্মাহর নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান ও চাহিদা পূরণ, উন্নত পেশা অর্জন এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানও বুঝায়। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক নতুন নতুন সমস্যা ও চাহিদা মুকাবিলার জন্য কেবল অন্যদের পথ চেয়ে প্রতিদিন বসে থাকা নিশ্চয় কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আজকের মুসলিম উম্মাহর অবস্থা হল, সে পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্টভোগী, পাশ্চাত্য বিনা তার কোনো গতি নেই। পরিতাপের বিষয় যে মুসলিম রাজা-বাদশারা অঢেল ধন-ঐশ্বর্যের মধ্যে কালাতিপাত করলেও এখনও তারা অসুস্থ হলে পশ্চিমা চিকিৎসকদের ছুরির নিচে গিয়ে শুতে হয়। মুসলিম রাজা-বাদশারা যতই হম্বিতম্বি করুন না কেন যখন প্যালেস্টাইন, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, কাশ্মির, উইঘুরু, মায়ানমার অত্যাচারির অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় তখন তা প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতাই তারা রাখেন না। গাদ্দাফি, সাদ্দাম, লাদেনকে অসহায়ভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। গাদ্দাফি, সাদ্দাম, লাদেনের পরিণতি মুসলিম বিশ্বের জন্য কী একটুও লজ্জার বিষয় নয়? মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ তাদের আত্মরক্ষার জন্য কেন কোনো ক্ষমতা অর্জন করতে পারলেন না? এসব নিয়ে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের কী এখনও ভাবার সময় আসে নি? এভাবেই কী সময় বয়ে যাবে আর মুসলিম উম্মাহ নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকবে? মুসলিম বিশ্ব এভাবে যতদিন বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তি, শিল্প ও সমর শক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষি থাকবে, পাশ্চাত্য ততদিন তার অর্থ ও রক্ত শোষণ করতেই থাকবে। মুসলিম বিশ্ব যদি বিশ্বনেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সম্মান ও ইজ্জতের জীবন লাভ করতে চায় এবং একই সঙ্গে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী হতে চায়, তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও সমর শক্তি, চিকিৎসা ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনেরও কোনো বিকল্প নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মুসলিম জাতিরই হারানো সম্পদ যা তাকে আবারো অর্জন করতে হবে।

জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও উম্মাহর ঐক্য

পূর্বে ইউরোপীয় যে জাতীয়তাবাদের কথা বর্ণিত হল, জাতীয়তাবাদের সেই ভূত ছোঁয়াচে রোগের মতো প্রাচ্যে সংক্রমিত হতে বেশি দিন লাগেনি। যে মুসলিম উম্মাহ তাদের মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে আত্মবিভেদে ছিন্নভিন্ন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে একদিন অপার ভ্রাতৃত্বের ছাদরে এক সুতায় ঐক্যবদ্ধ করেছিল, ইসলামি আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে এবং ইউরোপীয় বস্তুবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে তারাই এক সময় পথ ভুলে ঐক্য বিনষ্টকারী জাতীয়তাবাদের বিষ গলাদ্ধকরণ করে বসল। শত দুর্বলতা সত্ত্বেও উছমানী খেলাফত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দূর্ত ইংরেজরা আরবদেরকে স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে তুর্কিদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। অন্যদিকে আতাতুর্ক কামাল পাশা নিজ সমর্থকদেরকে তুর্কি জাতীয়তার ওপর উছকে দেয়। এভাবে উছমানী সালতানাতে 'তূরানবাদ' নামীয় ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যার লক্ষ্য ছিল আরব থেকে আসা ইসলামের বদলে তুর্কী সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ। তুর্কিদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে দেওয়া হল যে ইসলাম হচ্ছে আরব থেকে তাদের ওপর ছাপিয়ে দেওয়া বহিরাগত সেমেটিক ধর্ম যা তাদের উপযোগী নয়। সুতরাং তাদের আশু কর্তব্য হল প্রাচীন তুর্কি সভ্যতা সংস্কৃতিতে ফিরে যাওয়া। এভাবে এরা নিজ নিজ জাতীয়তাবাদী চেতনায় ফিরে যাওয়ার জন্য ইসলামকেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। অনেকে মনে করত যে আমরা তুর্কি, তাই আমাদের কাবা হল তূরান। চেঙ্গিস খান ছিলেন এদের জাতীয় বীর আর মোঙ্গল বিজয়াভিযান ছিল তাদের স্তুতি-বন্দনার বিষয়। এ

ধরনের আত্মঘাতী জাতীয়তাবাদী ঝোঁকপ্রবণতা সে সময় ইরানীদের মধ্যেও দানা বেঁধেছিল।[৪৩০]

উনিশ শতকের শেষ দিকে আরব জাতীয়তাবাদের নামে এই ব্যাধি আরবদের মধ্যেও সংক্রমিত হল। শুধু তাই নয়, এটি তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হল। পাশ্চাত্য আলো-বাতাস ও মন-মেজাজে বেড়ে ওঠা খ্রিস্টান আরব-অনারব বুদ্ধিজীবীরা পেছন থেকে এক্ষেত্রে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের তুর্কী কিংবা আরবের সঙ্গে দীন ও বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। পাশ্চাত্যের চিন্তানায়করা তখন এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি যারা বহু দিন ধরে এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা যখন দেখল একদল আরব যুবকের চিন্তাজগতে জাতীয়তাবাদী চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছে তখন তারা মুখে, কলমে, লেখায়, বক্তৃতায় নানাভাবে ঐ চিন্তাচেতনায় পুষ্টি জোগাতে লাগল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, Welfard Balenti- এর *Future of Islam* গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে, যেখানে দেখা যাবে যে লেখক কত ধূর্ততার সঙ্গে আরব জাতীয়তার বিষকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উসকে দেওয়ার ও বিকশিত করার চেষ্টা করেছেন।[৪৩১] ইউরোপীয় এই উগ্র-জাতীয়তাবাদী দর্শন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। নদবী রহ. লেখেন, শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এবং হারানো আরব মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সর্বোত্তম উপায়রূপে যে আরব জাতীয়তাবাদ তারা আঁকড়ে ধরেছিল, সাতষট্টির আরব-ইসরাইল যুদ্ধে তা কোনো অলৌকিক ফল বয়ে আনতে পারে নি, বরং এনেছিল নতুন জাতীয় লাঞ্ছনা ও যিল্লতি।[৪৩২] কারণ, তারা ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল- আরব-জাতীয়তাবাদের নামে, আরব-জাতীয়তাবাদের জন্য, ইসলামের জন্য নয়।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী দর্শন অনুসারে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে জাতি, দেশ, ভাষা প্রভৃতি উপাদানের উপর ভিত্তি করে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। এটি

---

[৪৩০] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৪৮-৪৯।
[৪৩১] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৫০-৫১।
[৪৩২] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৫৪।

পাশ্চাত্য সমাজ-চিন্তার সেই পুরনো রোগ যেখানে বহু পূর্বে তারা ধর্মকে যার যার ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল, প্রতিষ্ঠা করেছিল সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শন যেখানে ধর্মের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদী দর্শন গড়ে উঠেছে একই কায়দায়, ধর্মের চৌহদ্দির বাইরে। অথচ জাতি, দেশ, ভাষা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই যদি জাতীয়তা বা জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে হয় তাহলে প্রতিটি শহর এমনকি প্রতিটি মহল্লা নিজ নিজ স্বতন্ত্র জাতীয়তা ও ঐক্যের দাবী করতে পারে। এভাবে বাঙালি, পাঞ্জাবি, বেলুচ, পাঠান, মোগল, দ্রাবিড়, তুর্কী, ইরানী, আরবি- অজস্র অসংখ্য জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠবে আর তখন অনিবার্যরূপে প্রতিটা জাতী অন্য জাতী থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ, অন্যকে নিকৃষ্ট প্রমাণের চেষ্টা করবে এবং পরিণামে অনৈক্য ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকবে। এটিই ইউরোপীয় উগ্র-জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এখানেও যে, সে এ ধরনের মনগড়া দর্শনকে, যা অনিবার্যরূপে মানবজাতিকে পারস্পরিক ভালবাসা ও ঐক্যের বদলে বিচ্ছিন্নতা, বৈরীতা ও হিংসা-বিদ্বেষের বিষবাষ্পে ঠেলে দেয় এবং দিয়েছে, কখনই সমর্থন করে না। ইসলাম একদিকে যেমন মানুষের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে না আবার এসবকে ভুল পথে পরিচালিত করাও সমর্থন করে না। মানুষের মধ্যে ঐক্য, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা কেবল ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই হতে পারে। এক কথায় জাতীয়তা কেবল ঈমানের ভিত্তিতেই হতে পারে।[৪৩৩] এর ভিত্তিতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের শতধাবিভক্ত, হানাহানি ও রক্তারক্তিতে লিপ্ত জাতিসমূহকে এমন এক প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যার দ্বিতীয় নজির দেখা যায় না। মুসলিম উম্মাহ যদি জাতীয়তা ও ঐক্যের প্রশ্নে পাশ্চাত্য অনুকরণ পরিত্যাগ করে কুরআনী মূলনীতি ও তাদের নবীর

---

[৪৩৩] মুহাম্মদ শফি। ২০০৫। *তাফসিরে মারেফুল কুরআন*। ৩য় খণ্ড। ঢাকা : ইফা। "সূরা মায়েদা দ্রষ্টব্য।"

শিক্ষামালায় ফিরে না আসে, তাহলে তাদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হবে না। আল্লাহ বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

অর্থাৎ, "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর (ঐক্যবদ্ধ থাক); পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আল-ইমরান:১০৩।)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

অর্থাৎ, "আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না; যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।" (আনফাল:৪৬।)

মুসলিম উম্মাহ আজ একদিকে ঐক্য বিনষ্টকারী শত শত জাতীয়তাবাদে ডুবে মরছে, অন্যদিকে শরয়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়েও তারা শত শত দল-উপদল, বলা উচিত কুন্দলে বিভক্ত ও জর্জরিত; তারা শরয়ী শাখাগত খুটিনাটি বিষয়ে ঝগড়া-বিবাধ ও হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অথচ তাদের সবাই একই কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার দাবীদার। ইসলামের শাখাগত বিষয়ে ফিকহী ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক যা উম্মাহর জন্য কল্যাণকর; এটি নতুন কোনো বিষয় নয়, এটি সত্য দীনের পরিচায়ক। এই ভিন্নতার ওপর একাডেমিক গবেষণা, ইজতেহাদ হতে পারে কিন্তু এ নিয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হলে সেটি দুর্ভাগ্যজনক ও ক্ষতিকর।[৪৩৪] মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইসলাম বিরোধী শিবির উম্মাহকে একে অন্যের দিকে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের ফায়দা লুঠছে। কুরআন এ বিষয়েই উম্মাহকে সতর্ক করেছে। মুসলিম বিশ্ব যদি তাদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে চায় তাহলে তাদের আশু কর্তব্য হবে মনুষ্য রচিত এসব বাদ-মতবাদ

[৪৩৪] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.। ২০০৮। *প্রাগুক্ত*।

ও দলাদলি বাদ দিয়ে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতিতে শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করা ও উম্মাহর পুণঃঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।[৪৩৫]

আরব বিশ্বের গুরুত্ব ও দায়-দায়িত্ব

আরব বিশ্ব তার গুণ, বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে দাওয়াতে ইসলামের সুমহান দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে বড় হকদার। মানব ইতিহাসের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে আরব বিশ্বের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আরব বিশ্ব আজ যেন পথ ভুলা পথিক। অথচ নানা কারণে আরব বিশ্বের রয়েছে বিরাট গুরুত্ব। বিশ্বের এক বিরাট ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে আরব বিশ্ব গঠিত। আরবের বুকেই রয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তি ও উন্নতির সুবিশাল জ্বালানী তেলের ভাণ্ডার, পশ্চিমা বিশ্ব যার নাম দিয়েছে 'তরল সোনা'। পশ্চিমা বিশ্বের শিল্প-বাণিজ্য, যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্রের মূল অক্সিজেন তেল-গ্যাসের ভাণ্ডার আরব জমিনের বুকে লুকিয়ে আছে যার দিকে পশ্চিমা বিশ্বের লোভাতুর দৃষ্টি সদা উদ্যত। অন্যদিকে এই আরব ভূখণ্ড ইউরোপ-আমেরিকা ও দূর-প্রাচ্যের সংযোগস্থল। এ অঞ্চলেই রয়েছে সৌভাগ্যের প্রতীক নীলকন্যা নীলনদ এবং উর্বরতা, সম্পদ, শস্যপ্রাচুর্য, অগ্রগতি ও নাগরিক সভ্যতার সমৃদ্ধিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিশর ভূমি। এ অঞ্চলেই রয়েছে ফোরাত বিধৌত ইরাক, আছে সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং প্রতিবেশী বিস্তীর্ণ অঞ্চল যার জলবায়ু ও আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রকৃতি এসব অঞ্চলে অপার সৌন্দর্য অকৃপণরূপে ঢেলে দিয়েছে। সর্বোপরি আরব ভূখণ্ডেই রয়েছে মক্কা, মদীনা, হিজায ও জাজীরাতুল আরব। মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে এসব স্থান অপরিসীম প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। এখানেই প্রতি বছর বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এমন মানব সমাবেশ ঘটে যার কোনো তুলনা হয় না।

---

[৪৩৫] *প্রাগুক্ত।*

এসকল ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা গুণ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের কারণে আরব বিশ্ব সুদীর্ঘকালব্যাপী পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রহ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু, লোভ-লালসার ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের উত্তপ্ত ভূমি হিসেবে বিরাজ করে আসছে।[৪৩৬] নদবী লেখেন, এর প্রতিক্রিয়ারূপে আরব জাতির মধ্যে যেখানে জেগে উঠার কথা ছিল ঈমানী জ্যোতি ও ইসলামি চেতনার জোয়ার, আফসোস, তার পরিবর্তে আজ সমগ্র আরব বিশ্ব পাশ্চাত্যের ছড়িয়ে দেওয়া আরব-জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপূজার সুতীব্র মোহজাল, আন্দোলন ও দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে জর্জরিত।[৪৩৭] মুসলিম বিশ্ব আজ তাদের নেতৃত্ব ও রাহবারি গ্রহণ করার জন্য আরব বিশ্বের প্রতীক্ষায় রয়েছে।[৪৩৮] মুসলিম উম্মাহ কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষামালার উৎসভূমির প্রতি অকৃত্রিম প্রেম অনুভব করে এবং তার ডাকে সারা দিতে সদা উন্মুখ।

আরব জাতির প্রাণ

উপরে আরব জাতির যতসব গুণ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের কথা বলা হল এবং আরো যা যা হতে পারে তার সব কিছুর প্রাণ সায়্যিদুল আম্বিয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ, আর কিছু নয়। আরব বিশ্বের আজ যা কিছু গুণ, বৈশিষ্ট্য, গৌরব, মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে তার সঙ্গে যদি আরো রাশি রাশি যুক্ত করা হয়, আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তাঁর দীন ও শরীয়ত, শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে আরব জাতির অবস্থা হবে প্রাচীন জাহেলিযুগের মতো। যার অস্তিত্ব হবে পৃথিবীর মানচিত্রে একটিমাত্র কাল অক্ষর যার উপস্থিতি আছে, কোনো গুরুত্ব নেই। এমনকি মানববিশ্ব থেকে আরব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

---

[৪৩৬] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৫২১-৫২২।

[৪৩৭] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৫২২।

[৪৩৮] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৫৪৬।

আরবের গৌরবময় ইতিহাস, আলোকজ্জ্বল সভ্যতা, সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য, আরব সালতানাত, এত রাজ্য ও রাজত্ব- এসবই তো মুহাম্মদী নবুয়তের দয়া, দান ও অনুগ্রহের ফল, এ তো তাঁরই শুভাগমনের ফসল।[৪৩৯] জাহেলিয়াতের যুগে আরব জাতির অবস্থা কেমন ছিল তা আমরা প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ করেছি। সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে গোটা মানব জাতির সঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উদ্ধার করে মানবীয় অস্তিত্ব দান করেছিলেন। এক কথায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হলে, তাঁর দাওয়াত ও মিল্লাত না হলে আজকের শাম, ইরাক, মিশর তথা আজকের অনন্য মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী আরব জাহান ও আরব জাতির অবস্থান কী হতো? তার কোনো অস্তিত্বই হয়তো পৃথিবীপৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকত না। নদবী রহ. আক্ষেপের সুরে লেখেন, এইসব যা বলা হল, কসম করে বল হে আরব, তা কি সত্যি নয়? যদি সত্য হয়, তাহলে বলব, আরবের কোনো সরকার, বা জনগোষ্ঠী যদি দীনুল ইসলামকে পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে, কিংবা ইসলামপূর্ব আরব জাহেলিয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, যদি তারা জীবনব্যবস্থা থেকে শরীয়তে মুহাম্মদির বদলে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে চায়, কিংবা আরব জাতীয়তাবাদের ওপর নিজেদের ভবিষ্যত তৈরি করতে চায়, যদি কেউ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বার্থে বিকল্পহীন আদর্শরূপে গ্রহণ করতে না চায়- তাহলে এই মুহূর্তে তারা যেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল দান-অবদান, করুণা, অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেয় এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের অবস্থায় ফিরে যায়।

আজ আরব বিশ্বের আশু কর্তব্য হল নব্য সকল জাহেলিয়াতের সঙ্গ ত্যাগ করে, মনুষ্য রচিত সকল ভ্রান্ত ইজম পরিত্যাগ করে মুহাম্মদী ঈমানে পরিপূর্ণরূপে জেগে উঠা এবং সোনালী যুগের সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম

---

[৪৩৯] *প্রাগুক্ত।* পৃ. ৫২২-৫২৫।

জামাত যেভাবে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই ভূমিকায় আগে বেড়ে অবতীর্ণ হওয়া। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

অর্থাৎ, "বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" (তাওবা: ২৪)

আরব যুবশক্তি

মুসলিম উম্মাহকে আজ মোহগ্রস্থ করেছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও দ্রব্যসামগ্রী, তাদের উপর সওয়ার হয়েছে জীবনের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর ভয়। আরব বিশ্বও এর ব্যতিক্রম নয়, বরং এসব দিক দিয়ে আরো এগিয়ে রয়েছে। যে আরব যুবশক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে একদিন দৃপ্তপদে দৃপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে এসেছিল, স্বচ্ছন্দে আপন কাঁধে তুলে নিয়েছিল মানবতার মুক্তির পয়গাম ও মহা দায়িত্ব, দ্বীনের জন্য স্ত্রী-সন্তান, সহায়-সম্পদ তথা দুনিয়ার যাবতীয় কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল, বরণ করেছিল কঠোর ত্যাগের পথ এবং সর্বোপরি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বানিয়েছিল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার, সেই আরব যুবশক্তি আজও আছে কিন্তু সেইসব বোধ ও চেতনা সে হারিয়ে ফেলেছে। তার স্থলে সে ডুবে মরছে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস এবং অর্থহীন জীবন ও কর্মতৎপরতার সাগরে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'হে ইসমাঈলের পুত্রগণ, তীরন্দাযি কর, কারণ তোমাদের পিতা

ইসমাঈল তীরন্দায ছিলেন। অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, শোনো, তীরন্দাযিই হল শক্তি, তীরন্দাযিই হল শক্তি।'[৪৪০] আল্লাহর রাসূল এর দ্বারা হয়তো উম্মতকে আরাম-আয়েশের জীবন ত্যাগ করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার জীবন বরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, গতিই জীবন, পক্ষান্তরে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস জীবনকে অর্থহীন করে তুলে। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদিন তাঁর প্রশাসকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: আরাম-আয়েশ ও আজমি পোশাক থেকে দূরেই থেকো। রোদের অভ্যাস বজায় রাখ, কারণ রোদই হচ্ছে আরবদের স্নান। আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদে রুক্ষ, কঠোর ও সহিষ্ণু হও। মোটা খসখসে ও পুরনো জীর্ণ কাপড়ে অভ্যস্ত হও। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চড়ার ও লক্ষ্যভেদের অভ্যাস কর।

উপরে যা বলা হল তার অপরিহার্য দাবি হল ঈমানী ঐ চেতনা ও শক্তি লাভ করা যার বলে একদিন তারা পারস্য ও রোম শক্তির বিরুদ্ধে আপাতঃঅসম যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। আরব বিশ্বের সরকার, আরব লীগ, ওআইসি- সবার এখন প্রধান কর্তব্য হল আরব যুবশক্তি ও গোটা জাতির দিলে ঈমানের তরতাজা বীজ ও চেতনা বপণ করা, আরাম-আয়েশ এবং ভোগ-বিলাস ও অর্থহীন জীবনের গ্লানি থেকে তাদের জীবনে ত্যাগ ও কল্যাণকামিতা এবং সর্বোপরি পূর্বপুরুষ তথা উম্মাহর হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনার জিহাদী জীবনের শান ও তাৎপর্য সৃষ্টি করা। তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে তারা যদি সত্যিকার মর্যাদা ও গৌরবের জীবন লাভ করতে চায়, অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়, তাহলে এ কেবল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণের দ্বারাই সম্ভব যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষ সাহাবা জামাত করেছিলেন।

---

[৪৪০] বুখারি ও মুসলিম।

সংশোধন পদ্ধতি

ইসলাম এটি নিছক ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক কতগুলো সূত্রের সমষ্টি নয়। এটি একটি বাস্তবমুখী পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এ দীন একটি বিরাট বৃক্ষের মতো। একটি বিরাট সুউচ্চ বৃক্ষ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং তার মাথা আকাশের দিকে উন্নত থাকে। এত বড় বৃক্ষ স্বাভাবিকভাবেই মাটির অনেক গভীরে তার শিকড় প্রোথিত করবে এবং তার আকৃতি অনুসারে চারদিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঐ শিকড় ছড়িয়ে দেবে। এ দীনের অবস্থাও তাই। মানব জীবনের ছোট-বড় সকল বিষয়ে এ দীনের অনুশাসন রয়েছে। এ দীন শুধু ইহকালের বিধান হাজির করে না, পরকালের বিধানও হাজির করে। দৃশ্য অদৃশ্য উভয় জগতের রহস্যও উদ্ঘাটন করে দেয়। এভাবেই এটি একটা দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও বিশাল বৃক্ষের ন্যায় এবং এর শিকড়গুলো বৃক্ষের আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই মাটির গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

ইসলামি জীবন বিধানের এই স্বরূপ থেকে বুঝা যায় যে অন্তরে ঈমানের বীজ যথাযথভাবে বপন করার মধ্য দিয়েই এ দীন সমাজ-রাষ্ট্র সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্তরে- লা-ইলাহা-ইল্লাহর বিশ্বাস ও হাকিকত বদ্ধমূল হয়ে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াই এই কালেমার বাস্তব অর্থ। তখন এর বাইরে যে কোনো বিশ্বাস, কর্ম ও তরিকা ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করে। এভাবে দীনি আইন, বিধান তথা দীন প্রতিষ্ঠার আগেই মুমীনগণ তা গ্রহণের জন্য অন্তরচিত্তে প্রস্তুত থাকে। আত্মসমর্পনের মনোভাবই ঈমানের প্রথম দাবী, আর মনোভাবের দরুনই বিশ্বাসীগণ আগ্রহ ও আনন্দ সহকারে ইসলামের সকল বিধি-ব্যবস্থা মেনে নেয়। আদেশ জারি হবার সাথে সাথেই শির অবনত করে দেয়। আইন বাস্তবায়নের জন্যে তাদের শুধু আদেশ শোনাই যথেষ্ট। এ পথেই জাহেলী যুগের সকল অভ্যাস ও স্বভাব পরিত্যাগ করে একটি সোনালী সমাজ গড়ে উঠতে পেরেছিল। কুরআনের কয়েকটি আয়াত বা নবীর মুখনিঃসৃত বাণীই সে বিপুল পরিবর্তন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর দিকে আমাদের তাকানো প্রয়োজন। প্রতিটি স্তরেই এসব রাষ্ট্রকে আইন পরিষদ, শাসনতন্ত্র, পুলিশ বিভাগ, সামরিক শক্তি, প্রচারযন্ত্র ও প্রেসের উপর নির্ভর করতে হয়। তবু

তারা প্রকাশ্যে আইন লঙ্ঘনের ব্যাপারটিকে আংশিকভাবে দমন করতে সক্ষম হয়। বেআইনী ও নিষিদ্ধ কার্যকলাপে সমাজ পরিপূর্ণই থাকে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আরব সমাজে দুনিয়াবী সমাজ সংস্কারকদের মতো কোনো রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লব বা নীতিবাদী সংস্কার আন্দোলনের ডাক দিতেন তাহলে এ দীন প্রতিষ্ঠার কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। তের বছরের নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করতে হত না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়টি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এসব পথের সমসাময়িক যথেষ্ট যৌক্তিকতা আরব সমাজে ছিল। এসব যে কোনো পথে হাঁটলে তিনি তাঁর বিরাট গ্রহণযোগ্যতার কারণে নিঃসন্দেহে সফল হতেন। অধিকন্তু তাঁকে স্ব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বাণও জানানো হয়েছিল। কিন্তু এসবের কোনো পথেই তিনি অগ্রসর হন নি। তিনি কোনো কীর্তি ও কৃতিত্বও দাবী করেন নি। অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ ও সঠিক জ্ঞানের আধার আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এসব পথ ধরে চলতে দেননি। কারণ তিনি জানতেন যে এসব একটিও সমাজ সংশোধনের প্রকৃত পদ্ধতি নয়। তিনি আল্লাহর দিক নির্দেশনায় ব্যক্তির চরিত্র গঠনের ওপর সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিয়েছেন, এজন্য তিলে তিলে মানুষের ঈমান ও আমলকে গড়ে তুলেছেন; মুসলমানরা যখন ঈমান ও আমলে পরিপূর্ণতা লাভের মাধ্যমে সত্যিকার নৈতিক মানুষে পরিণত হয়েছেন তখন তের বছর পর রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এটিই গোটা সমাজে দীন প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, এই উম্মতের শেষ অংশের সংশোধন সেভাবেই হবে যেভাবে প্রথম অংশের হয়েছিল। আজকের মুসলিম সমাজ সেই জাহেলী সমাজ থেকে কোনো অর্থেই ভিন্ন দাবী করতে পারে না। নামে মুসলিম– শুধু এই পার্থক্য ছাড়া কোনো পার্থক্য আছে কী? এসবেরই মূলে রয়েছে ঈমানী ও আমলী রোগ। এই অবস্থায় শেষ জামানার এই উম্মতের সংশোধনের জন্য সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে যা সর্বজ্ঞ আল্লাহ ঠিক করেছিলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা অনুসরণ করেছিলেন।

অর্থাৎ, আজ মুসলিম উম্মাহর কাজ হবে, সর্বপ্রথম ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য জাতিকে আগে ঈমান ও আমলী রূপে গড়ে তোলা। ব্যক্তির চরিত্র ঠিক না হলে কোনো কর্মসূচীই ফলপ্রসূ হয় না যার ফল আজ আমরা চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। ব্যক্তিই মূল একক যার ভাল-মন্দের ওপর সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাল-মন্দ নির্ভর করে, অথচ আজ এই মূল বিষয়ই এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে সমাজ সংশোধনে বহু অর্থ ও কর্মসূচীর ডামাঢোল হচ্ছে কিন্তু মানুষ ভাল না হয়ে বরং আরো বিগড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রই যেহেতু গঠিত হচ্ছে না ফলে গোটা সমাজ বা রাষ্ট্র তো দূরের কথা একটি পরিবার বা গ্রামই ঠিক করা যাচ্ছে না। এজন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:

১. দীনি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার;
২. দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাজকিয়ায়ে-নফস বা আত্মশুদ্ধির দীক্ষা নিশ্চিত করা;
৩. দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাওয়াতী কাজের শিক্ষা, গবেষণা ও পরিচর্যা;
৪. প্রচলিত দাওয়াতুত্-তাবলিগের ব্যাপক প্রসার ও উন্নয়ন; দাওয়াতুত্-তাবলিগের সঙ্গে মাদারিস ও তাজকিয়ায়ে-নফস- এর সমন্বয় সাধন করা;
৫. প্রতিটি নেতৃত্বস্তরে দাওয়াতের প্রয়োগ;
৬. দাওয়াতী কাজে যুগের তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি।

মুসলিম উম্মাহর জেগে উঠার প্রতীক্ষায়

মুসলিম উম্মাহর এখনই সময় ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করার- যার মাধ্যমে সে অতীতের মতো অপরাপর সকল জাতির বিশুদ্ধ পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিজয়ী হতে পারে। এভাবেই তার পূর্বপুরুষগণ (সাহাবা জামাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) জীবনের সঙ্কীর্ণতা, মানুষ ও বস্তুর গোলামী এবং নানা অনাচার থেকে প্রথমে নিজেরা মুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চির-প্রশস্ততার দিকে প্রবেশ করেছিলেন এবং তারপর বের করে এনছিলেন মুমূর্ষু মানব জাতিকে। এভাবে গোটা মানবসভ্যতা নিশ্চিত ধ্বংস থেকে একটি সোনালী সভ্যতার আলো লাভ করেছিল। মুসলিম উম্মাহকে আজ তার

পূর্বপুরুষের মতো দাওয়াতে ইসলামের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য অপরাপর পথহারা জাতিগোষ্ঠীর সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়িয়ে বলা শুরু করতে হবে: "আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন যেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, বের করে আনি মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে, জাগতিক সঙ্কীর্ণতা থেকে পরকালীন প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।"

মানবজাতি আজ নিজেদের মুক্তি ও ত্রাণকর্তারূপে মুসলিম বিশ্বের দিকে প্রত্যাশার ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন: "তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে, যেন এ দীনকে অপরাপর দীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (তাওবাহ: ৩২-৩৩) মুসলিম উম্মাহর ভীত হওয়ার কিছু নেই, তার শুধু প্রয়োজন জেগে উঠার। ইসলামের নূর কখনও নির্বাপিত হবে না তা অমুসলিম বিশ্ব যতোই চেষ্টা করুক না কেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ সকল ভেদাভেদ, অজ্ঞতা, আলস্য ও উদ্যমহীনতা পিছনে ফেলে পবিত্র নবীর গড়ে তোলা সাহাবা জামাতের প্রাণোদ্দীপনায় সকল বাতিলের বিপক্ষে জেগে না উঠলে, বিশ্ব নেতৃত্বের সকল মঞ্চ নিজ হাতে তুলে না নিলে একদিকে যেমন দাওয়াতে ইসলামের মতো মহান ও পবিত্র দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যদিকে দায়িত্ব পালন না করার কারণে এবং মুমূর্ষু বিশ্বমানবতার দুরাবস্থার জন্য পরকালে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াঁতে হবে।

মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও পতনের যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক দলিল আমরা পেছনে দেখে এসেছি, পাশাপাশি পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার চরিত্র ও অশুভ পরিণতির পরিচয় পেয়েছি এবং পরিশেষে মুসলিম উম্মাহর পুনরুত্থানের যে অবশ্যম্ভাবী গতিপথ অঙ্কনের চেষ্টা করেছি সেসব আমাদেরকে নিঃসন্দেহে এই উপসংহারে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহ একটি পবিত্র ও মহা-

দায়িত্বশীল জাতি, যে দায়িত্ব সে শুধু নিজের প্রতি নয় অধিকন্তু গোটা বিশ্বমানবতার জন্য পরিপূর্ণরূপে পালন করবে। মুসলিম উম্মাহর এই দায়িত্ব পালনের ওপর গোটা বিশ্বের স্থিতি-অস্থিতি নির্ভর করে। মুসলিম বিশ্ব তার এই উত্থান ও সাফল্যের কারণ এবং বিশ্বমঞ্চের সকল অঙ্গন থেকে অধঃপতনের কারণসমূহ থেকে শিক্ষা নিবে; এবং বর্তমান ও আগামী বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ইসলামের শিক্ষামালা তথা মহান ও পবিত্র নবীর সিরাতের আলোকে দীন ও ঈমানী চেতনা, একইসঙ্গে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, শিল্প ও সমর শক্তি, এক কথায় মানব জীবনের সঙ্গে জড়িত সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ সক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করবে। এভাবেই মুসলিম উম্মাহ তার হারানো সম্পদ ও সকল গৌরব ফিরে পেতে পারে, এবং পৃথিবীর আবালবৃদ্ধবণিতার সম্মুখে সকল বাতিলের বিপক্ষে চিরন্তন ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়ে যাবে, যার জন্য বিশ্বমানবতা আজ বড়ো উন্মুখ হয়ে আছে। আল-কুরআনের ভাষায় বলা যায়: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۝ "এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে, তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।" (নজম : ৩৯-৪০)

এসব কারণেই মুসলিম উম্মাহর কাছে মানবজাতির প্রত্যাশা অনেক। কিন্তু তারা কী পারবে এই প্রত্যাশা পুরণ করতে, বিশ্বের আহ্বানে ও আন্দোলনে সাড়া দিতে? হ্যাঁ, তা অবশ্যই, কেননা তাকে এ দায়িত্ব দিয়েই জগতে প্রেরণ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর এজন্য প্রয়োজন বর্তমান আত্মবিনাশী ঘুম থেকে অতি দ্রুতই জেগে ওঠার, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি করার এবং এজন্য পূর্বসূরীদের মতো বেদনাবিধুর এক অস্থির হৃদয় নির্মাণ করার। নদবী রহ. সুন্দর করে লেখেন, মজলুম মানবতা ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত মানবজাতি কবি ইকবালের দরদপূর্ণ কবিতার ভাষায় মুসলিম জাতির কাছে ফরিয়াদ করে আসছে, আর এখনো তারা বিশ্বাস করে, যে নিবেদিতপ্রাণ মানুষের হাত কাবা নির্মাণ করেছিল, ৩৬০ মুর্তির জঞ্জাল থেকে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করেছিল, বিশ্বমানবতাকে টেনে তুলেছিল

ধ্বংসের দুর্গন্ধময় গহ্বর থেকে, তারাই আজ পারবে পৃথিবীর নব-নির্মাণের মহান দায়িত্ব পালন করতে।[৪৪১] কবি ইকবালের ভাষায় যেন মানবজাতির এই ব্যাকুল ফরিয়াদ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে:

হে মুসলিম, উর্ধ্বজগতের শাশ্বত বার্তার তুমি বিশ্বস্ত ধারক
বিশ্বজগতের মহান অধিপতির তুমি নিবেদিত সেবক
হে মাটির বান্দা, যমীন তোমার, যামানা তোমার
ঈমানের শরাব পান করো, কুফুরির বুতখানা থেকে বেরিয়ে এসো
জেগে ওঠো, জেগে ওঠো, ঘুমের ঘোর থেকে ওঠো।
ধিক ফিরিঙ্গিকে ও তার ছলাকলাকে
কখনও সাজে লাইলী, কখনও মজনু
ফিরিঙ্গির চেঙ্গিজিতে জাহান আজ বরবাদ
হে হারামের নির্মাতা, ফিরে এসো বিশ্বের বিনির্মাণের জন্য
জেগে ওঠো, ঘুমের ঘোর থেকে ওঠো।[৪৪২]

মুসলিম উম্মাহর ওপর মহান ও পবিত্র আল্লাহ যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, অর্থাৎ গোটা সমাজ ও বিশ্বকে শান্তির পথে পরিচালিত করতে সে যদি যথার্থ: (১) ঈমান (২) আমলে-সালেহ (৩) সৎকাজের আদেশ ও (৪) অসৎ কাজে নিষেধ- এসব শর্ত প্রতিপালন করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ বলেন:

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (মায়েদা:৫৪)

---

[৪৪১] সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। ২০১৩। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৫৪৬।
[৪৪২] *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৫৪৬-৫৪৭।

এখান থেকে বুঝা যায়, যারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য করবে না, যারা মুমিন-কাফির সবার সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলে, আসলে এরা মুনাফিক এবং যারা শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের সম্মুখে বোবা শয়তান সেজে নিশ্চুপ থাকে তারা জেনে থাকুক যে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ কারো পরোয়া করেন না। এদের জন্য ইসলামের কিছু যায় আসে না কারণ আল্লাহই যথেষ্ট যিনি প্রয়োজনে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যাদের কথা ওপরের আয়াতে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এমন নামধারী মুসলমানরা যে পরকালে ভীষণ পাকড়াওয়ের শিকার হবে তা ঐ আয়াত থেকেই বুঝা যায়। আর আল্লাহর পাকড়াও বড়ই কঠোর।

অন্যদিকে, মুসলমানরা যখন সম্মিলিতভাবে ***নাহি আনিল মুনকার*** এর দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে থাকে যার বিপরীতে সমাজ ও বিশ্বে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, দুর্বলের অধিকার হরণ, মদ-সুদ-জুয়া, অশ্লিলতা ও বেহায়াপনা প্রভৃতি পাপের বাজার চলে অবিরাম গতিতে এবং দিনে দিনে বেড়ে চলে তখন যেহেতু এসবের প্রতিকারে জমিনে কেউ নেই তখন আসমানী ব্যবস্থা (*action*) অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই আসমানী ব্যবস্থার এক নাম হলো ছোট-বড় আযাব-গজব বা শাস্তি যেমন: অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীলাবৃষ্টি, ফসল হানি, ভূমিকম্প, অপমৃত্যু, মহামারী প্রভৃতি যখন এর শাস্তি পাপী-নিষ্পাপ সকলেই ভোগ করে। পাপী শাস্তি ভোগ করে তার পাপের কারণে এবং নিষ্পাপরা শাস্তি ভোগ করে ***নাহি আনিল মুনকার*** এর গুরুদায়িত্ব পালন না করা তথা মৌনতা অবলম্বনের কারণে। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ, আর তোমরা এমন শাস্তি থেকে বেঁচে থাক যা কেবল জালিমদের উপরই পতিত হবে না; আর জেনে রাখ, আল্লাহর শাাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (সুরা আনফাল ৮:২৫)

মুসলমানরা যদি এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ও কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলে যা এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাহলে তারা উভয় জগতেই

মর্যাদা ও শান্তির জীবন লাভ করবে। যারা এরকম যথার্থ মুসলিম হবে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۞ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (কাহাফ : ১০৭) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। (নূর : ৫৫)

সমাপ্ত

প্রাণপ্রিয় আল্লাহ্, অভিভাবক হিসেবে তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট, সত্তায়-গুণে সর্বার্থে তুমি একক, তোমার তুল্য কিছুই নেই; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা, শেষ নবী ও রাসূল। হে আল্লাহ্, তুমি জান, তোমারই করুণাবলে তোমারই সন্তুষ্টিকল্পে এই গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে, হে আল্লাহ্, নিজের রহমগুণে আমার আদবহীনতা ও গুণাহর দিকে না তাকিয়ে এটিকে মানুষের হেদায়াতের ওসিলা বানিয়ে দাও, এর দোষ-ত্রুটি দূর করে একে কল্যাণ ও বরকত দিয়ে ভরে দাও- আমীন, আমীন, আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি:

আজিজুল হক রহ. অনু.। *বুখারী শরীফ*। ৫ম খণ্ড। ঢাকা। হামিদিয়া লাইব্রেরি। ২০০৫।

আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.। *আলোর কাফেলা সমগ্র*। নাসীম আরাফাত ও মাসউদুয যামান অনু. ঢাকা। মাকতাবাতুল আশরাফ। ২০১৩।

আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.। *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন*। মাসউদুর রহমান অনু.। ঢাকা। রাহনুমা প্রকাশনী। ২০১৪।

আফজাল চৌধুরী অনু.। *বার্ণাবাসের বাইবেল*। ঢাকা। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি। ২০১১।

আবুল কালাম আযাদ রহ.। আবদুল মতিন জালালাবাদী অনু.। *রাসূলে রহমত (সা)*। ঢাকা। ইফা। ২০০৯।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনু. *আল-বেরুনীর ভারততত্ত্ব*। ঢাকা। দিব্য প্রকাশ। ২০০৬।

আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহ্ইয়া। *হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি*। ঢাকা। মাকতাবাতুল আযহার। ২০১২।

আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী রহ.। *সীরাতুল মুস্তফা সা.*। ঢাকা। ইফা। ২০১৩।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী রহ.। *ইযহারুল হক*। খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর অনু. ঢাকা। ইফা। ২০০৭।

আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সুলায়মান নদবী রহ.। *সীরাতুন্নবী সা.*। ঢাকা। মদীনা পাবলিকেশন্স। ২০১২।

ইউসুফ আল কারযাভী। *ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী*। চট্টগ্রাম। আহমদ প্রকাশন। ২০১৭।

ইউসুফ আল কারযাভী। *ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা*। ঢাকা। আহসান পাবলিকেশন। ২০১৪।

ইবনে কাসীর রহ.। *তাফসীরে ইবনে কাসীর*। ঢাকা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ২০১২।

ইবনে কাসীর রহ.। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*। ৭ম খণ্ড। ঢাকা। ইফা। ২০০৫।

ইবনে হিশাম রহ.। *সীরাতুন্ নবী (সা.)*। ২য় খণ্ড। ঢাকা। ইফা। ২০১৩।

ইবনে খালদুন। *আল-মুকাদ্দিমা*। গোলাম সামদানী কুরায়শী অনু. ঢাকা। দিব্য প্রকাশ। ২০১২।

ইমাম মালিক রহ.। *মুয়াত্তা*। ঢাকা। ইফা। ২০১৪।

ইমাম আবু হামিদ আল-গাজজ্জালি। *তাহাফাতুল ফলাসিফা*।

ইমাম আবু হামিদ আল-গাজজ্জালি। কিমিয়ায়ে সায়াদাত। ঢাকা:এমদাদিয়া লাইব্রেরি। ২০০৪।
ইমাম আবু হামিদ আল-গাজজ্জালি। *এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন।*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন। *আল-কুরআনে বিজ্ঞান।* ঢাকা। ইফা। ২০১২।
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন। *সীরাত বিশ্বকোষ।* ঢাকা। ইফা। ২০০৩।
এহসানুল করিম। *মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জি।* মোঃ আফতাব হোসেন ও শহীদ উদ্দীন হোসাইন অনু. ঢাকা। ইফা। ২০১৫।
এ. এম. হারুনুর রশীদ। *নোবেল বিজয়ী আবদুস সালাম:আদর্শ* ও বাস্তবতা। ঢাকা। ইউনিভার্সিটি বুক পাবলিশার্স। ২০০১।
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.। *খুতুবাতে হাকিমুল ইসলাম।* ঢাকা। বইঘর। ২০১৫।
কাযী সাদ্দাদ। *আন-নাওয়াদিরুস্-সুলতানিয়া।*
কাজী সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী রহ.। *রাহমাতুল লিল আলামীন।* ঢাকা। মদীনা পাবলিকেশান্স। ২০০৬।
ক্ষিতিমোহন সেন। *হিন্দু ধর্ম।* কলিকাতা। আনন্দ। ২০০৮।
খলিল আহমদ হামেদী। গোলাম সোহবান সিদ্দিকী অনু. *শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী।* ঢাকা। প্রফেসর'স বুক কর্ণার। ২০১২।
গোলাম মোস্তফা। *বিশ্বনবী।* ঢাকা। আহমদ পাবলিশিং হাইজ। ২০১৩।
গোলাম আহমদ মোর্তাজা। *ইতিহাসের ইতিহাস।* ঢাকা। মাকতাবাতুত তাক্বওয়া। ২০১৫।
জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.। *তারীখুল-খুলাফা।* ফজলুল হক শাহ অনু. ঢাকা। মদিনা। ২০১১।
জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী। আবদুল্লাহ আল ফারুক অনু.। *খুতুবাতে জুলফিকার।* ঢাকা। মাকতাবাতুল আযহার। ২০১৫।
তারেক শামসুর রেহমান। ২০১৯। *মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি।* ঢাকা। শোভা প্রকাশ।
দীনেশ চন্দ্র সেন। *বৃহৎ বঙ্গ।* কলকাতা। দেজ। ১৯৯৩।
দীনেশ চন্দ্র সেন। *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান।* ঢাকা। পড়ুয়া। ২০০৮।
বার্ট্রান্ড রাসেল। *রাজনৈতিক আদর্শ।* ঢাকা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। ২০১৫।
বিবিএস। *ইঞ্জিল শরিফ।* ঢাকা। ১৯৮০।
মরিস বুখাইলি রহ.। *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান।* অনু. আখ্তার-উল্-আলম। ঢাকা। জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। ১৯৯৬।
মাওলানা যাকারিয়া রহ.। *হেকায়াতে সাহাবা।* ঢাকা। হামিদিয়া লাইব্রেরী। ২০০৪।

মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. ও মুহাম্মদ তাকী উসমানী। *নূরানী কাফেলা*। মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান অনু. ঢাকা। মাকতাবাতুল আশরাফ। ২০০৮।

মাওলানা হিফযুর রহমান। *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*। মাওলানা আবদুল আউয়াল অনু. ঢাকা। ইফা। ১৯৯৮।

মানবেন্দ্রনাথ রায়। *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান*। মোহাম্মদ আবদুল হাই অনু. কলকাতা। রেনেসাঁস। ২০০৪।

মুসতফা আস-সিবাঈ। *প্রাচ্যবিদের ইসলাম চর্চার নেপথ্যে*। আবদুল্লাহ আল ফারুক অনু. ঢাকা। মাকতাবাতুল আযহার। ২০১৭।

মুসতফা আস সিবাঈ। *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*। আকরাম ফারুক অনু. ঢাকা। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। ২০১০।

মুসতাক আহমদ। *শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী র.* ঢাকা। ইফা। ২০১২।

মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দলভী রহ.। *হায়াতুস্ সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)*। ঢাকা। দারুল কিতাব। ১৯৯৯।

মুহাম্মদ শফি রহ.। মহিউদ্দিন খান অনু. *তফসীরে মা'আরেফুল-কুরআন*। ২০১২। ঢাকা। ইফা।

মুহাম্মদ আব্দুল হাই রহ.। *ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম*। ঢাকা:মদিনা। ২০০৮।

মুহাম্মদ হাকিম চুগতাই। *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*। ঢাকা:মীনা বুক হাউজ। ২০১০।

মুহাম্মদ তাকী ওসমানী দাবা। *ইসলাম ও রাজনীতি*। অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম। ঢাকা। মাকতাবাতুল হেরা। ২০১৪।

মুহাম্মদ তাকী উসমানী দাবা। মুহাম্মদ তৈয়্যেব হোসাইন অনু. *ইসলামি জীবন-ব্যবস্থা*। ঢাকা। বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স। ২০১৪।

মুহাম্মদ তাকী উসমানী দাবা। *ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু*। ঢাকা। দারুল কলম। ২০০৩।

মুহাম্মদ তাকী ওসমানী দাবা। *পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র ও ইসলাম*। ঢাকা। মাকতাবাতুল আযহার। ২০১৫।

মুহাম্মদ তাকী ওসমানী দাবা। *খৃষ্টধর্মের স্বরূপ*। ঢাকা। মাকতাবাতুল আশরাফ। ২০১১।

মুহাম্মদ তাকী ওসমানী দাবা। *সফরনামা*। ঢাকা। মাকতাবাতুল আশরাফ। ২০০৮।

মুহাম্মদ মাদানী রহ.। *হাদীসে কুদসী*। ঢাকা। মীনা বুক হাউজ। ২০১৪।মুহাম্মদ

ইসমাঈল পানিপথী। *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*। মুহিউদ্দীন শামী অনু. ঢাকা। ইফা। ২০১৪।
মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ। *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*। ঢাকা। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। ২০১২।
মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল। *মহানবীর (সা.) জীবন চরিত*। আবদুল আউয়াল অনু. ঢাকা। ইফা। ২০১০।
মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলি। *হিন্দুধর্ম ও ইসলাম জানা-অজানা কথা*। ঢাকা। দারুল আরকাম পাবলিকেশন্স। ২০১২।
মুহাম্মদ নূরুল আমীন। *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*। ঢাকা। আহসান পাবলিকেশন। ২০০৬।
তারা চাঁদ। *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*। এস. মজিব উল্লাহ অনু. ঢাকা। ইফা। ২০১৪।
টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড। *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*। মো: সিরাজ মান্নান ইব্রাহিম ভূঁইয়া অনু. ঢাকা। ইফা। ২০১২।
নূরুল হোসেন খন্দখার। *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*। ঢাকা। ইফা। ২০০৯।
নীহাররঞ্জন রায়। *বাঙালির ইতিহাস*। কলকাতা। দেজ। ১৯৯৩।
ফিলিপ কে. হিট্টি। *আরব জাতির ইতিকথা*। ইব্রাহিম খাঁ অনু. ঢাকা। অবসর। ২০০২।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ.। *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ.। *কুরআন তাফসিরের মূলনীতি*।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.। ২০০৮। *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*। ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই। *সত্যের সন্ধানে*। ঢাকা। মদিনা পাবলিকেশন্স। ১৯৯৫।
শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই। *খ্রিস্টান-মুসলিম সংলাপ*। ঢাকা। দাওয়াহ প্রকাশন। ১৯৯৫।
শীলা বসাক। *বাংলার ব্রতপার্বণ*। কলকাতা। পুস্তক বিপণি। ২০০৮।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *মহানবী (সঃ) ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার*। ঢাকা। মাকতাবাতুল আশরাফ। ২০০৪।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল?* অনু. আবু তাহের মেছবাহ। ঢাকা। দারুল কলম। ২০১৩।

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*। আবু সাঈদ ওমর আলী অনু.। ঢাকা। মুহাম্মদ ব্রাদার্স। ২০১৫।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *নতুন প্রজন্মের* শিক্ষা *ভাবনা*। আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া অনু. ঢাকা। মাকতাবাতুল আযহার। ২০১৫।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *তারুণ্যের প্রদি হৃদয়ের তপ্ত আহবান*। মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন অনু. ও সঙ্কলিত। ঢাকা। মুহাম্মদ ব্রাদার্স। ২০১৫।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *কারওয়ানে জিন্দেগী*। ঢাকা। মুহাম্মদ ব্রাদার্স। ২০১৫।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনু.। *নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*। ঢাকা। মুহাম্মদ ব্রাদার্স। ২০১২।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *প্রাচ্যের উপহার*। আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনু.। ঢাকা। মাকতাবাতুল হেরা। ২০১৬।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *নতুন দাওয়াত নতুন পয়গাম*। জহির উদ্দিন বাবর অনু. ঢাকা। আল ইরফান পাবলিকেশন্স। ২০১০।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী*। আবদুস সাত্তার আইনী অনু. ঢাকা। মাকতাবাতুল ইসলাম। ২০১৭।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান*। আ ফ ম খালিদ হোসেন অনু. ঢাকা। মুহাম্মদ ব্রাদার্স। ২০০৪।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক (বিষয়ে) গবেষণামূলক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা*। মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন অনু.। ঢাকা। মুহাম্মদ ব্রাদার্স। ২০১৫।
সত্যেন সেন। *বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*। ঢাকা। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। ১৯৮৬।
সরদার ফজলুল করিম অনু.। *প্লেটোর ডায়ালগ*। ঢাকা। প্যাপিরাস। ২০০২।
সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ.। *ইসলামি সমাজ বিপ্লবের ধারা*। ঢাকা। আধুনিক প্রকাশনী। ২০১৭।
সৈয়দ আমীর আলী। *দি স্পিরিট অব ইসলাম*। রাশিদুল আলম অনু. কলকাতা। মল্লিক ব্রাদার্স। ১৯৮৭।
সুকুমার সেন। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। ১ম খণ্ড। কলিকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০০০।
হযরত যাকারিয়া রহ.। *হেকায়াতে সাহাবা*।

হযরত হাকীম মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আখতার রহ.। মাওলানা আবদুল মতিন বিন হুসাইন অনু. *আল্লাহপ্রেমের সন্ধানে*। ঢাকা:হাকিমুল উম্মত প্রকাশনী। ২০০৬।
হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম রহ.। ইফা অনু. *যাদুল মায়াদ*। ১৯৯০।
হাফিয আবূ শায়খ ইস্ফাহানী রহ.। মাওলানা মুশতাক আহমদ ও অন্যান্য অনু.। *আখলাকুন্ নবী (সা)*। ঢাকা। ইফা। ২০১৪।
হাসান আজিজুল হক। *সক্রেটিস*। ঢাকা। আলহা প্রকাশন। ১৯৯৯।
অতুলচন্দ্র সেন সংকলিত। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*।
অমর্ত্য সেন। *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*। কলকাতা। আনন্দ। ২০০৭।
আকরব আলী খান। *অবাক বাংলাদেশ:বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*। ঢাকা। প্রথমা। ২০১৭।
এ আর. দেশাই। *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*। কলকাতা। কে. পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী। ১৯৯২।

A.J. Butler. *Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty years of the Roman Dominion*. London. Clarendon Press. 1902.
Arthur Goldschmidt, JR. *A Breif History of Egypt.* New York. Infobase Publishing. 2008.
Bertrand Russell. *History of Western Philosophy*. New York. George Allen & Unwin Ltd. 1946.
Brooks Adams. *The Law of Civilization and Decay*. London. 1889.
C. E. M. Joad. *Philosophy of Our Times*. London. Readers' Union Ltd. 1941.
Derek V. Ager. "The Nature of the Foddil Records." Proceedings of the British Geological Association. Vol. 87. 1976.
Edward Gibbon. *The Decline and Fall of The Roman Empire*. London. J. M. Dent & Sons Ltd. 1938.
Encyclopedia Britanica.
Gordon R. Taylor. *The Great Evolution Mystery*.
Harold Lamb. *Genghis Khan*. London. 1928.
Halide Edib. *Conflict of East and West in Turkey*. Delhi. Jamia Millia Islamia. 1935.
H.G. Wells. *A Short History of the World*. World Public Library. 2010.

Historian's History of the World.
James McKee. *Introduction to Sociology*. Michigan. Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1969.
John William Drapar. *History of the Conflict between Religion and Science*. New York. D. Apleton & Company. 1875.
Jowharlal Neheru. *Discovery of India*.
Judd Harmon. *Political Thought from Plato to the Present*. N.Y. Mc Graw Hill, 1961.
Karen Armstrong. *Jerusalem. One City, Three Faiths*. New York. Ballantine Books. 2005.
Maurice Bucaille. *The Bible, The Qur'an and Science*. Translated from French by Alastair D. Pannell and The Author.
Mohammad Asad. *Islam at the Cross-Road*. Dar Al-Andalus, Gibraltar.
M. H. Hart. *The 100*. Kuala Lumpur. Golden Books Centre SDN, BHD. 2000.
Max Weber. *Religion of India*. Trans. and edt. by Hans H. Gerth and Don Martindale. Glencoe. The Free Press. 1958.
Michel Piltman. *Adam and Evolution*. London. River Publishing.1984.
Mark Czarnecki. "The Revival of the Creationist Crusade. 1981.
Robert Briffault. *The Making of Humanity*. London. George Allen & Unwin Ltd. 1919.
Stanley Lane-poole. *Saladin*. London. G.P.Putnams Son. 1898.
Vernon J. Bourke. *Ethics*. New York. The Macmillan Company. 1966.
Vidya Dhar Mahajan. *Political Theory*. New Delhi. S. Chand & Company Ltd. 1988.
W. E. H. Lecky. *History of European Morals*. New York. Longmans, Green and Co. 1913.
Warren Weaver. "Genetic Effects of Atomic Radiation." Science. Vol. 123, June 29. 1956.
Will Durant. *Our Oriental Heritage*. New York. Grove Press. 1963.
Will Durant.*The Story of Civilization*. Vol. 1. New York. Simon & Schuster. 1942.

লেখক পরিচিতিঃ

ড. মোহাম্মদ শামীম খান, জন্ম ১৯৭৪ খ্রি., সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ। পড়ালেখা: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ও নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া। সামাজিক বিজ্ঞানে সাম্মানিক স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি (আইবিএস, রাবি)। লেখালেখির চর্চা দীর্ঘদিনের, প্রবন্ধের মাধমে লেখালেখির শুরু। স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক, বিভিন্ন ম্যাগাজিন প্রভৃতিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। গবেষণা জার্নালে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে লিখেছেন ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবই- *পরিবেশ ও সমাজ পরিচিতি*। পেশাজীবনে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের একজন সদস্য, অধ্যাপনায় নিয়োজিত।